এহ্ইয়াউ উলুমিদ্দীন
(দ্বিতীয় খণ্ড)
ইমাম গায্যালী (রহঃ)
অনুবাদ
মুহিউদ্দীন খান
প্রকাশক
মদীনা পাবলিকেশান্স-এর পক্ষে
মোর্তজা বশীরউদ্দীন খান
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১১৪৫৫৫
প্রথম প্রকাশ
রমযান ১৪০৭ হিজরী
৬ষ্ঠ সংস্করণ
জমাদিউস সানী ১৪২৬ হিজরী
জুলাই ২০০৫ ইংরেজী
আষাঢ় ১৪১২ বাংলা
মুদ্রণ ও বাঁধাই
মদীনা প্রিন্টার্স
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মূল্য : ১৭০.০০ টাকা
ISBN : 984-8631-021-5

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদকের আরজ

সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মুসলিম দার্শনিক ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল্-গায্যালী রচিত 'এহইয়াউ উলুমিদ্দীনঃ বিগত আট শতাধিক বছর ধরে সমগ্র মুসলিম জাহানে সর্বাধিক পঠিত একটি মহাগ্রন্থ। তাঁর এ অমরগ্রন্থ যেমন এক পথভ্রান্ত মুসলমানদের মধ্যে নতুন জাগরণের সৃষ্টি করেছিল, তেমনি আজ পর্যন্তও মুসলিম মানসে দ্বীনের সঠিক চেতনা সৃষ্টির ক্ষেত্রে এ গ্রন্থটিকে অনন্য এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বীরূপে গণ্য করা হয়।

যুগশ্রেষ্ঠ আলেম ইমাম গায্যালী (রাহঃ) জীবনের প্রথম দিকে ছিলেন শাসন কর্তৃপক্ষের নৈকট্যপ্রাপ্ত একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। অন্যান্য আমীর-ওমারাগণের মতই তাঁর জীবনযাত্রাও ছিল বর্ণাঢ্য। কিন্তু ভোগ-বিলাসপূর্ণ জীবনযাত্রার মধ্যেও তাঁর ভেতরে লুকিয়ে ছিল মুমিনসুলভ একটি সংবেদনশীল আত্মা, যা সমকালীন মুসলিম জনগণের ব্যাপক স্খলন-পতন লক্ষ্য করে নীরবে অশ্রুবর্ষণ করতো। ইহুদী-নাসারাদের ভোগসর্বস্ব জীবনযাত্রার প্রভাবে মারাত্মকভাবে আক্রান্ত মুসলিম জনগণকে ইসলামের সহজ-সরল জীবনধারায় কি করে ফিরিয়ে আনা যায়, এ সম্পর্কে তিনি গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতেন। কোন কোন সময় এ চিন্তা তাঁকে আত্মহারা করে ফেলতো। এ ভাবনা-চিন্তারই এক পর্যায়ে এ সত্য তাঁর দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো যে, বর্তমানে মৃতকল্প মুসলিম জাতিকে নবজীবনে উজ্জীবিত করে তোলা একমাত্র দ্বীনের স্বচ্ছ আবে হায়াত পরিবেশনের মাধ্যমেই সম্ভব। আর তা বিলাসপূর্ণ জীবনের অর্গলে নিজেকে আবদ্ধ করে রেখে পরিবার-পরিজন এবং ঘর-সংসারসহ সবকিছুর মায়া ত্যাগ করে নিরুদ্দেশের পথে বের হয়ে পড়লেন। একদা বহুমূল্য পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করা ছিল যাঁর সর্বক্ষণের অভ্যাস, সে ব্যক্তিই মোটা চট-বস্ত্রে আব্রু ঢেকে দিনের পর দিন নানা স্থানে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

নিরুদ্দিষ্ট জীবনে ইমাম সাহেব পবিত্র মক্কা, মদীনা, বাইতুল মোকাদ্দাসসহ বহু স্থান ভ্রমণ করেন। দামেশকের জামে মসজিদের মিনারার নীচে নিতান্ত অপরিসর একটি প্রায় অন্ধকার কামরায় তিনি অনেকগুলি দিন তপস্যারত অবস্থায় কাটিয়ে দেন।

ইমাম সাহেবের এ কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ তাপস জীবনেরই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান ফসল এহইয়াউ উলুমিদ্দীন বা দ্বীনী এলেমের সঞ্জীবনী সুধা। এ গ্রন্থে ইসলামী এলেমের প্রতিটি দিক পবিত্র কোরআন-সুন্নাহ, যুক্তি ও অনুসরণীয় মনীষীগণের বক্তব্য দ্বারা যেভাবে বোঝানো হয়েছে, এমন রচনারীতি এক কথায় বিরল। বিশেষতঃ এ গ্রন্থটির দ্বারাই ইমাম সাহেব 'হুজ্জাতুল ইসলাম' বা ইসলামের যুক্তিঋদ্ধ কণ্ঠ উপাধিতে বরিত হয়েছেন। সমগ্র উম্মাহ তাঁকে একজন ইমামের বিরল মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে।

এ মহাগ্রন্থের প্রভাবেই হিজরী ৬ষ্ঠ শতকের সূচনাকালে ইসলামের ইতিহাসে একটা উল্লেখযোগ্য পট-পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। নূরুদ্দীন জঙ্গী, সালাহউদ্দীন আউয়ুবী প্রমুখ ইসলামের বহু বীর সন্তান– যাঁদের নিয়ে মুসলিম উম্মাহ গর্ব করে থাকে, এঁরা সবাই ছিলেন ইমাম গায্‌যালীর ভাবশিষ্য, এহইয়াউ উলুমিদ্দীন-এর ভক্ত পাঠক।

এ অমর গ্রন্থটি এ পর্যন্ত বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বাংলাভাষায় এর একটি পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ ছাড়া আরও একাধিক খণ্ড অনুবাদের প্রচেষ্টা লক্ষ্যগোচর হয়েছে। অগ্রপথিকগণের সেসব মহৎ প্রচেষ্টার প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেও বলতে চাই, এ মহাগ্রন্থটি বাংলাভাষাভাষীগণের সামনে নতুন করে পরিবেশন করার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করেই আমরা এ কষ্টসাধ্য কাজে হাত দিয়েছি। অবশ্য আমাদের সে উপলব্ধির যৌক্তিকতা বিজ্ঞ পাঠকগণই উদঘাটন করতে পারবেন।

খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে গ্রন্থটির চতুর্থ সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছে দেখে আমরা আনন্দিত। প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের কিছু ভুলত্রুটির প্রতি অনেকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এ সংস্করণে যথাসাধ্য সেগুলি সংশোধন করা হয়েছে। যারা এ ব্যাপারে কষ্ট করে আমাদেরকে অবহিত করেছেন তাঁদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। আল্লাহ্ পাক সংশ্লিষ্ট সকলকে এর সুফল দান করুন। এ সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে মদীনা পাবলিকেশান্স থেকে। আল্লাহ পাক কবুল করুন।

বিনীত

মুহিউদ্দীন খান

মাসিক মদীনা কার্যালয়, ঢাকা।

সূচীপত্র

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ত্রয়োদশ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অষ্টম অধ্যায়

কোরআন তেলাওয়াতের আদব

প্রকাশ থাকে যে, বান্দাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার বড় অনুগ্রহ হচ্ছে, তিনি নবী করীম (সাঃ) দ্বারা তাদেরকে গৌরবান্বিত করেছেন এবং অবতীর্ণ কিতাব কোরআন দ্বারা তাদের উপর আনুগত্যের দায়িত্ব চাপিয়েছেন। কোরআন এমন এক ঐশীগ্রন্থ, যার মধ্যে অগ্র বা পশ্চাৎ থেকে মিথ্যা অনুপ্রবেশ করে না। চিন্তাশীলদের জন্যে এর কিস্সা-কাহিনী ও বর্ণনা দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ করার অবকাশ রয়েছে। এ গ্রন্থে বিধি-বিধানের বিশদ বর্ণনা এবং হালাল হারাম পৃথকীকরণের সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে বিধায় এর মাধ্যমে সরল সঠিক পথে চলা সহজতর হয়ে গেছে। কোরআনই সত্যিকার আলো-নূর। এর মাধ্যমেই বিভ্রান্তি থেকে মুক্তি পাওয়া যায় এবং ঈমান ও তওহীদে ব্যাধি দেখা দিলে তা থেকে আরোগ্য লাভ করা যায়। উদ্ধতদের মধ্যে যে এই কোরআনের বিরোধিতা করেছে, আল্লাহ তাআলা তার কোমর ভেঙ্গে দিয়েছেন। যে এই গ্রন্থ ছাড়া অন্য গ্রন্থে জ্ঞান অন্বেষণ করেছে, সে আল্লাহর নির্দেশ থেকে পথভ্রান্ত হয়েছে। হাবলে মতীন (সুদৃঢ় রশি), নূরে মুবীন (প্রোজ্জ্বল আলো) এবং ওরওয়া ওসকা (মজবুত বন্ধন)-এর বিশেষণ এবং স্বল্প-বিস্তর ও ছোট-বড় সবকিছুকে পরিব্যাপ্ত করা এর কাজ। এর বৈচিত্র্যাবলীর না আছে কোন শেষ এবং জ্ঞানীদের কাছে এর উপকারিতাসমূহের না আছে কোন চূড়ান্ত সীমা। তেলাওয়াতকারীদের কাছে অধিক তেলাওয়াতে একে পুরানো মনে হয় না; বরং প্রতিবারই নতুনত্বের স্বাদ পাওয়া যায়। এ গ্রন্থই পূর্ববর্তী সকল মানুষকে পথ প্রদর্শন করেছে। জ্বিনরা এ কিতাব শ্রবণ করে দ্রুত তাদের সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছে

এভাবে তাদেরকে অবহিত করে ঃ

فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ـ

অর্থাৎ তারা বলল ঃ আমরা এক অত্যাশ্চর্য কোরআন শ্রবণ করেছি, যা সৎপথে পরিচালনা করে। আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। এখন থেকে আমরা আমাদের পালনকর্তার সাথে কাউকে শরীক করব না।

যে এ গ্রন্থের প্রতি ঈমান আনে, সে-ই তওফীকপ্রাপ্ত এবং যে এতে বিশ্বাসী হয়, সে-ই সত্যায়নকারী; যে একে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করে, সে হেদায়াত পায় এবং যে এর নীতি পালন করে সে ভাগ্যবান ও সাফল্যমণ্ডিত হয়।

এ গ্রন্থ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ـ

অর্থাৎ আমি কোরআন নাযিল করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষণ করব।

মানুষের অন্তরে ও সহীফাতে একে সংরক্ষিত রাখার উপায় হচ্ছে দৈনন্দিন তেলাওয়াত, এর আদব ও শর্তের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং তাতে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ আমল এবং শিষ্টাচার পালন করা। এ কারণেই এসব বিষয় বিস্তারিত বর্ণনা করা জরুরী। নিম্নে চারটি শিরোনাম এসব দিয়ে বর্ণিত হবে।

কোরআন মজীদের ফযীলত

রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোরআন তেলাওয়াত করার পর মনে করে, কেউ হয়তো তার চেয়ে বেশী সওয়াব লাভ করেছে, সে ঐ বিষয়কে ক্ষুদ্র মনে করে, যা আল্লাহ্ বৃহৎ করেছেন।

০ কেয়ামতের দিন কোন সুপারিশকারী কোরআন অপেক্ষা বড় মর্তবার হবে না-না কোন নবী, না ফেরেশতা এবং না অন্য কোন ব্যক্তি।

০ যদি কোরআন চামড়ার মধ্যে থাকে, তবে তাতে আগুন লাগবে না।

০ আমার উম্মতের উত্তম এবাদত হচ্ছে কোরআন তেলাওয়াত।

০ সৃষ্টজগত সৃষ্টি করার হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ তাআলা সূরা তোয়াহা ও ইয়াসীন পাঠ করেন। ফেরেশতারা শুনে বলল ঃ এই কোরআন যাদের প্রতি অবতীর্ণ হবে, তারা কতই না ভাগ্যবান। যে সকল অন্তর একে হেফ্য করবে তারা এবং যে সকল মুখে এটি পঠিত হবে তারা কত সুখী।

০ তোমাদের মধ্যে সে-ই উত্তম যে কোরআন শেখে ও অপরকে শিক্ষা দেয়।

০ আল্লাহ বলেন ঃ কোরআন পাঠ যে ব্যক্তিকে আমার কাছে সওয়াল ও দোয়া থেকে বিরত রাখে, আমি তাকে শোকরকারীদের চেয়ে উত্তম সওয়াব দান করি।

কেয়ামতের দিন তিন ব্যক্তি কাল মেশকের স্তূপের উপর অবস্থান করবে। তারা ভীত হবে না এবং তাদের কাছ থেকে হিসাব নেয়া হবে না যে পর্যন্ত না অন্য লোকদের পারস্পরিক ব্যাপারাদি সম্পন্ন হয়ে যায়। তাদের মধ্যে একজন সে ব্যক্তি, যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে কোরআন পাঠ করে, মানুষের ইমাম হয় এবং তারা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকে।

০ কোরআন তেলাওয়াত কর এবং মৃত্যুকে স্মরণ কর।

০ গায়িকা বাঁদীর গান তার মালিক যতটুকু শুনে, আল্লাহ্ কারীর কোরআন পাঠ তার চেয়ে অধিক শুনেন।

হযরত আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) বলেন ঃ কোরআন পাঠ কর এবং ঝুলন্ত কোরআন যেন তোমাকে বিভ্রান্ত না করে; অর্থাৎ কোরআন তোমার কাছে আছে এটাই যথেষ্ট মনে করো না। কারণ, যে অন্তর কোরআনের পাত্র, আল্লাহ্ তাকে আযাব দেন না।

হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ যখন তুমি জ্ঞানার্জনের ইচ্ছা কর, তখন কোরআন অধ্যয়ন কর। কেননা, এতে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষের জ্ঞান বিদ্যমান রয়েছে। এটাও তাঁরই উক্তি যে, তোমরা কোরআন পাঠ কর। তোমরা এর প্রত্যেকটি হরফের বদলে দশটি করে সওয়াব পাবে। আমি বলি না যে, আলিফ লাম মীম এক হরফ; বরং আলিফ এক হরফ,লাম দ্বিতীয় হরফ এবং মীম তৃতীয় হরফ। তিনি আরও বলেন ঃ

তোমাদের মধ্যে কেউ যখন নিজের কাছে দরখাস্ত করে তখন যেন কোরআনেরই দরখাস্ত করে। কারণ, কোরআনের সাথে মহব্বত রাখলে আল্লাহ ও রসূলের সাথে মহব্বত রাখবে। পক্ষান্তরে কোরআনের প্রতি শত্রুতা রাখলে আল্লাহ ও রসূলের প্রতি শত্রুতা রাখবে।

আমর ইবনুল আস (রাঃ) বলেন ঃ কোরআনের প্রত্যেকটি আয়াত জান্নাতের এক একটি স্তর এবং তোমাদের গৃহের প্রদীপ। তিনি আরও বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোরআন পাঠ করে, তার উভয় পার্শ্বে নবুওয়ত লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। পার্থক্য হল তার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয় না।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেনঃ যে গৃহে কোরআন পঠিত হয়, গৃহবাসীদের জন্য সেটি প্রশস্ত হয়ে যায়, তার কল্যাণ বেড়ে যায় এবং তাতে ফেরেশতা আগমন করে ও শয়তান বের হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যে গৃহে কোরআন পাঠ করা হয় না, সেই গৃহবাসীদের জন্য সেটি সংকীর্ণ হয়ে যায়, তার কল্যাণ হ্রাস পায় এবং ফেরেশতা চলে যায় ও শয়তান এসে বাসা বেঁধে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) বলেনঃ আমি আল্লাহ তাআলাকে স্বপ্নে দেখে আরজ করলাম ঃ ইলাহী, যে সকল বিষয় দ্বারা তোমার নৈকট্য অর্জন করা হয়, সেগুলোর মধ্যে উত্তম কোন্ বিষয়টি? আল্লাহ বলেন ঃ হে আহমদ , সর্বোত্তম বিষয় হচ্ছে আমার কালাম দ্বারা নৈকট্য অর্জন করা। আমি বললামঃ ইলাহী, অর্থ বুঝে, না অর্থ বুঝা ছাড়াই? আদেশ হল ঃ উভয় প্রকারে।

মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরাযী বলেনঃ কেয়ামতের দিন মানুষ যখন আল্লাহ তাআলার কোরআন পাঠ শুনবে, তখন মনে হবে যেন তারা ইতিমধ্যে তেমনটি আর শুনেনি।

ফোযায়ল ইবনে আয়ায (রহঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোরানের হাফেয তার এমন হওয়া উচিত যে, বাদশাহ থেকে নিয়ে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত কারও কাছে তার কোন প্রয়োজন নেই; বরং সকল মানুষ তারই মুখাপেক্ষী। তিনি আরও বলেনঃ কোরআনের হাফেয ইসলামের ধ্বজাধারী।

তার উচিত ক্রীড়াকৌতুক ও বাজে বিষয়াদিতে মশগুল না হওয়া। এটাই কোরআনের তাযীমের দাবী।

সুফিয়ান সওরী (রঃ) বলেন ঃ মানুষ যখন কোরআন পাঠ করে, তখন ফেরেশতা তার উভয় চোখের মাঝখানে চুম্বন করে। আমর ইবনে মায়মুন বলেন ঃ যে ব্যক্তি ফজরের নামাযান্তে কোরআন খুলে একশ আয়াত পাঠ করে, আল্লাহ তাআলা তাকে সমগ্র বিশ্ববাসীর আমলের সমান সওয়াব দান করেন।

বর্ণিত আছে, খালেদ ইবনে ওকবা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরজ করলেন ঃ আমার সামনে কোরআন পাঠ করুন। তিনি إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ আয়াতটি শেষ পর্যন্ত পাঠ করলেন। খালেদ আরজ করলেন ঃ আবার পাঠ করুন। তিনি পুনরায় পাঠ করলেন। খালেদ বললেন ঃ এতে মিষ্টতা ও মাধুর্য আছে। এর নিম্নভাগ বৃষ্টির মত বর্ষণ করে এবং উপরিভাগ অনেক ফলবান। এটা মানুষের কথা নয়।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহর কসম, কোরআনের চেয়ে বেশী মূল্যবান কোন সম্পদ নেই এবং এরপরে কোন অভাবও নেই। ফোযায়ল (রহঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি সূরা হাশরের শেষভাগ সকাল বেলায় পাঠ করে এবং সেদিন মারা যায়, তার জন্যে শহীদের মোহর অংকিত হবে। যে বিকাল বেলায় পাঠ করে এবং সে রাতে মারা যায়, তার অবস্থাও তদ্রূপ হবে।

কাসেম ইবনে আবদুর রহমান বলেন ঃ আমি জনৈক আবেদকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ এখানে তোমার অন্তরঙ্গ সঙ্গী কেউ নেই? সে কোরআন মজীদের দিকে হাত বাড়িয়ে সেটি আপন কাঁধে রাখল এবং বলল ঃ এটি আমার অন্তরঙ্গ সঙ্গী।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ তিনটি বিষয় দ্বারা স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং শ্লেষ্মা দূর হয়- মেসওয়াক করা, রোযা রাখা এবং কোরআন পাঠ করা।

গাফেলদের তেলাওয়াতের নিন্দা ঃ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন ঃ অনেক মানুষ কোরান তেলাওয়াত করে, অথচ কোরআন তাদেরকে অভিসম্পাত করে।

মায়সারা বলেন ঃ পাপাচারী ব্যক্তির পেটে কোরআন মুসাফির ও অসহায়।

আবু সোলায়মান দারানী বলেন ঃ কোরআনের হাফেয যখন কোরআন পাঠের পর আল্লাহ্ তাআলার নাফরমানী করে, তখন দোযখের ফেরেশতা মূর্তিপূজারীদের তুলনায় এরূপ হাফেযকে দ্রুত পাকড়াও করে।

জনৈক আলেম বলেন ঃ যখন কেউ কোরান পাঠ করে, এর পর অন্য কথাবার্তা তাতে মিলিয়ে দেয় এবং পুনরায় কোরআন পাঠ করতে থাকে, তখন তাকে বলা হয়– আমার কালামের সাথে তোর কি সম্পর্ক?

ইবনে রিমাহ্ বলেন ঃ আমি কোরআন হেফয করে অনুতাপ করেছি। কেননা, আমি শুনেছি, কেয়ামতে কোরআন ওয়ালাদেরকে সেই প্রশ্ন করা হবে, যা পয়গম্বরগণকে করা হবে।

হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ কোরআনের হাফেযকে অনেকভাবে চেনা যায়– রাতে, যখন মানুষ নিদ্রিত থাকে, (২) দিনে, যখন মানুষ ক্রুটি করে, (৩) তার দুঃখে যখন মানুষ আনন্দিত হয়, (৪) তার কান্নার কারণে যখন মানুষ হাসে, (৫) তার চুপ থাকার কারণে যখন মানুষ এদিকে ওদিকের বাক্যালাপে মশগুল হয় এবং (৬) তার বিনয়ের কারণে যখন মানুষ অহংকার করে। হাফেযের উচিত অধিক চুপ থাকা এবং নম্র হওয়া- নির্দয়, কথায় বাধাদানকারী, হট্টগোলকারী ও কঠোর হওয়া উচিত নয়।

রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ এই উম্মতের অধিকাংশ মোনাফেক কারী হবে। তিনি আরও বলেন ঃ যে পর্যন্ত কোরআন তোমাকে মন্দ কাজ করতে বারণ করে, সে পর্যন্ত কোরআন পাঠ কর। কোরআনের তেলাওয়াত মন্দ কাজে বাধা না দিলে তুমি কোরআন তেলাওয়াত করো না। অর্থাৎ এরূপ পড়া ও না-পড়া সমান। হাদীসে আরও বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি

কোরআনের হারামকৃত বিষয়কে হালাল মনে করে, কোরআনের সাথে তার পরিচয় হয়নি। জনৈক মনীষী বলেন ঃ বান্দা এক সূরা তেলাওয়াত শুধু করে আর ফেরেশতা তার জন্যে রহমতের দোয়া করে। সূরা শেষ হওয়া পর্যন্ত এই দোয়া চলে। কতক বান্দা সূরা শুরু করে এবং ফেরেশতা সূরা শেষ হওয়া পর্যন্ত তার প্রতি অভিসম্পাত করে। কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ এরূপ হয় কেন? তিনি বললেন ঃ কোরআনের হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম জানলে ফেরেশতা রহমতের দোয়া করে, নতুবা অভিসম্পাত করে।

জনৈক আলেম বলেন ঃ মানুষ কোরান তেলাওয়াত করে এবং অজ্ঞাতে নিজেকে অভিসম্পাত করে। অর্থাৎ সে বলে ঃ اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ। খবরদার, যালেমের প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত, অথচ যালেম সে নিজেই। সে নিজের উপর যুলুম করে। সে আরও বলে ঃ اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ। খবরদার মিথ্যাবাদীদের প্রতি আল্লাহর লানত; অথচ সে নিজেই একজন মিথ্যাবাদী। হযরত হাসান বসরী বলেনঃ তোমরা কোরআনকে মনযিল এবং রাত্রিকে উট সাব্যস্ত করেছ। উটে সওয়ার হয়ে মনযিল অতিক্রম কর। তোমাদের পূর্ববর্তীরা কোরআনকে পালনকর্তার ফরমান মনে করত। তারা রাতে এর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করত এবং দিনে তা পালন করত।

হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ কোরআন অনুযায়ী আমল করার জন্যেই কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু লোকেরা এর পড়া ও পড়ানোকেই আমল মনে করে নিয়েছে। এক ব্যক্তি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোরআন পাঠ করে এবং এর একটি হরফও ছাড়ে না; কিন্তু তদনুযায়ী আমল করে না।

হযরত ইবনে ওমর ও জুন্দুব (রাঃ)-এর হাদীসে আছে– আমাদের এত বয়স হয়েছে। আমাদের সময়ে মানুষ কোরআনের পূর্বে ঈমান লাভ করত। যখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি কোন সূরা নাযিল হত, তখন তারা সেই সূরার হালাল ও হারাম শিখত, আদেশ ও নিষেধ সম্পর্কে অবগত হত এবং বিরতির স্থান সম্পর্কেও জ্ঞান অর্জন করত; কিন্তু এর পরে আমরা এমন লোক দেখেছি যারা ঈমানের পূর্বে কোরআন প্রাপ্ত হয়েছে। তারা আলহামদু

থেকে নিয়ে কোরআনের শেষ সূরা পর্যন্ত পড়ে যায়; কিন্তু এতে আদেশ নিষেধের আয়াত কোন্‌টি এবং বিরতির জায়গা কোথায় তা কিছুই বুঝে না, ব্যস কেবল ঘাসের মত কেটে চলে যায়।

তওরাতে বর্ণিত আছে– আল্লাহ বলেন ঃ হে আমার বান্দারা, তোমাদের লজ্জা নেই; পথে চলা অবস্থায় যদি কারও চিঠি তোমাদের হাতে আসে, তোমরা পথের পার্শ্বে চলে যাও এবং চিঠির এক একটি শব্দ পাঠ কর। তার কোন মর্ম ছাড় না। অথচ আমি তোমাদের প্রতি আমার কিতাব নাযিল করেছি। এতে এক একটি বিষয় একাধিকবার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ব্যাখ্যা করেছি, যাতে তোমরা তার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ হৃদয়ঙ্গম কর; কিন্তু তোমরা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। আমি কি তোমাদের কাছে পত্রদাতার চেয়ে অধম হয়ে গেলাম? তার পত্র মনোযোগ সহকারে পাঠ কর আর আমার কিতাবের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন কর? তোমাদের কোন ভাই মাঝখানে কথা বললে তাকে থামিয়ে দাও। আমিও তোমাদের প্রতি অভিনিবেশ করি এবং তোমাদের সাথে কথা বলি; কিন্তু তোমরা মনে প্রাণে আমার দিক থেকে বিমুখ থাক। আমার মর্যাদা কি তোমাদের ভাইয়ের সমানও নয়?

তেলাওয়াতের বাহ্যিক আদব

যে তেলাওয়াত করবে, তার ওযু থাকতে হবে। সে দন্ডায়মান হোক অথবা উপবিষ্ট, উভয় অবস্থায় আদব ও গাম্ভীর্য থাকতে হবে। চারজানু হয়ে, বালিশে হেলান দিয়ে অহংকারের ভঙ্গিতে বসবে না। একাকী এমনভাবে বসবে, যেমন ওস্তাদের সামনে বসা হয়। তেলাওয়াতের সর্বোত্তম অবস্থা হচ্ছে মসজিদে নামাযে দাঁড়িয়ে তেলাওয়াত করা। এরূপ তেলাওয়াত সর্বোত্তম আমল। যদি ওযু ছাড়া শুয়ে শুয়ে কোরআন পড়া হয়, তাতেও সওয়াব পাওয়া যাবে; কিন্তু ওযুসহ দাঁড়িয়ে পড়ার মত সওয়াব হবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ ـ

যারা আল্লাহর যিকির করে দাঁড়িয়ে, বসে, পার্শ্বের উপর শুয়ে এবং পৃথিবী ও আকাশমন্ডলীর সৃজন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে।

এ আয়াতে সকল অবস্থারই প্রশংসা করা হয়েছে; কিন্তু দাঁড়িয়ে যিকির করার কথা বলা হয়েছে। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি নামাযে দাঁড়িয়ে কোরআন তেলাওয়াত করে, সে প্রত্যেক হরফের বদলে একশ'টি সওয়াব পায়। যে নামাযে বসে কোরআন তেলাওয়াত করে সে প্রত্যেক হরফের বদলে পঞ্চাশটি সওয়াব পায় এবং যে ওযু ছাড়া পাঠ করে সে দশটি নেকী পায়। রাতের বেলায় নামাযে দাঁড়িয়ে পড়া সর্বোত্তম। কেননা, রাতের বেলায় মন খুব একাগ্র থাকে । হযরত আবু যর গেফারী (রাঃ) বলেন ঃ রাতের বেলায় বেশীক্ষণ দাঁড়ানো ভাল এবং দিনের বেলায় অধিক সেজদা ভাল। কেরাআত কম-বেশী পাঠ করার ব্যাপারে মানুষের অভ্যাস ভিন্ন ভিন্ন। কেউ দিবারাত্রির মধ্যে এক খতম করে, কেউ দু'খতম এবং কেউ তিন খতম পর্যন্ত করেছেন। আবার কেউ এক মাসে এক খতম করে। এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এ উক্তি অনুসরণ করা উত্তম ঃ من قرا القران فى اقل من ثلاث لم يفقهه -

যে ব্যক্তি তিন দিনের কমে কোরআন খতম করে, সে কোরআন বুঝে না। কারণ, এর বেশী পাঠ করা যথার্থ তেলাওয়াতের পরিপন্থী। হযরত আয়েশা (রাঃ) এক ব্যক্তি সম্পর্কে শুনলেন, সে অত্যন্ত দ্রুত কোরআন পাঠ করে । তিনি বললেন ঃ এ ব্যক্তি কোরআনও পড়ে না- চুপ করেও থাকে না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত ইবনে ওমরকে বললেন ঃ সপ্তাহে এক খতম কর। কয়েকজন সাহাবী এরূপই করতেন। যেমন হযরত ওসমান (রাঃ), যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ), ইবনে মসউদ (রাঃ), উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) প্রমুখ। মোট কথা, কোরআন খতমের চারটি স্তর রয়েছে। প্রথম, দিবা-রাতে এক খতম করা। একে কেউ কেউ মাকরূহ বলেছেন। দ্বিতীয়, প্রত্যহ এক পারা পড়ে মাসে এক খতম করা। এ পরিমাণটি খুবই কম, যেমন প্রথমটি খুবই বেশী। তৃতীয়, সপ্তাহে এক খতম করা। চতুর্থ, সপ্তাহে দু'খতম করা, যাতে তিন দিনের কাছাকাছি

সময়ে এক খতম হয়ে যায়। এমতাবস্থায় মোস্তাহাব হচ্ছে, এক খতম দিনে শুরু করবে এবং এক খতম রাতে। দিনের খতমকে সোমবারে ফজরের দু'রাকআতে অথবা দু'রাকআতের পরে আর রাতের খতম জুমআর দিনের রাতে মাগরিবের দু'রাকআতে অথবা দু'রাকআতের পরে সমাপ্ত করবে। যাতে দিনের শুরুতে এবং রাতের শুরুতে উভয় খতম সমাপ্ত হয়। কেননা, রাতে খতম হলে ফেরেশতা সকাল পর্যন্ত তেলাওয়াতকারীর জন্য রহমতের দোয়া করতে থাকে এবং দিনে খতম হলে সন্ধ্যা পর্যন্ত রহমতের দোয়া করতে থাকে। সুতরাং দিন ও রাত্রির শুরুভাগে খতম করার ফায়দা এই যে, ফেরেশতাদের দোয়ার বরকত সমগ্র রাত ও দিনে পরিব্যাপ্ত হবে।

কতটুকু পড়তে হবে, এর বিবরণ হচ্ছে, তেলাওয়াতকারী যদি আবেদ হয় এবং আমলের সাহায্যে আধ্যাত্মিক পথ অতিক্রম করতে চায়, তবে এক সপ্তাহে দু'খতমের কম পড়বে। আর যদি শিক্ষাদান কার্যে ব্যাপৃত থাকে, তবে এক সপ্তাহে এক খতম করলেও দোষ নেই। যদি কেউ কোরআনের অর্থে চিন্তাভাবনা করে তেলাওয়াত করে, তবে একমাসে এক খতমই যথেষ্ট । কারণ, তাকে বার বার পড়তে হবে এবং অর্থ নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে হবে।

যে ব্যক্তি সপ্তাহে এক খতম করবে, সে কোরআনকে সাতটি মনযিলে ভাগ করে নেবে। সাহাবায়ে কেরামও এরূপ মনযিল নির্দিষ্ট করেছেন। বর্ণিত আছে, হযরত ওসমান (রাঃ) জুমআর রাতে শুরু থেকে সূরা মায়েদার শেষ পর্যন্ত তেলাওয়াত করতেন এবং শনিবার রাতে আনআম থেকে সূরা হুদ পর্যন্ত, রবিবার রাতে সূরা ইউসুফ থেকে মারইয়াম পর্যন্ত, সোমবার রাতে তোয়াহা থেকে কাসাস পর্যন্ত, মঙ্গলবার রাতে আনকাবুত থেকে সোয়াদ পর্যন্ত, বুধবার রাতে যুমার থেকে আররাহমান পর্যন্ত এবং বৃহস্পতিবার রাতে ওয়াকেয়া থেকে কোরআনের শেষ পর্যন্ত তেলাওয়াত করতেন। হযরত ইবনে মসউদও সাত মনযিলেই তেলাওয়াত সমাপ্ত করতেন; কিন্তু তাঁর ক্রম পৃথক ছিল । কোরআনের সাতটি মনযিল রয়েছে– প্রথম মনযিল সূরা ফাতেহা থেকে তিন সূরার,

দ্বিতীয় মনযিল পাঁচ সূরার, তৃতীয় মনযিল সাত সূরার, চতুর্থ মনযিল নয় সূরার, পঞ্চম মনযিল এগার সূরার, ষষ্ঠ মনযিল তের সূরার এবং সপ্তম মনযিল সূরা কাফ থেকে পরবর্তী সূরাসমূহের। এটা কোরআনের এক পঞ্চমাংশ, এক দশমাংশ ও অন্যান্য অংশে বিভক্ত হওয়ার পূর্বেকার কথা। এগুলো পরবর্তী সময়ে স্থিরীকৃত হয়েছে।

লেখার ব্যাপারে মোস্তাহাব হচ্ছে, কোরআন মজীদ পরিষ্কার ও ঝকঝকে অক্ষরে লেখবে। লাল কালি দিয়ে নোক্তা ও চিহ্ন সংযোজন করায় দোষ নেই । এ কাজ পাঠককে ভুল পাঠ থেকে রক্ষা করে। হযরত হাসান বসরী ও ইবনে সিরীন (রঃ) কোরআন মজীদকে এক পঞ্চমাংশ, এক দশমাংশ ইত্যাদি অংশে বিভক্ত করা খারাপ মনে করতেন। শা'বী ও ইবরাহীম থেকে বর্ণিত আছে, তাঁরাও লাল কালি দিয়ে নোক্তা সংযোজন করতেন। তাঁরা বলতেন ঃ কোরআন মজীদকে পরিষ্কার ও ঝকঝকে রাখ। যাঁরা এসব বিষয় মাকরূহ বলতেন, সম্ভবতঃ তাঁদের যুক্তি ছিল, এভাবে ক্রমশঃ বাড়াবাড়ির মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। তাই এতে কোন দোষ না থাকলেও বাড়াবাড়ির পথ রুদ্ধ করা এবং পরিবর্তনের কবল থেকে কোরআনকে রক্ষা করার জন্যে তারা নোক্তা সংযোজন করাও মাকরূহ বলতেন; কিন্তু যেক্ষেত্রে এসব দ্বারা কোন অনিষ্ট হয়নি এবং সকলের মতে স্থির রয়েছে যে, এগুলো দ্বারা অক্ষর সনাক্ত করা সহজ হয়, তখন এগুলোর ব্যবহারে কোন দোষ নেই এবং এগুলো নবাবিষ্কৃত হওয়ায়ও কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করে না। কেননা, অধিকাংশ নবাবিষ্কৃত বিষয় ভাল। সেমতে তারাবীহ্ সম্পর্কে বলা হয়, এটা হযরত ওমর (রাঃ)-এর আবিষ্কার এবং চমৎকার আবিষ্কার । এটা ভাল বেদআত । খারাপ বেদআত সে বেদআতকে বলা হয় যা সুন্নতের সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে দাঁড়ায় এবং সুন্নতকে বদলে দেয়।

জনৈক বুযুর্গ বলতেন– আমি নোক্তা সংযোজিত কোরআন মজীদ তেলাওয়াত করে থাকি; কিন্তু নিজে তাতে সংযোজন করি না। আওযায়ী ইয়াহইয়া ইবনে কাসীর থেকে বর্ণনা করেন– কোরআন প্রথমে মাসহাফের মধ্যে সাফ (নোক্তাবিহীন) ছিল। সর্বপ্রথম তাতে 'বা' ও 'তা'

অক্ষরে নোক্তা সংযোজন করা হয়। এতে কোন দোষ নেই; বরং এটা কোরআনের আলো। এর পর আয়াতের শেষে বড় বিন্দু আবিষ্কৃত হয়। এতেও কোন দোষ নেই। এর মাধ্যমে আয়াতসমূহের শুরু জানা যায়। এর পর শেষ ও সূচনার চিহ্নসমূহ আবিষ্কৃত হয়।

আবু বকর বযলী বলেন ঃ আমি হযরত হাসান বসরীকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ মাসহাফে এ'রাব (স্বরচিহ্ন তথা যের, যবর, পেশ) সংযোজন করা কেমন? তিনি বললেন ঃ এতে কোন দোষ নেই।

খালেদ খাদ্দা বলেন ঃ আমি হযরত ইবনে সিরীনের খেদমতে হাযির হয়ে দেখি, তিনি এ'রাব সংযোজিত কোরআন মজীদ পাঠ করছেন। অথচ তিনি এ'রাবকে খারাপ মনে করতেন। কথিত আছে, এ'রাব হাজ্জাজের আবিষ্কৃত । সে কারীদেরকে একত্রিত করে। তারা কোরআনের শব্দ ও অক্ষর গণনা করে তা সমান ত্রিশ পারায় ভাগ করে এবং এক চতুর্থাংশ, অর্ধাংশ ইত্যাদি চিহ্ন সংযুক্ত করে।

কোরআন মজীদ থেমে থেমে উত্তমরূপে পড়া মোস্তাহাব। কেননা পড়ার উদ্দেশ্যই চিন্তা-ভাবনা করা। থেমে থেমে উত্তমরূপে পড়লে চিন্তা-ভাবনার সুযোগ পাওয়া যায়। এ কারণেই হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কেরাআতের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে প্রত্যেকটি শব্দ পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ দ্রুতবেগে সমগ্র কোরআন পড়ে যাওয়ার তুলনায় থেমে থেমে কেবল সূরা বাকারা ও সূরা আলে এমরান পাঠ করা আমার কাছে অধিক ভাল। তিনি আরও বলেন ঃ আমি যদি সূরা যিলযাল ও সূরা কারেয়া বুঝে শুনে পাঠ করি, তবে এটা সূরা বাকারা ও সূরা আলে এমরান টেনে হেঁচড়ে পাঠ করার চেয়ে উত্তম মনে করি। মুজাহিদ (রহঃ)-কে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ দু'ব্যক্তি নামাযে একত্রে দাঁড়িয়ে একজন কেবল সূরা বাকারা পাঠ করল এবং অন্যজন সমগ্র কোরআন পড়ে নিল। তাদের মধ্যে কে বেশী সওয়াব পাবে? তিনি বললেন ঃ উভয়েই সমান সওয়াব পাবে। স্মর্তব্য, অর্থ বুঝার কারণেই কেবল থেমে থেমে পড়া

মোস্তাহাব নয়। কেননা, যে ব্যক্তি আরব নয়, সে আরবী ভাষা বুঝে না। সে কোরআনের অর্থ কিরূপে বুঝবে? অথচ থেমে থেমে পড়া তার জন্যও মোস্তাহাব । আসলে থেমে থেমে পড়ার মধ্যে কোরআনের সম্মান ও ইজ্জত বেশী হয়। দ্রুত পড়ার তুলনায় এর তাসিরও বেশী হয়।

তেলাওয়াতের সাথে ক্রন্দন করা মোস্তাহাব । রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ কোরআন পড় আর ক্রন্দন কর। যদি কাঁদতে না পার তবে কাঁদার মত আকৃতি ধারণ কর। তিনি আরও বলেন ঃ যে সুললিত কণ্ঠে কোরআন পড়ে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। সালেহ মুররী বলেন ঃ আমি স্বপ্নে রসূলে করীম (সাঃ)-এর সামনে কোরআন পড়েছি। তিনি শুনে বললেন ঃ সালেহ, এটা তো কেরাআত হল। কান্না কোথায়? হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ যখন তুমি সেজদার আয়াত পাঠ কর, তখন না কেঁদে সেজদা করো না। যদি তোমাদের কারও চোখ থেকে অশ্রু বের না হয়, তবে অন্তরে ক্রন্দন করা উচিত। ইচ্ছা করে কান্নার উপায় হচ্ছে মনে বেদনাবোধ উপস্থিত করা। কেননা, বেদনা থেকেই কান্নার উৎপত্তি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ কোরআন বেদনা সহকারে নাযিল হয়েছে। সুতরাং তোমরা সেভাবেই কোরআন পড়। মনে বেদনাবোধ উপস্থিত করার পন্থা হচ্ছে কোরআনের ধমক, সতর্কবাণী, প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা এবং কোরআনের আদেশ নিষেধ পালনে নিজের ত্রুটি বিচ্যুতি'র কথা চিন্তা করা। এতে অবশ্যই দুঃখ কান্না সৃষ্টি হবে। যদি এর পরও দুঃখ ও কান্না অন্তরে উপস্থিত না হয়, তবে তা অন্তরের একান্ত কঠোর হওয়ার আলামত। এ জন্যও ক্রন্দন করা উচিত।

আয়াতসমূহের হকের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। অর্থাৎ, সেজদার আয়াত পাঠ করলে সেজদা করবে অথবা অন্যের কাছে সেজদার আয়াত শুনলে যখন সে সেজদা করে, তখন শ্রোতাও করবে। তবে সেজদা করার জন্যে ওযু থাকা শর্ত। কোরআন মজীদে চৌদ্দটি সেজদার আয়াত আছে। সূরা হজ্জে দু'টি এবং সূরা সোয়াদে সেজদা নেই। [ইমাম আবু হানীফা (রাহঃ)-এর মতেও মোট সেজদা চৌদ্দটি ; কিন্তু সূরা হজ্জের দু'টির স্থলে প্রথমটি এবং সূরা সোয়াদে একটি।] এ সেজদার সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে

মাটিতে কপাল ঠেকানো এবং সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে তকবীর বলে সেজদা করা। সেজদার মধ্যে সেজদার আয়াতের সাথে মিল রেখে দোয়া করবে। উদাহরণতঃ যখন এই আয়াত পড়বে– خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (তারা সেজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং পালনকর্তার প্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করে এমতাবস্থায় যে, তারা অহংকার করে না।) তখন এই দোয়া করবে–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ السَّاجِدِيْنَ لِوَجْهِكَ الْمُسَبِّحِيْنَ بِحَمْدِكَ وَاَعُوْذُبِكَ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُتَكَبِّرِيْنَ عَنْ اَمْرِكَ وَعَلٰى اَوْلِيَائِكَ ـ

হে আল্লাহ! আমাকে তোমার সেজদাকারীদের, তোমার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণাকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর। আমি তোমার আদেশের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রদর্শনকারীদের দলভুক্ত হওয়া থেকে অথবা তোমার ওলীদের উপর বড়াইকারীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই।

এমনিভাবে প্রত্যেক আয়াতের সামঞ্জস্য রেখে দোয়া পড়বে।

নামাযের জন্যে যা যা শর্ত, তেলাওয়াতের সেজদার জন্যেও তা শর্ত। অর্থাৎ, সতর আবৃত করা, কেবলামুখী হওয়া, কাপড় ও দেহ পবিত্র হওয়া ইত্যাদি । সেজদার আয়াত শুনার সময় যার ওযু থাকে না, সে যখন ওযু করবে তখন সেজদা করবে। কেউ কেউ তেলাওয়াতের সেজদা পূর্ণাঙ্গ হওয়ার জন্যে বলেছেন, হাত তুলে তাহরীমার নিয়ত করার জন্যে আল্লাহু আকবার বলবে, এর পর সেজদার জন্যে আল্লাহু আকবার বলবে, এর পর মাথা তোলার জন্যে আল্লাহু আকবার বলবে এবং সব শেষে সালাম ফেরাবে। কেউ কেউ তাশাহহুদ পড়ার কথাও বলেছেন; কিন্তু নামাযের সাথে মিল দেখানো ছাড়া এর কোন ভিত্তি পাওয়া যায় না। তবে এরূপ মিল দেখানো অবান্তর । কেননা, এতে কেবল সেজদারই আদেশ আছে। তাই এ শব্দেরই অনুসরণ করা উচিত; কিন্তু সেজদায় যাওয়ার

জন্যে শুরুর প্রতি লক্ষ্য করে আল্লাহু আকবার বলা সমীচীন। এছাড়া অন্যান্য বিষয় অবান্তর মনে হয়। তেলাওয়াত শুরু করার সময় আদব হচ্ছে একথা বলা ঃ

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيٰطِيْنِ وَأَعُوْذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَّحْضُرُوْنَ ـ

অর্থাৎ, আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে সর্বজ্ঞাতা সর্বশ্রোতা আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রর্থনা করি। হে প্রভু, শয়তানদের প্ররোচনা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই এবং আশ্রয় চাই তোমার কাছে হে প্রভু, ওরা আমার কাছে হাযির হওয়া থেকে ।

এর পর সূরা নাস ও সূরা ফাতেহা পাঠ করবে এবং প্রত্যেক সূরা শেষে বলবে ঃ

صَدَقَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَبَلَّغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ اَللّٰهُمَّ انْفَعْنَا بِهٖ وَبَارِكْ لَنَا فِيْهِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْحَيَّ الْقَيُّوْمَ ـ

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা সত্য বলেছেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তা পৌঁছিয়েছেন। ইলাহী, তুমি এর দ্বারা আমাদেরকে উপকৃত কর। এর মাধ্যমে আমাদেরকে বরকত দাও। সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপালক আল্লাহ্র । আমি শক্তিশালী চিরজীবী আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রর্থনা করি।

তেলাওয়াতের মধ্যে তসবীহ্ তথা পবিত্রতাসূচক আয়াত এলে বলবে ঃ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ আল্লাহ্ পবিত্র, আল্লাহ্ মহান। দোয়া এবং এস্তেগফারের আয়াত এলে দোয়া ও এস্তেগফার পড়বে। আশার আয়াত এলে আশা করবে এবং ভয়ের আয়াত এলে আশ্রয় চাইবে। এগুলো মুখে বলবে অথবা মনে মনে কামনা করবে। হযরত হুযায়ফা বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে নামায পড়েছি। তিনি সূরা বাকারা শূরু করে যখনই কোন রহমতের আয়াত পড়েছেন, রহমত প্রার্থনা করেছেন। যখনই

আযাবের আয়াত পড়েছেন, আশ্রয় চেয়েছেন এবং যখনই পবিত্রতার আয়াত পাঠ করেছেন, সোবহানাল্লাহ্ বলেছেন। তেলাওয়াত সমাপ্ত হলে পর সেই দোয়া পড়বে, যা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) খতমের সময় পড়তেন। দোয়াটি এই ঃ

اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِىْ بِالْقُرْاٰنِ وَاجْعَلْهُ لِىْ اِمَامًا وَّنُوْرًا وَّهُدًى وَّرَحْمَةً اَللّٰهُمَّ ذَكِّرْنِىْ مِنْهُ مَا نَسِيْتُ وَعَلِّمْنِىْ مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَارْزُقْنِىْ تِلَاوَتَهٗ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لِىْ حُجَّةً يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! কোরআন দ্বারা আমার প্রতি রহম কর। কোরআনকে আমার জন্যে ইমাম, নূর, হেদায়াত ও রহমতে পরিণত কর। হে আল্লাহ্, আমি এর যতটুকু বিস্মৃত হয়েছি, তা স্মরণ করিয়ে দাও, যতটুকু শিখতে পারিনি তা শিখিয়ে দাও এবং আমাকে এর তেলাওয়াত নসীব কর, দিবা ও রাত্রির ক্ষণসমূহে অর্থাৎ সকাল-সন্ধ্যায়। একে আমার জন্যে প্রমাণ বানাও হে বিশ্ব পালক!

কেরাআত এতটুকু সশব্দে পড়া অবশ্য জরুরী যতটুকুতে নিজে শুনতে পায়। কেননা, কেরাআত অর্থ সশব্দে হরফ উচ্চারণ করা। নিজে শুনা এর সর্বনিম্ন স্তর। যে কেরাআত নিজে শুনে না তা দ্বারা নামায হবে না। এতটুকু সশব্দে পড়া, যা অপরে শুনে, তা একদিক দিয়ে ভাল এবং একদিকে মন্দ । আস্তে পড়া যে মোস্তাহাব, তা এই রেওয়ায়েত দ্বারা জানা যায় – রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ আস্তে পড়া সশব্দে পড়ার উপর এমন ফযীলত রাখে, যেমন গোপনে সদকা করা প্রকাশ্যে সদকা করার উপর ফযীলত রাখে। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে– সশব্দে কোরআন পাঠকারী এমন, যেমন প্রকাশ্যে সদকা দানকারী। এক হাদীসে সাধারণভাবে বলা হয়েছে– গোপন আমল প্রকাশ্য আমল অপেক্ষা সত্তর গুণ বেশী। অনুরূপভাবে আরও এরশাদ হয়েছে– خير الرزق ما يكفى وخير

الذكر الخفى উত্তম রিযিক যা পরিতুষ্টি আনে এবং উত্তম যিকির যা গোপনে হয়।

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে কেরাআত প্রতিযোগিতা করে সশব্দে পড়ো না। এক রাতে সায়ীদ ইবনে মূসাইয়েব (রাঃ) মসজিদে নববীতে হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজকে সজোরে কোরআন পাঠ করতে শুনলেন। তিনি সুললিত কণ্ঠস্বরের অধিকারী ছিলেন। সায়ীদ ইবনে মূসাইয়েব তাঁর গোলামকে বললেন ঃ এ নামাযীর কাছে গিয়ে তাকে নীচু স্বরে কেরাআত পড়তে বল। গোলাম বলল ঃ মসজিদ তো আমাদের একার নয়। এ ব্যক্তিরও এতে নামায পড়ার অধিকার আছে। আমি কিরূপে তাকে নিষেধ করব? অতঃপর হযরত সায়ীদ উচ্চ স্বরে বললেন ঃ হে নামাযী, তোমার যদি নামায দ্বারা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তবে আওয়ায নীচু কর। আর যদি মানুষকে শুনানো মকসুদ হয়, তবে আল্লাহ তাআলার কাছে এটা তোমার কোন উপকারে আসবে না। একথা শুনে হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ চুপ হয়ে গেলেন। তিনি সংক্ষেপে নামায শেষ করলেন এবং সালাম ফিরিয়ে জুতা নিয়ে বাড়ী চলে গেলেন। তিনি তখন মদীনা মুনাওয়ারার প্রশাসক ছিলেন।

সশব্দে পড়া যে মোস্তাহাব, তা এই হাদীস দ্বারা জানা যায়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার কয়েকজন সাহাবীকে রাতের নামাযে সশব্দে কেরাআত পড়তে শুনে তা সঠিক বলে অভিহিত করেন। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে ঃ যখন তোমাদের কেউ রাতে উঠে নামায পড়ে, তখন যেন কেরাআত সশব্দে পড়ে। কেননা, ফেরেশতারা এবং সে গৃহের জ্বিনরা তার কেরাআত শুনে এবং সেই নামায তারাও পড়ে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার তাঁর তিন জন সাহাবীর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন। তাঁদের অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন ছিল। তিনি হযরত আবু বকরকে খুব আস্তে আস্তে কেরাআত পড়তে দেখে কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ আমি যার সাথে কথা বলছি, তিনি অবশ্যই আমার কথা শুনেন। অতঃপর তিনি

হযরত ওমরকে সজোরে কেরাআত পড়তে দেখেন এবং-এর কারণ জিজ্ঞেস করেন। হযরত ওমর বললেন ঃ আমি নিদ্রিতদেরকে জাগ্রত করি এবং শয়তানকে বিব্রত করি। অতঃপর তিনি হযরত বেলালকে দেখেন, তিনি এক সূরার কয়েক আয়াত এবং অন্য এক সূরার কয়েক আয়াত পাঠ করছেন। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি আরজ করলেন ঃ আমি উৎকৃষ্টকে উৎকৃষ্টের সাথে যুক্ত করছি। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) তিন জন সম্পর্কেই বললেন ঃ তোমরা চমৎকার কাজ করছ। যখন সরব ও নীরব উভয় প্রকার কেরাআতের পক্ষে হাদীস বিদ্যমান তখন উভয় প্রকার হাদীসের মধ্যে সমন্বয় এভাবে হবে যে, আস্তে পাঠ করা রিয়া থেকে অধিকতর দূরবর্তী । এতে কৃত্রিমতার অবকাশ নেই। সুতরাং যে ব্যক্তি নিজের জন্যে রিয়া ও কৃত্রিমতার আশংকা করে, তার জন্যে আস্তে পড়াই উত্তম। আর যদি কেউ এরূপ আশংকা না করে এবং সজোরে পাঠ করলে অপরের পাঠে বিঘ্ন সৃষ্টি না হয়, তবে তার জন্যে সজোরে পাঠ করা উত্তম। কেননা, এতে আমল বেশী হয় এবং এর উপকার অন্যেরাও পায়। বলাবাহুল্য, যে কল্যাণ অন্যেরাও পায়, তা সেই কল্যাণ থেকে শ্রেষ্ঠ, যা কেবল একজনে পায়। এছাড়া সরব কেরাআত পাঠকের মনকে হুশিয়ার রাখে এবং তাকে কোরআন সম্পর্কে চিন্তা করার জন্য একাগ্র করে। আরও আশা থাকে, কোন ঘুমন্ত ব্যক্তি কেরাআত শুনে জেগে উঠবে এবং এবাদতে মশগুল হবে। মাঝে মাঝে এমনও হয় যে, কোন গাফেল ব্যক্তি পাঠককে দেখে হুশিয়ার হয়ে যায়। সে প্রভাবান্বিত হয় এবং কিছু করার ব্যাপারে আগ্রহী হয়। সুতরাং এসব নিয়তের কোন একটি নিয়ত থাকলে সরবে পাঠ করা উত্তম। । আর যদি সবগুলো নিয়তের সমাবেশ ঘটে, তবে সওয়াবও বহুগুণ বেড়ে যাবে। কেননা, নিয়ত অধিক হলে আমলও অধিক হয় এবং সওয়াব বৃদ্ধি পায়। এ কারণেই আমরা বলি, মাসহাফ দেখে কোরআন পাঠ করা মুখস্থ পাঠ করার চেয়ে উত্তম। কেননা, এতে চোখের দেখা অতিরিক্ত আমল । তাই সওয়াবও অতিরিক্ত হবে। কেউ কেউ বলেন ঃ দেখে কোরআন পাঠ করার সওয়াব সাত গুণ বেশী । কেননা, মাসহাফ দেখাও এবাদত। হযরত ওসমান (রাঃ) এত বেশী

মাসহাফ দেখে তেলাওয়াত করতেন যে, তাঁর কাছে দু'টি মাসহাফ ছিঁড়ে গিয়েছিল। অধিকাংশ সাহাবী দেখেই কোরআন পাঠ করতেন। যেদিন মাসহাফ দেখা হত না, সেদিনকে তাঁরা খারাপ মনে করতেন। মিসরের জনৈক ফেকাহবিদ সেহরীর সময় হযরত ইমাম শাফেয়ীর কাছে আগমন করেন। তখন তাঁর সামনে কোরআন খোলা ছিল। ইমাম শাফেয়ী ফেকাহবিদকে বললেন ঃ ফেকাহ তোমাকে কোরআন থেকে বিরত রেখেছে। আমাকে দেখ, আমি এশার নামায পড়ে সামনে কোরআন রাখি, আর ভোর পর্যন্ত তা বন্ধ করি না। মধুর কণ্ঠে কোরআন পাঠ করা এবং সাজিয়ে গুছিয়ে কেরাআত উচ্চারণ করা উচিত; কিন্তু অক্ষরগুলো এত বেশী টেনে পড়া উচিত নয় যাতে শব্দ বদলে যায় অথবা তার গাঁথুনি বিনষ্ট হয়ে যায়; বরং এক প্রকার সজ্জিত করে কেরআন পাঠ করবে। এটা সুন্নত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ زينوا القران باصواتكم

তোমরা তোমাদের কণ্ঠস্বর দ্বারা কোরআনকে সজ্জিত কর। তিনি আরও বলেন ঃ ما اذن الله لشئ ما اذن لنبى يتغنى بالقران

আল্লাহ্ তাআলা কোন বিষয়ের এতটুকু আদেশ দেননি, যতটুকু সুললিত কণ্ঠে কোরআন পড়ার জন্যে কোন পয়গম্বরকে আদেশ দিয়েছেন। আরও এরশাদ হয়েছে- ليس منا من لم يتغنى بالقران যে সুললিত স্বরে কোরআন পড়ে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

বর্ণিত আছে, এক রাতে রসূলে করীম (সাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি অনেক বিলম্বে আগমন করলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বিলম্বের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। হযরত আয়েশা বললেন ঃ ইয়া রসূলুল্লাহ্, আমি এক ব্যক্তির কেরাআত শুনছিলাম। এমন মধুর কণ্ঠ ইতিপূর্বে আমি শুনিনি। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) উঠে সেখানে পৌঁছে অনেকক্ষণ পর্যন্ত লোকটির কেরাআত শুনে ফিরে এলেন। অতঃপর বললেন ঃ লোকটি আবু হুযায়ফার মুক্ত গোলাম। আল্লাহ্র শোকর, যিনি আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোক সৃষ্টি করেছেন। অন্য এক রাতে রসূলে

আকরাম (সাঃ) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদের তেলাওয়াত শ্রবণ করলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ)। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে শুনার পর তিনি বললেন ঃ

من اراد ان يقرا القران غضا كما انزل فليقراه على قراءة ابن ام عبد ـ

যে ব্যক্তি ধীরে ও সুমধুর কণ্ঠে কোরআন পড়তে চায়, যেমনটি অবতীর্ণ হয়েছে, সে যেন ইবনে মসউদের কেরাআতের মত করে পড়ে।

একবার রসূলে করীম (সাঃ) ইবনে মসউদকে বললেন ঃ আমাকে কোরআন শুনাও। তিনি আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্! আপনার প্রতি তো কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। আপনাকে শুনাব কি করে? তিনি বললেন ঃ অন্যের মুখ থেকে কোরআন শ্রবণ করা আমার পছন্দনীয়। এর পর ইবনে মসউদ কোরআন পড়ে যাচ্ছিলেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) অশ্রু বহাচ্ছিলেন। একবার হযরত আবু মূসা আশআরীর কোরআন পাঠ শুনে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ এ লোকটি দাঊদ (আঃ) পরিবারের কিছু লাহান প্রাপ্ত হয়েছে। এ সংবাদ শুনে আবু মূসা আশআরী আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্! আপনি শুনছেন জানতে পারলে আমি আপনার জন্যে আরও সুন্দর করে পাঠ করতাম। কারী হায়সাম বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে একবার স্বপ্নে দেখলাম। তিনি আমাকে এরশাদ করলেন ঃ হায়সাম, তুমিই কোরআনকে আপন কণ্ঠস্বর দ্বারা সজ্জিত করে থাক? আমি আরজ করলাম ঃ জি। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তোমাকে উত্তম পুরস্কার দান করুন। বর্ণিত আছে, সাহাবায়ে কেরাম যখন কোন সমাবেশে একত্রিত হতেন, তখন একজনকে কোরআনের কোন সূরা পাঠ করতে বলতেন। হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আবু মূসাকে বলতেন ঃ আমাদের পালনকর্তার কথা স্মরণ করাও। তিনি তার সামনে এতক্ষণ কোরআন পাঠ করতেন যে, নামাযের সময় পর্যন্ত অতিবাহিত হওয়ার উপক্রম হত। তখন লোকেরা তাঁকে নামাযের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে তিনি বলতেন ঃ আমরা কি নামাযে নই? এটা ছিল আল্লাহ্ তায়ালার সেই এরশাদের প্রতি

ইঙ্গিত وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ (আল্লাহ্‌র স্মরণই বড়)। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কিতাবের একটি আয়াত শুনবে, সেটা তার জন্যে কেয়ামতের দিন নূর হবে। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে– তার জন্যে দশটি নেকী লেখা হবে। শ্রোতার জন্যে এত সওয়াব হলে পাঠকের জন্যে কি পরিমাণ হবে তা সহজেই অনুমেয়।

তেলাওয়াতের আভ্যন্তরীণ আদব

প্রথমতঃ খোদায়ী কালামের মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে হবে এবং মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র এই অনুগ্রহ ও কৃপা উপলব্ধি করতে হবে যে, তিনি সুউচ্চ আরশ থেকে এই কালামকে মানুষের বোধগম্য করে অবতীর্ণ করেছেন। এটা মানুষের প্রতি আল্লাহ্ তাআলার একটা মেহেরবানী যে, যে কালাম ছিল তাঁর চিরন্তন সিফত ও সত্তার সাথে প্রতিষ্ঠিত, তার অর্থসম্ভার তিনি মানুষের বোধগম্য করে দিয়েছেন। এখন এই সিফত অক্ষর ও কণ্ঠস্বরের সাথে জড়িত হয়ে মানুষের জন্যে দেদীপ্যমান হয়ে গেছে। অথচ অক্ষর ও কণ্ঠস্বর হল মানুষের সিফত বা বৈশিষ্ট্য; কিন্তু মানুষ নিজের সিফতকে মাধ্যম না বানিয়ে আল্লাহ্ তাআলার সিফত হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম নয় বিধায় খোদায়ী সিফতকে অক্ষর ও কণ্ঠস্বরের সাথে জড়িত করে দেয়া হয়েছে। যদি এরূপ করা না হত, তবে আরশও এই কালাম শ্রবণ করে স্থির থাকতে পারত না এবং মর্ত্যলোকেরও তা শুনার সাধ্য হত না; বরং তার মহিমা ও নূরের কিরণে আরশ থেকে ফরশ পর্যন্ত সবকিছু বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। হযরত মূসা (আঃ)-কে আল্লাহ্ তায়ালা সুদৃঢ় না রাখলে তিনি তাঁর কালাম শুনার মত শক্তি সাহস পেতেন না; যেমন তাঁর সামান্য দ্যুতি সহ্য করার শক্তি তূর পাহাড়ের হয়নি এবং পাহাড় ভেঙ্গে খন্ড-বিখন্ড হয়ে গেছে। খোদায়ী কালামের মহিমা এমন দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বুঝতে হবে, যা মানুষের বোধশক্তির অন্তর্গত। তাই জনৈক সাধক একে এভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, লওহে মাহফুযে কালামে ইলাহীর প্রত্যেকটি অক্ষর কাফ পর্বতের চেয়েও বৃহৎ। যদি সকল ফেরেশতা একযোগে এর একটি অক্ষর বহন করতে চায়, তাবে তা বহন

করার শক্তি তাদের হয় না। অবশেষে লওহে মাহফুযের ফেরেশতা ইসরাফীল (আঃ) এসে তা বহন করেন। তার বহন করাও আল্লাহ্ তাআলার অনুমতিক্রমে– নিজস্ব শক্তি বলে নয়; আল্লাহ্ তাআলা তাকে তা বহন করার শক্তি দান করেছেন এবং এতে তাঁকে নিয়োজিত রেখেছেন।

খোদায়ী কালাম মহামহিমান্বিত । এর তুলনায় মানুষের বোধশক্তি খুবই নিম্ন পর্যায়ের। এতদসত্ত্বেও এ কালাম যে মানুষের বোধগম্য হয়েছে, জনৈক দার্শনিক এর একটি চমৎকার কারণ ও দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। তিনি লেখেন, তিনি জনৈক বাদশাহকে পয়গম্বরগণের শরীয়ত অনুসরণ করতে বললে বাদশাহ তাঁকে কয়েকটি বিষয়ে প্রশ্ন করেন। দার্শনিক প্রশ্নগুলোর এমন উত্তর দিলেন, যা বাদশাহের বোধগম্য হতে পারে। অতঃপর বাদশাহ জিজ্ঞেস করলেন ঃ আচ্ছা বলুন তো, আপনারা পয়গম্বরগণের আনীত কালাম সম্পর্কে দাবী করেন যে, এটা মানুষের কালাম নয়; বরং আল্লাহ তাআলার কালাম । তা হলে এ কালাম মানুষ বুঝে কিরূপে? দার্শনিক জওয়াব দিলেন ঃ আমরা দেখি; মানুষ যখন কোন চতুষ্পদ জন্তু অথবা পক্ষীকে সামনে অগ্রসর হওয়া, পেছনে সরে যাওয়া, সম্মুখে মুখ করা অথবা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা ইত্যাদি বুঝাতে চায়, তখন অবশ্যই তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তুর স্তরে নেমে যেতে হয় এবং আপন উদ্দেশ্য এমন শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করতে হয়, যা জন্তুদের বোধগম্য ; যেমন টক টক করা, শীস দেয়া, হুমহুম বলা ইত্যাদি । অনুরূপভাবে মানুষও আল্লাহর কালাম পূর্ণাঙ্গরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে অক্ষম। ফলে পয়গম্বরগণও মানুষের সাথে সে কৌশলই অবলম্বন করেন যা মানুষ চতুষ্পদ জন্তুদের সাথে অবলম্বন করে। অর্থাৎ, তাঁরা আল্লাহর কালাম মানুষের বোধগম্য অক্ষরের মাধ্যমে বর্ণনা করেন। প্রজ্ঞাবোধক অর্থসম্ভার এসব অক্ষরের মধ্যে লুক্কায়িত থাকে বিধায় এসব অর্থসম্ভারের মহিমায় কালাম মহিমান্বিত হয়। সুতরাং স্বর যেন প্রজ্ঞাবোধক অর্থসম্ভারের দেহ ও গৃহ আর প্রজ্ঞা হল স্বরের আত্মা ও প্রাণ। মানুষের দেহ যেমন আত্মা থাকার কারণে সম্মানিত ও সম্ভ্রমযুক্ত হয়, তেমনি কালামের স্বর এবং

অক্ষরসমূহও অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞার কারণে সম্মানিত ও মহিমান্বিত হয়। প্রজ্ঞার কালাম সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী, সত্য ও মিথ্যার ব্যাপারে আদেশ প্রদানকারী, ন্যায়পরায়ণ শাসক ও প্রশংসনীয় সাক্ষী হয়ে থাকে। এ থেকেই আদেশ ও নিষেধ নির্গত হয়। মিথ্যার সাধ্য নেই, প্রজ্ঞাপূর্ণ কালামের সামনে টিকে থাকে, যেমন ছায়া সূর্য কিরণের সামনে টিকে থাকতে পারে না। মানুষ প্রজ্ঞার সকল স্তর অতিক্রম করার শক্তি রাখে না, যেমন মানুষের দৃষ্টিশক্তি সূর্যের দেহ অতিক্রম করতে পারে না; কিন্তু সূর্যের আলো মানুষ ততটুকুই পায়, যতটুকু দ্বারা তাদের চক্ষু আলোকিত হয় এবং কেবল আপন প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ দেখে নেয়। মোট কথা, খোদায়ী কালামকে এমন একজন বাদশাহ বুঝতে হবে, যার মুখমন্ডল অজ্ঞাত; কিন্তু আদেশ অব্যাহত। অথবা এমন সূর্য ভাবতে হবে, যার মূল উপাদান আগোচরে, কিন্তু আলো দেদীপ্যমান। অথবা এমন একটি উজ্জ্বল তারকা মনে করতে হবে, যাকে দেখে সে ব্যক্তিও পথ পেয়ে যায় যে তার গতিবিধি সম্পর্কে জ্ঞান রাখে না।

সারকথা, খোদায়ী কালাম উৎকৃষ্ট ধনভান্ডারসমূহের চাবিকাঠি এবং এমন আবে হায়াত, যে ব্যক্তি এ থেকে পান করে সে অমর হয়ে যায় এবং এটা এমন মহৌষধ, যে ব্যক্তি এটা সেবন করে, সে কখনও রুগ্ন হয় না।

কালামকে বুঝার জন্যে দার্শনিকের এ বর্ণনা একটি ক্ষুদ্র বিষয়। এলমে মোয়ামালায় এর বেশী বর্ণনা করা সমীচীন নয় বিধায় আলোচনা এখানেই সমাপ্ত করা হলো।

দ্বিতীয়তঃ তেলাওয়াতকারীর উচিত তেলাওয়াত শুরু করার সময় আল্লাহ্ তাআলার মাহাত্ম্য অন্তরে উপস্থিত করা এবং একথা জানা যে, সে যা পাঠ করছে তা মানুষের কালাম নয়। কালামে পাকের তেলাওয়াতে অনেক ঝুঁকি রয়েছে। কারণ আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ যারা পাক পবিত্র, তারাই কেবল কোরআন স্পর্শ করবে। কোরআনের বাহ্যিক জিলদ ও পাতাসমূহ যেমন মানুষ পবিত্রতা ব্যতীত স্পর্শ করতে পারে না, তেমনি এর আভ্যন্তরীণ অর্থও যাবতীয় অপবিত্রতা

থেকে অন্তরের পবিত্রতা ছাড়া এবং তাযীমের নূরে আলোকিত হওয়া ছাড়া আসতে পারে না। প্রত্যেক হাত যেমন কোরআনের জিলদ স্পর্শ করার যোগ্য নয়, তেমনি প্রত্যেক জিহবাও তার হরফসমূহ তেলাওয়াত করার কিংবা তার অর্থসম্ভার অর্জন করার সামর্থ্য রাখে না। এমনি ধরনের তাযীমের কারণে ইকরিমা ইবনে আবু জাহল যখন কোরআন খুলতেন, তখন অজ্ঞান হয়ে পড়তেন এবং বলতেন– এটা আমার পরওয়ারদেগারের কালাম, এটা আমার প্রভুর কালাম।

সারকথা, কালামের মাহাত্ম্যের দ্বারা মুতাকাল্লিমের তথা আল্লাহ্ তাআলার মাহাত্ম্য হয়। মুতাকাল্লিমের মাহাত্ম্য অন্তরে ততক্ষণ আসে না, যতক্ষণ না তাঁর গুণাবলী, শ্রেষ্ঠত্ব ও ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা হয়। সুতরাং তেলাওয়াতকারী নিজের অন্তরে আরশ, কুরসী, আকাশমন্ডলী, পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী জ্বিন, মানব, জীবজন্তু ও বৃক্ষের কথা উপস্থিত করে ভাববে যে, এগুলোর সৃষ্টিকর্তা, এগুলোর উপর ক্ষমতাবান এবং এগুলোর রুজিদাতা এক আল্লাহ্। সকলেই তাঁর কুদরতের অধীনে এবং তাঁর অনুগ্রহ, কৃপা, রহমত, আযাব ও প্রতাপের আওতাভুক্ত । তিনি নেয়ামত দিলে তা তাঁর কৃপা আর শাস্তি দিলে তা তাঁর ন্যায়পরায়ণতা। তিনি বলেন ঃ বেহেশতের জন্যে, আমার কোন পরওয়া নেই । কোন কিছুর পরওয়া না হওয়া খুবই মহত্ত্বের কথা। এসব বিষয় চিন্তা করলে মুতাকাল্লিমের মাহাত্ম্য অন্তরে উপস্থিত হয়। এর পর কালামের মাহাত্ম্য তাতে স্থান পায়।

তৃতীয়তঃ তেলাওয়াতের সময় অন্তর উপস্থিত থাকা এবং অন্য কোন চিন্তা মনে না থাকা উচিত। কোরআনে আছে– يٰيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ قوة বলে চেষ্টা ও অধ্যবসায় বুঝানো হয়েছে। চেষ্টা অধ্যবসায় সহকারে কিতাব গ্রহণ করার অর্থ কিতাব পাঠ করার সময় সকল চিন্তাভাবনা ও হিম্মত কিতাবের মধ্যেই ব্যাপৃত রাখা– অন্য কিছু চিন্তা না করা। জনৈক বুযুর্গকে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ কোরআন মজীদ পাঠ করার সময় আপনি

মনে মনে অন্য কোন কথা চিন্তা করেন কিনা? তিনি বললেন ঃ কোরআনের চেয়ে বেশী অন্য কোন বিষয় আমার প্রিয় নয়, যার কথা আমি চিন্তা করব। জনৈক বুযুর্গ যখন কোন সূরা পাঠ করতেন এবং তাতে মন নিবিষ্ট হত না, তখন তা পুনরায় পাঠ করতেন । এটা কালামের তাযীম থেকে উৎপন্ন হয়। কেননা, মানুষ যে কালাম পাঠ করে, তার তাযীম করলে সে তার সঙ্গ লাভ করে এবং তার প্রতি গাফেল হয় না। কোরআন মজীদে মন লাগার মত বিষয়াদি রয়েছে। শর্ত, যোগ্য পাঠক হতে হবে।

চতুর্থতঃ পঠিত বিষয়ে চিন্তাভাবনা করা উচিত। এটা অন্তরের উপস্থিতি থেকে আলাদা বিষয়। মাঝে মাঝে তেলাওয়াতকারী কোরআন ব্যতীত অন্য বিষয় চিন্তা করে না; কিন্তু কোরআন কেবল মুখে উচ্চারণ করে, তার অর্থ বুঝে না। অথচ পাঠ করার উদ্দেশ্য অর্থ বুঝা এবং চিন্তাভাবনা করা। এ কারণেই কোরআন থেমে থেমে পড়া সুন্নত । বাহ্যতঃ থেমে থেমে পড়লে অন্তর চিন্তা করবে এবং বুঝতে থাকবে। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ যে এবাদত বুঝে-সুজে করা হয় না, তাতে বরকত হয় না এবং যে তেলাওয়াতে চিন্তাভাবনা নেই; তাতে কল্যাণ নেই। যদি তেলাওয়াতকারী পুনরায় তেলাওয়াত না করে অর্থ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা না করতে পারে, তবে পুনরায় তেলাওয়াত করা উচিত; কিন্তু ইমামের পেছনে এরূপ করা অনুচিত। কেননা, ইমামের পেছনে এক আয়াত সম্পর্কে চিন্তা করলে এবং ইমাম অন্য আয়াতে মশগুল হলে সেটা এমন হবে, যেমন কোন ব্যক্তি তার কানে একটি কথা বলার পর সে একথা নিয়েই ব্যাপৃত হয়ে পড়ে এবং অবশিষ্ট কথা কিছুই বুঝে না। এটা তখনও প্রযোজ্য, যখন ইমাম রুকুতে চলে যায় অথচ মোক্তাদী ইমামের পঠিত আয়াত সম্পর্কেই চিন্তা-ভাবনা করতে থাকে; বরং ইমাম যে রোকনে যায় এবং যা কিছু পড়ে, মোক্তাদী তাই চিন্তা করবে। অন্য কিছু চিন্তা করা কুমন্ত্রণার অন্তর্ভুক্ত। আমের ইবনে আবদে কায়স বলেন ঃ নামাযে আমার মনে কুমন্ত্রণা দেখা দেয়। লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ আপনার মনে কি পার্থিব বিষয়াদির কুমন্ত্রণা দেখা দেয়? তিনি বললেন ঃ

পার্থিব বিষয়াদির কুমন্ত্রণার তুলনায় তো আমি যবেহ হয়ে যাওয়া উত্তম মনে করি; বরং ব্যাপার হচ্ছে, আমার অন্তর নিজের পালনকর্তার সামনে দন্ডায়মান হওয়াতে ব্যাপৃত হয়ে যায় এবং ভাবতে থাকে, এখান থেকে কিরূপে ফিরবে। দেখ, এ বিষয়টিকেও তিনি কুমন্ত্রণা মনে করছেন। এ বিষয়টি হযরত হাসান বসরীর সামনে আলোচিত হলে তিনি বললেন ঃ যদি আমের ইবনে আবদে কায়সের এ অবস্থা সত্য হয়, তবে আল্লাহ্ তাআলা আমার প্রতি এ অনুগ্রহ করেননি। বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" পাঠ করলেন এবং বিশ বার তার পুনরাবৃত্তি করলেন। এ পুনরাবৃত্তির কারণ এটাই ছিল যে, তিনি এর অর্থ নিয়ে চিন্তাভাবনা করছিলেন। হযরত আবু যর (রাঃ)-থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সাঃ) এক রাতে সাহাবীদেরকে নিয়ে নামায পড়লেন এবং সমস্ত রাত একই আয়াত বার বার পাঠ করলেন। আয়াতটি ছিল এই ঃ

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ـ

অর্থাৎ, যদি আপনি তাদেরকে আযাব দেন, তবে তারা তো আপনারই বান্দা। আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করেন তবে আপনি পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ।

তামীমে দারী একবার এ আয়াতেই সমস্ত রাত অতিবাহিত করে দেন ঃ

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئٰتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَوَاۤءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاۤءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ـ

অর্থাৎ, গোনাহগাররা কি ধারণা করে যে, আমি তাদেরকে সে ব্যক্তিদের মত করে দেব, যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম সম্পাদন করেছে? তাদের জীবন মৃত্যু কি সমান হবে? তাদের এ ফয়সালা অত্যন্ত অযৌক্তিক।

একবার সায়ীদ ইবনে জুবায়ের এ আয়াতটি পাঠ করতে করতে

ভোর করে দেন- وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ (হে অপরাধীর দল, আজ তোমরা পৃথক হয়ে যাও।) জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আমি একটি সূরা শুরু করি, এতে এমন কিছু বিষয় প্রত্যক্ষ করি যে, ভোর পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকি, কিন্তু সূরা শেষ হয় না। অন্য একজন বলেন ঃ যেসব আয়াত আমি বুঝি না এবং যেসব আয়াতে আমার মন বসে না, সেগুলো পাঠে সওয়াব হবে বলে আমি মনে করি না। আবু সোলায়মান দারানী বলেন ঃ আমি এক আয়াত পাঠ করি এবং চার পাঁচ রাত এতেই অতিবাহিত হয়ে যায়। আমি নিজে চিন্তা-ভাবনা ত্যাগ না করলে অন্য আয়াত পাঠ করার সুযোগই হয় না। জনৈক বুযুর্গ সূরা হূদেই ছয় মাস কাটিয়ে দেন। তিনি এ সূরাটিই বার বার পাঠ করেন। জনৈক সাধক বলেন ঃ আমার খতম একটি সাপ্তাহিক, একটি মাসিক, একটি বার্ষিক এবং একটি এমন, যা আমি ত্রিশ বছর ধরে শুরু করেছি, কিন্তু এখনও শেষ করতে পারিনি। অর্থাৎ, চিন্তাভাবনা ও অনুসন্ধান যত বেশী হয়, খতমের মেয়াদ ততই দীর্ঘ হয়ে যায়। তিতি আরও বলেন ঃ আমি নিজেকে মজুরের স্থলাভিষিক্ত করে রেখেছি। তাই আমি রোজের কাজও করি, সাপ্তাহিক এবং বার্ষিক হিসেবেও করি। পঞ্চমতঃ কোরআনের প্রত্যেক আয়াতের বিষয়বস্তু বের করে তা হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। কেননা, কোরআনে অনেক বিষয়বস্তু রয়েছে। এতে আল্লাহ তাআলার গুণাবলী, ক্রিয়াকর্ম এবং পয়গম্বরগণের অবস্থা, তাঁদের প্রতি মিথ্যারোপকারীদের পরিণতি, তাদেরকে ধ্বংস করার কাহিনী, আল্লাহ তাআলার আদেশ নিষেধ এবং জান্নাত ও দোযখের বিষয়স্তু বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ তায়ালার গুণাবলী সম্পর্কিত আয়াত উদাহরণতঃ এই ঃ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ وَّهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ (তাঁর অনুরূপ কেউ নেই। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।)

اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ.

অর্থাৎ, তিনি বাদশাহ, সর্বপ্রকার দোষমুক্ত সত্তা, নিরাপত্তাদানকারী, পরাক্রমশালী, মহান।

সুতরাং এসব নাম ও সিফত সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করতে হবে, যাতে গোপন রহস্য প্রকাশ পায়। এগুলোর মধ্যে অনেক অর্থসম্ভার লুক্কায়িত রয়েছে যা তওফীকপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ ছাড়া কেউ জানতে পারে না। হযরত আলী (রাঃ) এদিকে ইঙ্গিত করেই বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাকে কোন কথা গোপনে বলেননি, যা অন্যের কাছে প্রকাশ করেননি; কিন্তু সত্য, আল্লাহ্ তাআলা কোন কোন বান্দাকে কোরআন বুঝার ক্ষমতা দান করেন। সুতরাং হযরত আলী বর্ণিত এই বুঝার ক্ষমতা লাভের আকাঙ্ক্ষা করা উচিত। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষের জ্ঞান কামনা করে, তার উচিত কোরআন মজীদের জ্ঞান নিয়ে গবেষণা করা। আল্লাহ্ তাআলার নাম ও সিফতসমূহের মধ্যে কোরআনের অধিকাংশ জ্ঞান নিহিত। এগুলোর মধ্যে থেকে অধিকাংশ লোক তাই জেনেছে, যা তাদের বোধশক্তির উপযুক্ত। তারা এগুলোর গভীরে পৌঁছাতে পারেনি।

আল্লাহ্ তাআলার ক্রিয়াকর্মের মধ্যে রয়েছে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করা, মৃত্যু দান করা ইত্যাদি। এসব ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলার নাম ও গুণাবলী বুঝা উচিত। কেননা, ক্রিয়া কর্তার অবস্থা জ্ঞাপন করে এবং ক্রিয়ার মাহাত্ম্য দিয়ে কর্তার মাহাত্ম্য জানা যায়। তাই ক্রিয়ার মধ্যে কর্তাকে প্রত্যক্ষ করা উচিত। শুধু ক্রিয়ার দিকেই লক্ষ্য রাখবে না। কেননা, যে আল্লাহ্কে চেনে, সে প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে তাঁকে দেখতে পায়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নিজের দেখা প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে আল্লাহকে দেখে না, সে যেন আল্লাহর পরিচয়ই পায়নি। যে আল্লাহকে চিনেছে, সে জানে, আল্লাহর সত্তা ব্যতীত সকল বস্তু বাতিল এবং তাঁর সত্তা ব্যতীত সবকিছু ধ্বংসশীল। এ বিষয়টি এলমে মোকাশাফার সূচনা। এ কারণেই তেলাওয়াতকারী যখন আল্লাহর এই এরশাদ পাঠ করে ঃ

اَفَرَاَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ ـ اَفَرَأَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ ـ أَفَرأَيْتُمُ الْمَاءَ
الَّذِىْ تَشْرَبُوْنَ ـ اَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِىْ تُوْرُوْنَ ـ

অর্থাৎ, তোমরা যে বীজ বপন কর, সে সম্পর্কে চিন্তা করেছ কি? তোমরা যে বীর্যপাত কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? তোমরা যে পানি পান কর, তার ব্যপারে চিন্তা করেছ কি? তোমরা যে অগ্নি প্রজ্বলিত কর, তা লক্ষ্য করেছ কি?)

এসব আয়াত পাঠ করার সময় দৃষ্টিকে আগুন, পানি, বীজ বপন ও বীর্যপাত থেকে ফিরিয়ে রাখা উচিত নয়; বরং সবগুলো সম্পর্কে চিন্তা করা দরকার। উদাহরণতঃ বীর্য সম্পর্কে চিন্তা করবে যে, বীর্য একই উপাদানে গঠিত ছিল। এ থেকে অস্থি, মাংস, শিরা, উপশিরা কিরূপে নির্মিত হল? বিভিন্ন আকারের মাথা, হাত, পা, কলিজা, হৃৎপিন্ড ইত্যাদি কিরূপে গঠিত হল? এর পর তাতে শ্রবণ, দর্শন, বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদি সদগুণাবলী এবং ক্রোধ, কাম, কুফর, মূর্খতা, পয়গম্বরগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা, বাজে তর্ক-বিতর্ক করা ইত্যাদি মন্দ স্বভাব কিরূপে সৃষ্টি হল? আল্লাহ বলেন ঃ

اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ -

অর্থাৎ, মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাকে বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর সে হয়ে গেল সুস্পষ্ট তার্কিক।

মোট কথা, যখনই ক্রিয়াকে দেখবে, তখনই কর্তার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে। পয়গম্বরগণের অবস্থা যখন শুনবে, তাঁদের প্রতি কিভাবে মিথ্যারোপ করা হয়েছিল, নির্যাতন করা হয়েছিল এবং কতককে হত্যা পর্যন্ত করা হয়েছিল, তখনই বুঝে নেবে, আল্লাহ্ তাআলা পরাঙ্মুখ। তিনি রসূলগণেরও মুখাপেক্ষী নন এবং তাদেরও মুখাপেক্ষী নন, যাদের প্রতি রসূলগণ প্রেরিত হয়েছিলেন । তিনি সকলকে ধ্বংস কর দিলে তাঁর রাজত্বে বিন্দুমাত্র ত্রুটি দেখা দেবে না। এর পর পরিণামে যখন পয়গম্বরগণকে সাহায্যদানের অবস্থা শুনবে তখন বুঝবে, আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান। তিনি সত্যকে সাহায্যদান করেন।

আদ, সামুদ প্রভৃতি মিথ্যারোপকারী সম্প্রদায়ের অবস্থা শুনে আল্লাহ্

তাআলার প্রতাপ ও প্রতিশোধকে ভয় করবে এবং এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে।

জান্নাত জাহান্নামের বর্ণনা শুনেও এমনি ধরনের চিন্তা করবে। কোরআনে বর্ণিত অন্য কোন অবস্থা শ্রুতিগোচর হলে সে সম্পর্কেও চিন্তাভাবনা করবে। কেননা, কোরআন থেকে যেসব তত্ত্ব বুঝা যায়, সেগুলো পুরোপুরি লেখা সম্ভবপর নয়।

আল্লাহ্ বলেন ঃ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ

অর্থাৎ, আর্দ্র ও শুষ্ক সকলই প্রকাশ্য কিতাবে রয়েছে।

অন্যত্র বলেন ঃ

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّيْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ـ

অর্থাৎ, বলুন, যদি সমুদ্র কালি হয়ে হয়ে যায় আমার পালনকর্তার বাণীসমূহ লেখার জন্যে, তবে বাণী শেষ হওয়ার পূর্বে সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে, যদিও আমি এর অনুরূপ আরও কালি এনে নেই।

আল্লাহর বাণীর কোন শেষ নেই। এদিক দিয়েই হযরত আলী (রাঃ) এরশাদ করেন ঃ আমি ইচ্ছা করলে আলহামদুর তফসীর দ্বারা সত্তরটি উট বোঝাই করে দিতে পারি। এখানে আমরা যা উল্লোখ করেছি, তা কেবল পথ খুলে দেয়ার জন্যে করেছি। অন্যথায় এ বিষয়টি পুর্ণরূপে বর্ণনা করার আশাই করা যায় না। যে ব্যক্তি কোরআন মজীদের বিষয়বস্তু সামান্যও বুঝে না, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ اِلَيْكَ حَتّٰى اِذَا خَرَجُوْا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ اٰنِفًا اُولٰٓئِكَ الَّذِيْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ ـ

অর্থাৎ, তাদের কেউ কেউ আপনার দিকে কান পাতে। অবশেষে

যখন আপনার কাছ থেকে বের হয়ে যায়, তখন জ্ঞানপ্রাপ্তদেরকে বলে ঃ এ মাত্র সে কি বলল? এদের অন্তরেই আল্লাহ্ তাআলা মোহর মেরে দিয়েছেন।

ষষ্ঠতঃ কোরআন বুঝার ক্ষেত্রে যেসকল বাধাবিপত্তি রয়েছে, সেগুলো থেকে একাগ্র চিত্ত হতে হবে। অধিকাংশ লোক যারা কেরআনের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়নি, তাদের না বুঝার কারণ এটাই যে, শয়তান তাদের অন্তরের উপর বাধাবিপত্তির আবরণ রেখে দিয়েছে। ফলে কোরআনের বিস্ময়কর অর্থসম্ভার তাদের হৃদয়ঙ্গম হয় না। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

لو لا ان الشياطين يحومون على قلوب بنى ادم لنظروا الى الملكوت .

অর্থাৎ, যদি শয়তানরা মানুষের অন্তরের উপর অবিরাম চক্কর দিতে না থাকত, তবে তারা ফেরেশতা জগতকেও দেখতে পেত।

যে বস্তু ইন্দ্রিয়ের কাছে অনুপস্থিত এবং যা বিবেকের নূর ছাড়া জানা যায় না, তাই ফেরেশতা জগতের অন্তর্ভুক্ত। কোরআনের অর্থসম্ভারও এমনি ।

কোরআন বুঝার পথে আবরণ চারটি। প্রথম, এ ব্যাপারে সচেষ্ট হওয়া যে, কোরআনের অক্ষরসমূহকে মাখরাজ (উচ্চারণস্থল) থেকেই উচ্চারণ করা উচিত। কারীদের উপর নিয়োজিত একটি শয়তান এ ব্যাপার তদারক করে থাকে– যাতে সে কারীদের প্রচেষ্টা কোরআনের অর্থ বুঝা থেকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেয়। সে কারীদেরকে প্রত্যেকটি অক্ষর বার বার উচ্চারণ করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং তাদের মনে বদ্ধমূল ধারণা সৃষ্টি করে যে, অক্ষরটি এখনও সঠিক মাখরাজ থেকে উচ্চারিত হয়নি। সুতরাং যে ক্ষেত্রে কারীদের প্রচেষ্টা ও চিন্তাভাবনা কেবল অক্ষরসমূহের মাখরাজেই সীমিত থেকে যায়, সেক্ষেত্রে তাদের সামনে কোরআনের অর্থ কিরূপে পরিস্ফুট হবে? যে ব্যক্তি শয়তানের এ ধরনের প্রতারণার শিকার

হয়, সে ক্ষেত্রবিশেষে শয়তানের একজন বড় ভাঁড়ে পরিণত হয়।

দ্বিতীয় আবরণ হচ্ছে, কোন মতবাদ শুনে তার অনুসারী হয়ে যাওয়া এবং প্রশংসা করা। এরূপ ব্যক্তি তার বিশ্বাসের শিকলে আবদ্ধ থাকে। ফলে তার অন্তরে নিজের বিশ্বাস ছাড়া অন্য কোন কথা স্থান পায় না। তার দৃষ্টি কেবল নিজের শুনা কথার উপর নিবদ্ধ থাকে। যদি সে দূর থেকে কোন আলো দেখতে পায় এবং কিছু অর্থ তার বিশ্বাসের খেলাফ প্রকাশ পায়, তবে অনুসরণরূপী শয়তান তার উপর চড়াও হয়ে বলে ঃ এ কথা তোমার মনে কিরূপে এল? এটা তো তোমার বুযুর্গদের আকীদার খেলাফ। এর পর লোকটি এসব অর্থকে শয়তানের প্রবঞ্চনা মনে করে তা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়। এ অর্থেই সুফী বুযুর্গগণ বলেন, জ্ঞান এক প্রকার আবরণ। এখানে জ্ঞান বলে তারা এমন আকায়েদের জ্ঞান বুঝিয়েছেন, যা অধিকাংশ লোক কেবল অনুসরণের দিক থেকে অবলম্বন করে নেয়, অথবা মাযহাবের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ লোকেরা বিতর্কমূলক বাণীসমূহ লিপিবদ্ধ করে তাদেরকে শিখিয়ে দেয়। নতুবা সত্যিকার জ্ঞান হচ্ছে কাশফ ও অন্তর্দৃষ্টির নূর প্রত্যক্ষ করা। এটা কোনরূপেই আবরণ হতে পারে না, এরূপ জ্ঞানই চরম প্রার্থিত বিষয়।

তৃতীয় আবরণ হচ্ছে, কোন গোনাহে অব্যাহতভাবে লিপ্ত থাকা অথবা অহংকারী হওয়া অথবা পার্থিব বিষয়াদির মোহে পতিত হওয়া। এগুলোর কারণে অন্তর অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় এবং তাতে মরিচা পড়ে যায়। আয়নায় মরিচা পড়ে গেলে যেমন তাতে প্রতিচ্ছবি যথাযথ প্রতিফলিত হয় না, তেমনি এগুলো থাকলে অন্তরে সত্যের দ্যুতি পরিষ্কাররূপে ফুটে উঠে না। অন্তরের উপর মোহ ও কামনার স্তূপ যত বেশী হবে ততই এর তরফ থেকে কোরআনের অর্থের উপর বেশী আবরণ পড়বে। পক্ষান্তরে দুনিয়ার বোঝা যত হালকা হবে, ততই অর্থের দ্যুতি নিকটে এসে যাবে। কেননা, যার প্রতিচ্ছবি আয়নার মত, মোহ মরিচার মত এবং কোরআনের অর্থ সেই চিত্রের মত যার প্রতিচ্ছবি আয়নায় প্রতিফলিত হয়। অন্তর থেকে মোহ দূর করা আয়না ঘষে মেজে পরিষ্কার করার অনুরূপ। এজন্যেই

রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ আমার উম্মত যখন দীনার ও দেরহামকে বড় মনে করবে, তখন তার কাছ থেকে ইসলামের ভীতি দূর হয়ে যাবে। তারা যখন সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ ত্যাগ করবে, তখন ওহীর বরকত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। হযরত ফোযায়ল বলেন ঃ এর অর্থ, তারা কোরআনের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়বে।

চতুর্থ আবরণ হচ্ছে, বাহ্যতঃ কোন তফসীর পড়ে নিয়ে এরূপ বিশ্বাস করে নেয়া যে, হযরত ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদ কোরআনের যে তফসীর বর্ণনা করছেন, তা ছাড়া কোরআনের অন্য কোন তফসীর নেই। কেউ অন্য অর্থ বললে সে তার বিবেক দ্বারাই তা বলে। এরূপ তফসীরকার সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে ঃ যে ব্যক্তি নিজের মতামত দ্বারা কোরআনের তফসীর করে, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে তালাশ করে নেয়। এরূপ বিশ্বাসও কোরআন বুঝার ক্ষেত্রে একটি অন্তরায়।

চতুর্থ শিরোনামে আমরা বর্ণনা করব যে, মতামত দ্বারা তফসীর করার অর্থ কি?

সপ্তমতঃ কোরআনের প্রত্যেকটি সম্বোধন নিজের জন্যে মনে করবে। অর্থাৎ, কোন আদেশ নিষেধ শুনলে মনে করবে, এ আদেশ নিষেধ আমাকে করা হয়েছে। অনুরূপভাবে কোন পুরস্কারের ওয়াদা ও শাস্তি বাণী শুনলে তা নিজের জন্যে মনে করবে। পূর্ববর্তী উম্মত ও পয়গম্বরগণের কিস্সা উদ্দেশ্য নয়; বরং এ থেকে শিক্ষা দান করা লক্ষ্য। কেননা, কোরআন পাকের সবগুলো কিস্সার বিষয়বস্তু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও তাঁর উম্মতের জন্যে কিছু না কিছু উপকারী।

এজন্যই আল্লাহ্ বলেন ঃ مَا نُثَبِّتُ بِهٖ فُؤَادَكَ

অর্থাৎ, যা দ্বারা আমি আপনার অন্তরকে প্রতিষ্ঠা দান করি।

অতএব তেলাওয়াতকারীর মনে করে নেয়া উচিত, আল্লাহ্ তাআলা পয়গম্বরগণের অবস্থা তথা নির্যাতনের মুখে তাঁদের ধৈর্য এবং আল্লাহর সাহায্যের অপেক্ষায় ধর্মের উপর দৃঢ়ভাবে কায়েম থাকার কাহিনী বর্ণনা

করে আমাদের অন্তরকে সত্যের উপর কায়েম রাখতে চান। আল্লাহ্ তাআলা বিশেষভাবে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জন্যই কোরআন নাযিল করেননি; বরং কোরআন সমগ্র বিশ্বের জন্যে প্রতিষেধক, হেদায়াত, নূর, রহমত। তাই আল্লাহ্ সকল মানুষকে কোরআনরূপী নেয়ামতের শোকর আদায় করার আদেশ দিয়েছেন। এরশাদ হয়েছে ঃ

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَا اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهٖ ـ

অর্থাৎ, তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর। আর স্মরণ কর তোমাদের উপদেশের জন্যে তোমাদের উপর যে কিতাব ও প্রজ্ঞা নাযিল হয়েছে তাকে?

আরও এরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ـ

অর্থাৎ, আমি তোমাদের উপর এক কিতাব নাযিল করেছি, যাতে রয়েছে তোমাদের জন্যে উপদেশ। তোমরা কি বুঝ না?

আরও বলা হয়েছে ঃ

وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ ـ

অর্থাৎ, আমি আপনার প্রতি কোরআন নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানুষের কাছে তাদের প্রতি অবতীর্ণ বিষয়াদি পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করতে পারেন।

আরও বলা হয়েছে ঃ كَذَالِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ ـ

অর্থাৎ, এমনিভাবে আল্লাহ্ মানুষের কাছে তাদের অবস্থা বর্ণনা করেন।

আরও বলা হয়েছে ঃ وَاتَّبِعُوْآ اَحْسَنَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ

অর্থাৎ, তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ উত্তম বিষয়ের

অনুসরণ কর।

আল্লাহ্ বলেন ঃ هٰذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّوقِنُونَ

অর্থাৎ, এটা মানুষের জন্যে উপদেশ এবং বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্যে হেদায়াত ও রহমত।

আল্লাহ্ বলেন ঃ هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ

অর্থাৎ, এটা মানুষের জন্য বর্ণনা এবং খোদাভীরুদের জন্য হেদায়াত ও উপদেশ।

এসব আয়াত থেকে জানা গেল, সম্বোধন সকল মানুষকেই করা হয়েছে। তেলাওয়াতকারীও তাদের একজন বিধায় সেও নিঃসন্দেহে তাতে শরীক। তাই মনে করা উচিত, সম্বোধন দ্বারা সে-ই উদ্দেশ্য।

আল্লাহ্ বলেন ঃ وَاُوْحِيَ اِلَيَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْۢ بَلَغَ

অর্থাৎ– আমার প্রতি এই কোরআন ওহীযোগে প্রেরণ করা হয়েছে, যাতে এর মাধ্যমে আমি তোমাদেরকে এবং যার কাছে এই কোরআন পৌঁছে, সতর্ক করি।

মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরযী বলেন ঃ যার কাছে কোরআন পৌঁছে, তার সাথে যেন আল্লাহ তাআলা কথা বলেন। তেলাওয়াতকারী যখন নিজেকে সম্বোধিত মনে করবে, তখন যেনতেনভাবে তেলাওয়াত করবে না; বরং এমনভাবে তেলাওয়াত করবে, যেমন গোলাম তার প্রভুর পরওয়ানা পাঠ করে, যাতে প্রভু লেখে, তাকে বুঝেসুজে কাজ করতে হবে। এ কারণেই জনৈক আলেম বলেন ঃ এই কোরআন আমাদের পরওয়ারদেগারের তরফ থেকে পত্র ও ওয়াদা-অঙ্গীকারসহ আগমন করেছে, যাতে এগুলো আমরা নামাযের মধ্যে বুঝি এবং একান্তে অবগত হয়ে আনুগত্যের কাজে বাস্তবায়ন করি। হযরত মালেক ইবনে দীনার বলতেন ঃ হে কোরআনধারীগণ, কোরআন তোমাদের অন্তরে কি বপন করেছে? কোরআন মুমিনের জন্যে বসন্তকাল, যেমন মাটির জন্যে বৃষ্টি

বসন্তকাল। হযরত কাতাদা (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোরআনের সাহচর্য অবলম্বন করে, সে লাভবান হয়, না হয় লোকসান দেয়। আল্লাহ্ বলেন ঃ

هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ـ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا ـ

অর্থাৎ, কোরআন মুমিনের জন্যে প্রতিষেধক ও রহমত এবং এটা গোনাহগারদের জন্যে কেবল ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।

অষ্টম আদব এই যে, তেলাওয়াতের সময় যখন যে ধরনের বিষয়বস্তু আসবে, তখন সে ধরনের প্রভাব কবুল করবে। চিন্তা, ভয় ও আশার আয়াতসমূহ পাঠকালে, অন্তরে সে অবস্থাই সৃষ্টি করবে। যার অন্তরে আল্লাহর মারেফত কামেল হবে, তার অন্তরে অধিকাংশ সময় ভয় প্রবল থাকবে। কেননা, কোরআনের আয়াতসমূহে সংকোচন অনেক বেশী। উদাহরণতঃ রহমত ও মাগফেরাতের আলোচনা এমন সব শর্তের সাথে জড়িত দেখা যায়, যা অর্জন করতে সাধক অক্ষম হয়ে পড়ে। দেখ, মাগফেরাতের ক্ষেত্রে চারটি শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

وَاِنِّىْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدٰى ـ

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমি সে ব্যক্তির মাগাফেরাত করি, যে তওবা করে, ঈমান আনে, সৎকর্ম করে অতঃপর সৎপথে থাকে। আরও বলা হয়েছে ঃ

وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ـ

অর্থাৎ, পড়ন্ত দিনের কসম, নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু যারা ঈমান আনে, সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্য ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।

এতেও চারটি শর্ত উল্লিখিত হয়েছে। যেখানে সংক্ষেপ করা হয়েছে সেখানেও এমনি একটি শর্ত বর্ণিত হয়েছে, যাতে সবগুলো শর্ত দাখিল। উদাহরণতঃ বলা হয়েছে ঃ اِنَّ رَحْمَةَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহর রহমত সজ্জনদের নিকটবর্তী।

এখানে রহমতের জন্যে সজ্জন হওয়ার শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছে। সজ্জন হওয়ার জন্যে পূর্বোল্লিখিত সকল শর্তের উপস্থিতি দরকার। কোরআনের আদ্যোপান্ত পাঠ করলে এমনি ধরনের বিষয়বস্তু অনেক পাওয়া যাবে। যে ব্যক্তি এ বিষয়টি বুঝে, তার মধ্যে ভয় ও চিন্তা থাকাই যথার্থ। এ কারণেই হযরত হাসান বসরী বলেন ঃ যে কোরআন পাঠ করে ও তার প্রতি ঈমান রাখে, তার চিন্তা অনেক বেড়ে যায় এবং আনন্দ হ্রাস পায়। সে কাঁদে বেশী এবং হাসে কম। তার দুঃখ ও কর্মব্যস্ততা বেড়ে যায় এবং আরাম ও কর্মহীনতা কমে যায়। ওহায়ব ইবনে ওয়ার্দ বলেন ঃ আমি হাদীস ও ওয়াযের বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেছি; কিন্তু কোরআনের তেলাওয়াত ও চিন্তাভাবনা যত বেশী অন্তরকে নরম করে এবং চিন্তাকে টেনে আনে, তত বেশী আর কোন কিছুই পারে না। মোট কথা, তেলাওয়াত দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে, যে আয়াত তেলাওয়াত করা হয়, তার গুণে গুণান্বিত হয়ে যাওয়া। উদাহরণতঃ শাস্তির আয়াতে এবং যে আয়াতে মাগফেরাতকে অনেক শর্তের সাথে জড়িত করা হয়েছে, সেখানে এতটুকু ভীত হবে যেন মরেই যাবে। আর যেখানে রহমত ও মাগফেরাতের ওয়াদা করা হয়েছে, সেখানে এমন খুশী হবে যেন খুশীতে উড়ে যাবে। আল্লাহ্ তাআলার গুণাবলী ও নাম বর্ণিত হওয়ার সময় তার প্রতাপের সামনে বিনম্র হওয়া ও তাঁর মাহাত্ম্য জানার কারণে মস্তক নত করে দেবে। যখন কাফেরদের আলোচনা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ সম্পর্কে তাদের অসম্ভব উক্তি পাঠ করবে, যেমন আল্লাহ্ সন্তানধারী, তাঁর পত্নী আছে– তখন কণ্ঠস্বর নীচু করে দেবে এবং মনে মনে লজ্জিত হবে। জান্নাতের অবস্থা বর্ণিত হওয়ার সময় অন্তরে তাঁর প্রতি আগ্রহ জাগ্রত করবে এবং জাহান্নামের অবস্থা বর্ণনা করার সময় তার ভয়ে কেঁপে উঠবে। রসূলে করীম (সাঃ) একবার হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ)-কে আদেশ করলেন ঃ আমাকে কোরআন পাঠ করে শুনাও। হযরত ইবনে মসউদ বলেন ঃ আমি সূরা নিসা শুরু করে এই আয়াতে পৌঁছলাম–

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰٓؤُلَاءِ شَهِيْدًا ـ

অর্থাৎ, তখন কি অবস্থা হবে, যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী ডাকব এবং আপনাকে ডাকব তাদের উপর সাক্ষ্যদাতারূপে?

এ সময় দেখলাম, রসূলে করীম (সাঃ))-এর চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে। তিনি বললেন ঃ এখন বন্ধ কর। এটা বলার কারণ, এ অবস্থা প্রত্যক্ষকরণে তখন তাঁর অন্তর নিমজ্জিত ছিল। কেউ কেউ শাস্তির আয়াত শুনে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যেতেন। আবার কেউ কেউ এমনও ছিলেন যে, আয়াত শুনতে শুনতে তাদের আত্মা দেহপিঞ্জর ছেড়ে গিয়েছিল। সারকথা, এ ধরনের প্রভাবের ফলে তেলাওয়াতকারী নিছক নকলকারী থাকে না। উদাহরণতঃ

اِنِّىْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّىْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ -

অর্থাৎ, আমি পরওয়ারদেগারের অবাধ্য হলে এক মহাদিবসের আযাবকে ভয় করি।

এ আয়াত পাঠ করার সময় যদি অন্তরে ভয় না থকে, তবে এটা কেবল কালাম নকল করা হবে।

অনুরূপভাবে- عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاِلَيْكَ اَنَبْنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ

অর্থাৎ, তোমার উপর ভরসা করলাম, তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করলাম এবং প্রত্যাবর্তন তোমারই দিকে।

এ আয়াত পাঠ করার সময় যদি ভরসা ও প্রত্যাবর্তনের অবস্থা না হয়, তবে এটা মৌখিক উদাহরণই হবে। এরূপ পাঠক নিম্নোদ্ধৃত আয়াতসমূহের প্রতীক হয়ে যাবে-

وَمِنْهُمْ اُمِّيُّوْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتٰبَ اِلَّآ اَمَانِىَّ -

অর্থাৎ, তাদের মধ্যে কতক নিরক্ষর লোক রয়েছে, যারা কিতাবের খবর রাখে না; কিন্তু আশা-আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। অর্থাৎ, কেবল তেলাওয়াতই জানে।

وَكَأَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ ـ

অর্থাৎ, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে কিছু নিদর্শনাবলী রয়েছে, যেগুলোর কাছ দিয়ে তারা পথ চলে এবং সেদিকে ধ্যান করে না।

কেননা, কোরআন পাকে এসব নিদর্শন উত্তমরূপে বর্ণিত হয়েছে। পাঠক এগুলো এড়িয়ে গেলে এবং প্রভাবান্বিত না হলে বলতে হবে যে, সে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এ কারণেই জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোরআনের চরিত্রে ভূষিত হয় না, সে যখন কোরআন পাঠ করে, তখন আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ আমার কালামের সাথে তোর কি সম্পর্ক? তুই তো আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়েই নিয়েছিস। তুই যদি আমার দিকে প্রত্যাবর্তন না করিস, তবে আমার কালাম পাঠ করার প্রয়োজন নেই। পাপী ব্যক্তির বার বার কোরআন পাঠ করা এমন, যেমন কেউ রাজকীয় পরওয়ানা সারা দিনে কয়েকবার পাঠ করে এবং তাতে নির্দেশ থাকে, দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ কর; কিন্তু সে দেশকে উৎসন্ন করার কাজে লিপ্ত থাকে এবং পরওয়ানাটি কেবল পাঠ করেই ক্ষান্ত থাকে। সে যদি পরওয়ানা পাঠ না করত এবং রাজকীয় আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করত, তবে এতে রাজকীয় পরওয়ানার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন এবং রাজকীয় ক্রোধে পতিত হওয়ার আশংকা সম্ভবতঃ কম হত। এ কারণেই ইউসুফ ইবনে আসবাত বলেন ঃ আমি কোরআন তেলাওয়াতের ইচ্ছা করি; কিন্তু যখন কোরআনের বিষয়বস্তু স্মরণ করি, তখন ভীত হয়ে পড়ি এবং তেলাওয়াত ছেড়ে তসবীহ ও এস্তেগফার পাঠ করতে শুরু করি। যে ব্যক্তি কোরআনের আমল থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার কর্ম এই আয়াতের অনুরূপ ঃ

فَنَبَذُوْهُ وَرَاءَ ظُهُوْرِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُوْنَ ـ

অর্থাৎ, তারা তাকে পিঠের পশ্চাতে নিক্ষেপ করল এবং এর বদলে

তুচ্ছ বস্তু ক্রয় করল। তারা খুব মন্দ ক্রয় করে।

এ জন্যেই রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ যতক্ষণ মনে চায় এবং মন নরম থাকে, ততক্ষণ কোরআন পাঠ কর। এ অবস্থা না থাকলে কোরআন পাঠ ক্ষান্ত কর। আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ـ

অর্থাৎ, আল্লাহ্র নাম উচ্চারিত হলে যাদের অন্তর ভীত হয়, তাঁর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হলে যাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং যারা তাদের পালনকর্তার উপর ভরসা করে।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ কোরআন তেলাওয়াত শুনে যা মনে হয় সে আল্লাহকে ভয় করে, সেই সুকণ্ঠ কারী । তিনি আরও বলেন ঃ খোদাভীরুর মুখ থেকে কোরআন যেরূপ ভাল শুনা যায়, তেমন অন্য কারও মুখ থেকে শুনা যায় না। সুতরাং কোরআন পাঠের উদ্দেশ্যই হচ্ছে অন্তরে এসব অবস্থা প্রকাশ পাওয়া এবং তদনুযায়ী আমল করা। নতুবা কেবল শব্দ উচ্চারণে জিহবা নাড়াচাড়া করলে লাভ কি? এজন্যেই জনৈক কারী বলেন ঃ আমি আমার ওস্তাদকে কোরআন পাঠ করে শুনালাম। এর পর পুনরায় শুনানোর জন্যে যখন তাঁর খেদমতে উপস্থিত হলাম, তখন তিনি আমাকে ধমক দিয়ে বললেন ঃ আমার সামনে পাঠ করাকেই তুমি আমল মনে করে নিয়েছ। যাও, আল্লাহর সামনে পাঠ কর এবং দেখ তিনি কি নির্দেশ করেন এবং কি বুঝাতে চান। এ কারণেই সাহাবায়ে কেরাম হাল ও আমল অর্জনে ব্যাপৃত থাকতেন। রসূলে করীম (সাঃ) এক লাখ বিশ হাজার সাহাবী রেখে ওফাত পান; কিন্তু তাঁদের মধ্যে সমগ্র কোরআনের হাফেয ছিলেন খুবই সীমিত সংখ্যক । অধিকাংশ সাহাবী একটি অথবা দু'টি সূরা হেফয করতেন। যাঁরা সূরা বাকারা ও সূরা আনআম হেফয করতেন, তাঁদেরকে আলেম বলে গণ্য করা হত। এক ব্যক্তি কোরআন শিখতে এসে যখন–

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ ـ

অর্থাৎ, যে অণু পরিমাণ সৎকর্ম করবে, সে তা দেখতে পাবে এবং যে অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করবে, সে তাও দেখতে পাবে।

আয়াতে পৌছল, তখন একথা বলে চলে গেল, আমার জন্যে এটাই যথেষ্ট। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ লোকটি ফকীহ্ (আলেম) হয়ে ফিরে গেছে। বাস্তবে সে অবস্থাই প্রিয় ও দুর্লভ, যা আল্লাহ্ তাআলা ঈমানদারের অন্তরে আয়াত বুঝার পরে দান করেন। কেবল জিহবা নাড়াচাড়া করা তেমন উপকারী নয়; বরং যে ব্যক্তি মুখে তেলাওয়াত করে এবং আমল থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে, সে এই আয়াতের প্রতীক হওয়ার যোগ্য–

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِىْ اَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا ـ قَالَ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰيٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى ـ

অর্থাৎ, যে আমার কোরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার জন্যে রয়েছে সংকীর্ণ জীবিকা। আমি কেয়ামতের দিন তাকে অন্ধ অবস্থায় হাশরে সমবেত করব। সে বলবে ঃ পরওয়ারদেগার, আমাকে অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করলে কেন? আমি তো চক্ষুষ্মান ছিলাম। আল্লাহ্ বলবেন ঃ এমনিভাবে তোমার কাছে আমার আয়াতসমূহ আগমন করেছিল; তুমি সেগুলো বিস্মৃত হয়েছিলে। আজ তুমিও তদ্রূপ বিস্মৃত হবে।

অর্থাৎ, তুমি আয়াতসমূহ চিন্তাভাবনা ছাড়াই পরিত্যাগ করেছিলে এবং কোন পরওয়া করনি।

বলাবাহুল্য, যে তেলাওয়াতে জিহবা, বোধশক্তি ও অন্তর শরীক থাকে, তাকেই যথার্থ তেলাওয়াত বলা হয়। জিহবার কাজ অক্ষর শুদ্ধ করে পড়া। বোধশক্তির কাজ অর্থ বর্ণনা করা এবং অন্তরের কাজ হচ্ছে

আদেশ পালন করা ও প্রভাবান্বিত হওয়া। সুতরাং জিহবা যেন উপদেশদাতা, বোধশক্তি যেন ভাষ্যকার এবং অন্তর যেন উপদেশ গ্রহিতা।

নবম আদব হচ্ছে, তেলাওয়াতে এতটুকু উন্নতি করা যাতে মনে হয় কোরআন আল্লাহ্ তাআলার কাছ থেকে শুনছে, নিজের কাছ থেকে নয়। কেননা, তেলাওয়াতের তিনটি স্তর রয়েছে। সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে, তেলাওয়াতকারী নিজেকে ধরে নেবে যেন সে আল্লাহ্ তাআলার সম্মুখে দাঁড়িয়ে তেলাওয়াত্ করছে, আল্লাহ্ তার দিকে দেখছেন এবং তেলাওয়াত শুনছেন। এ স্তরে তেলাওয়াতকারীর মধ্যে প্রার্থনা, খোশামোদ, নম্রতা ও অক্ষমতার অবস্থা প্রকাশ পাবে। দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে, সে নিজের অন্তর দ্বারা প্রত্যক্ষ করবে যেন আল্লাহ্ তাআলা তাকে দেখছেন, স্বীয় কৃপায় তাকে সম্বোধন করেন এবং অনুগ্রহবশতঃ তার কাছে গোপন রহস্যের কথা বলেন। এমতাবস্থায় তেলাওয়াতকারী লজ্জা, সম্মান প্রদর্শন, শ্রবণ ও হৃদয়ঙ্গম করার স্তরে অবস্থান করবে।

তৃতীয় স্তর হচ্ছে, তেলাওয়াতকারী কালামের ভেতরে এ কালাম যাঁর সেই আল্লাহকে দেখবে এবং শব্দের মধ্যে তাঁর গুণাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করবে। অর্থাৎ, নিজেকে দেখবে না, নিজের কেরাআতের প্রতি লক্ষ্য করবে না এবং নিজের উপর নেয়ামত সম্পর্কেও ধ্যান করবে না; বরং সমগ্র শক্তি ও চিন্তা আল্লাহর রহমতে সীমিত ও নিবদ্ধ করে দেবে। এটা নৈকট্যশীলদের স্তর এবং প্রথম ও দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে আসহাবুল ইয়ামীনের স্তর। যে কেরাআত এই তিন স্তরের বাইরে থাকে, সেটা গাফেলদের কেরাআত। ইমাম জাফর সাদেক (রহঃ) তৃতীয় স্তর এভাবে ব্যক্ত করেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা তাঁর কালামে সৃষ্টির জন্যে আপন দ্যুতি বিকিরণ করেছেন। কিন্তু সৃষ্টি তা দেখে না। একবার তিনি নামাযে বেহুশ হয়ে পড়ে যান। জ্ঞান ফিরে এলে কেউ তাঁকে এ অবস্থার কারণ জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন ঃ আমি আয়াতটি বার বার মনে মনে পাঠ করছিলাম। অবশেষে আমি তা মুতাকাল্লিম আল্লাহর কাছ থেকে শুনলাম। ফলে তাঁর কুদরত দেখার জন্যে আমার দেহ স্থির রইল না। এ স্তরে

মিষ্টতা এবং মোনাজাতের আনন্দ অত্যধিক অর্জিত হয়। এ কারণেই জনৈক দার্শনিক বলেন ঃ আমি কোরআন পাঠ করতাম, কিন্তু তার মিষ্টতা অনুভব করতাম না। অবশেষে এভাবে পাঠ করলাম যেন আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মুখ থেকে শুনছি। তিনি তাঁর সহচরগণকে শুনাচ্ছেন। এর পর আর এক স্তর উপরে ওঠে এভাবে পাঠ করলাম যেন হযরত জিবরাঈল (আঃ) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে শিক্ষা দিচ্ছেন আর আমি শুনছি। এর পর আল্লাহ্ তাআলা আমাকে আরও একটি স্তর দান করলেন। এখন আমি কোরআন মুতাকাল্লিম আল্লাহ্র কাছ থেকে শুনি এবং এমন মিষ্টতা ও আনন্দ অনুভব করি, যাতে সবর করা যায় না। হযরত ওসমান ও হুযায়ফা (রাঃ) বলেন ঃ অন্তর পবিত্র হয়ে গেলে কোরআন তেলাওয়াত করে তৃপ্ত হওয়া যায় না। এটা বলার কারণ, পবিত্রতার ফলে কালামে মুতাকাল্লিমকে প্রত্যক্ষ করার দিকে অন্তর উন্নতি লাভ করে। এ কারণেই সাবেত বানানী বলেন ঃ বিশ বছর তো আমি কোরআনে কেবল শ্রমই স্বীকার করেছি; কিন্তু বিশ বছর তা থেকে মিষ্টতাও পেয়েছি। তেলাওয়াতকারী যদি মুতাকাল্লিমকেই প্রত্যক্ষ করে এবং অন্য দিকে দৃষ্টিপাত না করে, তবে আল্লাহ্ তাআলার এসব আদেশ পালনকারী হবে- فَفِرُّوا إِلَى اللّٰهِ অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর দিকে ধাবিত হও।

لَا تَجْعَلُوا مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا اٰخَرَ ـ

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্য সাব্যস্ত করো না।

সারকথা, যে ব্যক্তি প্রত্যেক কাজে আল্লাহ তাআলার প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, সে অন্যের প্রতি দৃষ্টিপাতকারী হবে। যে অন্যের প্রতি দৃষ্টিপাতকারী হবে, তার দৃষ্টিপাতে কিছুটা গোপন শেরক থাকবে। অথচ খাঁটি তওহীদ হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলা ব্যতীত অন্য কোন কিছুর দিকে লক্ষ্য না করা।

দশম আদব, আপন শক্তি ও বল ভরসা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হবে। উদাহরণতঃ যখন সৎকর্মপরায়ণদের প্রশংসা ও ওয়াদার আয়াত পাঠ করবে, তখন নিজেকে তাদের অন্তর্ভুক্ত মনে করবে না; কিন্তু আকাঙ্ক্ষা

করবে, আল্লাহ্ তাআলা তাদের মধ্যে তাকেও শামিল করুন। পক্ষান্তরে যখন গজব ও ক্রোধের আয়াত এবং গোনাহ্গারদের নিন্দা পাঠ করবে, তখন নিজেকে দেখবে এবং ধরে নেবে, এই সম্বোধন তাকেই করা হয়েছে। এর ফলস্বরূপ অন্তরে ভয় সৃষ্টি হবে। এ কারণেই হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) দোয়া করতেন ঃ ইলাহী, আমি তোমার কাছে জুলুম ও কুফর থেকে মাগফেরাত চাই। লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করল ঃ জুলুম তো বুঝা যায়; কিন্তু আপনি কুফর থেকে মাগফেরাত চান কিরূপে? তিনি বললেন ঃ

আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ

অর্থাৎ, নিশ্চয় মানুষ বড় জালেম ও অকৃতজ্ঞ। অর্থাৎ, এই কুফর (অকৃতজ্ঞতা) থেকে মাগফেরাত চাই। এটা মানুষের জন্যে আয়াতদৃষ্টে নিশ্চতরূপে প্রমাণিত। ইউসুফ ইবনে আসবাতকে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি যখন কোরআন পাঠ করেন, তখন কি দোয়া করেন? তিনি বললেন ঃ দোয়া কি করব, আপন গোনাহের মাগফেরাত সত্তর বার চাই। মোট কথা, কোরআন তেলাওয়াতে নিজেকে গোনাহের কাঠগড়ায় দেখলে এটা তার নৈকট্য লাভের কারণ হয়। এই ভয় তাকে নৈকট্যের এক স্তরে পৌঁছে দেয়। এ স্তর প্রথম স্তর থেকে উত্তম হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি দূরে থেকে নৈকট্য প্রত্যক্ষ করে, তাকে ভয়হীনতা দান করা হয়, যা পরিণামে তাকে প্রথম স্তরের দূরত্ব থেকে আরও দূরে পৌঁছিয়ে দেয়। হাঁ, তেলাওয়াতকারী যদি নিজের দিকে ভ্রুক্ষেপই না করে এবং তেলাওয়াতে আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কোন কিছু প্রত্যক্ষ না করে, তবে তার সামনে উর্ধ্ব জগতের রহস্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। সোলায়মান ইবনে আবু সোলায়মান দারানী বলেন ঃ সাধক ইবনে সওবান একদিন তাঁর ভাইকে বললেন ঃ আমি তোমার কাছে ইফতার করব। এর পর তিনি সকাল পর্যন্ত সেখানে যেতে পারেননি। পরদিন ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ হলে ভাই বলল ঃ আপনি আমার কাছে ইফতার করার ওয়াদা করে এলেন না, ব্যাপার কি? তিনি বললেন ঃ আমি তোমার সাথে ওয়াদা না করলে যে

কারণে আসতে পারিনি তা বলতাম না। ব্যাপার এই যে, আমি এশার নামায় শেষে মনে মনে ভাবলাম, তোমার কাছে যাওয়ার পূর্বে বেতেরও পড়ে নেই । কারণ, এর মধ্যে মৃত্যু এসে গেলে বেতের পড়ার সুযোগ হবে না। যখন আমি বেতেরের দোয়া পড়তে লাগলাম, তখন আমার সামনে একটি বাগিচা পেশ করা হল । এতে জান্নাতের বিভিন্ন ফুল শোভা পাচ্ছিল। আমি তন্ময় হয়ে সকাল পর্যন্ত ফুলগুলো দেখলাম। এ কারণে তোমার কাছে যাওয়ার সময় পাইনি। এ ধরনের কাশফ তখন হয়, যখন মানুষ নিজ থেকে, নিজের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা থেকে এবং কামনা-বাসনার ধ্যান থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। এ কাশফ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির তন্ময়তা অনুযায়ী বিশেষ রূপ ধারণ করে। উদাহরণতঃ যখন আশার আয়াত পাঠ করে এবং তার তন্ময়তার উপর সুসংবাদ প্রবল হয়, তখন তার সামনে জান্নাতের চিত্র ভেসে উঠে। সে তাও এমনভাবে দেখে, যেন চর্মচক্ষে বাহ্যতঃ দেখে যাচ্ছে। আর যদি তন্ময়তার উপর ভয় প্রবল হয়, তবে জাহান্নাম দৃষ্টিতে ভেসে উঠে এবং সে জাহান্নামের বিভিন্ন প্রকার শাস্তি সম্পর্কে জ্ঞাত হয়। এর কারণ, কোরআন মজীদে নরম-গরম, কোমল কঠোর, আশাব্যঞ্জক, ভীতিপ্রদ ইত্যাদি সকল প্রকার কালাম রয়েছে। মুতাকাল্লিম আল্লাহর গুণাবলী যেমন বহুবিধ, তেমনি তাঁর কালামের বিষয়বস্তুও বহুবিধ। আল্লাহ তাআলার গুণাবলীর মধ্যে রয়েছে রহমত, কৃপা, প্রতিশোধ, পাকড়াও ইত্যাদি। তাঁর এসব গুণই তাঁর কালামে পাওয়া যায়। সুতরাং যে ধরনের কালাম প্রত্যক্ষ করবে, অন্তরের হালও তেমনি বদলে যাবে। কেননা, এটা অসম্ভব যে, কালাম বদলে যাবে আর শ্রোতার হাল অপরিবর্তিত থাকবে।

বিবেকের সাহায্যে কোরআনের তফসীর প্রসঙ্গ

সুফী বুযুর্গগণ তাসাওউফের দৃষ্টিভঙ্গিতে কোরআনের কোন কোন আয়াতের এমন ব্যাখ্যা করে থাকেন, যা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ তফসীরবিদগণ থেকে বর্ণিত নয়। যারা কোরআনের বাহ্যিক তফসীর পাঠ করে এবং জানে, তারা এ ব্যাপারে সুফীগণের প্রতি কেবল

দোষারোপই করে না; বরং তাদের এ ব্যাখ্যাকে কুফর পর্যন্ত বলে থাকে। কেননা, এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

من فسر القران برايه فليتبوأ مقعده من النار ـ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আপন মতামতের ভিত্তিতে কোরআনের তফসীর করে, সে যেন নিজের ঠিকানা জাহান্নামে তৈরী করে নেয়।

দোষারোপকারীদের এ বক্তব্য সঠিক হলে কোরআন বুঝার অর্থ এছাড়া আর কিছুই থাকে না যে, বর্ণিত তফসীরসমূহ মুখস্থ করে নিতে হবে। পক্ষান্তরে তাদের বক্তব্য সঠিক না হলে উপরোক্ত হাদীসের উদ্দেশ্য কি, তা আলোচনা করতে হবে।

যারা বলে, কোরআনের অর্থ তাই, যা বাহ্যিক তফসীরে বর্ণিত রয়েছে, তারা নিজেদের বিদ্যার চরম সীমারই খবর দেয়। নিজেদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে তারা ঠিক কথাই বলে; কিন্তু অন্যদেরকে যে তারা নিজেদের স্তরে টেনে আনতে চায়, এ ব্যাপারে তারা ভ্রান্ত। কেননা, হাদীস ও মনীষীগণের উক্তি দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে, কোরআনের অর্থ বুঝার ক্ষেত্রে বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদের জন্যে অবকাশ রয়েছে। সেমতে হযরত আলী (রাঃ) এরশাদ করেন ঃ আল্লাহ তাআলা বান্দাকে তাঁর কালামের বোধশক্তি দান করেন। বর্ণিত অনুবাদ ছাড়া কোরআনের যদি অন্য কোন অর্থ না হয়, তবে এই বোধশক্তির উদ্দেশ্য কি? রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ কোরআনের একটি বাহ্যিক এবং একটি অভ্যন্তরীণ অর্থ আছে। আর আছে একটি সীমা ও একটি উদয়াচল। এ রেওয়ায়েতটি হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকেও তাঁরই উক্তি হিসেবে বর্ণিত আছে। তিনি ছিলেন তফসীরবিদ সাহাবীগণের অন্যতম। সুতরাং বাহ্যিক অর্থ, অভ্যন্তরীণ অর্থ, সীমা ও উদয়াচল– এ সবের কি অর্থ?

হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ আমি ইচ্ছা করলে আলহামদুর তফসীর দ্বারা সত্তরটি উট বোঝাই করতে পারি। এ উক্তির অর্থ কি? আলহামদুর বর্ণিত ও বাহ্যিক তফসীর তো খুবই সামান্য। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন ঃ মানুষ যে পর্যন্ত ফকীহ হয় না, এ পর্যন্ত সে কোরআনকে কয়েক

ভাগে ভাগ না করে নেয়। জনৈক আলেম বলেন ঃ প্রত্যেক আয়াতের ষাট হাজার অর্থ আছে এবং যেসব অর্থ অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে, সেগুলো আরও বেশী। অন্য একজন বলেন ঃ কোরআন সত্তর হাজার দু'শ বিদ্যা পরিব্যাপ্ত করে রেখেছে। কেননা, প্রত্যেক কলেমার জন্যে একটি বিদ্যা রয়েছে। প্রত্যেকেরই বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অর্থ এবং সীমা ও উদয়াচল রয়েছে বিধায় অর্থ চতুর্গুণ হয়ে গেছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীমকে পুনঃ পুনঃ বিশ বার আবৃত্তি করেন। অর্থ বুঝার জন্যেই এরূপ করেছেন। নতুবা এর অনুবাদ ও তফসীর তো স্পষ্টই ছিল। এর পুনরাবৃত্তির কি প্রয়োজন ছিল? হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ কেউ পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের জ্ঞান অর্জন করতে চাইলে সে কোরআন নিয়ে আলোচনা করুক। এটাও কেবল বাহ্যিক তফসীর দ্বারা অর্জিত হয় না।

সারকথা, আল্লাহ তাআলার ক্রিয়াকর্ম ও গুণাবলীর মধ্যে সকল জ্ঞান বিজ্ঞান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কোরআনে তাঁর সত্তা, ক্রিয়াকর্ম ও গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে। এসব জ্ঞান বিজ্ঞানের কোন শেষ নেই। কোরআনে এগুলোর প্রতি সংক্ষেপে ইশারা করা হয়েছে। এগুলোর বিশদ বিবরণ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা কোরআন বুঝার উপর নির্ভরশীল। কেবল বাহ্যিক তফসীর দ্বারা বিশদ বিবরণের ঈঙ্গিত জানা যায় না। যে সকল প্রামাণ্য ও যুক্তিপূর্ণ বিষয়ে মানুষের মতভেদ রয়েছে, কোরআন মজীদে সেগুলোর প্রতি ইশারা ঈঙ্গিত আছে। বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ ছাড়া এসব ঈঙ্গিত কেউ জানতে পারে না। এমতাবস্থায় বাহ্যিক শব্দের অনুবাদ ও তফসীর এসব ইঙ্গিত বুঝার জন্যে কিরূপে যথেষ্ট হতে পারে? এজন্যেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

اقرءوا القران والتمسوا غرائبه -

অর্থাৎ, তোমরা কোরআন পাঠ কর এবং তার রহস্যপূর্ণ বিষয়সমূহ অন্বেষণ কর। হযরত আলী (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে এরশাদ হয়েছে ঃ মহানবী (সাঃ) এরশাদ করেছেন যিনি আমাকে সত্য নবীরূপে প্রেরণ করেছেন, আমার উম্মত তার মূল ধর্ম পরিত্যাগ করে বাহাত্তর দলে বিভক্ত

হয়ে পড়বে। সকল দলই পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্তকারী হবে এবং জাহান্নামের দিকে দাওয়াত দেবে। এ পরিস্থিতি দেখা দিলে তোমরা কোরআন মজীদকে আঁকড়ে থাকবে। কারণ, এতে তোমাদের পূর্ববর্তী এবং পরবর্তীদের অবস্থাও স্থান পেয়েছে। তোমাদের পারস্পরিক আদান-প্রদান বিধানও এতে বিদ্যমান। প্রতাপশালীদের মধ্য থেকে যে এর বিরুদ্ধাচরণ করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে চুরমার করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি কোরআন ছাড়া অন্য কিছুতে জ্ঞান অন্বেষণ করবে, আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করবেন। কোরআন আল্লাহর মজবুত রশি, সুস্পষ্ট নূর এবং মহোপকারী প্রতিষেধক। যে একে ধারণ করে, সে সুরক্ষিত থাকে। যে এর অনুসরণ করে, সে মুক্তি পায়। এর রহস্যমন্ডিত বিষয়সমূহ কখনও বিচ্ছিন্ন হয় না এবং অনেক পাঠ করার কারণে পুরাতনও হয় না। হযরত হুযায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ রসূলে আকরাম (সাঃ) তাঁর ওফাতের পর স্বপ্নযোগে আমাকে উম্মতের বিভেদ ও অনৈক্যের সংবাদ দিলেন। আমি আরজ করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমি যদি সে যুগ পাই, তবে আপনি আমাকে কি করতে বলেন? তিনি বললেন ঃ আল্লাহর কালাম শেখবে এবং তাতে যা কিছু আছে তা মেনে চলবে। মুক্তির উপায় এটাই। আমি তিন বার এ প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলে তিনি একই জওয়াব দিলেন। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোরআন বুঝে নেয়, সে সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান বর্ণনা করে। এতে তিনি এদিকেই ইশারা করেছেন যে, কোরআন মজীদের আয়াতসমূহ সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। হযরত ইবনে আব্বাস وَمَنْ يُّؤْتَي الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا (যাকে হেকমত দান করা হয়, সে প্রভূত কল্যাণ প্রাপ্ত হয়।) –এই আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বলেন, হেকমতের অর্থ কোরআন বুঝার শক্তি। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ وَكُلًّا اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا .

অর্থাৎ, অতঃপর আমি ফয়সালাটির বোধশক্তি দান করলাম সোলায়মানকে। আর প্রত্যেককেই আমি দিয়েছি সাম্রাজ্য ও জ্ঞান। এ

আয়াতে হযরত দাউদ ও সোলায়মান উভয়কে যা দান করা হয়েছিল, তার নাম রাখা হয়েছে জ্ঞান ও সাম্রাজ্য। আর হযরত সোলায়মানকে বিশেষভাবে যা দেয়া হয়েছিল তার নাম বোধশক্তি রাখা হয়েছে এবং তা অগ্রে উল্লিখিত হয়েছে। এসব বিষয় থেকে জানা যায়, কোরআনের অর্থ বুঝার ক্ষেত্রে অনেক অবকাশ আছে। বর্ণিত বাহ্যিক তফসীর কোরআনের বিষয়বস্তুসমূহের চূড়ান্ত সীমা নয় যে, একে অতিক্রম করা যাবে না। কিন্তু এটাও ঠিক, রসূলুল্লাহ (সাঃ) পূর্বোক্ত হাদীসে নিজস্ব মতামতের ভিত্তিতে কোরআনের তফসীর করতে নিষেধ করেছেন এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) বলেন ঃ যদি আমি কোরআন সম্পর্কে নিজস্ব মতামতের ভিত্তিতে কিছু বলি, তবে কোন্ ভূপৃষ্ঠ আমাকে বহন করবে এবং কোন্ আকাশ আমাকে লুকাবে? এছাড়া আরও যে সকল রেওয়ায়েতে এই নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর উদ্দেশ্য তফসীরের ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর তরফ থেকে বর্ণনা ও শুনা যথেষ্ট মনে করা উচিত এবং নিজের মতামত ও বিবেক দ্বারা পৃথক অর্থ বুঝা অনুচিত। এছাড়া নিষেধাজ্ঞার অন্য কোন উদ্দেশ্যও থাকতে পারে। কিন্তু কোরআনের ব্যাপারে শ্রুত বিষয়াদি ছাড়া কেউ অন্য কিছু বলতে পারবে না – এরূপ উদ্দেশ্য হওয়া কয়েক কারণে অকাট্যরূপে বাতিল ।

প্রথম কারণ, শুনার ব্যাপারে শর্ত হচ্ছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে শুনতে হবে অথবা তফসীরটি তাঁর দিকে সম্বন্ধযুক্ত হতে হবে। অথচ এটা কোরআনের সামান্য অংশের তফসীরেই পাওয়া যায়। এর ফল এই দাঁড়ায় যে, যে তফসীর হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে মসউদ (রাঃ) নিজের পক্ষ থেকে বলেন, তা অগ্রাহ্য হবে এবং তাকেও নিজস্ব মতামতের ভিত্তিতে তফসীর আখ্যা দেয়া হবে। কেননা, তাঁরা এই তফসীর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছ থেকে শুনেননি। অন্য সাহাবীগণের তফসীরের অবস্থাও একই রূপ হবে।

দ্বিতীয় কারণ, সাহাবায়ে কেরাম ও তফসীরবিদগণ কোন কোন আয়াতের তফসীরে মতভেদ করেছেন। তাঁদের এসব বিভিন্নমুখী উক্তির

সমন্বয় সাধন করা কিছুতেই সম্ভব নয়। এগুলো সব রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছ থেকে শুনা অসম্ভব। এ থেকে অকাট্যরূপে জানা যায় যে, প্রত্যেক তফসীরবিদ সেই অর্থই বলেছেন, যা তিনি ইজতিহাদ দ্বারা বুঝতে পেরেছেন। সূরাসমূহের শুরুতে উল্লিখিত খন্ড অক্ষরসমূহের ব্যাপারে সাতটি বিভিন্নমুখী উক্তি বর্ণিত আছে। উদাহরণতঃ আলিফ-লাম-মীম সম্পর্কে কেউ বলেন, এগুলো আর-রহমানের অক্ষর। কেউ বলেন ঃ আলিফ অর্থ আল্লাহ্, লাম অর্থ লতীফ (কৃপাকারী) এবং মীম অর্থ রহীম (দয়ালু)। কেউ অন্য কথা বলেন। এগুলো এক অর্থে একত্রিত করা সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় সবগুলো রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে শ্রুত কিরূপে হতে পারে?

তৃতীয় কারণ, রসূলে আকরাম (সাঃ) হযরত ইবনে আব্বাসের জন্য দোয়ায় বলেছিলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ وَعَلِّمْهُ التَّاوِيْلَ -

অর্থাৎ, হে আল্লাহ, তাকে দ্বীনের ব্যাপারে বোধশক্তি দান কর এবং কোরআনের তফসীর শিক্ষা দাও।

সুতরাং কোরআনের ন্যায় তফসীরও যদি শ্রুত ও সংরক্ষিত হয়, তবে এর জন্যে হযরত ইবনে আব্বাসকে নির্দিষ্ট করার কি অর্থ হবে?

চতুর্থ কারণ, আল্লাহ্ বলেন ঃ لَعَلِمَهُ الَّذِىْ يَسْتَنْبِطُوْنَهُ مِنْهُمْ এ আয়াতে আলেমদের জন্যে اِسْتِنْبَاط (উদ্ভাবন)-এর কথা প্রমাণিত আছে, যার অর্থ চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে কোন কিছু জানা। বলাবাহুল্য, এটা শ্রুত বিষয় নয় – ভিন্ন কিছু। উপরোক্ত সবগুলো রেওয়ায়েত থেকে জানা যায়, কেবল শ্রুত বিষয় দ্বারা কোরআনের তফসীর করার ধারণা বাতিল; বরং কোরআন থেকে স্ব স্ব বোধশক্তি ও বিবেক অনুযায়ী বিষয়াদি চয়ন করা প্রত্যেক আলেমের জন্যে জায়েয। তবে বর্ণিত নিষেধাজ্ঞা দুই অর্থে ধরে নেয়া যায়। প্রথম– কোন বিষয়ে কারও কোন মতামত থাকে এবং সেদিকে স্বাভাবিক প্রবণতা রাখে। এর পর এই মতামত সঠিক

সাব্যস্ত করার জন্যে আপন মতামত ও খাহেশ অনুযায়ী কোরআনের অর্থ বর্ণনা করে। যদি তার এই মতামত না থাকত, তবে কোরআন থেকে এই অর্থ সে জানত না। এটা কখনও সজ্ঞানে হয়, যেমন কেউ কোন একটা বেদআতকে সঠিক প্রতিপন্ন করার জন্যে, কোরআনের কোন কোন আয়াত প্রমাণস্বরূপ পেশ করে। অথচ সে জানে আয়াতের উদ্দেশ্য এটা নয়। কিন্তু সে তার প্রতিপক্ষকে ধোকা দেয়। কখনও সে জানে না, আয়াতের উদ্দেশ্য এটা নয়। কিন্তু আয়াতটি একাধিক অর্থের সম্ভাবনা রাখে বিধায় যে অর্থ দ্বারা তার উদ্দেশ্য হাসিল হতে পারে, সেদিকেই তার মতামত গড়ে উঠে এবং সে সেদিককেই অগ্রাধিকার দান করে। এ ধরনের তফসীরের প্রেরণাদাতা মতামতই হয়ে থাকে। মতামত না থাকলে এ তফসীরও তার মতে প্রবল হত না। কখনও মানুষের একটি বিশুদ্ধ মতলব থাকে এবং তার জন্যে কোরআন থেকে প্রমাণ তালাশ করে। অতঃপর সে এমন আয়াতকে প্রমাণস্বরূপ পেশ করে, যার সম্পর্কে জানে, এই আয়াতের এই উদ্দেশ্য নয়। উদাহরণতঃ কেউ রাতের শেষ প্রহরে এস্তেগফার করার সপক্ষে এ হাদীসটি পেশ করে ঃ

تسحروا فان في السحور بركة ـ

অর্থাৎ, তোমরা সেহরী কর। সেহরী করার মধ্যে বরকত আছে। সে বলে ঃ

এখানে সেহরী করার অর্থ রাতের শেষ প্রহরে যিকির করা। অথচ সে জানে, এর উদ্দেশ্য রোযার জন্যে সেহরী খাওয়া। অথবা কেউ কোন কঠোরপ্রাণ ব্যক্তিকে সাধনা করার নির্দেশ দিয়ে এ আয়াতটি প্রমাণস্বরূপ পেশ করা اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى (ফেরাউনের কাছে যাও। সে উদ্ধত হয়ে গেছে।) অতঃপর সে বলে, আয়াতে ফেরাউন বলে অন্তর বুঝানো হয়েছে। এটাও মতামতের ভিত্তিতে তফসীর। এ ধরনের তফসীর কোন কোন ওয়ায়েয তাদের বিশুদ্ধ উদ্দেশ্যের জন্যে ব্যবহার করে। এ ক্ষেত্রে যদিও তাদের নিয়ত সঠিক, তবুও এ ধরনের তফসীর নিষিদ্ধ। ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা কখনও খারাপ উদ্দেশে মানুষকে

ধোকা দেয়ার জন্যে এবং নিজের মাযহাবে দাখিল করার উদ্দেশে এ ধরনের তফসীরকে কাজে লাগায় এবং কোরআনের অর্থ নিজস্ব মত অনুযায়ী বলে দেয়। অথচ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিশ্চিতরূপে জানে আয়াতের প্রকৃত অর্থ এটা নয়। মোট কথা, অশুদ্ধ ও মনের খেয়াল-খুশীর অনুগামী মতামতের ভিত্তিতে তফসীর করা নিষিদ্ধ। বিশুদ্ধ ইজতিহাদের মাধ্যমে তফসীর করলে তা নিষিদ্ধ তফসীরের আওতাভুক্ত হবে না। রায় তথা মতামত শব্দটি যদিও শুদ্ধ অশুদ্ধ উভয় প্রকার মতামত বোঝায়, কিন্তু কোন সময় রায় বিশেষভাবে সেই মতামতকেই বলা হয়, যা খেয়াল-খুশীর অনুগামী।

বর্ণিত নিষেধাজ্ঞার দ্বিতীয় অর্থ এই ধরে নেয়া যায় যে, অনেকেই আরবী শব্দাবলী সম্পর্কে বাহ্যিক ধারণা নিয়েই কোরআনের তফসীর করতে প্রবৃত্ত হয়। এতে শ্রুত কোন কিছু থাকে না। তারা কোরআনের অপ্রচলিত শব্দ সম্পর্কে জ্ঞাত থাকে না এবং অস্পষ্ট ও পরিবর্তিত শব্দ সম্পর্কেও তারা বিশেষজ্ঞ নয়। কোরআনের সংক্ষেপকরণ পদ্ধতি, উহ্যকরণ নীতি এবং অগ্রে ও পশ্চাতে উল্লেখকরণ নীতিরও কোন খবর তারা রাখে না। সুতরাং যে ব্যক্তি এসব বিষয়ে ওয়াকিফহাল নয় এবং কেবল আরবী বুঝা সম্বল করেই কোরআনের অর্থ চয়নে প্রবৃত্ত হয়, সে নিশ্চিতরূপেই অনেক ভুল করবে এবং খেয়াল-খুশীর ভিত্তিতে তফসীরকারদের দলভুক্ত হবে। কেননা, বাহ্যিক অর্থ বুঝার জন্যে প্রথমে বর্ণনা ও শ্রবণ দরকার। বাহ্যিক তফসীরে পাকাপোক্ত হওয়ার পর অবশ্য বোধশক্তি ও চয়ন শক্তি বেড়ে যায়।

যে সকল অপ্রচলিত শব্দ আরবদের কাছে শুনা ছাড়া বুঝা যায় না, সেগুলো বহু প্রকার। নিম্নে আমরা কয়েক প্রকারের দিকে ইশারা করে দিচ্ছি, যাতে এগুলোর মাধ্যমে অন্যগুলোর অবস্থাও পরিস্ফুট হয় এবং এ কথাও জানা যায় যে, শুরুতে বাহ্যিক তফসীর আয়ত্ত ও পাকাপোক্ত করা ছাড়া কোরআনের অভ্যন্তরীণ রহস্য পর্যন্ত পৌঁছার আশা দুরাশা মাত্র। যে ব্যক্তি বাহ্যিক তফসীরে পাকাপোক্ত হওয়া ছাড়াই কোরআনী রহস্য হৃদয়ঙ্গম করার দাবী করে, সে সে ব্যক্তির মত, যে দরজায় পা না রেখেই

গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার দাবী করে। কেননা, বাহ্যিক তফসীর অভিধান শিক্ষা করার স্থলবর্তী, যা বুঝার জন্যে অত্যাবশ্যক।

যে সকল বিষয় সম্পর্কে আরবদের কাছে শুনা জরুরী, সেগুলো অনেক। প্রথম উহ্যকরণ প্রক্রিয়ায় সংক্ষিপ্ত করা। যেমন, وَاٰتَيْنَا ثَمُوْدَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوْا بِهَا এর অর্থ হচ্ছে, আমি চোখ খুলে দেয়ার জন্যে সামুদ সম্প্রদায়কে একটি উষ্ট্রী দিলাম। তারা তাকে হত্যা করে নিজেদের উপর জুলুম করল। এখানে বাহ্যিক শব্দাবলী দেখে পাঠক ধারণা করবে, উষ্ট্রীটি দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিল, অন্ধ ছিল না। তারা কি কি জুলুম করল, নিজেদের উপর, না অন্যের উপর – পাঠক তাও জানবে না।

وَاُشْرِبُوْا فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ এ আয়াতে حب (মহব্বত) শব্দটি উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ, গোবৎসের মহব্বত দ্বারা তাদের অন্তর সিক্ত করে দেয়া হয়েছিল। اِذًا لَّاَذَقْنٰكَ ضِعْفَ الْحَيٰوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ – এ আয়াতের উদ্দেশ্য, আমি তোমাকে জীবিতদের আযাবের দ্বিগুণ এবং মৃতদের আযাবের দ্বিগুণ আস্বাদন করাব। এখানে عذاب শব্দটি উহ্য রয়েছে এবং জীবিত ও মৃতদের স্থলে حيوة ও ممات শব্দদ্বয় বলা হয়েছে। আভিধানিক অলংকারে এই উহ্যকরণ ও পরিবর্তন সিদ্ধ। وَاسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِىْ كُنَّا فِيْهَا এ বাক্যে اهل শব্দটি উহ্য আছে। অর্থাৎ, জিজ্ঞেস কর সেই গ্রামের অধিবাসীদেরকে, যেখানে আমরা ছিলাম।

ثَقُلَتْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ–এখানে ثقلت শব্দের অর্থ গোপন হওয়া। অর্থাৎ কেয়ামত আকাশ ও পৃথিবীবাসীদের কাছে গোপন। কোন বস্তু গোপন থাকলে তা ভারী হয়ে যায়। তাই শব্দের পরিবর্তন হয়ে গেছে এবং اهل শব্দটি উহ্য রাখা হয়েছে। وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ এখানে شكر শব্দটি উহ্য । অর্থাৎ তোমাদেরকে রুজি দেয়ার

শোকর এই কর যে, তোমরা তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন কর। وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ এখানে السنة শব্দটি উহ্য। অর্থাৎ, আমাদেরকে দাও যার ওয়াদা তুমি রসূলগণের বাচনিক করেছ। اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ এখানে নামপুরুষের সর্বনামটি কোরআনের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। অথচ তার উল্লেখ পূর্বে করা হয়নি। حَتّٰى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ এতে সর্বনামটি شمس -এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে, যা পূর্বে উল্লিখিত হয়নি। وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَاۤءَ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَاۤ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى এখানে يقولون শব্দটি উহ্য রাখা হয়েছে। অর্থাৎ যারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারা বলে ঃ আমরা এ জন্যেই তাদের পূজা করি, যাতে তারা আমাদেরকে আল্লাহ্র নৈকট্যশালী করে দেয়।

দ্বিতীয়, পরিবর্তিত শব্দ বর্ণিত হওয়া। যেমন وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ শব্দে سينا- এর পরিবর্তে سنين বর্ণিত হয়েছে এবং سَلَامٌ عَلٰى اِلْيَاسِيْنَ -তে الياس-এর স্থলে الياسين বর্ণিত হয়েছে।

তৃতীয়, কালাম পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করা, যা বাহ্যতঃ কালামের সংলগ্নতা ছিন্ন করে। যেমন–

وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُرَكَاۤءَ اَنْ يَّتَّبِعُوْنَ ۔

এখানে ان يتبعون পুনঃ উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থ হচ্ছে, যারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য শরীকদের এবাদত করে, তারা কেবল ধারণারই অনুসরণ করে।

চতুর্থ, শব্দের অগ্র পশ্চাৎ হওয়া। এরূপ স্থলে মানুষ সাধারণতঃ ভুল করে বসে। যেমন–

وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَّاَجَلٌ مُّسَمًّى -এটা

এভাবে বুঝতে হবে وَلَوْلَا كَلِمَةٌ وَاجَلٌ مُّسَمًّى لَّكَانَ لِزَامًا এরূপ না হলে اجل শব্দটিতে যবর হওয়া উচিত যেমন- لزاما তে হয়েছে।

পঞ্চম, শব্দ অস্পষ্ট হওয়া, যা অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন- امة। روح - شئ - قرين ইত্যাদি শব্দ।

আল্লাহ্ বলেন ঃ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوْكًا لَّايَقْدِرُ عَلٰى شَىْءٍ এখানে এর অর্থ ভরণ-পোষণে ব্যয় করা।

অন্যত্র বলা হয়েছে- وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ اَحَدُهُمَا اَبْكَمُ لَايَقْدِرُ عَلٰى شَىْءٍ এখানে شئ এর অর্থ ন্যায় ও সততার আদেশ করা।

فَاِنِ اتَّبَعْتَنِىْ فَلَا تَسْئَلْنِىْ عَنْ شَىْءٍ -এখানে شئ বলে পালন কর্তৃত্বের গুণ বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, এমন জ্ঞান, যোগ্যতা সৃষ্টির আগে যা জিজ্ঞেস করা সাধকের জন্যে বৈধ নয়।

اَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَىْءٍ اَمْ هُمُ الْخَالِقُوْنَ এখানে شئ এর অর্থ সৃষ্টিকর্তা।

এখন قرين শব্দের বিভিন্ন অর্থ দেখা যাক। আল্লাহ বলেন ঃ وَقَالَ قَرِيْنُهٗ هٰذَا مَا لَدَىَّ عَتِيْدٌ -এখানে- قرين -এর অর্থ নিয়োজিত ফেরেশতা।

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে قَالَ قَرِيْنُهٗ رَبَّنَا مَآ اَطْغَيْتُهٗ -এখানে قرين বলে শয়তান বুঝানো হয়েছে। এমনিভাবে -امة শব্দটি আরবীতে আট প্রকারে ব্যবহৃত হয়।

এক ঃ দল অর্থে, যেমন- وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ সেখানে একদল লোককে পেল, যারা পানি পান করাচ্ছিল।

দুই ঃ পয়গম্বরের অনুসারী অর্থে, যেমন আমরা বলি- আমরা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মত।

তিন ঃ সৎ ও ধর্মীয় নেতা অর্থে, যেমন- إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ حَنِيْفًا নিশ্চয় ইবরাহীম ছিলেন ধর্মীয় নেতা, আল্লাহর আজ্ঞাবহ ও একাগ্র চিত্তে।

চার ঃ ধর্ম অর্থে, যেমন- إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلٰى أُمَّةٍ -আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে এক ধর্মের উপর পেয়েছি।

পাঁচ ঃ সময় কাল অর্থে, যেমন- إِلٰى أُمَّةٍ مَّعْدُوْدَةٍ এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত।

ছয় ঃ দৈহিক গড়ন অর্থে, যেমন বলা হয় فلان حسن الامة অমুক ব্যক্তির দৈহি গড়ন সুন্দর।

সাত ঃ একক ও অনন্য ব্যক্তি অর্থে, যেমন রসূলুল্লাহ (সাঃ) যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফায়েলকে সৈন্যদের সাথে প্রেরণ করার সময় বলেছিলেন ঃ امة وحدة অর্থাৎ, সে উম্মতের অনন্য ব্যক্তি।

আট ঃ মা অর্থে, যেমন বলা হয় هذه امة زيد সে যায়েদের মা।

ষষ্ঠ ঃ ক্রমে ক্রমে বর্ণনা করা। উদাহণতঃ এক আয়াতে বলা হয়েছে, شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ . রমযান মাস, যাতে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। এতে রাতের বেলায় অবতীর্ণ হয়েছে, না দিনের বেলায়- তা প্রকাশ পায় না। এর পর বলা হয়েছে- إِنَّا أَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ আমি এক মোবারক রাতে কোরআন নাযিল করেছি। এতে রাতে অবতীর্ণ হওয়া প্রমাণিত হয়, কিন্তু সেটা কোন্ রাত ছিল, তা জানা যায় না। ত্ররপর বলা হয়েছে-

إِنَّا أَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ আমি কোরআন নাযিল করেছি শবে-কদরে। এতে সময়ের প্রশ্নেরও সমাধান হয়ে গেল।

মোট কথা, উপরোক্ত বিষয়সমুহ এমন যে হাদীস ও রেওয়ায়েতের বর্ণনা এবং আরবদের কাছে শুনা ব্যতীত এগুলোর জন্যে অন্য কিছু যথেষ্ট হয় না। কোরআন মজীদ আদ্যোপান্ত এ ধরনের বিষয় বিবর্জিত নয়। কারণ, এটা আরবী ভাষায় অবতীর্ণ, তাই ايجاز (সংক্ষেপকরণ), تطويل (দীর্ঘকরণ), اضمار (সর্বনাম আনা), حذف (উহ্যকরণ), ابدال (পরিবর্তন করা), تقديم (অগ্রে আনা), تاخير (পশ্চাতে আনা) ইত্যাদি যত প্রক্রিয়া আরবী ভাষায় প্রচলিত ও ব্যবহৃত, সবগুলোই কোরআনে বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি বাহ্যিক আরবী ভাষা বুঝেই কোরআনের তফসীর করতে প্রবৃত্ত হয় এবং শ্রবণ ও বর্ণনাকে কাজে না লাগায়, তবে সে সেই লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে, যারা নিজস্ব মতামতের ভিত্তিতে তফসীর করে। হাদীসে এরূপ তফসীরই নিষিদ্ধ করা হয়েছে– কোরআনের অপার রহস্য হৃদয়ঙ্গম করা নিষিদ্ধ করা হয়নি। মোট কথা, বাহ্যিক তফসীর তথা শব্দাবলীর অনুবাদ জানা অর্থসম্ভারের স্বরুপ বুঝার জন্যে যথেষ্ট নয়। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন ঃ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى এর বাহ্যিক অনুবাদ হচ্ছে, আপনি নিক্ষেপ করেননি যখন নিক্ষেপ করেছিলেন, কিন্তু আল্লাহ্ নিক্ষেপ করেছেন। এ অর্থের স্বরূপ অত্যন্ত সূক্ষ্ম। কেননা, এতে নিক্ষেপ করা এবং না করার কথা একই সাথে বলা হয়েছে। বাহ্যতঃ এতে দুটি পরস্পর বিরোধী বিষয়ের সমাহার হয়েছে। তবে এটা বুঝে নিলে কোন অসুবিধা থাকে না যে, নিক্ষেপ করা এক দিক দিয়ে এবং নিক্ষেপ না করা অন্য দিক দিয়ে। যেদিক দিয়ে নিক্ষেপ করা হয়নি, সে দিক দিয়ে আল্লাহ্ নিক্ষেপ করেছেন। অনুরূপভাবে এ আয়াতে বলা হয়েছে– قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ ওদের সাথে যুদ্ধ কর, যাতে আল্লাহ্ তোমাদের হাতে ওদেরকে শাস্তি দেন। এতে মুসলমানদেরকে যুদ্ধ করতে বলা হয়েছে। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ কাফেরদেরকে শাস্তিদাতা কিরূপে বুঝেন ? যদি বলা হয়– আল্লাহ্ তাআলাই যুদ্ধের জন্যে মুসলমানদের

হাতকে সক্রিয় করেন, তাই তিনি শাস্তিদাতা, তাহলে মুসলমানদেরকে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়ার অর্থ কি ? এসব অর্থের স্বরূপ এলমে মুকাশাফার এক অথৈ সমুদ্র মন্থন করেই জানা যায়– বাহ্যিক শব্দের অনুবাদ এতে উপকারী নয়। এটা জানার জন্যে প্রথমে বুঝতে হবে যে, মানুষের ক্রিয়াকর্ম তার কুদরত তথা সামর্থ্যের সাথে জড়িত। এ কুদরত আল্লাহ্ তাআলা কুদরতের সাথে সংযুক্ত। এমনি ধরনের অনেক সূক্ষ্ম জ্ঞান পরিস্ফুট হওয়ার পর ফুটে ওঠবে যে, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ উক্তিটি সঠিক ও যথার্থ। ধরে নেয়া যাক, যদি এসব অর্থের রহস্য উদঘাটন এবং এর প্রাথমিক ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি জানার কাজে কেউ সারা জীবন ব্যয় করে দেয়, তবে সম্ভবতঃ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে যাবে। কোরআন মজীদের এমন কোন কলেমা নেই, যার তথ্যানুসন্ধানে এধরনের বিষয়াদির প্রয়োজন হয় না, কিন্তু পাকাপোক্ত আলেমগণ এসব রহস্য সেই পরিমাণে জানতে পারেন, যে পরিমাণে তাদের এলমে আধিক্য, অন্তরে স্বচ্ছতা, আগ্রহে পর্যাপ্ততা এবং অন্বেষণে আন্তরিকতা থাকে। প্রত্যেকের জন্যে উন্নতির একটা নির্দিষ্ট সীমা থাকে। কেউ এর উপরের সীমায়ও উন্নতি করতে পারে, কিন্তু সকল স্তর অতিক্রম করে যাওয়া কারও পক্ষে সম্ভবপর নয়। আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং বলেন ঃ

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّىْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّىْ -

অর্থাৎ, যদি সমুদ্র কালি হয় এবং সকল বৃক্ষ কলম হয়ে যায়, তবুও আল্লাহ্র কলেমাসমূহের রহস্য লেখে শেষ করা যাবে না। এ কারণেই রহস্য বুঝার ক্ষেত্রে মানুষের অবস্থা বিভিন্ন হয়ে থাকে, অথচ আয়াতের বাহ্যিক অনুবাদ ও তফসীর সকলেই জানে; কিন্তু বাহ্যিক তফসীর তাৎপর্য বুঝার জন্যে যথেষ্ট নয়।

নিম্নে তাৎপর্য বুঝার একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হচ্ছে, যা জনৈক সাধক সেজদার অবস্থায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর একটি দোয়া থেকে বুঝতে

পেরেছেন। দোয়াটি এই ঃ

أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوْذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لَاأُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ ـ

অর্থাৎ, আমি তোমার সন্তুষ্টির আশ্রয় চাই তোমার ক্রোধ থেকে। আমি তোমার ক্ষমার আশ্রয় চাই তোমার শাস্তি থেকে। আমি তোমার আশ্রয় চাই তোমা থেকে। আমি তোমার প্রশংসা করে শেষ করতে পারি না। তুমি এমন, যেমন তুমি নিজে নিজের প্রশংসা করেছ। অর্থাৎ, রসূলে করীম (সাঃ)-কে সেজদা দ্বারা নৈকট্য লাভ করার আদেশ করা হলে তিনি সেজদায় নৈকট্য লাভ করলেন। তিনি আল্লাহ্ তায়ালার গুণাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে কতক গুণ দ্বারা কতক গুণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। সেমতে সন্তুষ্টি গুণ দ্বারা ক্রোধ গুণ থেকে আশ্রয় চাইলেন এবং ক্ষমা গুণ দ্বারা শাস্তি প্রদানের গুণ থেকে আশ্রয় কামনা করলেন। এর পর তাঁর নৈকট্য আরও বেড়ে গেল এবং প্রথম নৈকট্য এরই মধ্যে একীভূত হয়ে গেল। তখন তিনি গুণাবলী থেকে সত্তায় উন্নীত হলেন এবং বললেন ঃ اَعُوْذُبِكَ مِنْكَ আমি তোমার আশ্রয় চাই তোমা থেকে। এর পর তাঁর নৈকট্য এত বৃদ্ধি পেল যে, তিনি এই ভেবে লজ্জিত হলেন, নৈকট্যের পর্যায় থেকে আশ্রয় চাই– এ কেমন কথা! তখনই তিনি তারীফ প্রশংসার দিকে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং বললেন ঃ لَاأُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ আমি তোমার প্রশংসা করে শেষ করতে পারি না। এর পর তিনি প্রশংসাকে নিজের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করাও ত্রুটি জ্ঞান করলেন এবং বললেন ঃ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ তুমি এমন, যেমন তুমি নিজে নিজের প্রশংসা করেছ।

মোট কথা, সাধকের জন্যে এধরনের রহস্য উদঘাটিত হয়। এর পর এসব রহস্যের আরও অনেক স্তর আছে। অর্থাৎ নৈকট্যের অর্থ হৃদয়ঙ্গম

করা, বিশেষ নৈকট্য সেজদায় হওয়া, এক গুণ দ্বারা অন্য গুণ থেকে আশ্রয় চাওয়া, সত্তা থেকে সত্তার আশ্রয় প্রার্থনা করা ইত্যাদি । এসব রহস্য বাহ্যিক শব্দের অনুবাদ দ্বারা জানা যায় না, কিন্তু এগুলো বাহ্যিক অনুবাদের খেলাফও নয়, বরং এগুলো দ্বারা বাহ্যিক অনুবাদ পূর্ণাঙ্গ ও মহিমান্বিত হয়। কোরআনের অভ্যন্তরীণ অর্থসম্ভার বুঝতে হবে– এ কথা বলার পেছনে আমাদের উদ্দেশ্যও তাই যে, এসব অর্থসম্ভার বাহ্যিক অনুবাদের খেলাফ হবে না।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَوَّلاً وَاٰخِرًا وَالصَّلٰوةُ عَلٰى كُلِّ عَبْدٍ مُصْطَفٰى وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى ـ

নবম অধ্যায়

যিকির ও দোয়া

কোরআন তেলাওয়াতের পরে আল্লাহ্ তায়ালার যিকির ও তাঁর দরবারে ব্যাকুল হৃদয়ে দোয়ার মাধ্যমে নিজের উদ্দেশ্য পেশ করার চাইতে উত্তম কোন মৌখিক এবাদত নেই বিধায় যিকির ও দোয়ার ফযীলত এবং এতদুভয়ের আদব ও শর্ত বর্ণনা করা জরুরী। নিম্নে পাঁচটি শিরোনামে আমরা এসব বিষয় বর্ননা করব।

যিকিরের ফযীলত

এ সম্পর্কে কোরআন মজীদের আয়াতসমূহ নিম্নরূপ ঃ

فَاذْكُرُونِيْٓ اَذْكُرْكُمْ অর্থাৎ, তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করব।

সাবেত বানানী (রহঃ) বলেন ঃ আমি জানি, আমার পরওয়ারদেগার আমাকে কখন স্মরণ করেন। লোকেরা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি এটা কিরূপে জানেন ? তিনি বললেন ঃ আমি যখন তাঁকে স্মরণ করি, তখনই তিনি আমাকে স্মরণ করেন।

اُذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ○ তোমরা বেশী পরিমাণে আল্লাহ্কে স্মরণ কর।

فَاِذَا اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰكُمْ ـ

অর্থাৎ, অতঃপর যখন তোমরা আরাফাত থেকে তওয়াফের জন্যে রওয়ানা হও, তখন মাশআরুল হারামের কাছে আল্লাহকে স্মরণ কর এবং তিনি যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন সেভাবে তাকে স্মরণ কর।

فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا ـ

অতঃপর যখন তোমরা হজ্জের ক্রিয়াকর্ম সমাপ্ত কর, তখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর, যেমন তোমরা স্মরণ করতে তোমাদের বাপ-দাদাকে বরং আরও বেশী স্মরণ কর।

اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ ـ

যারা স্মরণ করে আল্লাহকে দাঁড়ানো অবস্থায়, বসা অবস্থায় এবং পার্শ্বস্থিত অবস্থায়।

فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ـ

অতঃপর নামাযান্তে তোমরা আল্লাহকে স্মরণ কর দাঁড়ানো অবস্থায়, বসা অবস্থায় এবং পার্শ্বস্থিত অবস্থায়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, রাতে-দিনে, জলে স্থলে, বাড়ীতে-সফরে, সচ্ছলতায় নিঃস্বতায়, রুগ্নাবস্থায় সুস্থাবস্থায় এবং যাহেরে বাতেনে যিকির করতে থাক। মোনাফেকদের নিন্দা করে বলা হয়েছে "

وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا তারা আল্লাহকে কমই স্মরণ করে।

اُذْكُرْ رَّبَّكَ فِىْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ ـ

তোমার পালনকর্তাকে স্মরণ করতে থাক মনে মনে, মিনতি সহকারে, ভয় সহকারে, জোরে কথা বলার চেয়ে কম শব্দে, সকাল ও সন্ধ্যায়। তোমরা গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ-আল্লাহর যিকির সর্ববৃহৎ। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ এর দু'অর্থ। এক, তোমরা আল্লাহকে যতই স্মরণ কর, তার চেয়ে তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ করা নিঃসন্দেহে বড় কথা। দুই, আল্লাহ তা'আলার যিকির অন্য সকল এবাদতের তুলনায় বড়।

এ সম্পর্কিত হাদীসসমূহ নিম্নরূপ ঃ

০ গাফেলদের মধ্যে আল্লাহর যিকিরকারী এমন, যেমন শুকনা ও ভাঙ্গা গাছপালার মাঝখানে কোন সবুজ বৃক্ষ থাকে।

ذكر الله فى الغافلين كالمقاتل فى الفارين যে গাফেলদের মধ্যে আল্লাহর যিকির করে, সে যেন পলায়নপর লোকদের মধ্যে যুদ্ধ করে।

ذكر الله فى الغافلين كالحى بين الاموات গাফেলদের মধ্যে আল্লাহর যিকিরকারী মৃতদের মধ্যে জীবিত ব্যক্তির ন্যায়।

০ এক হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ আমি বান্দার সাথে থাকি যে পর্যন্ত সে আমাকে স্মরণ করে এবং আমার স্মরণে তার ঠোঁট নড়াচড়া করে।

০ আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষাকারী আমলসমূহের মধ্যে যিকির অপেক্ষা অধিক ফলপ্রসূ আমল নেই। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আল্লাহর পথে জেহাদও নয়? তিনি বললেন ঃ আল্লাহর পথে জেহাদও নয়; কিন্তু যদি তরবারি দ্বারা মারতে মারতে তরবারি ভেঙ্গে ফেলে, আবার মারে ও তরবারি ভেঙ্গে ফেলে এবং আবার মারে ও তরবারি ভেঙ্গে ফেলে।

০ যে কেউ জান্নাতের পুষ্পোদ্যানে বিচরণ পছন্দ করে, তার বেশী করে যিকির করা উচিত।

০ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ সর্বোত্তম আমল কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ আল্লাহর যিকিরে রত থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা সর্বোত্তম আমল।

০ তোমরা সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহ তা'আলার যিকরে রত থাক, যাতে এ সময় তোমাদের কোন গোনাহ না হয়।

০ সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহ তা'আলার যিকির করা, আল্লাহর পথে

তরবারি ভেঙ্গে ফেলা এবং জলস্রোতের মত অর্থ দান করার চেয়েও উত্তম।

০ আল্লাহ জাল্লা শানুহু এরশাদ করেন ঃ যখন বান্দা আমাকে মনে মনে স্মরণ করে, তখন আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি। অর্থাৎ, আমি ছাড়া কেউ তা জানে না। বান্দা যখন আমাকে জনসমাবেশে স্মরণ করে, তখন আমি তাকে তাদের সে সমাবেশের চেয়ে উত্তম সমাবেশে স্মরণ করি। সে যদি আমার দিকে অর্ধ হাত অগ্রসর হয়, তবে আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই। সে আমার পানে আস্তে চললে আমি তার পানে দ্রুতবেগে চলি; অর্থাৎ তাড়াতাড়ি দোয়া কবুল করি।

০ আল্লাহ তা'আলা সাত ব্যক্তিকে আপন আরশের ছায়াতলে স্থান দেবেন। সেদিন, যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া কোন ছায়া থাকবে না। তাদের মধ্যে একজন সে ব্যক্তি, যে একান্তে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তাঁর ভয়ে কান্নাকাটি করে।

০ হযরত আবু দারদার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে এমন কথা বলব না, যা তোমাদের আমলের মধ্যে সর্বোত্তম; তোমাদের কাছে অনেক পরিচ্ছন্ন, তোমাদের মর্তবাসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ, তোমাদের জন্যে সোনারূপা দান করার চেয়েও ভাল এবং শত্রুর সাথে সংঘর্ষে [illegible] হয়ে নিজে মরা এবং তাদেরকে মারার চেয়েও উত্তম? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, সে কথাটি কি? তিনি বললেন ঃ তোমরা সদাসর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করবে।

০ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ যাকে আমার যিকির আমার কাছে চাওয়া থেকে বিরত রাখে, আমি তাকে এমন বস্তু দেব, যা যারা চায়, তাদেরকে দেয়া বস্তু অপেক্ষা উত্তম হবে।

এ সম্পর্কে মহৎ ব্যক্তিগণের উক্তি নিম্নরূপ ঃ

০ হযরত ফোযায়ল বলেন ঃ আমরা শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ হে ইবনে আদম! তুমি আমাকে এক ঘন্টা সকালে এবং

এক ঘন্টা আছরের পরে স্মরণ করে নিও। আমি এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সময়ে তোমার জন্যে যথেষ্ট হব।

০ হযরত হাসান বসরী বলেন ঃ যিকির দু'প্রকার। এক, মনে মনে আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করা, যাতে আল্লাহ ব্যতীত কেউ না জানে। এটা খুবই উৎকৃষ্ট যিকির এবং এর সওয়াব বেশী। এর চেয়েও উত্তম যিকির হচ্ছে আল্লাহ তা'আলাকে তখন স্মরণ করা, যখন তিনি বঞ্চিত করে দেন।

০ বর্ণিত আছে, সকল মানুষ পিপাসার্ত অবস্থায় পুনরুত্থিত হবে; কিন্তু যারা যিকিরকারী, তারা পিপাসার্ত হবে না।

০ হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন ঃ জান্নাতীরা কোন কিছুর জন্যে পরিতাপ করবে না, কিন্তু সেই মুহূর্তটির জন্যে পরিতাপ করবে, যা তাদের উপর দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে, কিন্তু তারা তাতে আল্লাহর যিকির করেনি।

মসলিসে যিকিরের ফযীলত ঃ রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যারা কোন মজলিসে যিকির করে, তাদেরকে ফেরেশতারা ঘিরে নেয়, রহমতের দ্বারা আবৃত করে এবং আল্লাহ তা'আলা উর্ধ্ব জগতে তাদের কথা আলোচনা করেন।

০ যারা সংঘবদ্ধ হয়ে আল্লাহ তা'আলার যিকির করে এবং সেই যিকির দ্বারা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকে না, তাদেরকে একজন ফেরেশতা আকাশ থেকে ডেকে বলে ঃ ওঠ, তোমাদের মাগফেরাত হয়ে গেছে। তোমাদের পাপসমূহ পুণ্যে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

০ যারা কোন জায়গায় বসে আল্লাহ তা'আলার যিকির করবে না এবং নবী (সাঃ)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করবে না, তারা কেয়ামতের দিন আক্ষেপ করবে।

০ হযরত দাউদ (আঃ) বলেন ঃ ইলাহী, যখন আপনি আমাকে

দেখেন, আমি যিকিরকারীদের মজলিস থেকে ওঠে গাফেলদের মজলিসের দিকে অগ্রসর হচ্ছি, তখন আমার পা ভেঙ্গে দিন। এটাও আপনার একটি কৃপা হবে।

০ রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ একটি নেক মজলিসের দ্বারা ঈমানদারদের বিশ লাখ মন্দ মজলিসের কাফফারা হয়ে যায়।

০ হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ আকাশের অধিবাসীরা পৃথিবীবাসীদের সেসব গৃহের দিকে তাকাবে, যেগুলোতে আল্লাহর যিকির হতে থাকবে। সে ঘরগুলো তাদের চোখে তারকার মত জ্বলজ্বল করতে থাকবে।

০ সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়না বলেন ঃ যখন লোকেরা একত্রিত হয়ে আল্লাহ তা'আলার যিকির করে, তখন শয়তান তার দোসর দুনিয়া থেকে আলাদা হয়ে যায় এবং দুনিয়াকে বলে ঃ দেখছ, এরা কি করছে? দুনিয়া বলে ঃ করতে দাও। এরা যখন আলাদা হয়ে যাবে, আমি ঘাড়ে ধরে ওদেরকে তোমার কাছে নিয়ে আসব।

০ হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) একবার বাজারে গিয়ে লোকজনকে বললেন ঃ তোমরা এখানে রয়েছ, ওদিকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ত্যাজ্য সম্পত্তি বন্টন করা হচ্ছে! লোকেরা বাজার ছেড়ে মসজিদের দিকে রওয়ানা হল, কিন্তু সেখানে কোন অর্থ-সম্পদ দেখল না। তারা ফিরে গিয়ে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-কে বলল ঃ আমরা তো কোন ত্যাজ্য সম্পত্তি বন্টন হতে দেখলাম না। হযরত আবু হোরায়রা বললেন ঃ তাহলে কি দেখেছ? তারা বললঃ কিছু লোককে দেখলাম তারা আল্লাহর যিকির করছে এবং কোরআন তেলাওয়াত করছে। তিনি বললেন ঃ এগুলোই তো রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ত্যাজ্য সম্পত্তি।

০ হযরত আবু হোরায়রা ও আবু সায়ীদ খুদরীর রেওয়ায়েতে রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ আমলনামা লিপিবদ্ধকারীগণ ছাড়া আল্লাহ তা'আলার আরও অনেক ফেরেশতা পৃথিবীতে যিকিরের মজলিস তালাশ করে ফিরে। তারা যখন কোন জনসমষ্টিকে আল্লাহর যিকির করতে দেখে,

তখন একে অপরকে ডেকে বলে ঃ আপন কাজে চল। অতঃপর সকল ফেরেশতা সেখানে আসে এবং দুনিয়ার আকাশ পর্যন্ত যিকিরকারীদেরকে ঘিরে নেয়। এর পর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ তোমরা আমার বান্দাদেরকে কি কাজে দেখে এসেছ? ফেরেশতারা আরজ করেঃ আমরা তাদেরকে এ অবস্থায় ছেড়ে এসেছি যে, তারা আপনার প্রশংসা, মহিমা ও পবিত্রতা বর্ণনা করছে। আল্লাহ বলেন ঃ তারা আমাকে দেখেছে কি? ফেরেশতারা বলে ঃ না। আল্লাহ বলেন ঃ যদি তারা আমাকে দেখে নেয়, তা হলে কি হবে? ফেরেশতারা বলে ঃ দেখে নিলে বেশীর ভাগ সময়ই আপনার পবিত্রতা ও প্রশংসা করবে। আল্লাহ বলেন ঃ তারা কি বস্তু থেকে আশ্রয় চায়? ফেরেশতারা বলে ঃ তারা জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চায়। আল্লাহ বলেন ঃ তারা জাহান্নাম দেখেছে কি? ফেরেশতারা বলে ঃ না। আল্লাহ বলেন ঃ যদি তারা জাহান্নাম দেখে নেয়, তবে কি হবে? ফেরেশতারা বলে ঃ দেখে নিলে আরও বেশী আশ্রয় চাইবে। আল্লাহ বলেন ঃ তারা কি প্রার্থনা করে? ফেরেশতারা বলে ঃ তারা জান্নাতপ্রার্থী। আল্লাহ বলেন ঃ তারা জান্নাত দেখেছে কি? ফেরেশতারা বলে ঃ না। আল্লাহ বলেন ঃ দেখে নিলে কি হবে? ফেরেশতারা বলে ঃ দেখে নিলে তারা আরও বেশী জান্নাত কামনা করবে। এর পর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ তোমরা সাক্ষী থাক, আমি তাদেরকে ক্ষমা করলাম। ফেরেশতারা আরজ করেঃ ইলাহী, তাদের মধ্যে অমুক ব্যক্তি যিকিরের নিয়তে সেখানে আসেনি; বরং নিজের কোন কাজে এসেছিল। আল্লাহ বলেন ঃ তারা এমন লোক যে, তাদের সাথে উপবেশনকারী কোন ব্যক্তিও তাদের বরকত থেকে বঞ্চিত হয় না।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার ফযীলত ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যা কিছু আমি এবং আমার পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ বলেছেন, তন্মধ্যে সর্বোত্তম উক্তি হচ্ছে- لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيكَ لَهُ

০ যে ব্যক্তি প্রত্যহ একশ'বার-

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ -

এই কালেমা পাঠ করবে, তা তার জন্যে দশটি গোলাম মুক্ত করার সমান হবে। তার জন্যে একশ' নেকী লেখা হবে। তার একশ' পাপ মোচন করা হবে। সে সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয়ে থাকবে। তার আমল থেকে উত্তম অন্য কারও আমল হবে না, সে ব্যক্তি ছাড়া, যে একশ'বারের বেশী এই কলেমা পাঠ করবে।

০ যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযু করে আকাশের দিকে তাকিয়ে এই কলেমা পাঠ করবে–

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدً عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ

তার জন্যে জান্নাতের দ্বারসমূহ উন্মুক্ত হয়ে যাবে। সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে যেতে পারবে।

০ যারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করে, তারা কবরে এবং কবর থেকে উত্থিত হওয়ার সময় আতঙ্কগ্রস্ত হবে না। আমি যেন দেখছি, তারা শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার সময় মাথা থেকে মাটি ঝেড়ে ফেলছে এবং মুখে বলছে– اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرٌ

০ হে আব হোরায়রা, তুমি যে সৎকর্ম করবে, তা কেয়ামতের দিন ওজন করা হবে, কিন্তু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষ্য দিলে তা ওজন করার জন্যে কোন দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে না। কারণ, যে ব্যক্তি সত্য মনে এই কলেমা পাঠ করে, তার পাল্লায় যদি এই কলেমা রাখা হয় এবং সপ্ত আকাশ, সপ্ত পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু অপর পাল্লায় রাখা হয়, তবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর পাল্লাই ঝুকে পড়বে।

০ যদি সত্য মনে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর যিকিরকারী ভূপৃষ্ঠ পরিমাণও গোনাহ নিয়ে আসে, তবুও আল্লাহ তাআলা সব গোনাহ মাফ করবেন।

০ হে আবু হুরায়রা! মরনোম্মখ ব্যক্তিকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষ্য শিক্ষা দাও। এটা গোনাহসমূহকে বিনাশ করে। আবু হোরায়রা আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, এটা তো মৃতদের জন্যে। জীবিতদের জন্যে

কি? তিনি বললেন ঃ তাদের জন্যে আরও বেশী বিনাশ করে।

من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنة ـ

যে ব্যক্তি খাঁটিভাবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

০ নিঃসন্দেহে তোমরা সকলেই জান্নাতে যাবে; কিন্তু যে ব্যক্তি অস্বীকৃতি মূলক ব্যবহার করবে, তার কথা ভিন্ন। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আল্লাহর সাথে অস্বীকৃতিমূলক ব্যবহার কি? তিনি বললেন ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ না বলা। অতএব তোমরা বেশী পরিমাণে এই কলেমা উচ্চারণ কর। নতুবা একদিন তোমাদের মধ্যে ও এই কলেমার মধ্যে আড়াল করে দেয়া হবে। কেননা, এটা কলেমায়ে তওহীদ, কলেমায়ে আখলাক, কলেমায়ে তাকওয়া, কলেমায়ে-তাইয়েবা, দাওয়াতুল হক (সত্যের আহ্বান) এবং "ওরওয়ায়ে-ওছকা" তথা মজবুত রশি। জান্নাতের মূল্যও এটাই।

০ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

অর্থাৎ, পুণ্যের বদলা পুণ্য ছাড়া কিছুই নয়। এতে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার পুণ্য হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা এবং পরকালের পুণ্য হচ্ছে জান্নাত। এমনিভাবে- لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ

অর্থাৎ, যারা পুণ্য কাজ করে, তাদের জন্যে রয়েছে পুণ্য এবং অতিরিক্ত আরও। এ আয়াতেও সে কথাই বলা হয়েছে।

০ হযরত বারা ইবনে আযেবের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি দশ বার বলবে-

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ

সে একটি গোলাম মুক্ত করার সমান সওয়াব পাবে।

o আমর ইবনে শোআয়বের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি একদিনে দু'শ বার উপরোক্ত কলেমা পাঠ করবে, তার অগ্রে সে-ও যাবে না যে তার পূর্বে ছিল এবং তাকে সেও পাবে না, যে তার পরে হবে, কিন্তু যে তার চেয়ে উত্তম আমল করবে, সে অবশ্য তার অগ্রে থাকবে।

o হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন বাজারে বলবে-

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ

তার জন্যে দশ লক্ষ নেকী লেখা হবে এবং তার দশ লক্ষ গোনাহ মার্জনা করা হবে। জান্নাতে তার জন্যে একটি গৃহ নির্মিত হবে।

o বর্ণিত আছে, বান্দা যখন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে, তখন এই কলেমা তার আমলনামার দিকে অগ্রসর হয় এবং যে গোনাহের উপর দিয়ে যায়, তাকে মিটিয়ে দেয়। অবশেষে নিজের মত কোন নেকী দেখে তার পার্শ্বে বসে পড়ে।

o আবু আইউব আনসারীর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি-

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ

বলে, তা তার জন্যে হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর সন্তান-সন্ততির মধ্য থেকে চারজন গোলাম মুক্ত করার সমান হবে।

o হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি রাত জেগে উপরোক্ত কলেমার সাথে-

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ـ

যোগ করে পাঠ করে, সে মাগফেরাত চাইলে মাগফেরাত হয়ে যাবে, দোয়া করলে তা কবুল হবে এবং ওযু করে নামায পড়লে নামায কবুল হবে।

সোবহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ ও অন্যান্য যিকিরের ফযীলত সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

০ যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর 'সোবহানাল্লাহ' ৩৩ বার, আলহামদু লিল্লাহ ৩৩ বার, আল্লাহু আকবর ৩৩ বার এবং শ' পূর্ণ করার জন্যে উপরোক্ত কলেমা ১ বার বলে, তার গোনাহ মাফ করা হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনাসম হয়।

০ যে ব্যক্তি দিনে একশ' বার সোবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী বলে, তার গোনাহ দূর হয়ে যাবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনাসম হয়।

০ এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে এসে আরজ করল ঃ আমার তরফ থেকে সংসার মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। আমি নিঃস্ব হয়ে গেছি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তুমি ফেরেশতাদের নামায এবং মানুষের তসবীহ পাঠ কর না কেন? এতে রুজি পাওয়া যায়। লোকটি বলল ঃ এটা কি? এরশাদ হল ঃ সোবহে সাদেক থেকে ফজরের নামায পড়া পর্যন্ত সময়ের মধ্যে 'সোনহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সোবহানাল্লাহিল আযীমি আস্তাগফিরুল্লাহ' পড়ে নেবে। সংসার তোমার কাছে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে ধরা দেবে। এ দোয়ার প্রত্যেক কলেমা দ্বারা আল্লাহ তাআলা একজন ফেরেশতা সৃষ্টি করবেন। তারা কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর তসবীহ পাঠ করবে এবং তুমি তার সওয়াব পাবে।

০ বান্দা যখন আলহামদু লিল্লাহ বলে, তখন তা আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থলকে পূর্ণ করে দেয়। এর পর যখন দ্বিতীয় বার বলে, তখন সপ্তম আকাশ থেকে শুরু করে সর্বনিম্ন পৃথিবী পর্যন্ত সবকিছু পূর্ণ করে দেয়। এর পর যখন তৃতীয় বার বলে, তখন আল্লাহ বলেন ঃ চাও, তুমি পাবে।

০ রেফায়া জারনী বর্ণনা করেন– আমরা একদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পেছনে নামায পড়ছিলাম। তিনি যখন রুকু থেকে মাথা তুলে

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ বললেন, তখন এক ব্যক্তি পেছন থেকে বলল ঃ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ নামাযান্তে তিনি বললেন ঃ কে বলেছিল? লোকটি আরজ করল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমি বলেছিলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আমি ত্রিশ জনের কিছু বেশী ফেরেশতাকে দেখলাম, এ কলেমাটি প্রথমে লেখার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

০ নোমান ইবনে বশীরের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যারা আল্লাহ্র প্রতাপ, পবিত্রতা, একত্ব ও প্রশংসার যিকির করে, তাদের এসব কলেমা আরশের চারপাশে ঘুরাফেরা করে। মৌমাছির মত ভন ভন শব্দ করে এগুলো পরওয়ারদেগারের সামনে যিকিরকারীদের আলোচনা করে। আল্লাহ্ তাআলার কাছে সর্বদা তোমাদের আলোচনা হোক, এটা কি তোমরা পছন্দ কর না?

০ হযরত আবু হুরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ –বলা আমার কাছে দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছু থেকে উত্তম। এক রেওয়ায়েতে এর সাথে لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ বাক্যটিও সংযুক্ত রয়েছে।

০ এ চারটি কলেমা আল্লাহ্ তাআলার সর্বাধিক পছন্দনীয় سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ –এসব কলেমা বলে যে কাজ শুরু করা হবে, তাতে কোন ত্রুটি হবে না।

০ আবু মালেক আশআরীর রেওয়ায়েতে নবী করীম (সাঃ) বলেন ঃ পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক। আলহামদু লিল্লাহ্ বলা দাঁড়ি পাল্লা পূর্ণ করে দেয় এবং সোবহানাল্লাহ ওয়াল হামদু লিল্লাহ্ বলা আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থল পূর্ণ করে দেয়। নামায নূর। খয়রাত দলীল। সবর আলো। কোরআন লাভ ও লোকসানের প্রমাণ। সকল মানুষ ভোরে ওঠে হয় নিজেদেরকে বিক্রি করে দেয়, না হয় নিজেদেরকে ক্রয় করে এবং মুক্ত করে।

○ হযরত আবু হোরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ দুটি কলেমা জিহ্বায় হালকা, দাঁড়ি পাল্লায় ভারী এবং আল্লাহর কাছে প্রিয়। একটি سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ এবং অপরটি سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ

○ হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করলাম– কোন কালামটি আল্লাহ তাআলার অধিকতর প্রিয়? তিনি বললেন ঃ যে কালামটি তিনি ফেরেশতাদের জন্যে বেছে রেখেছেন অর্থাৎ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ ـ

○ আবু হোরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেন, আল্লাহ তাআলা তাঁর কালামের মধ্য থেকে এসব কলেমা বেছে নিয়েছেন– سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ বান্দা যখন সোবহানাল্লাহ্ বলে, তখন তার জন্যে বিশটি নেকী লেখা হয় এবং তার বিশটি গোনাহ দূরা করা হয়। যখন আল্লাহু আকবর বলে, তখনও তাই করা হয়। এভাবে শেষ কলেমা পর্যন্ত উল্লেখ করে বললেন, প্রত্যেকটি বলার পর তাই করা হয়।

○ হযরত জাবের (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে আছে– যে ব্যক্তি সোবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী বলে, তার জন্যে জান্নাতে একটি বৃক্ষ রোপণ করা হয়।

○ হযরত আবু যর (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে আছে– নিঃস্ব সাহাবীগণ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করলেন, ধনীরা সওয়াব নিয়ে গেছে। তারা আমাদের মত নামায পড়ে, আমাদের মত রোযা রাখে এবং অতিরিক্ত মাল খরচ করে, আমরা তা পারি না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ আল্লাহ তাআলা কি তোমাদের জন্যে সদকা করার কিছু দেননি? তোমাদের জন্যে প্রত্যেক সোবহানাল্লাহ বলা সদকা, আলহামদু লিল্লাহ বলা সদকা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা সদকা, আল্লাহু আকবার বলা সদকা, ভাল কাজের আদেশ করা সদকা, মন্দ কাজে নিষেধ করা এবং স্ত্রীর সাথে সহবাস করা সদকা। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ,

আমরা স্ত্রীর সাথে কামভাব চরিতার্থ করব– এতেও সওয়াব পাওয়া যাবে? তিনি বললেন ঃ আচ্ছা বল তো, যদি কাম-বাসনা হারাম স্থানে ব্যয় করতে, তবে গোনাহ হত কিনা? তাঁরা আরজ করলেন ঃ অবশ্যই গোনাহ হত। তিনি বললেন ঃ এমনিভাবে হালাল স্থানে তা ব্যয় করলে সওয়াব হবে।

০ হযরত আবু যর (রাঃ) বললেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করলাম– ধনীরা সওয়াবে আমাদেরকে পেছনে ফেলে দিয়েছে। আমরা যা বলি, তা তারাও বলে, কিন্তু তারা ব্যয় করে– আমরা করি না। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ আমি তোমাকে এমন আমল বলে দিচ্ছি, যা তুমি করলে তোমার অগ্রগামীকে ধরে ফেলবে এবং তোমার পশ্চাদগামীর উপর শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হবে। তবে যে তোমার কথামত কথা বলে, তার কথা ভিন্ন। তুমি প্রত্যেক নামাযের পর ৩৩বার সোবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদু লিল্লাহ এবং ৩৪বার আল্লাহু আকবার পড়ে নেবে।

০ বুসরা বর্ণনা করেন– রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার মহিলাদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ মহিলাগণ, তোমরা নিজেদের জন্যে সোবহানাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং সুব্বুহুন কুদ্দুসুন বলা অপরিহার্য করে নাও। এতে শৈথিল্য করো না। অঙ্গুলির গিরায় গুনে নেবে। অঙ্গুলি কেয়ামতের দিন সাক্ষ্য দেবে এবং কথা বলবে।

০ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে অঙ্গুলিতে সোবহানাল্লাহ গণনা করতে দেখেছি।

০ হযরত আবু হোরায়রা ও আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) সাক্ষ্য দেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ বান্দা যখন বলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর, তখন আল্লাহ বলেন ঃ আমার বান্দা সত্য বলছে যে, আমাকে ছাড়া কোন মাবুদ নেই। আমি সর্ববৃহৎ। বান্দা যখন বলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শরীকা লাহু, তখন আল্লাহ বলেন ঃ আমার বান্দা সত্য বলেছে যে, আমাকে ছাড়া কোন মাবুদ নেই। আমি একক। আমার

কোন শরীক নেই। বান্দা যখন বলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ, তখন আল্লাহ বলেন ঃ আমার বান্দা ঠিক বলেছে। গোনাহ থেকে বাঁচার শক্তি এবং এবাদত করার ক্ষমতা অন্য কেউ দিতে পারে না। যে ব্যক্তি এসব কলেমা মৃত্যুর সময় বলে, তাকে জাহান্নামের অগ্নি স্পর্শ করবে না।

০ মুসাইয়্যিব ইবনে সা'দ তাঁর পিতার কাছ থেকে রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ তোমাদের কারও প্রত্যহ এক হাজার সৎকর্ম করার সাধ্য নেই। লোকেরা আরজ করল ঃ হাঁ, এটা কিরূপে সম্ভবপর? তিনি বললেন ঃ যে একশ'বার সোবহানাল্লাহ বলে নেবে, তার জন্যে এক হাজার সৎকর্ম লেখা হবে এবং তার এক হাজার পাপ দূর করা হবে।

০ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, হে আবদুল্লাহ ইবনে কায়স (অথবা আবু মূসা)! আমি কি তোমাকে জান্নাতের ভান্ডারসমূহের মধ্য থেকে একটি ভান্ডারের কথা বলব না? তিনি আরজ করলেন ঃ এরশাদ করুন। তিনি বললেন ঃ বল 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'।

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَّرَسُوْلًا ـ

অর্থাৎ, আমি আল্লাহকে পালনকর্তা জেনে সন্তুষ্ট, ইসলামকে ধর্ম জেনে সন্তুষ্ট এবং মুহাম্মদ (সাঃ)-কে রাসূল ও নবী জেনে সন্তুষ্ট।

যে ব্যক্তি সকাল বেলায় এই কলেমা পড়ে নেয়, আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিন তাকে অবশ্যই সন্তুষ্ট করবেন। এক রেওয়ায়েতে আছে, যে ব্যক্তি এই দোয়া রীতিমত পাঠ করে, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন।

০ মুজাহিদ বলেন ঃ মানুষ যখন ঘর থেকে বের হয় এবং বিসমিল্লাহ বলে, তখন ফেরেশতা বলে– তোকে হেদায়াত করা হয়েছে। যখন বলে تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ (আল্লাহর উপর ভরসা করলাম), তখন ফেরেশতা বলে– তোর জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট।

যখন বলে ঃ লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা, তখন ফেরেশতা বলে– তোর হেফাযত করা হয়েছে। এর পর তার কাছ থেকে শয়তান আলাদা হয়ে যায়। কারণ, তার উপর শয়তানের শক্তি চলে না। সে আল্লাহর হেদায়াত ও হেফাযতে দাখিল হয়ে যায়। এখানে প্রশ্ন হয়, আল্লাহর যিকির জিহ্বায় হালকা এবং কম কষ্টকর হওয়া সত্ত্বেও সকল এবাদতের তুলনায় অধিক উপকারী কিরূপে হয়ে গেল? অথচ এবাদতে যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করতে হয়। এর জওয়াব হচ্ছে, এ বিষয়ের যথার্থ অনুসন্ধান তো এলমে মুকাশাফা ছাড়া অন্য কোথাও শোভনীয় নয়, কিন্তু এলমে মুয়ামালায় যতটুকু আলোচনা সম্ভব, তা হচ্ছে, যে যিকির কার্যকর ও উপকারী হয়, তা হচ্ছে অন্তরের উপস্থিতি সহকারে সার্বক্ষণিক যিকির। কেবল মুখে যিকির করা ও অন্তর গাফেল থাকা খুব কমই উপকারী। এ কথাটি হাদীস থেকেও জানা যায়। কোন এক মুহূর্তে অন্তর উপস্থিত হওয়া এবং অন্য মুহূর্তে দুনিয়াতে মশগুল হয়ে আল্লাহ তা'আলা থেকে গাফেল হওয়া কম উপকারী। বরং আল্লাহ তা'আলার স্মরণে অন্তরের উপস্থিতি সর্বদা অথবা অধিকাংশ সময়ে সকল এবাদতের অগ্রবর্তী; বরং এর মাধ্যমেই যিকির সকল এবাদতের উপর শ্রেষ্ঠ হয়ে থাকে এবং এটাই সকল কার্যগত এবাদতের চূড়ান্ত লক্ষ্য। যিকিরের একটি শুরু ও একটি পরিণাম আছে। যিকিরের শুরু অনুরাগ ও মহব্বতের কারণ হয় এবং পরিণাম হচ্ছে, অনুরাগ ও মহব্বত যিকিরের কারণ হয়ে যায়। মহব্বতের কারণেই যিকির অনুষ্ঠিত হয়। যে অনুরাগ ও মহব্বত যিকির করতে উদ্বুদ্ধ করে, তাই কাম্য। কেননা, শিক্ষার্থী প্রথম অবস্থায় কখনও জোরপূর্বক আপন মন ও জিহ্বাকে কুমন্ত্রণা থেকে বিরত রেখে আল্লাহ তা'আলার যিকিরে ব্যাপৃত করে এবং খোদায়ী তওফীকে তা অব্যাহত রেখে অন্তরে আল্লাহর মহব্বত প্রতিষ্ঠিত করে নেয়। এটা মোটেই আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। কেননা, অভ্যাসগতভাবে দেখা যায় যে, কারও সামনে কোন অনুপস্থিত ব্যক্তির আলোচনা করা হলে এবং তার গুণাবলী বার বার তাকে শুনানো হলে সে অনুপস্থিত ব্যক্তিকে মহব্বত করতে থাকে। বরং কখনও অধিক আলোচনা দ্বারাই সে তার আশেক হয়ে যায়।

শুরুতে জোরপূর্বক যিকির দ্বারা আশেক হয়ে পরিণামে সে অধিক যিকির করতে এমন বাধ্য হয় যে, যিকির না করে থাকতেই পারে না। কেননা, যে যাকে মহব্বত করে, সে তার যিকির বেশী করে। এটাই নিয়ম। এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলার যিকির প্রথমে জোরপূর্বক হলেও তার ফলস্বরূপ পরিণামে আল্লাহর সাথে মহব্বত হয়ে যায় এবং আল্লাহর যিকির না করে ধৈর্য ধারণ করতে পারে না। এটাই অর্থ জনৈক বুযুর্গ থেকে বর্ণিত এই উক্তির, 'আমি বিশ বছর পর্যন্ত কোরআনের উপর কেবল মেহনতই করেছি। এর পর বিশ বছর কোরআন থেকে রত্ন আহরণ করেছি? এই রত্ন অনুরাগ ও মহব্বত ছাড়া কোন কিছু দ্বারা প্রকাশ পায় না। দীর্ঘ দিন জোরপূর্বক কষ্ট স্বীকার করলেই অনুরাগ ও মহব্বত অর্জিত হয় এবং তা মজ্জাগত হয়ে যায়। এ বিষয়টিকে অবান্তর মনে করবে না। কেননা, আমরা দেখি, মানুষ মাঝে মাঝে কোন বস্তু জোরপূর্বক খায় এবং বিস্বাদ হওয়ার কারণে তাকে পছন্দ করে না, কিন্তু জোরপূর্বক গলাধঃকরণ করে। এ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার ফলে শেষ পর্যন্ত বস্তুটি তার স্বভাবের সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়ে যায় এবং সে তা না খেয়ে থাকতে পারে না। মোট কথা, মানুষ অভ্যাসের দাস। প্রথমে যে কাজ সে জোরপূর্বক করে, শেষে তা তার মজ্জায় পরিণত হয়। আল্লাহ তা'আলার যিকির দ্বারা অনুরাগ অর্জিত হয়ে গেলে অবশিষ্ট সবকিছু থেকে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এছাড়া মৃত্যুর সময় সে সবকিছু থেকে আলাদা হয়ে যাবে। পরিবারের লোক, ধন-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি কবরে তার সঙ্গে যাবে না। আল্লাহর যিকির ছাড়া সেখানে কিছুই থাকবে না। সুতরাং যিকিরের প্রতি অনুরাগ থাকলে তা দ্বারা উপকৃত হবে এবং বাধা-বিপত্তি দূর হওয়ার কারণে আনন্দ উপভোগ করবে। পার্থিব জীবনে বিভিন্ন প্রয়োজন যিকিরে বাধা সৃষ্টি করে। মৃত্যুর পর কোন বাধা থাকবে না। তখন সে প্রিয়জনের সাথে একান্তে বাস করবে। তখন তার অবস্থা খুব উন্নত হবে। এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এরশাদ করেনঃ রূহুল কুদুস (জিবরাঈল) আমার মনে এ কথা রেখে দিয়েছেন যে, তোমার প্রিয় বস্তু

তোমাকে ত্যাগ করতেই হবে। এখানে পার্থিব বস্তু বুঝানো হয়েছে। কেননা, পৃথিবীর সবকিছু ধ্বংসশীল।

মৃত্যু মানে অস্তিত্ব লোপ পাওয়া; এর সাথে আল্লাহর যিকির কিরূপে থাকতে পারে? এ যুক্তির ভিত্তিতে মৃত্যুর পর যিকির করার কথা অস্বীকার করা ঠিক নয়। কেননা, মৃত্যুর কারণে মানুষ এমন বিলুপ্ত হয় না, যা যিকিরের পরিপন্থী। বরং সে কেবল দুনিয়া ও বাহ্যিক জগত থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়। ফেরেশতা জগত থেকে বিলুপ্ত হয় না। নিম্নোক্ত দু'টি হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এ বিষয়টির প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেন ঃ

القبر اما حفرة من حفر النار او روضة من رياض الجنة ـ

কবর জাহান্নামের গর্তসমূহের একটি গর্ত অথবা জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান।

ارواح الشهداء فى حواصل طيور خفر ـ

অর্থাৎ শহীদগণের আত্মা সবুজ পক্ষীকুলের পাকস্থলীতে থাকে। নিম্নোক্ত এরশাদেও এই ঈঙ্গিত রয়েছে, যা তিনি বদর যুদ্ধে নিহত মুশরিকদের প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করে বলেছিলেন ঃ হে অমুক, হে অমুক, তোমরা পরওয়ারদেগারে ওয়াদা সত্য পেয়েছ কিনা ? পরওয়ারদেগার আমাকে যে ওয়াদা দিয়েছিলেন, তা আমি সত্য পেয়েছি।

হযরত ওমর (রাঃ) এ কথা শুনে আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, তারা কিরূপে শুনবে এবং কিভাবে জওয়াব দেবে ? তারা তো মরে গেছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ আল্লাহর কসম, তোমরা আমার কথা তাদের চেয়ে বেশী শুন না। পার্থক্য হচ্ছে, তারা জওয়াব দেয়ার শক্তি রাখে না। এ রেওয়ায়েতটি সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত আছে। মুমিনদের সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন সে, তাদের আত্মা সবুজ পক্ষীকুলের পাকস্থলীতে আরশর নীচে ঝুলতে থাকে। হাদীসসমূহে বর্ণিত এই অবস্থা মৃত্যুর পর আল্লাহ্র যিকিরের পরিপন্থী নয়। আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ـ فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ

وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ اَنْ لَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ـ

অর্থাৎ, যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়েছে, তাদেরকে মৃত মনে করো না, বরং তারা জীবিত। তারা তাদের পরওয়ারদেগারের কাছে রিযিক প্রাপ্ত হয়। আল্লাহ্ তাদেরকে যে অনুগ্রহ দান করেন, তাতে তারা খুশী।

আল্লাহ্‌র যিকির শ্রেষ্ঠ হওয়ার কারণে শাহাদতের মর্তবা শ্রেষ্ঠ হয়েছে। কেননা, শাহাদতের উদ্দেশ্য হচ্ছে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে এমন অবস্থায় আল্লাহর সামনে যাওয়া যে, অন্তর আল্লাহর মধ্যে ডুবে গিয়ে অন্য সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে । সুতরাং কোন বান্দা যদি আল্লাহর মধ্যে ডুবে থাকতে সক্ষম হয়, তবে যুদ্ধের সারি ছাড়া তার জন্যে এ অবস্থায় অন্য কোনরূপে মৃত্যুবরণ করা সম্ভব নয়। কেননা, যুদ্ধের সারিতে নিজের প্রাণ, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি এমনকি, সমগ্র দুনিয়ার মোহ কেটে যায়। এগুলো জীবনের জন্যে আবশ্যক হয়ে থাকে। যুদ্ধ ক্ষেত্রে আল্লাহর মহব্বত ও তাঁর সন্তুষ্টির মধ্যে যখন জীবনেরই কোন মূল্য থাকে না, তখন এসব বস্তুর কি মূল্য থাকবে? এ থেকে জানা গেল, আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার মর্তবা অনেক বড়। কোরআন ও হাদীসে এর অসংখ্য ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। ওহুদ যুদ্ধে আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর আনসারী শহীদ হলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁর পুত্র জাবের (রাঃ)-কে বললেন ঃ জাবের, আমি তোমাকে একটি সুসংবাদ দিচ্ছি। জাবের আরজ করলেন ঃ উত্তম, আল্লাহ্ আপনাকে কল্যাণের সুসংবাদ দিন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ আল্লাহ্ তায়ালা তোমার পিতাকে জীবিত করে নিজের সামনে এভাবে বসিয়েছেন যে, তার মধ্যে ও আল্লাহ্ তায়ালার মধ্যে কোন আড়াল ছিল না। এর পর আল্লাহ্ বললেন ঃ হে আমার বান্দা, যা ইচ্ছা আমার কাছে প্রার্থনা কর। আমি তোমাকে দান করব। তোমার পিতা বলল ঃ ইলাহী, আমার বাসনা, আপনি আমাকে পুনরায় পৃথিবীতে প্রেরণ করুন, যাতে আমি আপনার পথে এবং আপনার রসূলের আনুগত্যে পুনরায় শহীদ হতে পারি। আল্লাহ্ বললেন ঃ এ ব্যাপারে আমার আদেশ পূর্বে

জারি হয়ে গেছে– মানুষ মৃত্যুর পর দুনিয়াতে ফিরে যাবে না। নিহত হওয়া এহেন পবিত্র অবস্থায় মৃত্যুর কারণ। যদি নিহত না হয় এবং দীর্ঘ দিন জীবিত থাকে, তবে দুনিয়ার কামনা - বাসনায় পুনরায় লিপ্ত হওয়া আশ্চর্য নয়। এ কারণেই সাধকগণ খাতেমা অর্থাৎ শেষ অবস্থার ব্যাপারে খুব ভীত থাকেন। অন্তর যতই আল্লাহর যিকরে লেগে থাকুক, কিন্তু তা পরিবর্তিত হতে থাকে এবং দুনিয়ার কামনা বাসনার দিকে কিছু না কিছু দৃষ্টি রাখে। সুতরাং শেষ অবস্থায় যদি অন্তর দুনিয়ার ব্যাপারাদিতে আচ্ছন্ন থাকে এবং তদবস্থায়ই দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়, তবে অনুমান এটাই যে, মৃত্যুর পর দুনিয়ার প্রতি আগ্রহী হয়ে দুনিয়াতে ফিরে আসার বাসনা করবে। কেননা, মানুষ যে অবস্থায় জীবন যাপন করে, সে অবস্থায়ই হাশর হয়। এমতাবস্থায় বিপদাশংকা থেকে অধিক আত্মরক্ষার উপায় হচ্ছে শহীদ হয়ে মৃত্যুবরণ করা। এর জন্যে শর্ত হচ্ছে, শহীদের উদ্দেশ্য অর্থোপার্জন করা অথবা বীরত্বে খ্যাতি অর্জন করা ইত্যাদি না হওয়া চাই। এরূপ উদ্দেশ্য নিয়ে কেউ শহীদ হলে হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী সে জাহান্নামে যাবে। বরং শহীদের উদ্দেশ্য হওয়া চাই আল্লাহর মহব্বত ও তাঁর বাণী সমুন্নত করা। নিম্নোক্ত আয়াতে এ অবস্থাই বর্ণিত হয়েছে।

إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ـ

অর্থাৎ আল্লাহ মুমিনদের প্রাণ ও ধন-সম্পদ জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন। এরূপ ব্যক্তিই দুনিয়াকে আখেরাতের বিনিময়ে বিক্রয় করে।

শহীদের অবস্থা কলেমায়ে তাইয়েবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর উদ্দেশের অনুরূপ। কেননা, এই কলেমার উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া কিছু নেই। বলাবাহুল্য, প্রত্যেক উদ্দেশ্য মাবুদ এবং প্রত্যেক মাবুদ ইলাহ তথা উপাস্য। শহীদ ব্যক্তি তার অবস্থার ভাষায় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে অর্থাৎ, আল্লাহ ব্যতীত তার কোন উদ্দেশ্য নেই। আর যে ব্যক্তি এই কলেমা তার মুখের ভাষায় বলে এবং তার অবস্থা এই কলেমার অনুরূপ না হয় তার

ব্যাপার আল্লাহর ইচ্ছাধীন থাকবে। সে বিপদমুক্ত নয়। এসব কারণেই রসূলে করীম (সাঃ) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলাকে সকল যিকিরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। কোন কোন জায়গায় উৎসাহ দানের উদ্দেশে সর্বাবস্থায় এ কলেমা উচ্চারণ করাকেই যিকির বলেছেন এবং কোন কোন জায়গায় আন্তরিকতা ও একনিষ্ঠতার শর্ত সহযোগে বলেছেন– من قال لا اله الا الله مخلصا (যে ইখলাসের সাথে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে)। ইখলাসের অর্থ হচ্ছে মৌখিক উক্তির অনুরূপ অবস্থা হওয়া। আল্লাহ তা'আলার কাছে আমাদের প্রার্থনা, তিনি যেন শেষ অবস্থায় আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করে দেন, যাদের অবস্থা, মুখের কথা এবং যাহের ও বাতেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর অনুরূপ।

দোয়ার ফযীলত ও আদব

এ সম্পর্কিত আয়াত নিম্নরূপ ঃ

وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ -

অর্থাৎ, হে নবী, আমার বান্দারা যখন আপনাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে, তখন বলে দিন, আমি তাদের নিকটেই আছি। আমি দোয়াকারীর দোয়ায় সাড়া দেই। অতএব তারা যেন আমার আদেশ পালন করে।

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً اِنَّهٗ لَايُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ অর্থাৎ তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে বিনীতভাবে ও সঙ্গোপনে দোয়া কর। তিনি সীমালজ্ঘনকারীকে পছন্দ করেন না।

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّامَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى -

অর্থাৎ বলে দিন, তোমরা আল্লাহর কাছে দোয়া কর অথবা রহমানের

কাছে, তাঁর বহু উত্তম নাম রয়েছে, এখন যে নামেই ইচ্ছা দোয়া কর।

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ـ

অর্থাৎ, তোমাদের পালনকর্তা বলেন ঃ তোমরা আমার কাছে দোয়া কর। আমি তোমাদের দোয়ায় সাড়া দেব। নিশ্চয় যারা আমার এবাদতে অহংকার করে, তারা সত্বরই লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

এ সম্পর্কে হাদীসসমূহ নিম্নরূপঃ

০ নোমান ইবনে বশীরের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ الدعاء هو العبادة (দোয়াই হল এবাদত) অতঃপর তিনি ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ আয়াতটি পাঠ করলেন।

০ الدعاء مخ العبادة অর্থাৎ দোয়া এবাদতের সারবস্তু।

০ হযরত আবু হুরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়ার চেয়ে বড় কোন কিছু নেই।

০ দোয়া দ্বারা তিনটি বিষয়ের কোন না কোন একটি অর্জিত হয় দোয়াকারীর গোনাহ মার্জনা করা হয় অথবা সে কোন কল্যাণ প্রাপ্ত হয় অথবা কোন নেকী তার জন্যে সঞ্চিত রাখা হয়।

০ আল্লাহ তা'আলার কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। তিনি প্রার্থনা করা পছন্দ করেন। স্বাচ্ছন্দ্যের অপেক্ষা করা চমৎকার এবাদত।

দোয়ার আদব দশটি ঃ

(১) দোয়ার জন্যে উত্তম দিনসমূহের দিকে তাকিয়ে থাকা; যেমন, বছরে আরাফার দিন, মাসসমূহের মধ্যে রমযান মাস, সপ্তাহের মধ্যে জুমুআর দিন এবং রাতের প্রহরসমূহের মধ্যে সেহরীর সময়। আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (তারা সেহরীর সময়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে।) রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা

প্রতি রাত্রে শেষ এক-তৃতীয়াংশ বাকী থাকার সময় দুনিয়ার আসমানে বিশেষ কৃপাদৃষ্টি দান করেন এবং বলেন ঃ এমন কে আছে, যে আমার কাছে দোয়া করবে আর আমি তা কবুল করব? বর্ণিত আছে, হযরত এয়াকুব (আঃ) তাঁর সন্তানদেরকে বলেছিলেন- سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيْ (আমি সত্বরই তোমাদের জন্যে পরওয়ারদেগারের কাছে মাগফেরাতের দরখাস্ত করব)। এতে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সেহরীর সময় দোয়া করা। সেমতে তিনি রাতের শেষ প্রহরে গাত্রোত্থান করেন এবং দোয়া প্রার্থনা করেন। সন্তানরা তাঁর পেছনে আমীন আমীন বলেছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ওহী পাঠালেন ঃ আমি তাদের অপরাধ মার্জনা করলাম এবং তাদেরকে পয়গম্বর করলাম।

(২) উত্তম অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করা। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ যখন আল্লাহর পথে সৈন্যরা শত্রুদের মুখোমুখি হয়, যখন বৃষ্টি বর্ষিত হতে থাকে এবং যখন ফরয নামাযের জন্যে তকবীর বলা হয়, তখন আকাশের দরজা খুলে যায়। এসব সময় দোয়া করাকে উত্তম সুযোগ মনে করবে। হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ নামাযসমূহ উৎকৃষ্ট মুহূর্তে নির্ধারিত হয়েছে। অতএব নামাযের পরে দোয়া করা অপরিহার্য করে নাও। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আযান ও একামতের মাঝখানে দোয়া প্রত্যাখ্যাত হয় না। বাস্তবে সময় উৎকৃষ্ট হলে অবস্থাও উৎকৃষ্ট হয়। উদাহরণতঃ সেহরীর সময় মনের পরিচ্ছন্নতা, আন্তরিকতা এবং উদ্বেগজনক বিষয়াদি থেকে মুক্ত হওয়ার সময়। আরাফা ও জুমআর দিন উদ্যমসমূহের একত্রিত হওয়া এবং আল্লাহর রহমত নামিয়ে আনার জন্যে অন্তরসমূহের ঐকমত্যের সময়। এছাড়া সেজদার অবস্থাও দোয়া কবুল হওয়ার জন্যে উপযুক্ত। হযরত আবু হোরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ বান্দা সকল অবস্থা অপেক্ষা সেজদার অবস্থায় তার পরওয়ারদেগারের অধিক নিকটবর্তী হয়। সুতরাং সেজদায় বেশী পরিমাণে দোয়া কর। হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আমাকে রুকু ও সেজদায় কোরআন পাঠ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

অতএব তোমরা রুকুতে আল্লাহর তাযীম কর এবং সেজদায় দোয়া করার খুব চেষ্টা কর। এ অবস্থা দোয়া কবুল হওয়ার জন্যে উপযুক্ত।

(৩) কেবলামুখী হয়ে দোয়া করা এবং হাত এতটুকু উঁচুতে তোলা যাতে বগলের শুভ্রতা দৃষ্টিগোচর হয়। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরাফাতের ময়দানে আগমন করলেন এবং কেবলামুখী হয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দোয়া করলেন। সালমান (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ তোমাদের পরওয়ারদেগার লজ্জাশীল দাতা। বান্দা যখন তাঁর দিকে উভয় হাত উত্তোলন করে, তখন তিনি খালি হাত ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন– রসূলুল্লাহ (সাঃ) দোয়ায় হাত এতটুকু উপরে তুলতেন যাতে তাঁর বগলের শুভ্রতা দৃষ্টিগোচর হয়ে যেত। তিনি দোয়ায় উভয় অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করতেন না। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক ব্যক্তির কাছ দিয়ে গমন করলেন। সে তখন দোয়া করছিল এবং শাহাদতের উভয় অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করছিল। তিনি বললেন ঃ এক অঙ্গুলি দিয়েই ইশারা কর। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন ঃ শৃঙ্খলবদ্ধ হওয়ার পূর্বে হাতগুলো দোয়ার জন্যে উত্তোলন কর।

দোয়া শেষে উভয় হাত মুখমন্ডলে বুলিয়ে নেয়া উচিত। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন উভয় হাত দোয়ায় প্রসারিত করতেন, তখন মুখমন্ডলে না বুলিয়ে সরাতেন না। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন দোয়া করতেন, তখন উভয় হাতের তালু মিলিয়ে নিতেন এবং ভিতরের অংশ মুখের দিকে রাখতেন। দোয়ায় আকাশের দিকে দৃষ্টি না রাখা উচিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ লোকেরা যেন দোয়ায় তাদের দৃষ্টি আকাশের দিকে উত্তোলন করা থেকে বিরত থাকে। নতুবা তাদের দৃষ্টি ছোঁ মেরে নিয়ে যাওয়া হবে।

(৪) নিম্নস্বরে দোয়া করা। হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সহযাত্রী হয়ে সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলাম। মদীনার নিকটবর্তী হয়ে তিনি তকবীর বললেন। লোকেরাও

খুব উচ্চস্বরে আল্লাহু আকবার বলল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ লোকসকল, যাকে তোমরা ডাকছ, তিনি বধির এবং অনুপস্থিত নন; বরং তিনি তোমাদের ও তোমাদের সওয়ারীর ঘাড়ের মাঝখানে রয়েছেন। কোরআন বলে ঃ

وَلَا تَجْهَرْ بِصَلٰوتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا অর্থাৎ, তুমি নামাযে উচ্চ শব্দ করো না এবং চুপিসারেও পড়ো না।

হযরত আয়েশা (রাঃ) এ আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ এর উদ্দেশ্য, দোয়া সশব্দেও করো না এবং একেবারে নিঃশব্দেও করো না; বরং মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করা উচিত। আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে আপন নবী যাকারিয়া (আঃ)-এর প্রশংসা করে বলেছেন ঃ

اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَاءً خَفِيًّا অর্থাৎ, যখন সে তার পরওয়ারদেগারকে আস্তে ডাক দিল।

আল্লাহ আরও বলেন ঃ اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً

অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে বিনীত ও নীচু স্বরে ডাক।

(৫) দোয়ায় ছন্দ মিলানোর চেষ্টা না করা। দোয়ার অবস্থা কাকুতি মিনতি ও বিনয়ের অবস্থা হওয়া উচিত। এতে ছন্দের মিল সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা থাকা সমীচীন নয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ সত্বরই কিছু লোক এমন হবে, যারা দোয়ায় সীমালঙ্ঘন করবে।

কেউ কেউ– اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ

অর্থাৎ, তোমাদের পালনকর্তাকে বিনীতভাবে ও সঙ্গোপনে ডাক, তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

–এই আয়াতের তফসীরে বলেন, এখানে 'সীমালঙ্ঘনকারী' বলে দোয়ায় সযত্নে ছন্দের মিল সৃষ্টিকারীকে বুঝানো হয়েছে। সেমতে কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত দোয়া ছাড়া অন্য কোন দোয়া না করাই

উত্তম। কেননা, অন্য দোয়া করলে তাতে সীমালঙ্ঘনের আশংকা থাকে। ভাল দোয়া কোন্‌টি, তা সকলের জানা নেই। এ কারণেই হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ) থেকে হাদীস অথবা তাঁরই উক্তি বর্ণিত রয়েছে যে, জান্নাতেও আলেমগণের প্রয়োজন হবে। যখন জান্নাতীদেরকে বলা হবে– তোমরা বাসনা কর, তখন কিভাবে বাসনা করতে হবে তা তাদের জানা থাকবে না। অবশেষে আলেমগণের কাছে থেকে শিখে বাসনা করবে। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ দোয়ায় ছন্দের মিল সৃষ্টি থেকে দূরে থাক। তোমাদের জন্যে এতটুকু বলাই যথেষ্ট–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ

অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে জান্নাত কামনা করি এবং যে কথা ও কাজ মানুষকে জান্নাতের নিকটবর্তী করে, তা প্রার্থনা করি। আমি তোমার কাছে জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি এবং যে কথা ও কাজ জাহান্নামের নিকটবর্তী করে, তা থেকেও আশ্রয় প্রার্থনা করি। পূর্ববর্তী জনৈক বুযুর্গ এক ওয়ায়েযের কাছ দিয়ে গমন করছিলেন। ওয়ায়েয তখন ছন্দ মিলিয়ে দোয়া করছিল। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলার সামনে কাব্যিক বাহাদুরী প্রদর্শন করছ? সাক্ষী থাক– আমি হাবীব আজমীকে দোয়া করতে দেখেছি, যাঁর দোয়ার বরকত দেশময় খ্যাত। তিনি তার দোয়ায় এর বেশী বলতেন না–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا جَيِّدِيْنَ اَللّٰهُمَّ لَاتَفْضَحْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَللّٰهُمَّ وَفِّقْنَا لِلْخَيْرِ ـ

— হে আল্লাহ, আমাদেরকে খাঁটি ও নির্মল কর। হে আল্লাহ, আমাদেরকে কেয়ামতের দিন লাঞ্ছিত করো না। হে আল্লাহ, আমাদের সৎকাজের তওফীক দান কর। মানুষ চতুর্দিক থেকে জড়ো হয়ে তারপেছনে দোয়া করত। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ লাঞ্ছনা ও অক্ষমতার ভাষায় দোয়া কর– বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল ভাষায় নয়। কথিত আছে, আলেম ও

আবদালগণের মধ্যে কেউ দোয়ায় সাতটি বাক্যের বেশী বলতেন না। সূরা বাকারার শেষাংশ এর প্রমাণ। কোরআনের অন্য কোথাও বান্দার দোয়া এর চেয়ে বেশী উল্লিখিত হয়নি। প্রকাশ থাকে যে, ছন্দের মিল বলে প্রয়াস সহকারে কথা বলা বুঝানো হয়েছে। এটা বিনয় ও কাকুতি-মিনতির পরিপন্থী। এখানে ছন্দের স্বাভিবিক মিল উদ্দেশ্য নয়। কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে বর্ণিত দোয়ার মধ্যেও ছন্দের মিল বিদ্যমান রয়েছে, কিন্তু এটা সযত্ন প্রয়াস ও বানোয়াট নয়। স্বাভাবিকভাবে আগত। সুতরাং হাদীসে বর্ণিত দোয়াসমুহকেই যথেষ্ট মনে করবে অথবা ছন্দের মিলের জন্যে প্রয়াস ছাড়াই কাকুতি-মিনতিসহকারে দোয়া করবে। মনে রাখবে, অক্ষমতাই আল্লাহ তায়ালার পছন্দনীয়।

(৬) আগ্রহ ও ভয়সহকারে দোয়া করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا ـ

অর্থাৎ, নিশ্চয় তারা সৎকাজে অগ্রগামী হত এবং আমার কাছে আশা ও ভয়সহকারে দোয়া করত।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তায়ালা যখন কোন বান্দাকে পছন্দ করে নেন, তখন তার অনুনয়-বিনয় শুনার জন্যে তাকে বিপদগ্রস্ত করেন।

(৭) অকাট্যরূপে দোয়া করা এবং কবুল হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ যখন তোমাদের কেউ দোয়া করে, তখন এরূপে বলা উচিত নয় যে,ইলাহী! তুমি ইচ্ছা করলে আমাকে ক্ষমা কর এবং তুমি ইচ্ছা করলে আমার প্রতি রহম কর; বরং দৃঢ়তার সাথে আবেদন করা উচিত যে, আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি রহম কর। কেননা, আল্লাহর উপর কেউ জোর-জবরদস্তি করতে পারে না। তিনি আরও বলেন ঃ খুব আগ্রহ সহকারে দোয়া করা উচিত। কেননা, আল্লাহর জন্যে কোন কিছুই বড় নয়। অন্য এক হাদীসে আছে– আল্লাহ তা'আলার কাছে কবুল হওয়ার বিশ্বাস নিয়ে দোয়া কর। মনে রেখো, আল্লাহ তা'আলা গাফেল অন্তরের দোয়া কবুল করেন না। সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়না বলেন ঃ তুমি নিজের দোষত্রুটি অবগত হয়ে দোয়া থেকে বিরত

থেকো না। মনে করো না যে, তুমি অসৎ, তোমার দোয়া কবুল হবে না। কেননা, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির সর্বাধিক মন্দ অর্থাৎ, অভিশপ্ত শয়তানের দোয়াও কবুল করেছেন। সেমতে কোরআনে আছে–

قَالَ رَبِّ اَنْظِرْنِيْٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ـ

অর্থাৎ, শয়তান বলল ঃ পরওয়ারদেগার, আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত সময় দাও। আল্লাহ বললেন ঃ যা তোকে সময় দেয়া হল।

(৮) উত্তম অবস্থায় দোয়ার শব্দাবলী তিন বার বলা। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) দোয়া করলে তিনবার করতেন এবং কোন কিছু চাইলে তিন বার চাইতেন। দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে এরূপ মনে করা উচিত নয় যে, বিলম্ব হয়ে গেছে। কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ তোমাদের দোয়া তখন কবুল হবে, যখন তোমরা তড়িঘড়ি করবে না এবং এরূপ বলবে না যে, আমি দোয়া করলাম অথচ কবুল হল না। দোয়া করার সময় আল্লাহ তা'আলার কাছে অনেক কিছু চাইবে। কেননা, আল্লাহ মহান দাতা। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আমি বিশ বছর যাবত একটি বিষয় চেয়ে দোয়া করছি, এখনও কবুল হয়নি, কিন্তু কবুল হবে বলে আমার আশা আছে। বিষয়টি হচ্ছে, আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে অনর্থক বিষয়াদি ত্যাগ করার তওফীক কামনা করেছি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ তোমাদের কেউ আল্লাহ তা'আলার কাছে কিছু চাওয়ার পর যদি জানতে পারে যে, দোয়া কবুল হয়েছে, তবে সে বলবে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ بِنِعْمَتِهٖ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ ـ

অর্থাৎ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যার নেয়ামত দ্বারা সৎকর্মসমূহ পূর্ণতা লাভ করে। দোয়া কবুলে কিছু বিলম্ব হলে এরূপ বলবে– اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ অর্থাৎ সর্বাবস্থায় সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যে।

(৯) আল্লাহর যিকির দ্বারা দোয়া শুরু করা এবং প্রথমেই সওয়াল না করা। সালামা ইবনে আকওয়া বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে কখনও এই কলেমা না বলে দোয়া শুরু করতে শুনিনি–

سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَلِى الْاَعْلَى الْوَهَّابِ ـ

অর্থাৎ আমার মহান সুউচ্চ দাতা পরওয়ারদেগার পবিত্র।

আবু সোলায়মান দারানী বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার কাছে কোন সওয়াল করতে চায়, তার উচিত প্রথমে দরূদ পড়া এবং দরূদ দ্বারা দোয়া সমাপ্ত করা। কেননা, আল্লাহ তা'আলা উভয় দরূদ কবুল করেন। কাজেই দরূদদ্বয়ের মধ্যবর্তী বিষয় কবুল না করে ছেড়ে দেবেন– এটা তাঁর শানের জন্যে শোভন নয়। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যখন তোমরা আল্লাহর কাছে সওয়াল কর, তখন আমার প্রতি দরূদ পাঠ দ্বারা শুরু কর। আল্লাহ তা'আলার শান এরূপ নয় যে, কেউ তাঁর কাছে দুটি বিষয় চাইলে একটি পূর্ণ করবেন এবং অপরটি করবেন না।

(১০) তওবা করা এবং হকদারদের হক তাদেরকে অর্পণ করে পূর্ণ উদ্যম সহকারে আল্লাহ তা'আলার দিকে মনোনিবেশ করা। এ বিষয়টি মানুষের অভ্যন্তরীণ অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত এবং দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে এটাই মূল কথা। কা'বে আহবার (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত মূসা (আঃ)-এর আমলে একবার ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি বনী ইসরাঈলের সাথে বৃষ্টির জন্যে দোয়া করতে বের হলেন, কিন্তু বৃষ্টি হলো না। অতঃপর তিনি তিন দিন বাইরে থাকলেন, তবুও বৃষ্টি হল না। আল্লাহ তা'আলা এ মর্মে ওহী পাঠালেন, আমি তোমার ও তোমার সঙ্গীদের দোয়া কবুল করব না। তোমাদের মধ্যে চোগলখোর রয়েছে। হযরত মূসা (আঃ) আরজ করলেন ঃ ইলাহী, কোন্ ব্যক্তি চোগলখোর তা আমাকে বলে দিন। তাকে আমরা বহিষ্কার করব। আদেশ হল হে মূসা, আমি চোগলখুরী করতে নিষেধ করে নিজেই তা করব– এ কেমন কথা! মূসা (আঃ) বনী ইসরাঈলকে বললেন ঃ তোমরা সকলেই চোগলখুরী থেকে তওবা কর। সকলেই তওবা করল। তখন বৃষ্টি বর্ষিত হল।

সায়ীদ ইবনে জুবায়র বলেন ঃ বনী ইসরাঈলের এক বাদশার আমলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। জনসাধারণ বৃষ্টির জন্যে দোয়া করল। বাদশাহ বলল ঃ আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, না হয় আমি তাকে

কষ্ট দেব। জনগণ বলল, আপনি আল্লাহ তা'আলাকে কিরূপে কষ্ট দেবেন? তিনি তো আকাশে আছেন। বাদশাহ বলল, আমি তাঁর ওলী ও অনুগতদেরকে হত্যা করব। এটাই তাঁর কষ্টের কারণ হবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বৃষ্টি দান করলেন।

সুফিয়ান সওরী বলেন ঃ আমি শুনেছি, বনী ইসরাঈলের মধ্যে একবার সাত বছর পর্যন্ত অনাবৃষ্টি লেগে থাকে। ফলে মানুষ মৃতদের ও শিশুদেরকে খেয়ে ফেলে। তারা পাহাড়ে গিয়ে গিয়ে ক্রন্দন করত ও কাকুতি মিনতি করত। আল্লাহ তা'আলা তাদের পয়গম্বরের কাছে ওহী পাঠালেন; আমার দিকে চলে চলে যদি তোমাদের হাঁটু পর্যন্ত ক্ষয় হয়ে যায়, তোমাদের তোলা হাত আকাশের মেঘমালা স্পর্শ করে এবং দোয়া করতে করতে জিহবা ক্লান্ত হয়ে যায়, তবুও আমি কারও দোয়া কবুল করব না এবং ক্রন্দনকারীর প্রতি দয়া করব না, যে পর্যন্ত না হকদারদের হক তাদের কাছে পৌঁছে দেবে। অতঃপর যখন সকলেই এ বিষয়ে উদ্যোগী হল, তখন বৃষ্টি বর্ষিত হল।

হযরত মালেক ইবনে দীনার বলেন ঃ একবার বনী ইসরাঈলের মধ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। তারা বৃষ্টির জন্যে কয়েক বার বাইরে গেল, কিন্তু বৃষ্টি হল না এবং পয়গম্বরের কাছে ওহী এল ঃ তাদেরকে বলে দাও, তোমরা নাপাক দেহে আমার দিকে আস এবং যে হাতে খুন করেছ, সেই হাত আমার দিকে প্রসারিত কর। তোমরা হারাম হাতের দ্বারা উদর পূর্ণ করে রেখেছ। ফলে তোমাদের প্রতি আমার ক্রোধ বেড়ে গেছে। এখন দূরবর্তী হওয়া ছাড়া তোমরা আমার কাছ থেকে কিছুই পাবে না।

আবু সিদ্দীক নাজী বলেন ঃ হযরত সোলায়মান (আঃ) একবার বৃষ্টির জন্যে দোয়া করতে বের হলেন এবং পথিমধ্যে একটি পিপীলিকাকে উল্টে পড়ে থাকতে দেখলেন। পিপীলিকাটি পা আকাশের দিকে তুলে বলছিল, ইলাহী, আমরাও তোমার অন্যতম সৃষ্টি। তোমার রুজি ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না। অপরের গোনাহের বিনিময়ে আমাদেরকে ধ্বংস করো না। হযরত সোলায়মান (আঃ) লোকদেরকে বললেন ঃ ফিরে চল। অন্য

প্রাণীর দোয়ায় তোমরা বৃষ্টি পেয়ে গেছ। আওযায়ী বলেন ঃ একবার লোকজন বৃষ্টির জন্যে দোয়া করতে বের হল। তাদের মধ্যে বেলাল ইবনে সা'দ দাঁড়িয়ে আল্লাহ তা'আলার হামদ করার পর বললেন ঃ উপস্থিত লোকজন, তোমরা তোমাদের পাপ-তাপের কথা স্বীকার কর কিনা? সকলেই বলল, নিশ্চয় স্বীকার করি। অতঃপর বেলাল ইবনে সা'দ বললেন, ইলাহী, আমরা শুনেছি তুমি তোমার কোরআন মজীদে বলেছ- مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ সৎকর্মপরায়ণদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আমরা আমাদের পাপ স্বীকার করেছি। অতএব তোমার মাগফেরাত আমাদের মত লোকদের জন্যেই। ইলাহী, আমাদের মাগফেরাত কর, আমাদের প্রতি রহম কর এবং আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ কর। অতঃপর বেলাল হাত উত্তোলন করলেন। লোকেরাও হাত তুলল। দেখতে দেখতে বৃষ্টি বর্ষিত হল।

মালেক ইবনে দীনারকে লোকেরা বলল, আপনি আমাদের জন্যে পরওয়ারদেগারের কাছে বৃষ্টির দোয়া করুন। তিনি বললেন ঃ তোমরা মনে করছ বৃষ্টি বর্ষণে বিলম্ব হচ্ছে, কিন্তু আমি মনে করি প্রস্তর বর্ষণে বিলম্ব হচ্ছে। অর্থাৎ, আমাদের পাপ-তাপ প্রস্তর বর্ষণের যোগ্য।

বর্ণিত আছে, হযরত ঈসা (আঃ) একবার বৃষ্টির দোয়া করার জন্যে বের হলেন। ময়দানে পৌঁছে তিনি লোকদেরকে বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে যারা গোনাহ করেছ, তোরা ফিরে যাও। এ কথা বলার পর এক ব্যক্তি ছাড়া সকলেই ফিরে গেল। ঈসা (আঃ) লোকটিকে বললেন ঃ তুমি কি কোন গোনাহ করনি? সে বললঃ আমি অন্য কোনা গোনাহ জানি না, তবে একদিন আমি নামায পড়ছিলাম। আমার কাছ দিয়ে এক মহিলা চলে গেল। আমি তাকে চোখে দেখলাম। মহিলা চলে গেলে আমি চোখে অঙ্গুলি ঢুকিয়ে উপড়ে ফেললাম এবং সেই মহিলার পেছনে নিক্ষেপ করলাম। হযরত ঈসা (আঃ) বললেন ঃ তুমি দোয়া কর। আমি আমীন বলে যাই। সেমতে লোকটি দোয়া করতেই আকাশ মেঘমালায় ছেয়ে গেল এবং প্রচুর বৃষ্টি বর্ষিত হল।

ইয়াহইয়া গাস্সানী বলেন ঃ হযরত দাউদ (আঃ)-এর আমলে অনাবৃষ্টি হলে লোকেরা আলেমদের মধ্য থেকে তিন ব্যক্তিকে মনোনীত করল এবং তাদের সাথে দোয়া করতে বের হল। একজন আলেম বললঃ ইলাহী, তুমি তওরাতে বলেছ–কেউ আমার উপর জুলুম করলে আমরা যেন তাকে মাফ করি। ইলাহী, আমরা নিজেদের উপর জুলুম করেছি। অতএব তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর। দ্বিতীয় আলেম বললঃ ইলাহী, তুমি তওরাতে বলেছ–আমরা যেন আমাদের গোলামদেরকে মুক্ত করে দেই। ইলাহী, আমরাও তোমার গোলাম। অতএব তুমি আমাদেরকে মুক্ত কর। তৃতীয় আলেম বললঃ ইলাহী তুমি তওরাতে বলেছ– আমাদের দরজায় মিসকীন এসে দাঁড়ালে আমরা যেন তাকে বঞ্চিত না করি। ইলাহী, আমরাও মিসকীন এবং তোমার দরজায় দণ্ডায়মান। আমাদের দোয়া নামঞ্জুর করো না। এরূপ দোয়ার পর তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হল।

আতা সলমী বলেন ঃ এক বছর অনাবৃষ্টি হলে আমরা বৃষ্টির দোয়ার জন্যে বাইরে গেলাম। পথে সা'দুন নামক পাগলকে কবরস্থানে দেখা গেল সে আমাকে দেখে বললঃ এটা কেয়ামতের দিন, না মানুষ কবর থেকে বের হচ্ছে? আমি বললাম ঃ এসবের কিছুই নয়। বরং বৃষ্টি হয় না; তাই মানুষ দোয়া করতে বের হয়েছে। সে বলল ঃ হে আতা, কোন্ অন্তরে দোয়া কর– যমীনের অন্তরে, না আকাশের অন্তরে? আমি বললাম ঃ আকাশের অন্তরে। সে বললঃ কখনও নয়। হে আতা, মেকি মুদ্রাওয়ালাদেরকে বলে দাও– তারা যেন সে মুদ্রা না চালায়। কেননা, পরখকারী খুবই হুশিয়ার। এর পর সে আকাশের দিকে তাকিয়ে বললঃ ইলাহী, শহরগুলোকে বান্দাদের গোনাহের কারণে ধ্বংস করো না, বরং তোমার গোপন নামসমূহের বরকতে আমাদেরকে প্রচুর মিঠা পানি দান কর, যাতে বান্দারা জীবিত হয় এবং শহরগুলো সিক্ত হয়। তুমিই সর্ববিষয়োপরি ক্ষমতাবান। আতা বলেন ঃ সা'দুনের এই দোয়া শেষ হওয়ার পূর্বেই আকাশ গর্জে উঠল, বিদ্যুৎ চমকে ওঠল এবং মুষলধারে বারিপাত শুরু হল।

দরূদের ফযীলত

আল্লাহ তাআলা বলেন–

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ـ

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি রহমত প্রেরণ করেন। মুমিনগণ, তোমরাও তাঁর প্রতি রহমত প্রেরণ কর এবং সালাম বল।

বর্ণিত আছে, রসূলে করীম (সাঃ) একদিন হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় বাইরে এসে বললেন ঃ আমার কাছে জিব্রাঈল (আঃ) এসে বলল ঃ আপনি কি এতে সন্তুষ্ট নন যে, আপনার উম্মতের কেউ আপনার প্রতি দরূদ প্রেরণ করলে আমি তার প্রতি দশ বার রহমত প্রেরণ করি এবং আপনার উম্মতের কেউ এক বার সালাম প্রেরণ করলে আমি তার প্রতি দশ বার সালাম প্রেরণ করি? এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে, যে আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করে, ফেরেশতারা তার প্রতি দরূদ প্রেরণ করে, যে পর্যন্ত সে আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করে। অতএব ইচ্ছা করলে কেউ কম দরূদ পড়ুক অথবা বেশী পড়ুক। আরও বলা হয়েছে– সে ব্যক্তি আমার অধিকতর নিকটবর্তী হবে, যে আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করবে। ঈমানদারের জন্যে এটাই যথেষ্ট কৃপণতা যে, তার সামনে আমার আলোচনা হলে সে আমার প্রতি বেশী দরূদ প্রেরণ করে না। আমার উম্মতের যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করে, তার জন্যে দশটি নেকী লেখা হয় এবং তার দশটি গোনাহ মিটিয়ে দেয়া হয়। আরও বলা হয়েছে– যে ব্যক্তি আযান একামত শুনে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করবে, তার জন্যে আমার শাফায়াত অপরিহার্য হবে ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَاعْطِهِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَالشَّفَاعَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ্ এই পরিপূর্ণ আহবান ও প্রতিষ্ঠিত নামাযের প্রভু- তুমি তোমার রসূল ও নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি রহমত প্রেরণ কর, তাকে ওছিলা, ফযীলত ও সুউচ্চ মর্যাদা দান কর এবং কেয়ামতের দিন শাফায়াতের ক্ষমতা দান কর।

আরও বলা হয়েছে – পৃথিবীতে কিছু ফেরেশতা বিচরণ করে। তারা আমার উম্মতের সালাম আমার কাছে পৌঁছায়। যখন কেউ আমার প্রতি সালাম প্রেরণ করবে, তখন আল্লাহ তাআলা আমার আত্মা আমার মধ্যে ফেরত পাঠাবেন, যাতে আমি তার সালামের জওয়াব দিতে পারি। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমরা কিভাবে আপনার প্রতি দরুদ প্রেরণ করব? তিনি বললেন ঃ তোমরা বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ -

অর্থাৎ হে আল্লাহ ! তোমার বান্দা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি রহমত প্রেরণ কর এবং তাঁর বংশধর, পত্নীগণ ও সন্তান-সন্ততির প্রতি রহমত প্রেরণ কর ; যেমন রহমত প্রেরণ করেছ ইবরাহীমের (আঃ) প্রতি ও ইবরাহীমের বংশধরের প্রতি। মুহাম্মদ (সাঃ), তাঁর পত্নীগণ ও সন্তান-সন্ততিকে বরকত দাও ; যেমন বরকত দিয়েছ ইবরাহীমকে (আঃ) ও তাঁর বংশধরকে। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত পবিত্র।

বর্ণিত আছে, রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর ওফাতের পর লোকেরা হযরত ওমর (রাঃ)-কে ক্রন্দন করতে করতে এ কথা বলতে শুনল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার প্রতি আমার পিতামাতা উৎসর্গ হোক; একটি খোরমা বৃক্ষের শাখার উপর আপনি খোতবা পাঠ করতেন। এ শাখাটি আপনার বিরহে আহাজারি শুরু করে। অবশেষে আপনি তার উপর হাত রেখে দিলে সে চুপ হয়ে যায়। এখন আপনার বিরহে আপনার উম্মতের

আহাজারি আরও অধিক শোভনীয়। ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার প্রতি আমার পিতামাতা কোরবান হোক; আল্লাহ তা'আলার কাছে আপনার মর্যাদা এত দূর উন্নীত হয়েছে যে, আপনার আনুগত্য আল্লাহ নিজের আনুগত্য সাব্যস্ত করেছেন। সেমতে এরশাদ হয়েছে–

وَمَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ـ

অর্থাৎ, যে রসূলের আনুগত্য করে, সে আল্লাহরই আনুগত্য করে। ইয়া রসূলাল্লাহ, আপনার প্রতি আমার পিতামাতা উৎসর্গ হোক; আল্লাহর কাছে আপনার মর্তবা এতটুকু উন্নীত হয়েছে যে, আপনার ত্রুটি আপনাকে বলার আগেই আল্লাহ তা মার্জনা করে দিয়েছেন। সেমতে বলা হয়েছে–

عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ ـ

অর্থাৎ আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করেছেন। আপনি তাদেরকে অনুমতি দিলেন কেন? ইয়া রসূলাল্লাহ, আপনার প্রতি আমার পিতামাতা উৎসর্গ-হোক; আপনার মর্যাদা এত উচ্চে যে, আপনাকে সকল নবীর শেষে প্রেরণ করেছেন এবং কোরআনে সকলের পূর্বে আপনাকে উল্লেখ করেছেন। সেমতে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْحٍ وَاِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰى ـ

–যখন আমি নবীগণের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম– আপনার কাছ থেকে, নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও ঈসার কাছ থেকে। ইয়া রসূলাল্লাহ, আপনার প্রতি আমার পিতামাতা উৎসর্গ হোক, আপনার মর্তবা এতটুকু যে, দোযখীরা দোযখের বিভিন্ন স্তরে আযাবে পতিত হয়ে বাসনা করবে হায়, আমরা যদি রসূলের আনুগত্য করতাম! সেমতে কোরআনে তাদের অবস্থা এভাবে বর্ণিত হয়েছে– يٰلَيْتَنَا اَطَعْنَا اللّٰهَ وَاَطَعْنَا الرَّسُوْلَ

–হায় আফসোস, আমরা যদি আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করতাম! ইয়া রসূলাল্লাহ, আপনার প্রতি আমার পিতামাতা কোরবান হোক; আল্লাহ

তা'আলা মূসা ইবনে এমরানকে একটি প্রস্তর খন্ড দান করেছিলেন, তা থেকে নির্ঝরিণী প্রবাহিত হত। এটা আপনার অঙ্গুলির জন্যে অভূতপূর্ব ছিল না। আপনার অঙ্গুলি থেকে পানির ফোয়ারা বয়ে যেত। আপনার প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। আপনার প্রতি আমার পিতামাতা উৎসর্গ হোক; আল্লাহ তা'আলা সোলায়মান (আঃ)-কে বায়ু দান করেছিলেন, যা সকাল-সন্ধ্যায় এক মাসের পথ অতিক্রম করত। এটা আপনার বোরাকের চেয়ে অধিক বিস্ময়কর ছিল না, যাতে সওয়ার হয়ে আপনি সপ্তম আকাশ পর্যন্ত ভ্রমণ করে সে রাতের ফজরের নামায নিজ গৃহে পড়েছেন। আপনার প্রতি রহমত হোক ইয়া রসূলাল্লাহ, আপনার প্রতি আমার পিতামাতা কোরবান হোক ইয়া রসূলাল্লাহ; আল্লাহ তা'আলা ঈসা ইবনে মরিয়মকে মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করার মোজেযা দান করেছিলেন। এটা এ ঘটনা থেকে অধিক আশ্চর্যজনক ছিল না যে, বিষমিশ্রিত ভাজা করা ছাগল আপনার সাথে কথা বলেছিল। সেটির বাহু আরজ করেছিল ঃ আমাকে খাবেন না। আমার মধ্যে বিষ আছে। ইয়া রসূলাল্লাহ, আপনার প্রতি আমার পিতামাতা উৎসর্গ হোক; হযরত নূহ (আঃ) স্বজাতির জন্যে এই দোয়া করেছিলেন–

رَبِّ لَاتَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا .

–হে আল্লাহ! পৃথিবীর বুকে কাফেরদের একটি গৃহও অক্ষত ছাড়বেন না। আপনি আমাদের জন্যেও এরূপ দোয়া করলে আমরা সকলেই ধ্বংস হয়ে যেতাম। অথচ আপনার পৃষ্ঠদেশ পিষ্ট করা হয়েছে, আপনার মুখমন্ডল আহত হয়েছে এবং সামনের দাঁত ভেঙ্গেছে, কিন্তু আপনি কল্যাণকর কথাই বলে গেছেন। আপনি বলেছেন– اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِىْ فَاِنَّهُمْ لَايَعْلَمُوْنَ –হে আল্লাহ, আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা কর। তারা অবুঝ। ইয়া রসূলাল্লাহ, আপনার প্রতি আমার পিতামাতা উৎসর্গ হোক; আপনি বয়স কম পেয়েছেন। এ সত্ত্বেও এত লোক আপনার অনুসারী হয়েছে যা হযরত নূহ (আঃ)-এর হয়নি। অথচ তিনি সুদীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন। আপনার প্রতি অনেক মানুষ বিশ্বাস স্থাপন করেছে

এবং তাঁর প্রতি অল্প সংখ্যক লোকই বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। ইয়া রসূলাল্লাহ আপনার প্রতি আমার পিতামাতা কোরবান হোক ; যদি আপনি নিজের কাছে নিজের সমতুল্য লোক ছাড়া অন্য কাউকে না বসাতেন, তবে সঙ্গে বসার সৌভাগ্য আমরা কোথায় পেতাম! যদি আপনি নিজের সমকক্ষ লোকের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতেন, তবে এ সম্পর্ক থেকে বঞ্চিত থাকতাম। যদি আপনি নিজের মত ব্যক্তির সাথে খাদ্য গ্রহন করতেন, তবে আপনার সাথে আহার করার গৌরব আমরা অর্জন করতে পারতাম না, কিন্তু আল্লাহর কসম, আপনি আমাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছেন, সঙ্গে বসে আহার করেছেন, পশমী-বস্ত্র পরিধান করেছেন, গাধায় সওয়ার হয়েছেন, অপরকে পেছনে সওয়ার করিয়েছেন, নিজের খাদ্য মাটিতে রেখেছেন এবং অঙ্গুলি লেহন করেছেন। এসব কাজ আপনি বিনয়বশত করেছেন। আল্লাহ্ আপনার প্রতি রহম করুন এবং সালাম প্রেরণ করুন। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আমি হাদীস লিপিবদ্ধ করতাম। এতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করতাম, কিন্তু সালাম বলতাম না। একদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) -কে স্বপ্নে দেখলাম, তিনি বলছেন ঃ তুমি আমার প্রতি দরূদ পূর্ণ কর না কেন? এর পর যখনই লেখেছি দরূদ ও সালাম উভয়টি পাঠ করেছি।

আবুল হাসান শাফেয়ী বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে স্বপ্নে দেখে আরজ করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) তাঁর পুস্তিকায় লিখেছেন ঃ

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ ـ

(আল্লাহ তা'আলা মোহাম্মদের প্রতি রহমত প্রেরণ করুক যতবার স্মরণ করে তাঁকে স্মরণকারীগণ এবং তাঁর স্মরণ থেকে গাফেল হয় গাফেল লোকেরা।)-এর বিনিময়ে সে আপনার কাছ থেকে কি পেয়েছে? তিনি বললেন ঃ সে আমার পক্ষ থেকে এই পেয়েছে যে, কেয়ামতের ময়দানে তাকে হিসাবের জন্যে দাঁড় করানো হবে না।

এস্তেগফারের ফযীলত ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْآ اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ -

অর্থাৎ, যারা অশ্লীল কাজ করে অথবা নিজেদের উপর জুলুম করে, অতঃপর তাদের গোনাহের জন্যে এস্তেগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা করে।

আলকামা ও আসওয়াদের রেওয়ায়েতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ কোরআন মজীদে দু'টি আয়াত রয়েছে, কোন বান্দা গোনাহ করে এ দু'টি আয়াত পাঠ করলে আল্লাহ তা'আলা তার গোনাহ মার্জনা করেন। তন্মধ্যে একটি উপরোল্লেখিত আয়াত ও অপরটি এই ঃ

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا -

—যে মন্দ কাজ করে অথবা নিজের উপর জুলুম করে, অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল ও দয়ালু পাবে। আল্লাহ আরও বলেন ঃ

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا -

অর্থাৎ অতঃপর তোমার পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তিনি তওবা গ্রহণকারী। আরেক আয়াতে আছে ঃ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ

অর্থাৎ ভোর রাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারীগণ। রসূলে করীম (সাঃ) প্রায়ই এই দোয়া উচ্চারণ করতেন—

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ -

অর্থাৎ পবিত্র তুমি হে আল্লাহ, তোমার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করি। হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি তওবা কবুলকারী দয়ালু।

তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি বেশী পরিমাণে এস্তেগফার করে, আল্লাহ তা'আলা তার প্রত্যেক দুঃখ দূর করেন এবং প্রত্যেক বিপদ থেকে উদ্ধারের উপায় করে দেন। তাকে ধারণাতীত স্থান থেকে রিযিক দান করেন। তিনি আরও বলেন ঃ আমি দিনে সত্তর বার আল্লাহ্ তা'আলার কাছে মাগফেরাত চাই এবং তাঁর সামনে তওবা করি। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অগ্র-পশ্চাত সকল গোনাহ ক্ষমা করা হয়েছিল। এতদসত্ত্বেও যিনি এস্তেগফার ও তওবা করতেন। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে– আমার অন্তরে ময়লা এসে যায় যে পর্যন্ত না আমি প্রত্যহ একশ' বার এস্তেগফার করি। অন্য এক হাদীসে আছে–

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ

যে ব্যক্তি এই কলেমা বিছানায় শোয়ার সময় তিন বার বলবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার গোনাহ মাফ করে দেবেন যদিও তা সমুদ্রের ফেনার সমান অথবা মরুভূমির বালু কণার সমান অথবা বৃক্ষসমূহের পাতার সমান অথবা দুনিয়ার দিনসমূহের সমান হয়। হযরত হুযায়ফা (রাঃ) বলেন ঃ আমি আমার পরিবারের লোকজনের প্রতি কঠোর ভাষা ব্যবহার করতাম। একদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করলাম, আমার ভয় হয়, কোথাও আমার কঠোর ভাষা আমাকে দোযখে না দাখিল করে দেয়। তিনি বললেন ঃ তুমি এস্তেগফার পড় না কেন? আমি তো দিনে একশ'বার এস্তেগফার করি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এস্তেগফারে এই কলেমা পড়তেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ خَطِيْئَتِيْ وَجَهْلِيْ وَإِسْرَافِيْ فِيْ أَمْرِيْ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ جِدِّيْ وَهَزْلِيْ وَخَطَائِيْ وَعَمَدِيْ وَكُلُّ ذَالِكَ عِنْدِيْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ

وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ .

অর্থাৎ হে আল্লাহ, মাফ কর আমার গোনাহ, আমার মূর্খতা, আমার কাজে আমার বাড়াবাড়ি এবং যা তুমি আমার চেয়েও বেশী জান। হে আল্লাহ, মাফ কর আমার ইচ্ছাকৃত গোনাহ, আমার বিদ্রূপের গোনাহ, আমার ভুলবশতঃ গোনাহ, আমার জেনেশুনে করা গোনাহ। এগুলোর সবই আমি করেছি। হে আল্লাহ, মাফ কর আমার ভবিষ্যত গোনাহ, আমার অতীত গোনাহ, আমার গোপন গোনাহ, আমার প্রকাশ্য গোনাহ এবং যে গোনাহ তুমি আমার চেয়ে বেশী জান। তুমিই রহমত অগ্রে নিয়ে যাও এবং তুমিই পেছনে রাখ। তুমি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

হযরত আবু হুরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ মুমিন ব্যক্তি যখন গোনাহ করে, তখন তার অন্তরে একটি কাল দাগ পড়ে। এর পর যদি সে তওবা করতঃ গোনাহ থেকে বিরত হয় এবং এস্তেগফার করে, তবে তার অন্তরের দাগ মিটে যায়। পক্ষান্তরে গোনাহ বেশী করলে দাগ আস্তে আস্তে বড় হয় এবং অন্তরকে ছেয়ে ফেলে। একেই বলা হয় ران যার উল্লেখ এই আয়াতে আছে– كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ অর্থাৎ, কখনও নয়; বরং তাদের অন্তরে তারা যা করত, তার মরিচা পড়ে গেছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেন ঃ বান্দা যখন গোনাহ করে এবং বলে– اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ (হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা কর, তখন আল্লাহ বলেন ঃ আমার বান্দা গোনাহ করার পর জেনেছে, তার একজন পালনকর্তা আছেন, যিনি গোনাহের শাস্তি দেন এবং পাপ মার্জনা করেন। অতএব, হে আমার বান্দা, যা ইচ্ছা কর, আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম। তিনি আরও বলেন ঃ যে ব্যক্তি এস্তেগফার করতে থাকে, তাকে অব্যাহত গোনাহকারী বলা হয় না যদিও সে দিনে সত্তর বার একই গোনাহ করে ; বর্ণিত আছে, নিম্নোক্ত কলেমাসমূহ উত্তম এস্তেগফারের মধ্যে গণ্য ঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ وَاَنَا عَبْدُكَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ

وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَاَبُوْءُ عَلٰى نَفْسِيْ بِذَنْبِيْ فَقَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْلِيْ ذُنُوْبِيْ مَا قَدَّمْتُ مِنْهَا وَمَا اَخَّرْتُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِلَّا اَنْتَ ـ

অর্থাৎ, ইয়া ইলাহী, তুমি আমার রব এবং আমি তোমার বান্দা। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি সাধ্যমত তোমার অঙ্গীকার ও ওয়াদার উপর আছি। আমি তোমার কাছে আমার মন্দ কাজ থেকে আশ্রয় চাই। আমি তোমার নেয়ামত স্বীকার করি এবং আমার গোনাহ স্বীকার করি। আমি নিজের উপর জুলুম করেছি এবং আমার অপরাধ স্বীকার করেছি। তুমি ক্ষমা কর আমার গোনাহ, যা আমি আগে করেছি এবং পিছনে করেছি। তুমি ব্যতীত সকল গোনাহ কেউ ক্ষমা করতে পারে না।

খালেদ ইবনে মেদান বলেন যে, আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ আমার বান্দাদের মধ্যে সর্বাধিক প্রিয় তারা, যারা আমার মহব্বতের কারণে পারস্পরিক মহব্বত রাখে এবং যাদের মন মসজিদের সাথে বাঁধা থাকে এবং সকাল থেকেই এস্তেগফার করে। আমি যখন পৃথিবীর লোকদেরকে শাস্তি দিতে চাই, তখন তাদের কথা মনে পড়ে। তখন তাদের বরকতে পৃথিবীর লোকদেরকে শাস্তি থেকে অব্যাহতি দান করি। হযরত কাতাদাহ বলেন ঃ কোরআন মজীদ তোমাদেরকে তোমাদের রোগ ও প্রতিকার উভয়টিই বলে দেয়। তোমাদের রোগ হচ্ছে গোনাহ এবং প্রতিকার হচ্ছে এস্তেগফার। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ যারা ধ্বংস হয়, তাদের জন্যে অবাক লাগে যে, মুক্তির উপায় হাতে থাকার পরেও তারা কিরূপে ধ্বংস হয়! লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ মুক্তির উপায় কি? তিনি বললেন ঃ এস্তেগফার। তিনি আরও বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা যাকে আযাব দেওয়ার ইচ্ছা করেন না, তার অন্তরে এস্তেগফার করার কথা জাগ্রত করে দেন। ফোযাযল বলেন ঃ গোনাহ বর্জন না করে এস্তেগফার হচ্ছে মিথ্যাবাদীদের তওবা। খ্যাতনাম্নী তাপসী রাবেয়া বলেন ঃ আমাদের এস্তেগফারের জন্যে

অনেক এস্তেগফার দরকার। অর্থাৎ গাফেল অন্তর নিয়ে এস্তেগফার করাও একটি গোনাহ ও ঠাট্টা। এর জন্যে পৃথক এস্তেগফার করা উচিত। জনৈক দার্শনিক বলেন ঃ যে ব্যক্তি অনুতাপ করার পূর্বে এস্তেগফার করে, সে অজ্ঞাতে আল্লাহ তাআলার সাথে ঠাট্টা করে।

আবু আবদুল্লাহ ওয়াররাক বলেন ঃ যদি তোমার ঘাড়ে সমুদ্রের ফেনার পরিমাণ গোনাহ থাকে এবং তুমি তোমার আন্তরিকতা সহকারে পরওয়ারদেগারের কাছে এই দোয়া কর, তবে ইনশাআল্লাহ, তোমার গোনাহ দূর হয়ে যাবে। দোয়াটি এই ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ تُبْتُ اِلَيْكَ مِنْهُ ثُمَّ عُدْتُّ فِيْهِ وَاَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ مَا وَعَدْتُّكَ بِهٖ مِنْ نَفْسِىْ ثُمَّ لَمْ اُوْفِ لَكَ بِهٖ وَاَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ عَمَلٍ اَرَدْتُّ بِهٖ وَجْهَكَ فَخَالَطَهٗ غَيْرُكَ وَاَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ نِعْمَةٍ اَنْعَمْتَ بِهَا عَلَىَّ فَاسْتَعَنْتُ بِهَا عَلٰى مَعْصِيَتِكَ وَاَسْتَغْفِرُكَ يَا عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ اَتَيْتُهٗ فِىْ ضِيَاءِ النَّهَارِ وَسَوَادِ اللَّيْلِ فِىْ مَلَاءٍ وَخَلَاءٍ وَسِرٍّ وَعَلَانِيَةٍ يَا حَلِيْمُ -

অর্থাৎ, হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে এমন প্রত্যেক গোনাহ থেকে এস্তেগফার করছি, যা থেকে তওবা করার পর পুনরায় করেছি। আমি এস্তেগফার করছি এমন ওয়াদা থেকে, যা আমি নিজে তোমার সাথে করেছি, অতঃপর তা পূর্ণ করিনি। আমি এস্তেগফার করছি এমন আমল থেকে, যার উদ্দেশ্য ছিল একমাত্র তোমার সন্তুষ্টি অর্জন; কিন্তু পরে তাতে অন্য সত্তাও মিশ্রিত হয়ে গেছে। আমি এস্তেগফার করছি এমন নেয়ামত থেকে, যা তুমি আমাকে দিয়েছিলে, আমি তা দ্বারা গোনাহের কাজে সাহায্য নিয়েছি। হে দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী, আমি তোমার কাছে এমন প্রত্যেক গোনাহ থেকে এস্তেগফার করছি, যা আমি দিনের আলোকে,

রাতের অন্ধকারে জনসমক্ষে, নির্জনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে করেছি, হে সহনশীল। কারও মতে এটা হযরত আদম (আঃ)-এর এবং কারও মতে হযরত খিযির (আঃ)-এর এস্তেগফার।

বর্ণিত দোয়া

কারণ ও দোয়াকারী ব্যক্তির সাথে সম্বন্ধযুক্ত এসব দোয়া সকাল-সন্ধ্যায় এবং প্রত্যেক নামাযের পরে পাঠ করা মোস্তাহাব। এগুলোর মধ্য থেকে নিম্নে আমরা সতরটি দোয়া উদ্ধৃত করছি।

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দোয়া

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দোয়া, যা তিনি ফজরের সুন্নতের পর পাঠ করতেন বলে বর্ণিত আছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ আমাকে আমার পিতা আব্বাস রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে পাঠিয়েছিলেন। আমি সন্ধ্যায় তাঁর খেদমতে উপস্থিত হলাম। তখন তিনি আমার খালা মায়মূনার গৃহে অবস্থান করছিলেন। এর পর তিনি রাত্রে ওঠে নামায পড়তে থাকেন। ফজরের সুন্নত পড়া শেষ হলে তিনি এ দোয়া পাঠ করলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِىْ بِهَا قَلْبِىْ
وَتَجْمَعُ بِهَا شَمْلِىْ وَتَلُمُّ بِهَا شَعْثِىْ وَتَرُدُّ بِهَا اُلْفَتِىْ وَتُصْلِحُ
بِهَا دِيْنِىْ وَتَحْفَظُ بِهَا غَائِبِىْ وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِىْ وَتُزَكِّىْ بِهَا
عَمَلِىْ وَتُبَيِّضُ بِهَا وَجْهِىْ وَتُلْهِمُنِىْ بِهَا رُشْدِىْ وَتَعْصِمُنِىْ
بِهَا مِنْ كُلِّ سُوْءٍ اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِىْ اِيْمَانًا صَادِقًا وَيَقِيْنًا لَيْس
بَعْدَهُ كُفْرٌ وَرَحْمَةً اَنَالُ بِهَا شَرْفَ كَرَامَتِكَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ـ
اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْفَوْزَ عِنْدَ الْقَضَاءِ وَمَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَعَيْشَ
السُّعَدَاءِ وَالنَّصْرَ عَلَى الْاَعْدَاءِ وَمُرَافَقَةَ الْاَنْبِيَاءِ ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ

اَنْزِلُ بِكَ حَاجَتِىْ وَاِنْ ضَعُفَ رَائِىْ وَقِلَّتْ حِيْلَتِىْ وَقَصُرَ عَمَلِىْ وَافْتَقَرْتُ اِلٰى رَحْمَتِكَ فَاَسْئَلُكَ يَا قَاضِىَ الْاُمُوْرِ يَا شَافِىَ الصُّدُوْرِ كَمَا تُجِيْرَ بَيْنَ الْبُحُوْرِ اَنْ تُجِيْرَنِىْ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ وَمِنْ دَعْوَةِ الثُّبُوْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْقُبُوْرِ ـ اَللّٰهُمَّ مَا قَصُرَ عَنْهُ رَائِىْ وَضَعُفَ عَنْهُ عَمَلِىْ وَلَمْ تَبْلُغْهُ نِيَّتِىْ وَاُمْنِيَتِىْ مِنْ خَيْرٍ وَعَدْتَّهُ اَحَدًا مِنْ عِبَادِكَ اَوْ خَيْرٍ اَنْتَ مُعْطِيْهِ اَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ فَاِنِّىْ اَرْغَبُ اِلَيْكَ فِيْهِ وَاَسْئَلُكَ يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ـ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا هَادِيْنَ مُهْتَدِيْنَ غَيْرَ ضَالِّيْنَ وَلَا مُضِلِّيْنَ حَرْبًا لِاَعْدَائِكَ وَسِلْمًا لِاَوْلِيَائِكَ نُحِبُّ بِحُبِّكَ مَنْ اَطَاعَكَ مِنْ خَلْقِكَ وَنُعَادِى بِعَدَاوَتِكَ مَنْ خَالَفَكَ مِنْ خَلْقِكَ ـ اَللّٰهُمَّ هٰذَا الدُّعَاءُ وَعَلَيْكَ الْاِجَابَةُ وَهٰذَا الْجُهْدُ وَعَلَيْكَ التُّكْلَانُ وَاِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ يَا ذَا الْحَبْلِ الشَّدِيْدِ وَالْاَمْرِ الرَّشِيْدِ اَسْئَلُكَ الْاَمْنَ يَوْمَ الْوَعِيْدِ وَالْجَنَّةَ يَوْمَ الْخُلُوْدِ مَعَ الْمُقَرَّبِيْنَ الشُّهُوْدِ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ وَالْمُوْفِيْنَ بِالْعُهُوْدِ اِنَّكَ رَحِيْمٌ وَدُوْدٌ وَاَنْتَ تَفْعَلُ مَا تُرِيْدُ سُبْحَانَ الَّذِىْ تَعَطَّفَ بِالْعِزِّ وَقَالَ بِهٖ سُبْحَانَ الَّذِىْ لَبِسَ بِالْمَجْدِ وَتَكَرَّمَ بِهٖ سُبْحَانَ الَّذِىْ لَا يَنْبَغِى التَّسْبِيْحُ اِلَّا بِهٖ سُبْحَانَ ذِى الْفَضْلِ وَالنِّعَمِ سُبْحَانَ ذِى الْقُدْرَةِ وَالْكَرَمِ سُبْحَانَ الَّذِىْ اَحْصٰى كُلَّ شَىْءٍ بِعِلْمِهٖ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِّىْ نُوْرًا فِىْ قَلْبِىْ وَنُوْرًا فِىْ قَبْرِىْ وَنُوْرًا فِىْ سَمْعِىْ وَنُوْرًا فِىْ

بَصَرِىْ وَنُوْرًا فِىْ شَعْرِىْ وَنُوْرًا فِىْ بَشَرِىْ وَنُورًا فِى لَحْمِىْ وَنُوْرًا فِىْ دَمِىْ وَنُوًّا فِىْ عِظَامِىْ وَنُورًا مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ وَنُورًا فِى دَمِى وَنُورًا فِىْ عِظَامِىْ وَنُورًا مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ وَنُوْرًا مِنْ خَلْفِىْ وَنُورًا عَنْ يَمِيْنِىْ وَنُورًا عَنْ شِمَالِىْ وَنُورًا مِنْ فَوْقِىْ وَنُورًا مِنْ تَحْتِىْ اَللّٰهُمَّ زِدْنِىْ نُوْرًا وَاعْطِنِىْ نُورًا وَاجْعَلْ لِّىْ نُورًا ـ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে এমন রহমত প্রার্থনা করি, যদ্দ্বারা তুমি আমার অন্তরকে সৎপথ প্রদর্শন করবে। আমার দ্বিধাবিভক্ত বিষয়াদিকে সংহত করবে। আমার পেরেশানী দূর করবে, আমার মহব্বতকে ফিরিয়ে আনবে, আমার দ্বীন সংশোধন করবে, আমার অদৃশ্য বস্তুর হেফাযত করবে, আমার উপস্থিত বিষয়কে উচ্চ করবে, আমার আমল পবিত্র করবে, আমার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করবে, আমার অন্তরে সুমতি জাগাবে এবং সকল মন্দকাজ থেকে আমাকে রক্ষা করবে। আমাকে সত্যিকার ঈমান দান কর। এমন বিশ্বাস দান কর, যার পরে কোন কুফর নেই। এমন রহমত দান কর, যদ্দ্বারা আমি তোমার কাছে মৃত্যুর সময় সাফল্য প্রার্থনা করি, শহীদদের মর্তবা, ভাগ্যবানদের জীবন, শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য এবং পয়গম্বরগণের সাহচর্য প্রার্থনা করি। ইলাহী, আমি তোমার কাছে আমার অভাব পেশ করি, যদিও আমার কলাকৌশল দুর্বল এবং আমার আমল সামান্য। আমি তোমার রহমতের মুখাপেক্ষী। অতএব আমি তোমার কাছে সওয়াল করি হে শাসক, হে দুঃখ বিমোচনকারী, তুমি যেমন সমুদ্রসমূহ আলাদা রেখেছ, তেমনি আমাকে আলাদা রাখ দোযখের আযাব থেকে, ধ্বংসের আহ্বান থেকে এবং কবরের আযাব থেকে। হে আল্লাহ, যে কল্যাণের ওয়াদা তুমি কোন বান্দাকে দিয়েছ অথবা তুমি তোমার কোন সৃষ্টিকে যে কল্যাণ দান করবে, কিন্তু আমার উদ্যম আমল ও আশা সেই পর্যন্ত পৌঁছে না, আমি সেই কল্যাণের ব্যাপারেও তোমার কাছে আগ্রহ প্রকাশ করি এবং প্রার্থনা করি হে রাব্বুল আলামীন! ইলাহী, আমাদেরকে হেদায়াতকারী ও হেদায়াতপ্রাপ্ত

কর এবং পথভ্রষ্ট ও পথভ্রষ্টকারী করো না। তোমার শত্রুদের বিরুদ্ধে যোদ্ধা এবং তোমার ওলীদের সাথে সন্ধিকারী বানাও। আমরা যেন তোমার মহব্বতের কারণে মহব্বত করি সে ব্যক্তিকে, যে তোমার সৃষ্টির মধ্য থেকে তোমার আনুগত্য করে। আমরা যেন তোমার শত্রুতার কারণে শত্রুতা করি সে ব্যক্তির সাথে, যে তোমার বিরুদ্ধাচরণ করে। হে আল্লাহ, এটা দোয়া এবং কবুল করা তোমার কাজ। এটা চেষ্টা এবং ভরসা তোমারই উপর। আমরা আল্লাহর জন্যে এবং আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করব। গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার শক্তি নেই এবং এবাদত করার সাধ্য নেই; মহান ও সুউচ্চ আল্লাহর সাহায্য ছাড়া। হে মজবুত রশির (অর্থাৎ ধর্ম ও কোরআনের) এবং সঠিক বিষয়ের মালিক, তোমার কাছে সওয়াল করি শাস্তির দিনে নিরাপত্তা, অনন্ত দিনে জান্নাত, নৈকট্যশীলতা, রুকুকারী, সেজদাকারী ও অঙ্গীকার পূর্ণকারীদের সাথে। নিশ্চয় তুমি দয়ালু, প্রিয়। তুমি যা ইচ্ছা তা কর। পবিত্র সেই সত্তা, যিনি ইযযতের চাদর পরিধান করেছেন এবং তদ্দ্বারা মহান হয়েছেন। পবিত্র সেই সত্তা, যাকে ছাড়া কারও পবিত্রতা বর্ণনা করা সমীচীন নয়। কৃপা ও অনুগ্রহের মালিক পবিত্র। দান ও সামর্থ্যের মালিক পবিত্র। পবিত্র তিনি, যিনি আপন জ্ঞান দ্বারা সবকিছুকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছেন। হে আল্লাহ! দান কর আমার অন্তরে নূর, আমার কবরে নূর, আমার কর্ণে নূর, আমার চোখে নূর, আমার কেশে নূর, আমার ত্বকে নূর, আমার মাংসে নূর, আমার রক্তে নূর, আমার অস্থিতে নূর, আমার সম্মুখে নূর, আমার পশ্চাতে নূর, আমার ডানে নূর, আমার বামে নূর, আমার উপরে নূর এবং আমার নীচে নূর। হে আল্লাহ, আমার নূর বৃদ্ধি কর, আমাকে নূর দান কর এবং আমার জন্যে নূর কর।

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর দোয়া

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর দোয়া, যা রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে বলে দিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ হে আয়েশা! এই কলেমাগুলোর মধ্যে সকল প্রকার দোয়া রয়েছে। এগুলোর অর্থ পরিপূর্ণ। ইহকাল ও পরকালের জরুরী বিষয়াদি এবং সমস্ত প্রয়োজন এর অন্তর্ভুক্ত। অতএব, তুমি এগুলো অপরিহার্য করে নাও এবং পাঠ কর। কলেমাগুলো এই ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهٖ عَاجِلِهٖ وَاٰجِلِهٖ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ اَعْلَمْ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ عَاجِلِهٖ وَاٰجِلِهٖ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَالَمْ اَعْلَمْ اَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ وَاَسْئَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَسْتَعِيْذُكَ مِمَّا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَسْئَلُكَ مَا قَضَيْتَ لِىْ مِنْ اَمْرٍاَنْ تَجْعَلَ عَاقِبَتَهٗ رُشْدًا بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ ـ

অর্থাৎ, ইলাহী, আমি তোমার কাছে সম্পূর্ণ কল্যাণ প্রার্থনা করি বর্তমানের ও ভবিষ্যতের এবং আমি যা জানি ও যা জানি না। আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই সকল অনিষ্ট থেকে বর্তমানের ও ভবিষ্যতের এবং আমি যা জানি ও যা জানি না। আমি তোমার কাছে জান্নাত প্রার্থনা করি এবং এমন কথা ও কাজ প্রার্থনা করি, যা আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করে দেবে। আমি তোমার কাছে জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাই এবং এমন কথা ও কাজ থেকে আশ্রয় চাই, যা তোমার বান্দা ও রসূল মুহাম্মদ (সাঃ) প্রার্থনা করেছেন। আমি তোমার কাছে সেই বিষয় থেকে আশ্রয় চাই, যা থেকে আশ্রয় চেয়েছেন তোমার বান্দা ও রসূল মুহাম্মদ (সাঃ)। আমার প্রার্থনা, তুমি আমার জন্যে যে বিষয়ের ফয়সালা করেছ,

তার পরিণাম আমার জন্যে আপন কৃপাগুণে শুভ কর হে পরম দয়ালু।

হযরত ফাতেমা যাহরা (রাঃ)-এর দোয়া

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ হে ফাতেমা, আমার উপদেশ শুনতে তোমার কোন বাধা আছে কি? আমি বলছি– এই দোয়া কর ঃ

يَاحَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ لَا تَكِلْنِىْ اِلٰى نَفْسِىْ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَاصْلِحْ لِىْ شَانِىْ ـ

অর্থাৎ, "হে চিরজীবী, হে শক্তিধর, তোমার রহমতের ফরিয়াদ জানাই। আমাকে এক মুহূর্তের জন্যেও আমার নিজের কাছে সোপর্দ করো না এবং আমার সকল অবস্থা সংশোধন কর।"

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর দোয়া

রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাহাকে এভাবে দোয়া করতে বলেছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ وَاِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلِكَ وَمُوْسٰى نَبِيِّكَ وَعِيْسٰى كَلِمَتِكَ وَرُوْحِكَ وَبِكَلَامِ مُوْسٰى وَاِنْجِيْلِ عِيْسٰى وَزَبُوْرِ دَاوٗدَ وَفُرْقَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ وَبِكُلِّ وَحْيٍ اَوْ حَيْتَهٗ اَوْ قَضَاءٍ قَضَيْتَهٗ اَوْ سَائِلٍ اَعْطَيْتَهٗ اَوْ غَنِيٍّ اَغْنَيْتَهٗ اَوْ فَقِيْرٍ اَغْنَيْتَهٗ اَوْ ضَالٍّ هَدَيْتَهٗ وَاَسْئَلُكَ بِاِسْمِكَ الَّذِىْ اَنْزَلْتَهٗ عَلٰى مُوْسٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَسْئَلُكَ بِاِسْمِكَ الَّذِىْ تَثْبُتُ بِهٖ اَرْزَاقُ الْعِبَادِ وَاَسْئَلُكَ بِاِسْمِكَ الَّذِىْ وَضَعْتَهٗ عَلَى الْاَرْضِ فَاسْتَقَرَّتْ وَاَسْئَلُكَ بِاِسْمِكَ الَّذِىْ وَضَعْتَهٗ عَلَى السَّمَاوَاتِ فَاسْتَقَلَّتْ وَاَسْئَلُكَ بِاِسْمِكَ الَّذِىْ وَضَعْتَهٗ عَلَى الْجِبَالِ فَرَسَتْ وَاَسْئَلُكَ بِاِسْمِكَ الَّذِىْ اِسْتَقَلَّ بِهٖ

عَرْشِكَ وَاَسْئَلُكَ بِاِسْمِكَ الطُّهْرِ الطَّاهِرِ الْاَحَدِ الصَّمَدِ الْوِتْرِ الْمُنَزَّلِ فِيْ كِتَابِكَ مِنْ لَدُنْكَ مِنَ الْفَوْزِ الْمُبِيْنِ وَاَسْئَلُكَ بِاِسْمِكَ الَّذِيْ وَضَعْتَهُ عَلَى النَّهَارِ فَاسْتَنَارَ وَعَلَى اللَّيْلِ فَاَظْلَمَ وَبِعَظْمَتِكَ وَكِبْرِيَائِكَ وَبِنُوْرِ وَجْهِكَ الْكَرِيْمِ اَنْ تَرْزُقَنِيْ الْقُرْاٰنَ وَالْعِلْمَ وَتَخْلُطَهُ بِلَحْمِيْ وَدَمِيْ وَسَمْعِيْ وَبَصَرِيْ وَتَسْتَعْمِلَ بِجَسَدِيْ بِحَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ فَاِنَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ـ

অর্থাৎ, ইলাহী, আমি তোমার কাছে সওয়াল করি তোমার নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মাধ্যমে, তোমার খলীল ইবরাহীম (আঃ)-এর মাধ্যমে, তোমার সাথে কথোপকথনকারী মূসা (আঃ)-এর মাধমে, তোমার কলেমা ঈসা (আঃ)-এর মাধ্যমে, মূসা (আঃ)-এর তওরাতের মাধ্যমে, ঈসা (আঃ)-এর ইঞ্জীলের মাধ্যমে, দাউদ (আঃ)-এর যবুরের মাধ্যমে, মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কোরআনের মাধ্যমে, তোমার প্রেরিত প্রত্যেক ওহীর মাধ্যমে, তোমার জারিকৃত প্রত্যেক ফয়সালার মাধ্যমে, যে সওয়ালকারীকে তুমি দান করেছ, তার মাধ্যমে, যে ধনীকে তুমি খুশী করেছ তার মাধ্যমে, যে ফকীরকে তুমি ধনী করেছ, তার মাধ্যমে এবং যে পথভ্রষ্টকে তুমি হেদায়েত দান করেছ, তার মাধ্যমে। আমি সওয়াল করি তোমার সেই নামের ওসিলায়, যা তুমি মূসা (আঃ)-এর প্রতি নাযিল করেছ। আমি সওয়াল করি সেই নামের ওসিলায়, যদ্দ্বারা বান্দার রিযিক কায়েম থাকে। আমি সওয়াল করি সেই নামের ওসিলায়, যাকে তুমি পৃথিবীর উপর রেখেছ, ফলে সে স্থির হয়ে গেছে। আমি সওয়াল করি সেই নামের ওছিলায়, যাকে তুমি আকাশমন্ডলীর উপর স্থাপন করেছ, ফলে আকাশ উঁচু হয়ে গেছে। আমি সওয়াল করি সেই নামের ওসিলায়, যাকে তুমি পর্বতমালার উপর স্থাপন করেছ, ফলে পর্বতমালা অটল হয়ে গেছে। আমি সওয়াল করি সেই নামের ওসিলায়, যদ্দ্বারা তোমার আরশ

স্থির হয়ে গেছে। আমি সওয়াল করি তোমার পাক-পবিত্র, একক, বিজোড় নামের ওসিলায়, যা তোমার তরফ থেকে তোমার কিতাবে অবতীর্ণ হয়েছে। আমি তোমার নিকট তোমার নামে দোয়া করি যা দিবসের উপর স্থাপন করেছ বলে তা আলো দেয় এবং রাতের উপর স্থাপন করেছ বলে তা অন্ধকার হয়। তোমার সম্মানে, সাহায্যে, তোমার গৌরবের সাহায্যে, তোমার সম্মানিত মুখমণ্ডলের সাহায্যে দোয়া করি যেন তুমি আমাকে কুরআনের রিযিক ও অর্থ দান কর এবং আমার মাংস, রক্ত, কর্ণ ও চক্ষুর সহিত তা মিশ্রিত কর এবং তা দ্বারা আমার শরীরকে কার্যে নিযুক্ত কর তোমার শক্তি ও সামর্থ্যের সাহায্যে। কেননা, তোমার শক্তি সামর্থ্য ব্যতীত অন্য কোন শক্তি সামর্থ্য নেই হে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

হযরত বোরায়দা আসলামী (রাঃ)-কে শেখানো দোয়া

হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বোরায়দা (রাঃ)-কে বলেছিলেন, হে বোরায়দা! আমি কি তোমাকে কতগুলো কলেমা শেখাব না? আল্লাহ্ যার মঙ্গল ইচ্ছা করেন তাকে তিনি এগুলো শিক্ষা দেন এবং সে কখনও এগুলো ভুলে যায় না। হযরত বোরায়দা বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ! অবশ্যই তা আপনি আমাকে শিক্ষা দিন। তখন হুযুর (সাঃ) বললেন, তুমি বল, হে মাবুদ! আমি দুর্বল, তোমার সন্তুষ্টি আমার দুর্বলতাকে যেন অবরুদ্ধ করে, আমার ঝুটি ধরে যেন আমাকে মঙ্গলের দিকে নিয়ে যায় এবং ইসলামকে আমার সন্তুষ্টির শেষ সীমা করে। হে মাবুদ! আমি দুর্বল, আমাকে রক্ষা কর। আমি অপমানিত, আমাকে সম্মানিত কর। আমি দরিদ্র আমাকে ধনবান কর। হে সর্বশ্রেষ্ঠ করুণাময়!

হযরত কাবিসা বিন মোখরেক (রাঃ)-কে শেখানো দোয়া

যখন কাবিসা (রাঃ) হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-কে বললেন, আমাকে এমন কলেমা শিখিয়ে দিন যা আল্লাহর সাহায্যে আমার উপকারে আসে, আমি বৃদ্ধ হয়েছি, যা পূর্বে করতে সমর্থ ছিলাম এখন তার অনেক কিছুতেই অসমর্থ হয়ে পড়েছি। তখন হুযুর (সাঃ) বললেন, যখন তুমি ফজরের নামায পড়বে, নামাযের বাদে তিন বার পড়বে– সোবহানাল্লাহি

ওয়া বিহামদিহী সোবহানাল্লাহিল আযীম লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। যখন তুমি এই দোয়া পড়বে– দুশ্চিন্তা, কষ্ট, ব্যাধি বিশেষতঃ যক্ষ্মা রোগ ইত্যাদি থেকে তুমি নিরাপদ থাকবে। এ দোয়াটি তোমার দুনিয়া সম্পর্কিত ফায়দায় আসবে। আর যদি তুমি পাঠ কর "আল্লাহুম্মাহদিনী মিন ইন্দিকা ওয়া আফদি আলাইয়্যা মিন ফাদলিকা ওয়ানশুর আলাইয়্যা মিঁর রাহমাতিকা ওয়ানযিল আলাইয়্যা মিন বারাকাতিকা অর্থাৎ হে মাবুদ! তোমার নিকট থেকে আমাকে হেদায়াত দাও। তোমার অনুগ্রহ থেকে আমাকে অনুগ্রহ কর। তোমার রহমত থেকে আমাকে রহমত দান কর। তোমার বরকত থেকে আমাকে বরকত দান কর। অতঃপর তিনি বললেন, শুনে রাখ! যখন কোন বান্দা এভাবে এ দোয়াটি পড়বে তার জন্য রোজ কেয়ামতে চারটি দরজা খুলে দেয়া হবে। যে কোন দরজা দিয়ে সে মঞ্জিলে মকসূদে প্রবেশ করতে পারবে। হুযুর (সাঃ) আরও বললেন, এ দোয়া আমার আখেরাত সম্বন্ধে উপকারে আসবে।

হযরত আবু দারদা (রাঃ)-কে শেখানো দোয়া

হযরত আবূ দারদা (রাঃ)-কে বলা হল, তোমার ঘর উড়ে গেছে (তাঁর মহল্লায় আগুন লেগেছিল)। তিনি বললেন, তেমন ইচ্ছা আল্লাহর হয়নি। তাঁকে কথাটি তিন বার বলা হল এবং তিনিও তিন বারই বললেন, তেমন ইচ্ছা আল্লাহর হয়নি। তার পর তাঁর নিকট একজন লোক এসে বলল, হে আবু দারদা! আগুন আপনার গৃহের নিকট এসে আপনা থেকে নিভে গেছে। তিনি বললেন, আমি তা পূর্বেই জেনে গেছি। তখন তাঁকে বলা হল, আমরা জানি না তোমার কোন্ কথা অধিক আশ্চর্যজনক। তিনি বললেন, আমি হুযুর (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি এই কলেমা রাতে বা দিনে পাঠ করে, কোন কিছুই তার অনিষ্ট করে না। আমি সে কলেমাটিই পাঠ করেছি। যথা ঃ হে মাবুদ! তুমি আমার প্রভু। তুমি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। আমি তোমার উপর ভরসা করি। তুমি সম্মানিত আরশের মালিক। আল্লাহর শক্তি সামর্থ্য ব্যতীত অন্যের কোন শক্তি সামর্থ্য নেই। আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাই হয়। আর যা ইচ্ছা করেন না

তা হয় না। জেনে রাখ, আল্লাহ সমস্ত জিনিসের উপর শক্তিশালী এবং তাঁর জ্ঞান সমস্ত বস্তুতে ব্যাপ্ত। হে মাবুদ! আমার নফসের মন্দ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই এবং প্রত্যেক প্রাণীর মন্দ হতে, যাদের ঝুটি তোমার হাতের মুঠোয়। নিশ্চয় আমার প্রভু সরল ও সত্য পথে অধিষ্ঠিত। আরবী ভাষায় দোয়াটি এরূপ ঃ আল্লাহুম্মা আন্তা রাব্বী লা ইলাহা ইল্লা আন্তা আলাইকা তাওয়াক্কালতু ওয়া আন্তা রাব্বুল আরশিল আযীমি লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীমি। মা শাআল্লাহু কানা ওয়ামা লাম ইয়াশাউ লাম ইয়াকুন। ই'লামু আন্নাল্লাহা আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর ওয়া আন্নাল্লাহা ক্বাদ আহাতা বিকুল্লি শাইয়িন ইলমান ওয়া আহসা কুল্লা শাইয়িন আদাদা। আল্লাহুম্মা ইন্নী আঊযু বিকা মিন শাররি নাফসী ওয়া মিন শাররি কুল্লি দাব্বাতিন আন্তা আখিযুম বিনাসিয়াতিহা ইন্না রাব্বী আলা সিরাতিম্ মুস্তাক্বীম।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়া

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) প্রত্যহ ভোর বেলা আল্লাহর দরবারে এই দোয়া করতেন– হে মাবুদ! এ তোমার নতুন সৃষ্টি, তোমার আনুগত্যে একে উন্মুক্ত কর এবং তোমার ক্ষমা ও সন্তুষ্টিতে একে শেষ কর। এর মধ্যে তুমি আমার জন্য নেকী দাও এবং আমার নিকট থেকে তা কবুল কর। একে পবিত্র কর। আমার জন্য একে দুর্বল কর এবং এর মধ্যে যদি আমি কোন কিছু মন্দ করি তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল, করুণাময়, প্রেমময় ও সম্মানিত।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বলতেন, যে ব্যক্তি প্রত্যূষে আল্লাহর নিকট এরূপ দোয়া করে সে দিনের শোকর আদায় করে।

হযরত ঈসা (আঃ)-এর দোয়া

হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহর নিকট এরূপ দোয়া করতেন– হে মাবুদ! আমি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করছি। যা আমি অপছন্দ করি তা' দূর করতে আমি অসমর্থ এবং যা আমি আশা করি তা' সফল করতে আমি সমর্থ নই। চাবিকাঠি অন্যের হাতে। তবে আমলের বদৌলতে আমি

প্রত্যূষে জাগ্রত হই। আমা থেকে অধিক দরিদ্র আর কেউ নেই। হে মাবুদ! আমার শত্রু যেন আমার ব্যাপারে আনন্দিত না হয়। আমার বন্ধু যেন আমাকে মন্দ না জানে। আমার দ্বীনের ক্ষেত্রে আমাকে কোনরূপ বিপন্ন করো না। আমার পার্থিব চিন্তা বড় করো না। যারা আমার প্রতি দয়াশীল নয়, তুমি তাদের উপর আমাকে ন্যস্ত করো না হে চিরজীবী ও চিরস্থায়ী।

হযরত খিযির (আঃ)-এর দোয়া

বর্ণিত আছে, যে কোন মৌসুমে হযরত খিযির (আঃ) ও হযরত ইলইয়াস (আঃ) আল্লাহর নিকট এরূপ দোয়া করতেন– আল্লাহর নামে, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন। আল্লাহর শক্তি ব্যতীত আর কোন শক্তি নেই, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন। সমস্ত নেয়ামতই আল্লাহর নিকট থেকে আসে, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন। সমস্ত কল্যাণ আল্লাহর হাতে, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন। আল্লাহ ব্যতীত মন্দ দূর করার সাধ্য আর কারুরই নেই। যে ব্যক্তি প্রত্যূষে এই দোয়া তিন বার পাঠ করে, সে অগ্নিতে দগ্ধীভূত হওয়া থেকে, পানিতে নিমজ্জিত হওয়া থেকে এবং নিজে বা নিজের মাল-সামান অপহৃত হওয়া থেকে আল্লাহর ইচ্ছায় নিরাপদ থাকে।

হযরত মা'রূফ কারখী (রহঃ)-এর দোয়া

মুহাম্মদ বিন হাসান (রহঃ) বলেছেন, হযরত মা'রূফ কারখী (রহঃ) আমাকে বলেছিলেন, আমি কি তোমাকে দশটি কলেমা শিক্ষা দেব না? তার পাঁচটি অপার্থিব। যে ব্যক্তি ঐ কলেমাগুলোর দ্বারা আল্লাহর দরবারে দোয়া করবে, সে আল্লাহকে তার নিকট পাবে। আমি বললাম, আপনি আমাকে সেগুলো লেখে দিন। তিনি বললেন, না; বরং আমি তা তোমার নিকট বার বার বলছি, যেরূপ বকর বিন খানিস (রহঃ) আমার নিকট তা বার বার বলেছিলেন। যথা ঃ আমার দ্বীনের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আমার দুনিয়ার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। সম্মানিত আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট, যখন আমি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি। যে আমার বিরুদ্ধাচরণ করে তার জন্য শক্তিশালী ও ধৈর্যশীল আল্লাহই যথেষ্ট। কোন অমঙ্গল ও অকল্যাণ নিয়ে যে ব্যক্তি

আমার নিকট আসে, শক্তিশালী আল্লাহ্ই আমার জন্য যথেষ্ট। মৃত্যুকালে করুণাময় আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট। হিসাবের কালে সম্মানিত আল্লাহ্ আমার জন্য যথেষ্ট। আমলসমূহ মীযানে মাপার কালে দয়ালু আল্লাহ্ই আমার জন্য যথেষ্ট। পুলসেরাতের নিকট মহাশক্তিমান আল্লাহ্ই আমার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ্ ব্যতীত কোন্ দ্বিতীয় উপাস্য নেই। তিনিই আমার জন্য যথেষ্ট। তাঁর উপর আমি নির্ভর করি। তিনিই গৌরবান্বিত আরশের মালিক। যে ব্যক্তি প্রত্যহ সাত বার এ দোয়া পাঠ করে, তার আখেরাতের ব্যাপারে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। চাই সে ব্যক্তি সত্যবাদী হোক বা মিথ্যাবাদী।

হযরত ওতবা (রহঃ)-এর দোয়া

হযরত ওতবা (রহঃ)-এর মৃত্যুর পর কোন এক বুযুর্গ তাঁকে স্বপ্নে দেখলেন। তিনি ওতবা (রহঃ)-এর নিকট থেকে শুনলেন, আমি নিম্নোক্ত দোয়ার গুণে বেহেশতে প্রবেশ করেছি। যথা ঃ হে মাবুদ! হে পথপ্রদর্শক এবং গোনাহ্গারদের প্রতি দয়া প্রদর্শনকারী ও ভুলত্রুটি মার্জনাকারী! তুমি তোমার বিপদাপন্ন বান্দার প্রতি রহম কর, তোমার মুসলমান বান্দাদের প্রতি দয়া কর, আর আমাদেরকে সেই জীবিত লোকদের অন্তর্ভুক্ত কর, যাদের রিযিক অর্জিত হচ্ছে আর তুমি যাদের প্রতি নেয়ামত বিতরণ করেছ, অর্থাৎ নবী-রসূল, সিদ্দীক, শহীদ এবং অন্যান্য সৌভাগ্যশীলদের সাথে আমার এ দোয়া কবুল কর।

হযরত আদম (আঃ)-এর দোয়া

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, যখন আল্লাহ্ তাআলা হযরত আদম (আঃ)-এর তওবা কবুল করার ইচ্ছা করলেন, হযরত আদম (আঃ) তখন খানায়ে কা'বার চারদিকে সাত বার তওয়াফ করেন। তার পর দু'রাকাত নামায আদায় করলেন এবং বললেন, হে মাবুদ! তুমি আমার গুপ্ত ও প্রকাশ্য সব কিছুই অবগত। অতএব তুমি আমার ওযর কবুল কর। তুমি আমার আবশ্যকতা জান, অতএব আমার দোয়া মঞ্জুর কর। আমার মনের ভিতর গুপ্ত কি রয়েছে তা' তুমি অবগত। অতএব আমার গোনাহ ক্ষমা কর। হে মাবুদ! তোমার নিকট আমি ঈমানের দোয়া করছি, যেন আমার

মন সুসংবাদ লাভ করে। আমি সত্য একীন কামনা করছি, যে পর্যন্ত আমি জানতে পারি যে, যা আমার বিরুদ্ধে লিপিবদ্ধ তা' আমার উপর পতিত হবে না। যে সন্তুষ্টি আমাকে দেয়া হয়েছে তা' আমি চাই, হে সম্মান ও গৌরবের অধিকারী! তখন আল্লাহ তাআলা ওহী পাঠালেন, হে আদম! আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম। তোমার বংশধরদের মধ্যে যে এই দোয়ার দ্বারা আমার নিকট দোয়া করবে আমি তাকেও ক্ষমা করব। তার দুঃখ, চিন্তা ও দরিদ্রতা দূর করে দেব। তাকে প্রত্যেক ব্যবসায়ীর চেয়ে বেশী লাভ দেব। তাছাড়া পার্থিব সুখ-সমৃদ্ধি তার নিকট স্বেচ্ছায় ছুটে আসবে, যদিও সে সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে।

হযরত আলী (রাঃ)-এর দোয়া

হযরত আলী (রাঃ) নিম্নোক্ত কালাম শরীফ দ্বারা আল্লাহর নিকট দোয়া করতেন। হুযুর (সঃ) এরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক দিন নিজেই নিজের গৌরব প্রকাশ করে বলতে থাকেন, আমি আল্লাহ, বিশ্ব জগতের প্রভু। আমি আল্লাহ, আমি ব্যতীত অন্য উপাস্য নেই। আমি চিরজীবী ও চিরস্থায়ী। আমি আল্লাহ, আমার পিতা নেই, সন্তান নেই। আমি আল্লাহ, আমি ব্যতীত অন্য উপাস্য নেই। আমি ক্ষমাশীল, আমি আল্লাহ, আমি ব্যতীত অন্য উপাস্য নেই। আমি প্রত্যেক জিনিসের আদি সৃষ্টিকর্তা এবং সকল কিছুর আমারই নিকট প্রত্যাবর্তন। আমি মহাজ্ঞানী, মহাসম্মানিত, রহীম ও রহমান, বিচার দিনের মালিক, মঙ্গল ও অমঙ্গলের সৃষ্টিকর্তা, অদ্বিতীয়, একক অভাবশূন্য, যিনি স্ত্রী বা পুত্র গ্রহণ করেননি, যিনি বিজোড়, অদৃশ্য ও দৃশ্য বস্তু যার জ্ঞাত, যিনি পবিত্র, যিনি মহান মালিক, যিনি প্রশান্ত, যিনি মুমিন, যিনি মুহাইমিন, যিনি প্রবল প্রতাপান্বিত, গৌরবান্বিত, সৃষ্টিকর্তা, পরিবর্তনকারী, উচ্চ, ধ্বংসকারী, সহিষ্ণু ও ধৈর্যশীল, মহাসম্মানিত, প্রশংসা ও গৌরবের একচ্ছত্র অধিকারী, গুপ্ত ও প্রকাশ্য জিনিস সবিশেষ জ্ঞাত, শক্তিশালী, ক্ষমাশীল রিযিকদাতা। প্রত্যেকটি কলেমার পূর্বে তিনি বলেন, আমি আল্লাহ, আমি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই।

যে ব্যক্তি আল্লাহর উপরোক্ত গুণবাচক নামসমূহ উচ্চারণ করে আল্লাহর কাছে দোয়া করে সে যেন বলে, নিশ্চয়ই তুমি আল্লাহ, তুমি ব্যতীত উপাস্য নেই। যে ব্যক্তি এভাবে দোয়া পাঠ করে, তাকে সেজদাকারী এবং বিনয়ী লোকদের অন্তর্ভুক্ত বলে লিপিবদ্ধ করা হয়। তারা বেহেশতে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ), হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং হযরত মূসা (আঃ) ও অন্যান্য নবীদের নিকট অবস্থান করবে। তাদের জন্য দুনিয়া ও আসমানে এবাদতকারীদের সওয়াব লেখা হবে।

সোলায়মান তাইমী (রহঃ)-এর দোয়া

বর্ণিত রয়েছে, ইউনুস বিন আবিদ (রহঃ) রোম শহরে শাহাদাতপ্রাপ্ত এক ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, সোলায়মান তাইমী (রহঃ)-এর কোন্ কাজটি উত্তম দেখেছ? তিনি বললেন, আমি একস্থানে তাঁর আল্লাহর প্রশংসা দেখেছি। তা' এরূপ ঃ

"সোবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি অ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম।"

অর্থাৎ আমি আল্লাহর প্রশংসা স্তুতি করছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহ ব্যতীত কেউ উপাস্য নেই। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠ ও মহান আল্লাহ ব্যতীত কোনই শক্তি সামর্থ্য নেই।

অর্থাৎ অধিক সওয়াবের দিনকে, নতুন সুপ্রভাতকে, আমলনামা লেখককে এবং তাদের সাক্ষীদেরকে মারহাবা। আমাদের এদিন ঈদের দিন। লেখ আমরা যা বলি। আল্লাহর নামে শুরু, যিনি প্রশংসিত, পবিত্র, উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, মহব্বতকারী, মখলুকের ব্যাপারে যা ইচ্ছা তাই করেন। আমি সকালে গত্রোত্থান করেছি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী হয়ে, তাঁর সাক্ষাতের সত্যায়নকারী হয়ে, তাঁর প্রমাণের স্বীকৃতিদাতা হয়ে, গোনাহ থেকে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে, আল্লাহর পালনকর্তৃত্বের প্রতি নতশির হয়ে, আল্লাহ ছাড়া অপরের উপাস্য হওয়া অস্বীকারকারী হয়ে, আল্লাহর প্রতি ফকীর হয়ে, আল্লাহর উপর ভরসাকারী হয়ে এবং আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী

হয়ে। আমি আল্লাহকে, তাঁর ফেরেশতাগণকে, তাঁর নবী-রসূলগণকে, আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণকে, আল্লাহর অতীত ও ভবিষ্যৎ সৃষ্টিসমূহকে এ বিষয়ে সাক্ষী করছি যে, তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর বান্দা ও রসূল। জান্নাত সত্য। জাহান্নাম সত্য। হাউজ সত্য। শাফায়াত সত্য। মুনকার-নকীর সত্য। তোমার ওয়াদা সত্য। তোমার সাক্ষাৎ সত্য। কেয়ামত সংঘটিত হবে। এতে কোন সন্দেহ নেই। কবরে যারা আছে আল্লাহ তাদেরকে পুনরুত্থিত করবেন। এ সাক্ষ্যের উপরই আমি জীবিত রয়েছি এবং এরই উপর মৃত্যু বরণ করব। এরই উপর ইনশাআল্লাহ পুনরুত্থিত হব। হে আল্লাহ, তুমি আমার প্রভু। তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমার গোলাম। আমি সাধ্যমত তোমার ওয়াদার উপর রয়েছি। হে আল্লাহ আমি আশ্রয়ের দোয়া করি তোমার কাছে তোমার সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে এবং প্রত্যেক অনিষ্টকর বস্তুর অনিষ্ট থেকে। ইলাহী, আমি নিজের উপর জুলুম করেছি। অতএব, আমার গোনাহসমূহ ক্ষমা কর। তুমি ব্যতীত কেউ গোনাহ ক্ষমা করবে না। আমাকে উত্তম চরিত্রের পথ দেখাও। তুমি ব্যতীত কেউ উত্তম চরিত্রের পথ দেখায় না। আমা থেকে কুচরিত্র দূর করে দাও। তুমি ব্যতীত কেউ কুচরিত্র দূর করে না। আমি হাযির আছি এবং আনুগত্যে তৎপর রয়েছি। সকল কল্যাণ তোমার হাতে। আমি তোমার তরফ থেকে এবং তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করি। তোমার কাছে ক্ষমা চাই। তোমার দিকে তওবা করি। ইলাহী, আমি তোমার প্রেরিত রসূলগণের প্রতি ঈমান রাখি। ইলাহী, আমি তোমার অবতীর্ণ কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস রাখি। আল্লাহ নবী উম্মী মুহাম্মদের উপর রহমত নাযিল করুন এবং তাঁর বংশধরের প্রতি। তাদের প্রতি অনেক সালাম। আমার কালামের শেষে ও শুরুতে। সকল নবী রসূলের উপরও রহমত নাযিল করুন। আমীন, হে বিশ্ব পালক।

ইলাহী, আমাদেরকে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাউজে উপনীত কর এবং তাঁর পানপাত্র দ্বারা তৃপ্তিদায়ক ও সহজসেব্য শরবত পান করাও, এর পর

যাতে আমরা কখনও পিপাসিত না হই। আমাদেরকে তাঁর দলে উত্থিত কর এমতাবস্থায়, যেন আমরা লাঞ্ছিত না হই, অঙ্গীকার ভঙ্গকারী না হই, সন্দেহকারী না হই, ফেতনায় পতিত না হই, গজবে পতিত না হই এবং পথভ্রষ্ট না হই। ইলাহী, আমাকে দুনিয়ার ফেতনা থেকে বাঁচাও। তোমার প্রিয় ও পছন্দনীয় বিষয়ের তওফীক দাও। আমার সকল অবস্থা সংশোধন কর। ইহকাল পরকালে আমাকে মজবুত উক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত রাখ। আমি জালেম হলেও আমাকে বিভ্রান্ত করো না। পবিত্র, পবিত্র হে সুউচ্চ, হে মহান, হে স্রষ্টা, হে দয়ালু, হে প্রতাপান্বিত। তিনি পবিত্র, যাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে পর্বতমালা ও তার প্রতিধ্বনি। তিনি পবিত্র, যাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করে সমুদ্র তার তরঙ্গমালাসহ। পবিত্র তিনি, যাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করে মৎস্যকুল আপন ভাষায়। পবিত্র তিনি, যাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে সপ্ত আকাশ ও সপ্ত পৃথিবী এবং তাদের ভিতরকার ও উপরকার সবকিছু। পবিত্র তিনি, যাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করে তার সৃষ্টির সকল বস্তু! তুমি একক। তোমার কোন শরীক নেই। তুমি জীবন দাও। তুমিই মরণ দাও। তুমি চিরজীবী। তোমার মৃত্যু নেই। তোমার হাতেই কল্যাণ। তুমি সর্ববিষয়োপরি ক্ষমতাবান।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত দোয়া

এসব দোয়া আবু তালেব মক্কী, ইবনে খোযায়মা ও ইবনে মোনযেরের সংগ্রহ গ্রন্থ থেকে নির্বাচিত হয়েছে। যারা আখেরাত কামনা করে, সকালে উঠার সময় তাদের কিছু ওযীফা থাকা মোস্তাহাব। ওযিফা অধ্যায়ে এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হবে। রসূলে করীম (সাঃ) যে সকল দোয়া করেছেন, সেগুলোতে তাঁর অনুসরণ করতে চাইলে নামাযের পর দোয়ার শুরুতে এরূপ পাঠ করা উচিত-

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلِيِّ الْاَعْلَى الْوَهَّابِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ

অর্থাৎ, পবিত্র, আমার সুউচ্চ দাতা প্রভু। তিনি ব্যতীত কোন মাবুদ

নেই। তিনি একক। তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁর এবং প্রশংসা তাঁর। তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। এর পর তিন বার বলবে ঃ

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا ـ

অর্থাৎ, আল্লাহ পালনকর্তা– এতে আমি সন্তুষ্ট। ইসলাম ধর্ম, এতে আমি সন্তুষ্ট এবং মুহাম্মদ (সাঃ) নবী– এতে আমি সন্তুষ্ট। আরও বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِكَهُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَشَرِّ الشَّيْطٰنِ وَشِرْكِهٖ ـ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ্, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী, প্রত্যেক বস্তুর পালনকর্তা ও মালিক, আমি সাক্ষ্য দেই যে, তুমি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই নিজ প্রবৃত্তির অনিষ্ট, শয়তানের অনিষ্ট ও তার শেরক থেকে। আরও বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِيْ دِيْنِيْ وَدُنْيَايَ وَاَهْلِيْ وَمَالِيْ ـ اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِيْ وَاٰمِنْ رَوْعَاتِيْ وَاَقِلْنِيْ عَثَرَاتِيْ وَاحْفِظْنِيْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِيْ وَعَنْ يَمِيْنِيْ وَعَنْ شِمَالِيْ وَمِنْ فَوْقِيْ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اُغْتَالَ مِنْ تَحْتِيْ ـ اَللّٰهُمَّ لَاتُؤْمِنَّ مَكْرَكَ وَلَاتُوَلِّنِيْ غَيْرَكَ وَلَاتَنْزِعْ عَنِّيْ سَتْرَكَ وَلَا تُنْسِنِيْ ذِكْرَكَ وَلَا تَجْعَلْنِيْ مِنَ الْغٰفِلِيْنَ ـ

অর্থাৎ হে আল্লাহ্ আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি ক্ষমা এবং আমার ধর্মীয়, পার্থিব, আর্থিক ও পারিবারিক নিরাপত্তা। হে আল্লাহ, গোপন কর আমার দোষ, অভয় দান কর আমার ভয়ে, ক্ষমা কর আমার ত্রুটি বিচ্যুতি এবং হেফাযত কর আমার সম্মুখ, পেছন, ডান, বাম এবং

উপর দিক থেকে। আর আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি নীচের দিক থেকে। অতর্কিতে ধ্বংস হওয়া থেকে। হে আল্লাহ, আমাকে তোমার আযাব থেকে নির্ভীক করো না এবং তোমাকে ছাড়া অন্যের কাছে সোপর্দ করো না। আমার উপর থেকে তোমার পর্দা হটিয়ে নিও না। আমাকে তোমার স্মরণ বিস্মৃত হতে দিয়ো না এবং আমাকে গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত করো না। এর পর তিন বার সাইয়্যেদুল এস্তেগফার পাঠ করবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتَ اَبُوْءُ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَاِنَّهُ لَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ

(এর অনুবাদ পূর্বে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।) অতঃপর তিন বার এ দোয়া পাঠ করবে ঃ اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ بَدَنِىْ وَعَافِنِىْ فِىْ سَمْعِىْ وَعَافِنِىْ فِىْ بَصَرِىْ ইলাহী, আমাকে আমার দেহে নিরাপত্তা দাও, কর্ণে নিরাপত্তা দাও এবং চোখে নিরাপত্তা দাও। তুমি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। আরও বলবে ঃ

اللهم انى اسئلك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر الى وجهك وشوقا الى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة واعوذ بك ان اظلم او يظلم او اعتدى او يعتدى على او اكسب خطيئة او ذنبا لا تغفر اللهم انى اسئلك الثبات فى الامر والعزيمة على الرشد واسئلك شكر نعمتك وحسن عبادتك واسئلك قلبا سليما ولسانا صادقا وعملا متقبلا واسئلك من خير ما تعلم واعوذ بك من شر ما

تعلم واستغفرك بما تعلم فانك تعلم ولا اعلم وانت علام
الغيوب ـ اللهم اغفرلى ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما
اعلنت فانك انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شئ قدير
وعلى كل غيب شهيد ـ اللهم انى اسئلك ايمانا لايرتد
ونعيما لاينفد وقرة عين الابد ومرافقة نبيك محمد صلى
الله عليه وسلم فى اعلى جنة الخلد ـ اللهم انى اسئلك
الطيبت وفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين
واسئلك حبك وحب من احبك وحب كل عمل يقرب الى حبك
وان تتوب على وتغفر لى وترحمنى واذا اردت بقوم فتنة
فاقبضنى اليك من غير مفتون ـ اللهم بعلمك الغيب وقد
ربك على الخلق احيني ما كانت الحيوة خيرا لى وتوفنى اذا
كانت الوفاة خيرا لى واسئلك خشيتك فى الغيب والشهادة
وكلمة العدل فى الرضاء والغضب والقصد فى الغنى والفقر
ولذة النظر الى وجهك والشوق الى لقائك واعوذبك من ضراء
مضرة وفتنة مضلة ـ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به
بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن
اليقين ما تحلون به علينا مصائب الدنيا ـ اللهم املا
وجوهنا منك حياء وقلوبنا منك فرقا واسكن فى نفوسنا من
عظمتك ما تذلل به جوارحنا لخدمتك واجعلك ـ اللهم احب
الينا ممن سواك واجعلنا اخشى لك ممن سواك ـ اللهم اجعل

اول يومنا هذا صلاحا واوسطه فلاحا واخره نجاحا ـ اللهم اجعل
اوله رحمة واوسطه نعمة واخره مكرمة مغفرة الحمد لله الذى
تواضع كل شئ لعظمته وذل كل شئ لعزته وخضع كل شئ
ملته واستسلم كل شئ لقدرته والحمد لله الذى سكن كل
شئ لهيبته واظهر كل شئ بحكمة وتصاغر كل شئ
لكبريائه ـ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وازواج
محمد وذريته وبارك على محمد وعلى اله وازواجه وذريته
كما باركت على ابراهيم فى العلمين ـ انك حميد مجيد ـ
اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك النبى الامى
رسولك الامين واعطه المقام المحمود الذى وعدته يوم الدين
ـ اللهم اجعلنا من اوليائك المتقين وحزبك المفلحين
وعبادك الصالحين واستعملنا لمرضاتك عنا ووفقنا
لمحابك مناوصرفنا بحسن اختيارك لنا نسئلك جوامع
الخير وفواتحه وخواتمه ونعوذ بك من جوامع الشر وفواتحه
وخواتمه ـ اللهم بقدرتك على تب على انك انت التواب
الرحيم وبحلمك عنى اعف عنى انك انت الغفار الحليم
وبعلمك بى ارفق بى انك انت ارحم الراحمين وبملكك لى
ملكنى نفسى ولا تسلطها على انك انت الملك الجبار
سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت عملت سوء وظلمت
نفسى فاغفرلى ذنبى انك انت ربى انه لايغفر الذنوب الا انت

اللهم الهمني رشدى وقني شر نفسي اللهم ارزقني حلالا لا تعاقبني عليه وقنعني بما رزقتيني استعملني به صالحا تقبله مني اللهم اني اسئلك العفو والعافية وحسن اليقين والمعافاة في الدنيا والاخرة يا من لاتضره الذنوب ولا تنفعه المغفرة هب لي ما لايضرك واعطني ما لا ينقصك ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين انت ولي في الدنيا والاخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين انت ولينا فاغفرلنا وارحمنا وانت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الاخرة ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا ولا تجعلنا فتنة للقوم الظلمين ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفرلنا ربنا انك انت العزيز الحكيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكفرين ربنا اغفرلنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤف رحيم ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار - ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد - ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا

تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولنا فانصرنا على القوم الكفرين - رب اغفرلى ولوالدى وارحمهما كما ربينى صغيرا - واغفر للمؤمنين والمؤمنت والمسلمين والمسلمت والاحياء منهم والاموات رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وانت الاعز الاكرم وانت خير الراحمين وخير الغافرين انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا -

অর্থাৎ, ইলাহী, আমি তোমার কাছে দোয়া করি ফয়সালার পর তোমার সন্তুষ্টি, মৃত্যুর পর শীতল জীবন, তোমার পানে দৃষ্টিপাত করার আনন্দ এবং তোমার দীদারের আগ্রহ কোন ক্ষতিকর বস্তুর ক্ষতি ছাড়াই ও কোন বিভ্রান্তকারীর ফেতনা ছাড়াই। আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই এ বিষয় থেকে যে, আমি কারও উপর জুলুম করি অথবা কেউ আমার উপর জুলুম করুক অথবা আমি সীমালঙ্ঘন করি কিংবা আমার উপর সীমালঙ্ঘন করা হোক অথবা আমি এমন কোন অন্যায় ও গোনাহ করি, যা তুমি ক্ষমা করবে না। হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি কাজে কর্মে দৃঢ়তা এবং সৎকর্মের উপর অটলতা। আমি আরও প্রার্থনা করি তোমার নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা এবং তোমার এবাদতে সুষ্ঠুতা। আমি আরও চাই সুস্থ অন্তর, সরল চরিত্র, সত্যবাদী জিহ্বা ও গ্রহণযোগ্য আমল। আমি চাই তোমার জানা বিষয়সমূহের কল্যাণ। আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি তোমার জানা বিষয়সমূহের অনিষ্ট থেকে। তোমার জানা গোনাহ থেকে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করি। কেননা, তুমি জান, আমি জানি না। তুমি সকল অদৃশ্য বিষয় অবগত। হে আল্লাহ, ক্ষমা কর আমার

আগের গোনাহ, আমার পেছনের গোনাহ, আমার গোপন গোনাহ, আমার প্রকাশ্য গোনাহ। নিশ্চয় তুমিই আপন রহমতে অগ্রগামী কর এবং তুমিই পশ্চাৎগামী কর। তুমি সবকিছুর উপর ক্ষমতা রাখ এবং সকল অদৃশ্য বিষয় প্রত্যক্ষ কর। হে আল্লাহ, আমি এমন ঈমান চাই, যা টলে না, এমন নেয়ামত চাই, যা খতম হয় না, আর চাই চোখের চিরস্থায়ী শীতলতা এবং জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরে তোমার নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সঙ্গ। হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে পবিত্র বস্তু চাই। আর চাই সৎকর্মের সম্পাদন ও অসৎ কর্মের বর্জন এবং ফকীর মিসকীনের ভালবাসা। আমি চাই তোমার মহব্বত, তোমাকে যারা মহব্বত করে, তাদের মহব্বত, এমন প্রত্যেক আমলের মহব্বত, যা তোমার মহব্বতের নিকটবর্তী করে। আরও চাই, তুমি আমার তওবা কবুল কর, আমার প্রতি রহম কর, আমাকে ক্ষমা কর এবং যখন তুমি কোন সম্প্রদায়কে ফেতনায় পতিত করতে চাও, তখন আমাকে ফেতনায় না ফেলে নিজের দিকে তুলে নাও। হে আল্লাহ, তোমার অদৃশ্য বস্তুর জ্ঞান দ্বারা এবং তোমার কুদরত দ্বারা আমাকে ততদিন জীবিত রাখ, যতদিন জীবিত থাকা আমার জন্যে কল্যাণকর হয় এবং আমাকে তখন মৃত্যু দাও, যখন মৃত্যু আমার জন্যে কল্যাণকর হয়। আমি যেন দেখে ও না দেখে তোমাকে ভয় করি, সন্তুষ্টি ও ক্রোধের সময় ন্যায় কথা বলি, দারিদ্র্যে ও ধনাঢ্যতায় সোজা পথে চলি, তোমার দিকে চেয়ে আনন্দ অনুভব করি এবং তোমার দীদারের প্রতি আগ্রহান্বিত থাকি। আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই ক্ষতিকর বস্তুর ক্ষতি থেকে এবং বিভ্রান্তকারী ফেতনা থেকে। হে আল্লাহ, আমাদেরকে ঈমানের সাজে সজ্জিত কর এবং হেদায়াতকারী ও হেদায়াতপ্রাপ্ত বানাও। হে আল্লাহ, তুমি আমাদেরকে তোমার এতটুকু ভয় নসীব কর যা আমাদের মধ্যে ও তোমার অবাধ্যতার মধ্যে আড়াল হয়ে যায়, এতটুকু আনুগত্য দান কর, যা দ্বারা তুমি আমাদেরকে জান্নাতে পৌঁছাও এবং এতটুকু বিশ্বাস দাও, যার ফলে দুনিয়ার বিপদাপদ সহ্য করা সহজ হয়ে যায়। ইলাহী, আমাদের মুখমণ্ডল তোমার লজ্জায় এবং আমাদের অন্তর তোমার ভয়ে পূর্ণ করে দাও। আমাদের মনে তোমার এমন মাহাত্ম্য সঞ্চার কর,

যার ফলে আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তোমার খেদমতে নত হয়ে যায়। হে আল্লাহ, তোমাকে আমাদের কাছে অন্য সবকিছু থেকে প্রিয়তম কর। আমরা যেন অন্য সবকিছুর চেয়ে তোমাকেই অধিক ভয় করি। হে আল্লাহ, এদিনের শুরু ভাগকে কল্যাণ, মধ্যভাগকে সাফল্য এবং শেষ ভাগকে নাজাতে পরিণত করে দাও। হে আল্লাহ, এর শুরু ভাগকে কর রহম, মধ্যভাগকে নেয়ামত এবং শেষ ভাগকে দান ও মাগফেরাত। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যাঁর মাহাত্ম্যের সামনে প্রত্যেক বস্তু অবনত, যাঁর ইয্যতের সামনে প্রত্যেক বস্তু নম্র, যাঁর রাজত্বের সামনে প্রত্যেক বস্তু অক্ষম এবং যাঁর কুদরতের সামনে প্রত্যেক বস্তু অনুগত। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যাঁর ভয়ে সবকিছু স্থির হয়ে আছে, যিনি প্রত্যেক বস্তু প্রজ্ঞা সহকারে প্রকাশ করেছেন এবং যার বড়ত্বের সামনে সবকিছু ক্ষুদ্র। হে আল্লাহ, রহমত প্রেরণ কর মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি, তাঁর বংশধরের প্রতি, তাঁর পত্নীগণের প্রতি এবং তাঁর সন্তান-সন্ততির প্রতি এবং বরকত দাও মুহাম্মদ (সাঃ)-কে, তাঁর বংশধরকে, তাঁর পত্নীগণকে এবং তাঁর সন্তান-সন্ততিকে; যেমন তুমি বরকত দিয়েছ ইবরাহীমকে সারা বিশ্বে। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত, পবিত্র। ইলাহী, রহম প্রেরণ কর তোমার বান্দা, উম্মী নবী ও বিশ্বস্ত রসূল মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি এবং তাঁকে দাও প্রশংসিত স্থান কেয়ামতের দিন, যার ওয়াদা তুমি করেছ। হে আল্লাহ, আমাদেরকে তোমার সাবধানী ওলীদের সফলকাম দলের ও সৎকর্মপরায়ণ লোকদের অন্তর্ভুক্ত কর এবং আমাদেরকে এমন কাজে নিয়োজিত করে দাও যাতে তুমি সন্তুষ্ট থাক। আমাদেরকে এমন বিষয়ের তওফীক দাও, যা তোমার প্রিয়। আমাদেরকে ভালরূপে পছন্দ করে ফেরাও। আমরা তোমার কাছে চাই পূর্ণ কল্যাণ, তার শুরু ও পরিণতি। আমরা তোমার কাছে আশ্রয় চাই পূর্ণ অনিষ্ট থেকে, তার শুরু ও পরিণতি থেকে। হে আল্লাহ, তুমি আমার উপর সক্ষম বিধায় আমাকে তওবার তওফীক দান কর, নিশ্চয় তুমি তওবা কবুলকারী, দয়ালু। তুমি আমার প্রতি সহনশীল বিধায় আমাকে মার্জনা কর। নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল, সহনশীল। তুমি আমাকে জান বিধায় আমার সাথে নম্র ব্যবহার কর। নিশ্চয় তুমি পরম

দয়ালু। তুমি আমার মালিক বিধায় আমাকে আমার নিজের মালিক কর এবং আমার নফসকে আমার উপর চাপিয়ে দিয়ো না। নিশ্চয় তুমি প্রতাপশালী, শাহানশাহ্। হে আল্লাহ, আমি তোমার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করি। তুমি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। আমি মন্দ কর্ম করেছি এবং নিজের উপর জুলম করেছি। অতএব আমার গোনাহ মাফ কর। নিশ্চয় তুমি আমার পালনকর্তা। তুমি ব্যতীত কেউ গোনাহ মাফ করার নেই। হে আল্লাহ, আমাকে সৎপথ প্রদর্শন কর এবং নফসের অনিষ্ট থেকে রক্ষা কর। ইলাহী, আমাকে হালাল রিযিক দান কর, যার কারণে আমাকে শাস্তি দেবে না এবং তোমার দেয়া রিযিকের উপর আমাকে সন্তুষ্ট রাখ। এর মাধ্যমে আমাকে তোমার কাছে গ্রহণীয় সৎকর্মে নিয়োজিত কর। ইলাহী, আমি তোমার কাছে দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষমা, নিরাপত্তা ও সুন্দর বিশ্বাস প্রার্থনা করি। হে এমন সত্তা, গোনাহ যার ক্ষতি করে না এবং মাগফেরাত যার মর্যাদা খর্ব করে না, আমাকে এমন বিষয় দান কর, যা তোমার ক্ষতি করে না এবং তোমার মর্যাদা হ্রাস করে না। হে প্রভু, আমাদেরকে পূর্ণমাত্রায় সবর দাও এবং মুসলমানরূপে ওফাত দাও। দুনিয়া ও আখেরাতে তুমিই আমার সুহৃদ। আমাকে মুসলমানরূপে ওফাত দাও এবং সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করে দাও, তুমিই আমাদের সুহৃদ। অতএব আমাদেরকে ক্ষমা কর। আমাদের প্রতি রহম কর। তুমি সর্বোত্তম ক্ষমাকারী। আমাদের জন্যে লেখ এ জগতে নেকী এবং আখেরাতে নেকী। হে পরওয়ারদেগার, আমরা তোমার উপর ভরসা করেছি, তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করেছি এবং প্রত্যাবর্তনস্থল তোমারই দিকে। হে প্রভু, আমাদেরকে জালেম কওমের জন্যে ফেতনা করো না। হে প্রভু, আমাদেরকে কাফেরদের জন্যে ফেতনা করো না। আমাদেরকে ক্ষমা কর হে প্রভু। নিশ্চয় তুমি পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। হে পরওয়ারদেগার, আমাদের গোনাহ এবং কাজকর্মে আমাদের অপব্যয় মার্জনা কর, আমাদের পদযুগল দৃঢ় রাখ এবং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর। হে পরওয়ারদেগার, ক্ষমা কর আমাদেরকে এবং আমাদের সেই ভাইদেরকে, যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে এবং মুমিনদের জন্যে আমাদের অন্তরে

কোন বিদ্বেষ রেখো না। হে পরওয়ারদেগার, তুমি মহব্বতকারী, দয়ালু। পরওয়ারদেগার, আমাদের দাও তোমার কাছ থেকে রহমত এবং আমাদের কাজকে সুশৃংখল কর। পরওয়ারদেগার, আমাদেরকে দাও দুনিয়াতে নেকী, আখেরাতে নেকী এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা কর। পরওয়ারদেগার, আমরা এক ঘোষককে একথা ঘোষণা করতে শুনেছি– তোমরা ঈমান আন তোমাদের পালনকর্তার প্রতি। অতএব, আমরা ঈমান এনেছি। পরওয়ারদেগার, আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা কর, আমাদের কুকর্ম মিটিয়ে দাও এবং আমাদেরকে সজ্জনদের সাথে ওফাত দাও। পরওয়ারদেগার, তুমি তোমার রসূলগণের মুখে আমাদেরকে যে ওয়াদা দিয়েছ, তা পূরণ কর। কেয়ামতের দিন আমাদেরকে লাঞ্ছিত করো না। নিশ্চয় তুমি ওয়াদা ভঙ্গ কর না। পরওয়াদেরগার, আমরা ভুলে গেলে অথবা ভুল করলে আমাদেরকে শাস্তি দিয়ো না। পরওয়ারদেগার, আমাদের উপর বোঝা আরোপ করো না, যেমন চাপিয়েছ আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। পরওয়ারদেগার, যে বিষয়ের শক্তি আমাদের নেই তা আমাদের উপর আরোপ করো না। আমাদেরকে মার্জনা কর, আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি রহম কর। তুমি আমাদের প্রভু। অতএব কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর। পরওয়ারদেগার, আমাকে ও আমার পিতামাতাকে ক্ষমা কর, যেমন শৈশবে তারা আমাকে লালন-পালন করেছেন। তুমি ক্ষমা কর মুমিন পুরুষ ও নারীদেরকে, মুসলমান পুরুষ ও নারীদেরকে এবং তাদের জীবিত ও মৃতদেরকে। পরওয়ারদেগার, ক্ষমা কর, রহম কর এবং যে গোনাহ তুমি জান তা মার্জনা কর। তুমি পরাক্রান্ত, সম্মানিত। তুমি দয়ালু ও পরম ক্ষমাশীল। নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্যে এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। পাপ থেকে বাঁচার শক্তি এবং এবাদত করার সাধ্য কারও নেই মহান সুউচ্চ আল্লাহর সাহায্য ছাড়া। আল্লাহ আমাদের জন্যে যথেষ্ট। তিনি চমৎকার কার্যনির্বাহী। হে আল্লাহ মুহাম্মদ, তাঁর বংশধর ও সহচরগণের প্রতি রহমত প্রেরণ করুন এবং অনেক অনেক সালাম পৌছান।

যে সকল দোয়ায় রসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন কিছু থেকে আশ্রয় চেয়েছেন সেগুলো এই ঃ

হে আল্লাহ, আমি আশ্রয় চাই তোমার কাছে কৃপণতা থেকে। আমি আশ্রয় চাই তোমার কাছে কাপুরুষতা থেকে। আমি আশ্রয় চাই তোমার কাছে অথর্ব বয়সে পৌঁছে যাওয়া থেকে। আমি আশ্রয় চাই সংসারের ফেতনা থেকে আমি আশ্রয় চাই কবরের আযাব থেকে। হে আল্লাহ, আমি আশ্রয় চাই এমন লোভ থেকে, যা অন্য লোভের দিকে পরিচালনা করে, অস্থানে লোভ করা থেকে এবং যেখানে আশা নেই সেখানে লোভ করা থেকে। ইলাহী, আমি আশ্রয় চাই এমন এলেম থেকে যা উপকার করে না, এমন অন্তর থেকে যা নত হয় না, এমন দোয়া থেকে যা গৃহীত হয় না এবং এমন মন থেকে, যা তৃপ্ত হয় না। আমি আশ্রয় চাই ক্ষুধা থেকে। কেননা, এটা মন্দ শয্যাসঙ্গী। আমি আশ্রয় চাই খেয়ানত থেকে; কেননা, এটা মন্দ সহচর। আরও আশ্রয় চাই অলসতা থেকে, কৃপণতা ও কাপুরুষতা থেকে, চরম বার্ধক্য থেকে, অকেজো বয়সে পৌঁছা থেকে, দাজ্জালের ফেতনা থেকে, কবরের আযাব থেকে এবং জীবন ও মৃত্যুর ফেতনা থেকে। হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে চাই নম্র, বিনয়ী ও তোমার পথে প্রত্যাবর্তনকারী অন্তর। ইলাহী, আমি চাই তোমার মাগফেরাতের শর্তসমূহ, তোমার মাগফেরাতের কারণসমূহ, প্রত্যেক গোনাহ থেকে নিরাপত্তা, প্রত্যেক সৎকর্মের সুযোগ, জান্নাত লাভে সফলতা এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি। ইলাহী, আমি আশ্রয় চাই পতনজনিত মৃত্যু থেকে, আরও আশ্রয় চাই দুঃখ থেকে, নিমজ্জিত হওয়া থেকে, প্রাচীর ধসে পড়া থেকে এবং তোমার পথে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে মৃত্যুবরণ করা থেকে। আরও আশ্রয় চাই দুনিয়াকামী হয়ে মৃত্যুবরণ করা থেকে। ইলাহী, আমি আশ্রয় চাই যা জানি তার অনিষ্ট থেকে এবং যা জানি না তার অনিষ্ট থেকে। ইলাহী, তুমি আমাকে মন্দ অভ্যাস, মন্দ কর্ম, রোগ ও খেয়াল খুশী থেকে বাঁচিয়ে রাখ। হে আল্লাহ, আমি আশ্রয় চাই বিপদের কঠোরতা থেকে, ভাগ্যাহত হওয়া থেকে, মন্দ তকদীর থেকে এবং শত্রুর হাসি থেকে। হে আল্লাহ, আমি আশ্রয় চাই কুফর, ঋণ

ও দারিদ্র্য থেকে। আমি আশ্রয় চাই জাহান্নামের আযাব থেকে, আমি আশ্রয় চাই দাজ্জালের ফেতনা থেকে। ইলাহী, আমি আমার কর্ণ ও চক্ষুর অনিষ্ট থেকে এবং জিহ্বা ও অন্তরের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই। ইলাহী, আমি আশ্রয় চাই স্বীয় বাসস্থানে মন্দ প্রতিবেশী থেকে। কেননা, সফরের প্রতিবেশী বদলে যায়। ইলাহী আমি আশ্রয় চাই, নিষ্ঠুরতা থেকে, গাফিলতি থেকে, দারিদ্র্য, উপবাস, লাঞ্ছনা ও অভাবগ্রস্ততা থেকে। আরও আশ্রয় চাই কুফর, দারিদ্র্য, পাপাচার কলহ, নেফাক, কুচরিত্র, খ্যাতি ও রিয়া থেকে। আমি আশ্রয় চাই বধিরতা, মূকতা, অন্ধত্ব, মস্তিষ্ক বিকৃতি, কুষ্ঠরোগ ও দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে। ইলাহী, আমি আশ্রয় চাই তোমার নেয়ামত দূর হয়ে যাওয়া, সুস্থতা বিগড়ে যাওয়া, আকস্মিক আযাব ও তোমার ক্রোধ থেকে। ইলাহী, আমি আশ্রয় চাই জাহান্নামের আযাব ও ফেতনা, কবরের আযাব ও ফেতনা, ধনাঢ্যতার অনিষ্ট, দারিদ্র্যের অনিষ্ট এবং দাজ্জালের অনিষ্ট থেকে। আমি আশ্রয় চাই কর্জ ও গোনাহ্ থেকে। ইলাহী, আমি আশ্রয় চাই নফস থেকে, যা তৃপ্ত হয় না। অন্তর থেকে, যা নত হয় না। নামায থেকে, যা উপকার করে না। দোয়া থেকে, যা কবুল হয় না। আমি আশ্রয় চাই জীবনের অনিষ্ট থেকে, বুকের ফেতনা থেকে। ইলাহী, আমি আশ্রয় চাই কর্জের আধিক্য থেকে, শত্রুর প্রাবল্য থেকে এবং শত্রুর হাসি থেকে।

বিভিন্ন কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট দোয়া

পূর্বে আমরা মুয়াজ্জিনের আযানের দোয়া লিপিবদ্ধ করে এসেছি। এছাড়া পবিত্রতা অধ্যায়ে পায়খানায় যাওয়া ও বাইরে আসার দোয়া এবং ওযুর দোয়াও লেখে এসেছি। এগুলো যথাস্থানে পাঠ করা উচিত। এক্ষণে বিভিন্ন কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট আরও কতিপয় দোয়া উদ্ধৃত হচ্ছে।

কোন কাজ করার উদ্দেশে গৃহ থেকে বের হওয়ার সময় বলবে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ اَوْ اَجْهِلَ اَوْ يُجْهَلُ عَلَيَّ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ اَلتُّكْلَانُ عَلَى اللّٰهِ ـ

অর্থাৎ, আল্লাহর নামে শুরু। হে পরওয়ারদেগার, আমি আশ্রয় চাই এ বিষয় থেকে যে, আমি কারও উপর জুলুম করি অথবা কেউ আমার উপর জুলুম করুক কিংবা আমি কারও সাথে মূর্খতা করি অথবা কেউ আমার সাথে মূর্খতা করুক। পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু। কুকর্ম থেকে বাঁচার শক্তি এবং এবাদত করার সাধ্য নেই আল্লাহর সাহায্য ছাড়া, ভরসা আল্লাহ্র উপরই

কোন মজলিস থেকে ওঠার পর মজলিসে যেসব অনর্থক কথাবার্তা হয়েছে, সেগুলোর কাফ্ফারা স্বরূপ কোন দোয়া পাঠ করতে চাইলে এই দোয়া পাঠ করবে–

سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ عَمِلْتُ سُوْءً وَظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ اِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّآ اَنْتَ ـ

অর্থাৎ, ইলাহী, আমি তোমার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করি। আমি সাক্ষ্য দেই যে, তুমি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই এবং তওবা করি। আমি মন্দ কাজ করেছি এবং নিজের উপর জুলুম করেছি। অতএব আমাকে ক্ষমা কর। তুমি ব্যতীত কেউ গোনাহ মার্জনা করে না।

বাজারে প্রবেশ করার সময় এই দোয়া পড়বে ঃ

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَىٌّ لَا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ السُّوْقِ وَخَيْرَ مَا فِيْهَا ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اُصِيْبَ فِيْهَا يَمِيْنًا فَاجِرَةً اَوْ صَفْقَةً خَاسِرَةً ـ

অর্থাৎ, আল্লাহ ব্যতীত মাবুদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই, প্রশংসা তাঁরই। তিনি জীবন ও মরণ দেন। তিনি

চিরজীবী, মৃত্যুবরণ করেন না। তাঁর হাতে কল্যাণ। তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ, আমি এই বাজারের এবং বাজারে যা আছে সবকিছুর কল্যাণ প্রার্থনা করি। ইলাহী, আমি এই বাজারের অনিষ্ট এবং বাজারস্থিত সবকিছুর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই। ইলাহী আমি আশ্রয় চাই এ বিষয় থেকে যে, এ বাজারে আমি কোন পাপের কসম খাই অথবা অলাভজনক ক্রয়-বিক্রয় করি।

ঋণ থেকে মুক্তি লাভের জন্যে এ দোয়া পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاغْنِنِىْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

অর্থাৎ, ইলাহী, তুমি হারামের পরিবর্তে হালালকেই আমার জন্যে যথেষ্ট কর এবং তোমার কৃপা দ্বারা আমাকে অন্যের দিক থেকে পরাঙ্মুখ করে দাও।

নতুন বস্ত্র পরিধান করলে এই দোয়া পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ كَسَوْتَنِىْ هٰذَا الثَّوْبَ فَلَكَ الْحَمْدُ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِهٖ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهٗ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صُنِعَ لَهٗ ـ

অর্থাৎ, ইলাহী, তুমি আমাকে এই বস্ত্র পরিধান করিয়েছ। অতএব তোমারই প্রশংসা। আমি এর কল্যাণ এবং যে উদ্দেশে এটা তৈরী হয়েছে তার কল্যাণ চাই এবং উদ্দেশ্যের অনিষ্ট থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই।

অলক্ষুণে কোন কিছু দেখে মন খারাপ হলে এই দোয়া পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ لَا يَأْتِىْ بِالْحَسَنٰتِ اِلَّا اَنْتَ وَلَا يُذْهِبُ بِالسَّيِّئٰتِ اِلَّا اَنْتَ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ـ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ, তুমি ব্যতীত কেউ শুভকর্ম ঘটায় না এবং তুমি ব্যতীত কেউ অশুভ বিষয় দূর করে না। আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত মন্দ থেকে বাঁচার এবং শুভ কাজ সাধনের সাধ্য কারো নেই।

ঝড় তুফানের সময় বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ الرِّيْحِ وَخَيْرَ مَا فِيْهِ اَوْ خَيْرَ مَا اَرْسَلْتَ بِهٖ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا ـ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ, আমি দোয়া করি এই বায়ুর কল্যাণ, এর মধ্যে যা আছে তার কল্যাণ এবং যে বিষয় দিয়ে একে প্রেরণ করেছ, তার কল্যাণ এবং এর অকল্যাণ থেকে তোমার আশ্রয় চাই।

বজ্র গর্জন শুনলে বলবে ঃ

سُبْحٰنَ مَنْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ ـ

অর্থাৎ, বজ্র যার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং ফেরেশতারাও যার ভয়ে পবিত্রতা ঘোষণা করে, তিনি পবিত্র।

প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহ তাআলার যা ফয়সালা তা তো হবেই, এটা অনিবার্য। এমতাবস্থায় দোয়ার উপকারিতা কি? এর জওয়াব, দোয়া দ্বারা বিপদাপদ দূর হওয়াও আল্লাহ তাআলার ফয়সালা। দোয়া বিপদ টলে যাওয়ার কারণ এবং রহমত টেনে আনার উপায় হয়ে থাকে; যেমন ঢাল তীর প্রতিহত করার কারণ এবং বৃষ্টি সবুজ ঘাস উৎপন্ন হওয়ার কারণ হয়ে থাকে। ঢাল ও তীরে যেমন মোকাবিলা হয়, তেমনি দোয়া ও বিপদাপদের মধ্যে মোকাবিলা হয়। আল্লাহ তাআলার ফয়সালা মেনে নেয়ার জন্য অস্ত্র ধারণ না করা জরুরী নয়। আল্লাহ বলেন ঃ خُذُوْا حِذْرَكُمْ তোমরা তোমাদের অস্ত্র হাতে তুলে নাও।

আসল ব্যাপার, কারণের সাথে ঘটনার জড়িত হওয়াটা প্রথম ফয়সালা, যাকে কাযা বলা হয়। এর পর আস্তে আস্তে এক একটি কারণের ভিত্তিতে ঘটনা সংঘটিত হতে থাকাটা দ্বিতীয় ফয়সালা, যাকে কদর (বিধিলিপি) বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা মানুষের তকদীরে কল্যাণ রেখে কোন কারণের উপর সীমিত রেখেছেন। যে ব্যক্তির অন্তশ্চক্ষু খোলা, তার মতে এসব বিষয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। এ ছাড়া দোয়ার

উপকারিতা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, দোয়ার সাহায্যে আল্লাহ তাআলার সাথে অন্তরের উপস্থিতি হতে পারে, যা এবাদতের চরম লক্ষ্য। এ কারণেই রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ দোয়া এবাদতের নির্যাস। অধিকাংশ মানুষের অবস্থা হচ্ছে, অভাব অথবা বিপদাপদ দেখা দিলেই তাদের অন্তর আল্লাহর দিকে আকৃষ্ট হয়। আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ অর্থাৎ মানুষকে যখন অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে লম্বা চওড়া দোয়া করতে শুরু করে।

সুতরাং দোয়ার প্রয়োজন আছে। দোয়া মানুষের অন্তরকে কাকুতি-মিনতি ও অনুনয়-বিনয় সহকারে আল্লাহ তা'আলার সমীপে উপস্থিত করে। এর মাধ্যমেই যিকির অর্জিত হয়, যা সেরা এবাদত। এ কারণেই নবী, ওলী ও গুণী ব্যক্তিবর্গের উপর বালা-মসিবত বেশী আসে। ধনাঢ্যতা প্রায়ই অহংকার ও আত্মম্ভরিতার কারণ হয়ে থাকে, যা দোয়ার পরিপন্থী। আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى অর্থাৎ মানুষ সীমালঙ্ঘন করেই থাকে; সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে
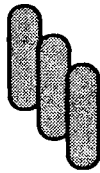
দশম অধ্যায়

ওযিফা ও রাত্রি জাগরণের ফযীলত

প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীকে তাঁর বান্দাদের অনুগত করেছেন; এ উদ্দেশে নয় যে, মানুষ এর উঁচু গৃহসমূহে থেকে যাবে; বরং উদ্দেশ্য, মানুষ পৃথিবীকে একটি বিশ্রামাগার মনে করবে এবং এখান থেকে এমন পাথেয় সংগ্রহ করে নেবে, যা তার আসল দেশের সফরে কাজে লাগবে। মানুষ এখান থেকেই কর্ম ও গুণগরিমার উপঢৌকন আহরণ করবে, দুনিয়ার ধ্বংসাত্মক বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকবে এবং মনে করবে, বয়স ও আয়ুষ্কাল মানুষকে এমনভাবে নিয়ে যায় যেমন নৌকা তার আরোহীদের নিয়ে সামনের দিকে এগুতে থাকে। এ বিশ্ব চরাচরে সকল মানুষই মুসাফির। বয়স এ সফরের দূরত্ব, শ্বাস-প্রশ্বাস এর পদক্ষেপ। এবাদত ও আনুগত্য এ সফরের পুঁজি এবং কাম-ক্রোধ, লোভ, মোহআদি এ পথের দুর্ধর্ষ ডাকাত। এ সফরের লাভ হচ্ছে জান্নাতে বিশাল সাম্রাজ্য ও চিরস্থায়ী নেয়ামত সহকারে আল্লাহ তাআলার দীদার লাভে সাফল্য অর্জন। আর লোকসান হচ্ছে জাহান্নামের অসহ্য আযাব ও লোহার বেড়ী পরিধান সহকারে আল্লাহ তাআলা থেকে দূরে সরে যাওয়া। এমতাবস্থায় মানুষের প্রতিটি বিশ্বাসই অত্যন্ত মূল্যবান। যে ব্যক্তির একটি নিঃশ্বাস গাফেল অবস্থায় অতিবাহিত হয় এবং তাতে সে আল্লাহর আনুগত্যমূলক কোন আমল না করে, সে কেয়ামতের দিন এত বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হবে, যার কোন সীমা পরিসীমা নেই। এই সত্য বিপদাশংকা ও ভয়াবহ অবস্থার কারণে তওফীকপ্রাপ্তরা কর্মতৎপর হয়ে যাবতীয় কামবাসনা ও লোভ মোহ সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়েছেন। তাঁরা আল্লাহর যিকিরে দিবারাত্র অতিবাহিত করার উদ্দেশে প্রত্যেক ওয়াক্তে আলাদা আলাদা ওযিফা নির্দিষ্ট করেছেন, যাতে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভ করা যায়। এ কারণেই আলোচ্য গ্রন্থেও ওযিফাসমূহের বিশদ বিবরণ পেশ করা সমীচীন মনে হয়। ইনশাআল্লাহ পরবর্তী দু'টি শিরোনামে এ লক্ষ্য পরিস্ফুট হয়ে যাবে।

ওযিফার ফযীলত ও ধারাবাহিকতা

জানা উচিত, অন্তশ্চক্ষুসম্পন্ন মনীষীগণের মতে আল্লাহ্ তাআলার দীদার ব্যতীত মুক্তির কোন উপায় নেই। এ দীদার লাভের একমাত্র পন্থা, বান্দা আল্লাহ তাআলার প্রিয়পাত্র হবে, আরেফ হবে এবং তদবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করবে। সার্বক্ষণিক যিকির ব্যতীত যেমন আল্লাহ্ তাআলার মহব্বত অর্জন করা যায় না, তেমনি তাঁর সত্তা, গুণাবলী ও ক্রিয়াকর্মে ফিকির তথা চিন্তা ভাবনা ছাড়া তাঁর মারেফত হাসিল করা যায় না। সার্বক্ষণিক যিকির ফিকির তখনই সহজলভ্য হয়, যখন কেউ দুনিয়া ও তার কামনা-বাসনা বিদায় দিয়ে দেয় এবং জীবন ধারণের জন্যে যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু বাদে সবকিছু থেকে নিজেকে আলাদা করে নেয়। এসকল বিষয়ের জন্যে প্রয়োজন হচ্ছে নিজের দিবারাত্রির সম্পূর্ণ সময় যিকির ফিকিরে ডুবিয়ে রাখা। মানুষ স্বভাবগতভাবে এক প্রকারের যিকির ফিকির দ্বারা ক্লান্ত হয়ে যায়। সে নির্দিষ্ট কোন একটি পদ্ধতির উপর সবর করতে পারে না। তাই প্রত্যেক সময়ের জন্যে পৃথক পৃথক ওযিফা নির্দিষ্ট করা জরুরী, যাতে এ পদ্ধতিগত পরিবর্তনের কারণে মানুষের আনন্দ বেশী হয় এবং আগ্রহ বেড়ে যায়। এ কারণেই ওযিফাসমূহের বণ্টন বিভিন্ন পদ্ধতিতে করা হয়েছে। সুতরাং যেব্যক্তি বিনা হিসাবে জান্নাতে যেতে চায়, তার উচিত সমস্ত সময় এবাদতে ব্যয় করা। আর যে ব্যক্তি তার নেকীর পাল্লা ভারী দেখতে চায়, সে যেন তার অধিবাংশ সময় এবাদতে নিয়োজিত রাখে। যে ব্যক্তি কিছু নেক আমল করে এবং কিছু মন্দ আমল, তার ব্যাপারটি বিপজ্জনক। তবুও আল্লাহ তাআলার কৃপায় আশা করা যায়, সেও রক্ষা পাবে। যারা অন্তরের চোখে দেখে, তাদের কাছে দিবারাত্রির সময় যিকির ও ফিকিরে ব্যয় করার উৎকর্ষতা আপনা আপনি পরিস্ফুট। কিন্তু কেউ যদি অন্তশ্চক্ষুর অধিকারী না হয়, সে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উদ্দেশে আল্লাহ্ তাআলার বাণীসমূহ দেখে নিতে পারে এবং ঈমানের নূর দ্বারা বিচার করতে পারে, এসব বাণী থেকে কি বুঝা যায়? অথচ রসূলে করীম (সাঃ) সকল বান্দা অপেক্ষা অধিকতর নৈকট্যশীল

এবং মর্তবায় সকলের উর্ধ্বে ছিলেন। তবুও আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে লক্ষ্য করে এরশাদ করেন ঃ

إِنَّ لَكَ فِى النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيْلًا ۔

অর্থাৎ, নিশ্চয় দিবাভাগে আপনার জন্যে রয়েছে অধিক কর্মব্যস্ততা। সুতরাং আপনি আপনার পালনকর্তার যিকির করুন এবং একনিষ্ঠভাবে তাঁর ধ্যানে মগ্ন হোন।

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيْلًا ۔

অর্থাৎ, সকাল-সন্ধ্যায় আপনার পালনকর্তার নাম যিকির করুন। রাতে তাঁর প্রতি সেজদায় অবনত হোন এবং দীর্ঘ সময় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন।

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاَدْبَارَ السُّجُوْدِ ۔

অর্থাৎ, আপনার পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করুন সূর্যোদয়ের পূর্বে, সূর্যাস্তের পূর্বে এবং রাত্রির কিছু অংশে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করুন এবং নামাযের পরে।

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوْمُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاِدْبَارَ النُّجُوْمِ ۔

অর্থাৎ, আপনার পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করুন যখন গাত্রোত্থান করেন এবং রাত্রির কিছু অংশে ও তারকা ডুবে যাওয়ার পরে।

إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِىَ اَشَدُّ وَطْأً وَّاَقْوَمُ قِيْلًا ۔

অর্থাৎ, নিশ্চয় এবাদতে রাত্রি জাগরণ গভীর অভিনিবেশ ও হৃদয়ঙ্গম করার পক্ষে অনুকূল।

وَمِنْ اٰنَآءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰى ـ

অর্থাৎ, রাত্রির কিছু অংশে এবং দিবাভাগে পবিত্রতা বর্ণনা করুন, সম্ভবতঃ আপনি সন্তুষ্ট হবেন।

اَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئٰتِ ـ

অর্থাৎ, নামায কায়েম করুন দিনের উভয় প্রান্তে এবং রাত্রির কিছু অংশে; নিশ্চয়ই নেকী পাপ কর্ম দূর করে দেয়।

এর পর লক্ষ্য করা উচিত, যারা আল্লাহ তা'আলার সফলকাম বান্দা, তাদের সম্পর্কে তিনি কি বলেছেন ? উদাহরণতঃ এরশাদ হয়েছে ঃ

اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اٰنَآءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَّقَائِمًا يَّحْذَرُ الْاٰخِرَةَ وَيَرْجُوْا رَحْمَةَ رَبِّهٖ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ـ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি রাত্রির প্রহরসমূহে সেজদা ও দন্ডায়মান অবস্থায় এবাদতে মগ্ন থাকে, আখেরাতের ভয় রাখে এবং পরওয়ারদেগারের রহমত আশা করে, সে কি তার সমান হবে? যে তা করে না, যারা জ্ঞানী এবং যারা অজ্ঞান, তারা কি সমান?

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا ـ

অর্থাৎ, তারা শয্যা গ্রহণ করে না এবং ভয় ও আশা সহকারে তাদের পালনকর্তার কাছে দোয়া করে।

وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ـ

অর্থাৎ, যারা তাদের পালনকর্তার জন্যে সেজদাবনত ও দাঁড়ানো অবস্থায় রাত্রি যাপন করে।

كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ وَبِالْاَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ـ

— তারা রাত্রির অল্প অংশই নিদ্রা যেত এবং শেষ রাতে এস্তেগফার করত।

فَسُبْحَنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ۔

অর্থাৎ, আল্লাহ পবিত্র, তোমাদের বিকালে এবং তোমাদের ভোরে (অর্থাৎ সর্বদা) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে তাঁরই প্রশংসা এবং শেষ প্রহরে ও দ্বিপ্রহরে। অর্থাৎ সন্ধ্যায় ও সকালে আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ঘোষণা কর।

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ ۔

অর্থাৎ, তাদেরকে বিতাড়িত করবেন না, যারা তাদের পরওয়ারদেগারের কাছে দোয়া করে সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে।

উপরোক্ত আয়াতসমূহে চিন্তাভাবনা করলে জানা যাবে যে, সময়ের রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং সময়কে ওযিফা দ্বারা সর্বক্ষণ পরিপূর্ণ রাখা হচ্ছে আল্লাহর দিকে পৌছার পথ। এ কারণেই রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলার সর্বাধিক প্রিয় বান্দা তারা, যারা যিকিরের জন্যে সূর্য, চন্দ্র ও ছায়ার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে।

আল্লাহ আরও বলেন ঃ

اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ –সূর্য ও চন্দ্র হিসাব অনুযায়ী চলে।

اَلَمْ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيْلًا ثُمَّ قَبَضْنٰهُ اِلَيْنَا قَبْضًا يَّسِيْرًا ۔

অর্থাৎ, তুমি কি তোমার পালনকর্তাকে দেখ না, তিনি কিভাবে ছায়াকে প্রলম্বিত করেন? তিনি ইচ্ছা করলে একে স্থির রাখতে পারতেন। এর পর আমি সূর্যকে করেছি এর নির্দেশক। অতঃপর আমি একে নিজের দিকে ধীরে ধীরে গুটিয়ে আনি।

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِىْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ـ

অর্থাৎ, তিনিই আল্লাহ্, যিনি তোমাদের জন্যে তারকারাজি সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা অন্ধকারে পথ খুঁজে পাও।

সুতরাং এরূপ ধারণা করবে না যে, চন্দ্র সূর্যের গতিবিধি সুশৃঙ্খল ও হিসাবাধীন হওয়া এবং ছায়া, আলো ও তারকারাজি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য এগুলো দ্বারা দুনিয়ার কাজে সাহায্য লওয়া। বরং এগুলো সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে, এগুলো দ্বারা সময়ের পরিমাণ জেনে তাতে আল্লাহর এবাদত করা এবং আখেরাতের ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করা। সেমতে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا ـ

অর্থাৎ, তিনিই আল্লাহ, যিনি রাত ও দিনকে একে অপরের পশ্চাদগামী করে সৃষ্টি করেছেন সেই ব্যক্তির জন্যে, যে বুঝতে চায় অথবা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চায়।

অর্থাৎ, দিন ও রাত্রির একটিকে অপরটির স্থলবর্তী হওয়ার জন্যে সৃষ্টি করেছেন, যাতে রাতের কোন এবাদত থেকে গেলে তা দিয়ে পূরণ করে নেয়া যায় এবং দিনের এবাদত থেকে গেলে রাতে তা পূরণ করা যায়। এতে বর্ণনা করা হয়েছে, এটা যিকির ও শোকরের জন্যে– অন্য কিছুর জন্যে নয়। আরও বলা হয়েছে ঃ

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اٰيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا اٰيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا اٰيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ـ

অর্থাৎ আমি রাত ও দিনকে দু'টি নিদর্শন করেছি, অতঃপর রাতের নিদর্শনকে নিষ্প্রভ করে দিনের নিদর্শনকে দেখার উপযোগী করেছি, যাতে

তোমরা পালনকর্তার অনুগ্রহ অন্বেষণ কর এবং বছরের গণনা ও হিসাব জানতে পার।

ওযিফার সময় ও ক্রমবিন্যাস ঃ দিবাভাগের ওযিফা সাতটি এবং রাত্রিকালীন চারটি। দিনের বেলার প্রথম ওযিফার সময় সোবহে সাদেক থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত। এটা খুবই অভিজাত সময়। এর আভিজাত্য বুঝার জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট যে, আল্লাহ্ তাআলা এ সময়ের কসম খেয়েছেন– وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ অর্থাৎ ভোরের কসম, যখন, সেটি আবির্ভূত হয়। নিজের প্রশংসায় বলেছেন فَالِقُ الْاِصْبَاحِ ভোরের আবিষ্কর্তা। এ সময়েই সূর্য কিরণ ছড়িয়ে পড়ার কারণে রাত্রির কালো ছায়া সংকুচিত হয়ে যায়। তখন মানুষকে পবিত্রতা ঘোষণা করতে বলা হয়েছে। فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা কর, যখন সন্ধ্যা হয় এবং যখন ভোর হয়।

দিনের ওযিফাসমূহের ক্রমবিন্যাস ঃ ভোরে ঘুম থেকে ওঠে আল্লাহকে স্মরণ করে বলবে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ

এ দোয়াটি শেষ পর্যন্ত পড়বে। যা প্রথম অধ্যায়ে জাগ্রত হওয়ার পর পড়ার আলোচনায় লিখিত হয়েছে। দোয়া পাঠ করার সময়ই পোশাক পরিধান করবে। পোশাক পরিধানে আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা এবং তা দ্বারা এবাদতে সাহায্য নেয়ার নিয়ত করবে, রিয়া ও অহংকারের নিয়ত করবে না। প্রয়োজন হলে পায়খানায় যাবে এবং বাম পা প্রথমে পায়খানার ভিতর রাখবে। এ সময় সেই দোয়া পাঠ করবে, যা পবিত্রতা অধ্যায়ে পায়খানায় যাওয়া ও বের হওয়ার আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে। এর পর সুন্নত অনুযায়ী মেসওয়াক করবে, যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এরপর সকল সুন্নত ও দোয়াসহ ওযু করবে। এসব সুন্নত ও দোয়া আমরা পূর্বেই লিপিবদ্ধ করেছি। তাই এ অধ্যায়ে এগুলো কেবল

আগে পরে আদায়ের কথা বলা হবে। সম্পূর্ণ দোয়ার পুনরাবৃত্তি করা হবে না। ওযু সমাপনান্তে ফজরের দু'রাকআত সুন্নত নিজ গৃহে আদায় করবে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাই করতেন। সুন্নতের পর এ দোয়াটি পড়বে- اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ عِنْدِكَ (শেষ পর্যন্ত)। এর পর মস্জিদে রওয়ানা হবে এবং এ সময়কার জন্য নির্ধারিত দোয়া পাঠ করবে।

নামাযের জন্যে লাফিয়ে লাফিয়ে চলবে না; বরং ধীরস্থিরভাবে চলবে। হাদীসে তাই বর্ণিত আছে। মসজিদের ভিতরে ডান পা প্রথম রাখবে এবং মসজিদে যাওয়ার দোয়া পাঠ করবে। এর পর ফাঁকা থাকলে প্রথম সারিতে জায়গা নেবে। মুসল্লীদের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে যাবে না এবং কাউকে কষ্ট দেবে না। ফজরের সুন্নত নামায গৃহে না পড়ে থাকলে সুন্নত আদায় করে তৎপর দোয়ায় মশগুল হবে। গৃহে পড়ে থাকলে দুরাকআত তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়ে জামাআতের অপেক্ষায় বসে থাকবে। জামাআত অন্ধকার থাকতে আদায় করা মোস্তাহাব। (হানাফী মাযহাবে যথেষ্ট ফর্সা হওয়ার পর আদায় করা মোস্তাহাব।) কোন ওয়াক্তের জামাত ছেড়ে দেয়া উচিত নয়, বিশেষতঃ ফজর ও এশার জামাত কখনও ছাড়বে মা। এগুলোতে সওয়াব বেশী। আনাস ইবনে মালেকের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) ফজরের নামায সম্পর্কে বলেন ঃ যে ব্যক্তি ওযু করতঃ নামাযের জন্যে মসজিদে যাবে, তার প্রত্যেক পদক্ষেপে একটি করে সওয়াব হবে এবং একটি পাপ মোচন করা হবে। সৎকাজের সওয়াব দশ গুণ পর্যন্ত পাওয়া যায়। নামায শেষে সূর্যোদয়ের পর মসজিদ থেকে বের হলে তার দেহে যত লোম রয়েছে, সেই পরিমাণ সওয়াব তার জন্যে লেখা হবে। আর যদি চাশতের নামাযও পড়ে বের হয় তবে প্রতি রাকআতের বদলে দশ লক্ষ নেকীর সওয়াব পাবে। পূর্ববর্তী বযুর্গগণ ভোর হওয়ার পূর্বে মসজিদে গমন করতেন। জনৈক তাবেয়ী বলেন ঃ আমি ভোর হওয়ার পূর্বেই মসজিদে গিয়ে দেখি, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) আমার পূর্বে পৌঁছে গেছেন। তিনি আমাকে বললেন ঃ ভাতিজা, এ সময়ে গৃহ থেকে কি মতলবে বের হয়েছ? আমি বললাম ঃ ফজরের নামায পড়ার

জন্যে। তিনি বললেন ঃ তোমাকে সুসংবাদ। আমরা এরূপ বের হওয়া এবং মসজিদে বসে থাকাকে রসূলুল্লাহ্র (সাঃ)-এর সাহচর্যে আল্লাহ্র পথে জেহাদ করার সমান মনে করতাম। হযরত আলী (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ এক রাতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাদের গৃহে আগমন করলেন। তখন আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। হযরত ফাতেমা (রাঃ)-ও নিদ্রামগ্ন ছিলেন। তিনি বললেন ঃ তোমরা নামায পড় না কেন? আমি আরজ করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আমাদের প্রাণ আল্লাহর হস্তগত। তিনি যখন আমাদেরকে ওঠাতে চান, তখনই উঠি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) ফিরে গেলেন। কিন্তু আমি শুনলাম তিনি স্বীয় উরুতে করাঘাত করতে করতে বলছিলেন ঃ

وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا অর্থাৎ মানুষ সকল কিছুর চেয়ে অধিক বিতর্ক করে।

ফজরের সুন্নত ও তৎপরবর্তী দোয়া শেষে একামত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এস্তেগফার ও তসবীহে মশগুল থাকা উচিত। অর্থাৎ, এ সময় সত্তর বার اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ এবং একশ'বার سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ পাঠ করবে। এর পর সকল বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ আদবের প্রতি লক্ষ্য রেখে ফরয নামায পড়বে। এসব আদব আমরা নামায অধ্যায়ে লেখে এসেছি। নামাযান্তে মসজিদে বসে সূর্যোদয় পর্যন্ত যিকির করবে। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ আমি যে জায়গায় ফজরের নামায পড়ি সেখানে বসে থাকা এবং সূর্যোদয় পর্যন্ত যিকির করাকে চারটি গোলাম মুক্ত করার চেয়ে অধিক প্রিয় মনে করি। বর্ণিত আছে, তিনি ফজরের নামাযান্তে সূর্যোদয় পর্যন্ত নামাযের জায়গায় বসে থাকতেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, তিনি সূর্যোদয়ের পর দু'রাকআত নামায পড়তেন। এর ফযীলত সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। হযরত হাসান (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) পরওয়ারদেগারের রহমতের আলোচনা প্রসঙ্গে বলতেন, আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ হে ইবনে

আদম, ফজরের নামায এবং আসরের নামাযের পর কিছুক্ষণ আমার যিকির করলে তোমার জন্যে এ দুসময়ের মাঝখানে আমিই যথেষ্ট হব। অতএব সূর্যোদয় পর্যন্ত কথাবার্তা না বলে এই চার প্রকার ওযিফা পাঠ করা উচিত–

(১) দোয়া, (২) যিকির, (৩) কোরআন তেলাওয়াত এবং (৪) ফিকির তথা ভাবনা করা। নামায শেষ হলেই দোয়া শুরু করবে এবং বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَاِلَيْكَ يَعُوْدُ السَّلَامُ حَيِّنَا رَبَّنَا
بِالسَّلَامِ وَاَدْخِلْنَا دَارَ السَّلَامِ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ـ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ, আমাদের সর্দার মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি রহমত প্রেরণ কর এবং তাঁর বংশধরের প্রতি। ইলাহী, তুমিই শান্তি, তোমা থেকেই শান্তি এবং শান্তি তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করে। আমাদেরকে শান্তি সহকারে জীবিত রাখ এবং আমাদেরকে শান্তির বাসগৃহে তথা জান্নাতে দাখিল কর। তুমি মহান হে প্রতাপান্বিত ও সম্মানিত।

এর পর এই দোয়া শুরু করবে ঃ

سُبْحٰنَ رَبِّىَ الْعَلِىِّ الْاَعْلَى الْوَهَّابِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا
شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَىٌّ لَّا يَمُوْتُ
بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَهْلُ النِّعْمَةِ
وَالْفَضْلِ وَالثَّنَاءِ الْحَسَنِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا نَعْبُدُ اِلَّآ اِيَّاهُ
مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ـ

অর্থাৎ, আমার পরওয়ারদেগার পবিত্র, মহান, সুউচ্চ, অতি দাতা। আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি এবং তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই। প্রশংসা তাঁরই। তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন, তিনি

চিরজীবী, মৃত্যুবরণ করবেন না। কল্যাণ তাঁরই হাতে, তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি নেয়ামত, কৃপা ও উত্তম প্রশংসার অধিকারী। আমরা একান্তভাবে তাঁরই এবাদত করি, যদিও তা কাফেরদের পছন্দনীয় নয়।

এর পর নবম অধ্যায়ের তৃতীয় ও চতুর্থ শিরোনামে লিখিত দোয়াসমূহ পাঠ করবে। সম্ভব হলে সবগুলো পড়বে, নতুবা যতটুকু স্মরণ আছে অথবা যতটুকু আপন অবস্থার উপযোগী, ততটুকু পাঠ করবে।

যিকিরের কলেমা সেগুলোই যেগুলো বার বার পাঠ করতে হয়। এগুলো বার বার পাঠ করার সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে প্রত্যেক কলেমা তিন বার অথবা সত্তর বার পাঠ করা এবং মধ্যবর্তী স্তর হচ্ছে দশ বার পাঠ করা। সুতরাং অবসর অনুযায়ী এগুলো বার বার পাঠ করবে। বলাবাহুল্য, বেশী পড়ার সওয়াব বেশী। তবে দশ বার পড়া নিয়মিত অব্যাহত রাখা সম্ভব বিধায় এটাই উত্তম। যে ওযিফার বেশী সংখ্যা সব সময় পড়া যায় না, তার কম সংখ্যা সব সময় পড়া উত্তম। অন্তরের উপর এর প্রভাব বেশী পড়ে। এটা ফোঁটা ফোঁটা পানির ন্যায়, যা পর পর মাটিতে পতিত হয়। তাতে গর্ত সৃষ্টি হয়ে যায়, সেখানে পাথরও থাকে। পক্ষান্তরে অধিক সংখ্যক ওযিফা, যা অনিয়মিত পাঠ করা হয়, তা সেই পানির ন্যায়, যা একযোগে অথবা বিলম্বের পর কয়েকবারে ঢেলে দেয়া হয়। এ পানির কোন প্রভাব অনুভূত হবে না।

ওযিফার কলেমা দশটি

(١) لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ

(٢) سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ـ

(٣) سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ ـ

(٤) سُبْحٰنَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهٖ ـ

(٥) اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَسْئَلُهُ التَّوْبَةَ ـ

(٦) اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ـ

(٧) لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ ـ

(٨) بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اِسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ

(٩) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ ـ

(١٠) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ ـ

এ দশটি কলেমা দশ বার করে পাঠ করলে একশ' বার হয়ে যাবে। এটা একই কলেমা একশ' বার পাঠ করা অপেক্ষা উত্তম। কেননা, এগুলোর প্রত্যেকটির সওয়াব ও ফযীলত আলাদা আলাদা। প্রত্যেকটি দ্বারা অন্তর এক প্রকার আনন্দ পায়। এক কলেমা থেকে অন্য কলেমায় যাওয়াও মনের জন্যে সুখকর ও ক্লান্তিনাশক।

কোরআন তেলাওয়াতে মোস্তাহাব হচ্ছে, এমন আয়াত পাঠ করবে, যেগুলোর ফযীলত হাদীসে বর্ণিত আছে অর্থাৎ, সূরা ফাতেহা, আয়াতুল কুরসী, اٰمَنَ الرَّسُوْلُ থেকে সূরা বাকারার শেষ পর্যন্ত। এছাড়া شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ-এর সাথে আরও দু'আয়াত قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ

لَقَدْ بِغَيْرِ حِسَابٍ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ থেকে পর্যন্ত
لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত,
قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ থেকে সূরা ফাতাহ্‌র শেষ পর্যন্ত, رَسُوْلَهُ
يَتَّخِذْ وَلَدًا থেকে সূরা বনী ইসরাঈলের শেষ পর্যন্ত, সূরা হাদীদের শুরুর পাঁচ আয়াত এবং هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ থেকে সূরা হাশরের শেষ পর্যন্ত পাঠ করবে। আর যদি 'মুসাব্বাআতে আশার' পাঠ করা হয়, তবে পুরোপুরি সওয়াব পাওয়া যাবে। 'মুসাব্বাআতে আশার' সেই দশটি কলেমাকে বলা হয়, যা হযরত খিযির (আঃ) হযরত ইবরাহীম তায়মী (রহঃ)-কে উপহারস্বরূপ শিক্ষা দেন এবং এগুলো প্রত্যেক সকাল ও সন্ধ্যায় সাত সাত বার পাঠ করার উপদেশ দেন। এগুলো পাঠ করলে সকল দোয়ার সওয়াব অর্জিত হয়ে যাবে। বর্ণিত আছে, যয়ন ইবনে দাররা একজন আবদাল ছিলেন। তিনি রেওয়ায়েত করেন– একবার আমার এক ভাই সিরিয়া থেকে আগমন করে আমাকে একটি উপহার দিয়ে বলে ঃ এটা কবুল করুন। এটা উৎকৃষ্ট উপহার। আমি বললাম ঃ তোমাকে এ উপহার কে দিল? সে বলল ঃ আমাকে ইবরাহীম তায়মী দান করেছেন। আমি বললাম ঃ তুমি ইবরাহীম তায়মীকে জিজ্ঞেস করনি যে, তিনি এটা কোথায় পেলেন? সে বলল ঃ হাঁ, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। জওয়াবে তিনি বললেন, তিনি কা'বা গৃহের আঙ্গিনায় বসে তাহলীল, তসবীহ ও তাহমীদে মশগুল ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে তাঁকে সালাম করতঃ ডান পার্শ্বে বসে যায়। তিনি জীবনে কখনও এমন সুন্দর সুশ্রী পুরুষ দেখেননি এবং তাঁর পোশাকের চেয়ে উৎকৃষ্ট, শুভ্র ও সুগন্ধিযুক্ত পোশাকও দেখেননি। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি কে এবং কোত্থেকে আগমন করলেন? আগন্তুক বলল ঃ আমি খিযির। ইবরাহীম জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি আমার কাছে কি উদ্দেশে আগমন করেছেন। খিযির বললেন ঃ আপনার সাথে সালাম কালাম করতে এসেছি। আমার কাছে একটি উপহার আছে,

যা আমি আপনাকে দিতে চাই। কেননা, আপনার প্রতি আমার মনে আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বত রয়েছে। ইবরাহীম জিজ্ঞেস করলেন ঃ উপহারটি কি? খিযির বললেন ঃ সূর্যোদয় ও তার আলো পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ার পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে সূরা ফাতেহা, সূরা ফালাক, সূরা নাস, সূরা কাফিরূন এবং আয়াতুল কুরসী সাত সাত বার পাঠ করবেন. অতঃপর سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ কলেমাটি সাত বার, দরূদ শরীফ সাত বার, নিজের জন্যে, পিতা-মাতার জন্যে এবং সকল মুমিন পুরুষ ও নারীর জন্যে এস্তেগফার সাত বার এবং নিম্নোক্ত দোয়া সাত বার পাঠ করবেন–

اَللّٰهُمَّ افْعَلْ بِىْ وَبِهِمْ عَاجِلًا وَاٰجِلًا فِى الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ مَا اَنْتَ لَهٗ اَهْلٌ وَلَا تَفْعَلْ بِنَا يَا مَوْلَانَا مَا نَحْنُ لَهٗ اَهْلٌ اِنَّكَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ جَوَّادٌ كَرِيْمٌ رَؤُفٌ رَّحِيْمٌ -

কিন্তু সাবধান, কোন সকাল সন্ধ্যায় এ আমল তরক করা উচিত হবে না। ইবরাহীম তায়মী বলেন ঃ আমি খিযির (আঃ)-কে বললাম ঃ এ উপহার আপনাকে কে দান করল, আমি তা জানতে চাই। তিনি বললেন ঃ এটা রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে দান করেছেন। আমি বললাম ঃ আপনি এর সওয়াব সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। তিনি বললেন ঃ আপনি যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যিয়ারত লাভ করবেন, তখন এর সওয়াব জিজ্ঞেস করে নেবেন। তিনিই বলে দেবেন।

ইবরাহীম তায়মী বলেন ঃ আমি এক রাতে স্বপ্নে দেখলাম, ফেরেশতারা যেন আমাকে বহন করে জান্নাতে পৌঁছে দিল। সেখানে আমি বিস্ময়কর বস্তুসমূহ দেখলাম। অতঃপর ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম– এসব সাজসরঞ্জাম কার জন্যে? তারা বলল ঃ যে কেউ তোমার মত আমল করবে, তার জন্যে। ইবরাহীম জান্নাতে দেখা অনেক বস্তুর বর্ণনা দিলেন এবং বললেন ঃ আমি সেখানকার ফল খেয়েছি, পানি পান করেছি। আমার কাছে রসূলুল্লাহ (সাঃ) আগমন করেছেন। তাঁর সাথে

সত্তর জন পয়গম্বর এবং সত্তর সারি ফেরেশতা ছিল। প্রত্যেক সারিতে পূর্ব-পশ্চিমের দূরত্ব পরিমাণে ফেরেশতা ছিল। তিনি আমাকে সালাম দ্বারা গৌরবান্বিত করলেন এবং আমার হাত ধরলেন। আমি আরজ করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, খিযির বলেন, তিনি এ হাদীসটি আপনার কাছে শুনেছেন। তিনি বললেন ঃ খিযির ঠিকই বলেছেন। তিনি যা বলেছেন, সত্য বলেছেন। পৃথিবীর লোকদের মধ্যে তিনিই আলেম, আবদালদের সরদার এবং আল্লাহর সৈনিকদের অন্যতম। অতঃপর আমি আরজ করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, যে ব্যক্তি এ আমল করে এবং আমি স্বপ্নে যা দেখেছি তা না দেখে, সে কি তা পাবে যা আমি পেয়েছি? তিনি বললেন ঃ সেই সত্তার কসম, যিনি আমাকে সত্য নবীরূপে প্রেরণ করেছেন– এই ওযিফার আমলকারী যদিও আমাকে না দেখে এবং জান্নাত না দেখে, তবুও তার সমস্ত কবীরা গোনাহ মাফ করা হবে। তার উপর থেকে আল্লাহ্ তাআলা ক্রোধ প্রত্যাহার করে নেবেন। বাম দিকের ফেরেশতাকে পূর্ণ এক বছরের পাপ লিপিবদ্ধ না করার আদেশ দেবেন। সেই সত্তার কসম, যিনি আমাকে সত্য নবীরূপে প্রেরণ করেছেন– এই ওযিফার আমল সে-ই করবে, যাকে আল্লাহ তাআলা ভাগ্যবানরূপে সৃষ্টি করেছেন এবং সেই বর্জন করবে, যে হতভাগারূপে সৃজিত হয়েছে। কথিত আছে, ইবরাহীম তায়মী চার মাস পর্যন্ত কিছুই পানাহার করেননি। এটা সম্ভবতঃ এ স্বপ্ন দেখার পরবর্তী অবস্থাই হবে।

কোরআন তেলাওয়াতের পর ফিকিরও একটি নিয়মিত কর্ম হওয়া উচিত। কি বিষয়ে ফিকির করবে এবং কিভাবে ফিকির করবে, তার বিস্তারিত বিবরণ চতুর্থ খণ্ডে ফিকির অধ্যায়ে উল্লেখ করা হবে। কিন্তু ফিকির মোটামুটি দু'প্রকার।

প্রথম, এমন বিষয়ে ফিকির করা, যা এলমে মোআমালায় উপকারী। উদাহরণতঃ নিজের অতীত ত্রুটি-বিচ্যুতির হিসাব নিকাশ করা, সামনের দিনগুলোর ওযিফা নির্দিষ্ট করা, কল্যাণের পরিপন্থী বিষয়সমূহ প্রতিহত করা, নিজের পাপের স্মরণ করা, যেসব বিষয়ের দ্বারা আমলে ত্রুটি দেখা দেয় সেগুলো চিন্তা করা, যাতে আমল সংশোধিত হয় এবং অন্তরে নিজের

আমল সম্পর্কে ও মুসলমানদের সাথে লেনদেন করার ব্যাপারে উত্তম নিয়ত হাযির করা।

দ্বিতীয়, এমন বিষয়ে ফিকির করা, যা এলমে মোকাশাফায় উপকারী। উদাহরণতঃ আল্লাহ্ তাআলার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ নেয়ামত এবং তা উপর্যুপরি লাভ করার বিষয়ে চিন্তাভাবনা করা, যাতে আল্লাহর অধিক মারেফত অর্জিত হয় এবং তাঁর অধিক শোকর করা যায়। অথবা আল্লাহ্ তাআলার শাস্তি নিয়ে চিন্তাভাবনা করা, যাতে আল্লাহ্র কুদরতের মারেফত বৃদ্ধি পায় এবং শাস্তি ও প্রতিশোধের ভয় বেশী হয়। এসব বিষয়ের মধ্যে প্রত্যেকটির অনেক বিভাগ রয়েছে। কারও জন্যে এগুলোতে ফিকির করার অবকাশ আছে এবং কারও জন্যে নেই। এ সম্পর্কে চতুর্থ খণ্ডে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

ফিকির একটি সেরা এবাদত। কেননা, এতে যিকিরও আছে এবং অতিরিক্ত আরও দু'টি বিষয় আছে। এক, মারেফত বেশী হওয়া। কারণ, ফিকির মারেফত ও কাশফের চাবি। দুই, মহব্বত বেশী হওয়া। কেননা, অন্তর যার মাহাত্ম্যে বিশ্বাসী হয় তাকেই মহব্বত করে। আল্লাহ্ তাআলার মাহাত্ম্য, তাঁর গুণাবলী, অত্যাশ্চর্য ক্রিয়াকর্ম ও কুদরতের মারেফত ব্যতীত পরিস্ফুট হয় না। ধারাবাহিকতা এভাবে হয়– ফিকির দ্বারা মারেফত অর্জিত হয়, মারেফত দ্বারা মাহাত্ম্য এবং মাহাত্ম্যের মাধ্যমে মহব্বত সৃষ্টি হয়। যিকিরও মহব্বতের কারণ হয়ে থাকে; কিন্তু মারেফতের কারণে যে মহব্বত হয়, তা মহব্বতের তুলনায় অনেক শক্তিশালী, দীর্ঘস্থায়ী ও বড় হয়ে থাকে। যেমন, কোন ব্যক্তি কারও সৌন্দর্য চোখে দেখে এবং তার সুন্দর চরিত্র ও ক্রিয়াকর্ম প্রশংসনীয় অভ্যাস সম্পর্কে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অবগত হয়ে তার প্রতি আশেক হয়ে যায়। অন্য এক ব্যক্তি কোন অনুপস্থিত লোকের সৌন্দর্য ও গুণের কথা কয়েকবার মোটামুটিভাবে শুনে বিস্তারিত অবগত না হয়েই তার জন্যে পাগলপারা হয়ে যায়। এখানে প্রথম ব্যক্তির এশক ও দ্বিতীয় ব্যক্তির মহব্বত সমান নয়। কেননা, কথায় বলে, شنیده کے بود مانند دیده অর্থাৎ শোনা বিষয় চাক্ষুষ দেখার

মত হবে কেমন করে? মারেফত অর্জনকারীর মহব্বত প্রত্যক্ষদর্শীর মহব্বতের অনুরূপ হয়ে থাকে এবং যিকিরকারীর মহব্বত শ্রবণকারীর মহব্বতের মত হয়ে থাকে। অর্থাৎ, যারা মনে ও মুখে সব সময় আল্লাহ্ তাআলার যিকির করে এবং কেবল অনুকরণগত ঈমান দ্বারা রসূলের আনীত বিষয়সমূহকে সত্য জ্ঞান করে, তাদের কাছে আল্লাহ্র গুণাবলীর মধ্য থেকে কয়েকটি মোটামুটি বিষয় রয়েছে, যেগুলোর প্রতি তারা অন্যদের বলার কারণে বিশ্বাস স্থাপন করে নিয়েছে। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহর মারেফত অর্জনকারী, তারা আল্লাহর প্রতাপ প্রতিপত্তি ও সৌন্দর্য অন্তরের দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেছে, যা বাহ্যিক চর্মচক্ষু থেকে অনেক বেশী শক্তিশালী। আল্লাহর প্রতাপ ও সৌন্দর্যের প্রকৃত স্বরূপ অবগত হওয়া কারও পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু প্রত্যেকেই এতটুকু প্রত্যক্ষ করতে পারে, যতটুকু তার জন্যে পর্দা উন্মুক্ত হয়। আল্লাহর সৌন্দর্য পর্দার কোন শেষ নেই। তবে যেসব পর্দাকে নূর বলা সঙ্গত এবং সেগুলো পর্যন্ত সাধক পৌঁছে মনে করতে থাকে যে, সে আসল পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, সেগুলোর সংখ্যা সত্তর। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলার সত্তরটি নূরের পর্দা রয়েছে। যদি তিনি এগুলো তুলে দেন, তবে তাঁর চেহারার নূর সমগ্র সৃষ্টিকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেবে। এসব পর্দাও একটির চেয়ে আরেকটি প্রখর এবং পরস্পর সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজির নূরের মত বিভিন্নতর। প্রথম অবস্থায় সবচেয়ে ক্ষুদ্র নূর প্রকাশ পায়, এর পর আরও বেশী এবং এর পর আরও বেশী নূর আত্মপ্রকাশ করে। এ কারণেই জনৈক সুফী বুযুর্গ হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ক্রমোন্নতিতে তাঁর সামনে যেসকল নূর প্রকাশ পেয়েছিল, সেগুলোর স্তর বর্ণনা করেছেন।

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا

অর্থাৎ, যখন তাঁর সামনে রাত্রি অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেল, তখন তিনি তারকা দেখতে পেলেন।

এ আয়াতের তফসীরে বুযুর্গগণ বলেন ঃ যখন হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর কাছে গোটা ব্যাপারটি সন্দিগ্ধ হয়ে গেল, তখন তিনি একটি

নূরের পর্দায় উপনীত হলেন, যা অন্যান্য নূর থেকে কম ছিল। এ কারণেই একে 'তারকা' বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। এ আয়াতে 'তারকা' বলে রাতের জ্বলজ্বলে 'তারকা' বুঝানো হয়নি। কেননা, এসব তারকা সম্পর্কে প্রত্যেকেই জানে যে, এগুলো 'রব' হওয়ার যোগ্য নয়। সুতরাং যে বস্তুকে সাধারণ মানুষও খোদা মনে করে না, তাকে খলীলুল্লাহ্ কিরূপে খোদা বলতে পারতেন? এসব পর্দাকে যে নূর বলা হয়েছে, তার অর্থও আলো নয়, যা চোখে দেখা যায়; বরং এখানে নূর বলে তাই বুঝানো হয়েছে, যা নিম্নোক্ত আয়াতে বুঝানো হয়েছে।

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ -

অর্থাৎ, আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর নূর। তাঁর নূর একটি তাকের মত, যাতে রয়েছে প্রদীপ।

এখন আমরা এ আলোচনা থেকে কলম ফিরিয়ে নিচ্ছি। কেননা, এটা এলমে মোআমালার বাইরে। এর স্বরূপ পর্যন্ত পৌঁছা কাশফ ব্যতীত সম্ভবপর নয়। খুব কম লোকের সামনেই এ দরজা উন্মুক্ত হয়। সাধারণ লোকের পক্ষে কেবল এলমে মোআমালায় উপকারী বিষয়াদি নিয়েই ফিকির করা সম্ভব। এ ফিকির অর্জিত হলে এর উপকারও অনেক।

মোট কথা, যে আখেরাত তলব করে, তার উচিত দোয়া, যিকির, তেলাওয়াত ও ফিকির– এ চারটি বিষয়ের ওযিফা ফজরের নামাযের পরে করা, বরং সর্বদা নিয়মিত নামাযান্তে এই ওযিফা করা। কেননা নামাযের পরে এগুলোর চেয়ে বড় কোন ওযিফা নেই। এসব বিষয়ের ক্ষমতা অর্জন করার উপায় হচ্ছে, নিজের কর্ম ও ঢাল নিয়ে নেয়া। অর্থাৎ, রোযা এমন একটি ঢাল, যা দ্বারা শয়তানের পথ সংকীর্ণ হয়ে যায়। শয়তানই বড় শত্রু এবং কল্যাণের পথে বাধা।

সোবহে সাদেকের পর ফজরের দু'রাকআত সুন্নত ও দু'রাকআত ফরয ছাড়া সূর্যোদয় পর্যন্ত কোন নামায নেই। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম এসময় যিকিরে মশগুল থাকতেন। এসময়ে যিকির

করাই উত্তম; কিন্তু যদি ফরয নামাযের পূর্বে নিদ্রা প্রবল হয় এবং নামায ছাড়া তা দূর না হয়, তবে নিদ্রা দূর করার উদ্দেশে নামায পড়লে কোন ক্ষতি নেই।

দিনের ওযিফার দ্বিতীয় সময় সূর্যোদয় থেকে চাশতের সময় পর্যন্ত। 'চাশত' বলতে আমাদের উদ্দেশ্য সূর্যোদয় থেকে সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়া পর্যন্ত যতটুকু সময়, তার অর্ধেক হওয়া। বার ঘণ্টার দিন ধরা হলে সূর্যোদয়ের তিন ঘণ্টার মধ্যে চাশত হবে। অর্থাৎ, চার প্রহরের মধ্য থেকে এক প্রহর অতিবাহিত হবে। এই এক প্রহরে দুটি অতিরিক্ত ওযিফা রয়েছে। প্রথম চাশতের নামায। এর অবস্থা আমরা 'নামাযের রহস্য' অধ্যায়ে বর্ণনা করেছি। এশরাকের সময় দু'রাকআত নামায পড়া উত্তম। যখন সূর্য কিরণ পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে এবং সূর্য অর্ধ বর্শা পরিমাণ উপরে উঠে যায়, তখনকার সময়কে এশরাক বলা হয়। চার, ছয় অথবা আট রাকআত নফল তখন পড়বে, যখন রৌদ্র কিরণে বালু গরম হয়ে যায় এবং পা ঘর্মাক্ত হতে থাকে। যে ব্যক্তি চাশত ও এশরাকের যেকোন একটি নামায পড়বে, তার জন্যে চাশতের সময় খুবই উত্তম। কেউ যদি সূর্য অর্ধ বর্শা পর্যন্ত উপরে উঠার সময় থেকে ঢলে পড়ার কিছুক্ষণ পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে নামায পড়ে নেয়, তবে সে-ও আসল সওয়াব পেয়ে যাবে। কেননা, এ নামাযের সময় হচ্ছে দু'টি মাকরূহ সময়ের মধ্যকার সময়। এই সমগ্র সময়কে চাশতই বলা হয়। এশরাকের দু'রাকআত পড়ার সময় তখন হয়, যখন সূর্যোদয়ের মাকরূহ সময় অতিবাহিত হয়ে নামায পড়ার অনুমোদিত সময় শুরু হয়। কেননা, রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ সূর্যোদয়ের সাথে সাথে শয়তানের শিংও বের হয়। যখন সূর্য উঁচু হয়, তখন শয়তান তা থেকে আলাদা হয়ে যায়।

এ সময়ের দ্বিতীয় অতিরিক্ত ওযিফা হচ্ছে মুসলমান জনগণের সাথে সম্পর্কযুক্ত উৎকৃষ্ট কাজ সম্পাদন করা। উদাহরণতঃ কোন রোগীর হাল-হকিকত জিজ্ঞেস করতে যাওয়া, জানাযার সাথে যাওয়া, তাকওয়ার কাজে সাহায্য করা, এলেমের মজলিসে হাযির হওয়া এবং কোন মুসলমানের অভাব দূর করা। এ ধরনের কোন কাজ না থাকলে উপরোক্ত

চার ওযিফা অর্থাৎ, দোয়া যিকির, তেলাওয়াত ও ফিকিরে মশগুল থাকবে। ইচ্ছা করলে নফল নামাযে ব্যাপৃত থাকবে। কারণ, সোবহে সাদেক হওয়ার পর নফল নামায মাকরূহ থাকলেও এ সময়ে মাকরূহ নয়।

দিনের ওযিফার তৃতীয় সময় চাশতের সময় থেকে সূর্য ঢলে পড়া পর্যন্ত। এ সময়ের ওযিফাও উপরোক্ত চারটি বিষয় এবং অতিরিক্ত দু'টি বিষয়। প্রথম, জীবিকা উপার্জনে মশগুল হওয়া। সুতরাং ব্যবসায়ী হলে সততা ও ঈমানদারীর সাথে ব্যবসা করবে। পেশাদার হলে মানুষের হিত সাধনের প্রতি লক্ষ্য রাখবে এবং কোন কাজে আল্লাহর যিকির বিস্মৃত হবে না। প্রত্যহ উপার্জন করতে সক্ষম হলে সেদিনের প্রয়োজন পরিমাণে উপার্জন করে ক্ষান্ত হবে। এই পরিমাণে উপার্জন করার পর পরওয়ারদেগারের ঘরে গিয়ে আখেরাতের জন্যে পাথেয় সংগ্রহ করা উচিত। কেননা, আখেরাতের পাথেয় অধিক দরকারী। এর মুনাফা অনন্তকাল স্থায়ী। সেমতে বলা হয়, ঈমানদার ব্যক্তিকে তিনটি কাজের কোন না কোন একটি করতে দেখা যায়। হয় সে মসজিদে নামায ইত্যাদিতে মশগুল থাকে, না হয় জনকোলাহল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আপন গৃহে থাকে, না হয় কোন জরুরী কাজে নিয়োজিত থাকে। অধিকাংশ লোক জরুরী বস্তুর পরিমাণ কি তা জানে না। না হলেও চলে, সেটাকেও তারা জরুরী মনে করে নেয়। এর কারণ, শয়তান তাদেরকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং মন্দ কাজে প্ররোচিত করে। এ সময়ের দ্বিতীয় অতিরিক্ত ওযিফা হচ্ছে দুপুরের ঘুম। এটা এই দৃষ্টিতে সুন্নত যে, এর মাধ্যমে রাত্রি জাগরণে সাহায্য পাওয়া যায়। যেমন– দিনের বেলায় রোযা রাখতে সহায়ক বিধায় সেহরী খাওয়া সুন্নত। সুতরাং রাতে না জেগেও যদি কেউ দিনে ঘুমায়, তবে সে কোন সৎকাজ করেনি। দিনের ঘুমের সময় যদি কেউ গাফেল লোকদের সাথে গল্প গুজবে মেতে থাকে, তবে তার জন্যে দিনে ঘুমানোই উত্তম। কেননা, ঘুমানোর মধ্যে চুপ থাকা ও নিরাপত্তা তো রয়েছে। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ এক যমানা আসবে, যখন চুপ থাকা ও ঘুমিয়ে পড়া সকল আমলের সেরা আমল হবে। অনেক এবাদতকারীর

উত্তম অবস্থা হচ্ছে নিদ্রার অবস্থা। এটা তখনও যখন এবাদতে এখলাস না থাকে এবং নামের উদ্দেশে এবাদত করা হয়। হযরত সুফিয়ান সওরী বলেন ঃ পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ ঘুমানোর সময়কে নিরাপত্তার জন্যে ভাল মনে করতেন। মোট কথা, নিরাপত্তা ও রাত জাগরণের নিয়তে দিনে ঘুমানো সওয়াবের কাজ। কিন্তু সূর্য ঢলে পড়ার এতটুকু পূর্বে জাগ্রত হওয়া উচিত, যাতে নামাযের জন্যে প্রস্তুত হওয়া যায়।

দিনের ওযিফার চতুর্থ সময় সূর্য ঢলে পড়ার সময় থেকে যোহরের ফরয ও সুন্নত নামায সমাপ্ত করা পর্যন্ত। এ সময় দিনের সকল সময় অপেক্ষা ছোট ও উত্তম। সুতরাং সূর্য ঢলার পূর্বে ওযু করে মসজিদে উপস্থিত হবে। যখন সূর্য ঢলে পড়ে এবং মুয়াজ্জিন আযান শুরু করে, তখন আযানের জওয়াব পর্যন্ত সবর করবে। এর পর আযান ও একামতের মধ্যবর্তী সময়কে এবাদতে ব্যয় করার জন্যে উঠে দাঁড়াবে। খোদায়ী উক্তি وَحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ এ সময়ই বুঝানো হয়েছে। এসময় চার রাকআত নামায পড়বে। এসব রাকআত লম্বা করে পড়া উচিত। কেননা, এ সময়ে আকাশের দরজা খোলা থাকে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এটা পছন্দ করতেন যে, এ সময় তাঁর কোন আমল উপরে উত্থিত হোক। এর পর জামাতে যোহরের ফরয নামায পড়বে এবং ফরযের পর দু'রাকআত পড়বে।

দিনের ওযিফার পঞ্চম সময় যোহরের পর থেকে আসর পর্যন্ত। এ সময় মসজিদে বসে যিকির ও নামাযে মশগুল থেকে আসরের নামাযের জন্যে অপেক্ষা করা মোস্তাহাব। কেননা, এক নামাযের পর অন্য নামাযের অপেক্ষা করা উৎকৃষ্ট আমল। এটা ছিল পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের রীতি। কেউ তখন যোহর ও আসরের মাঝামাঝি সময়ে মসজিদে প্রবেশ করলে নামাযীদের তেলাওয়াতের গুঞ্জন মৌমাছির আওয়াযের মত শুনতে পেত। যদি ঘরে থাকলে ধর্মের নিরাপত্তা ও ফিকিরে একাগ্রতা বেশী হয়, তবে ঘরে চলে যাওয়াই উত্তম। যে ব্যক্তি সূর্য ঢলে পড়ার পূর্বে ঘুমিয়ে নেয়, তার জন্যে এ সময় ঘুমানো মাকরূহ। কেননা, দিনে দু'বার ঘুমানো ভাল

নয়। জনৈক আলেম বলেন ঃ তিনটি বিষয়ের কারণে আল্লাহ্ তাআলা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন– এক, আশ্চর্যের বিষয় ছাড়াই হাসা; দুই, ক্ষুধা ছাড়াই খাদ্য গ্রহণ করা এবং তিন, রাত জাগরণ ছাড়াই দিনের বেলায় ঘুমানো। দিবা রাত্রির চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আট ঘন্টা ঘুমানোই ঘুমের সুষম পরিমাণ। রাত্রি বেলায় আট ঘন্টা ঘুমিয়ে থাকলে দিনে ঘুমানোর কোন অর্থ নেই। তবে রাতে কম ঘুমিয়ে থাকলে দিনের বেলায় ঘুমিয়ে আট ঘন্টা পূর্ণ করা যেতে পারে। ষাট বছর বয়স হলে তা থেকে বিশ বছর কমে যাওয়াটাই মানুষের জন্যে যথেষ্ট। প্রত্যহ আট ঘন্টা ঘুমালেই তা হয়। রুটি যেমন দেহের খাদ্য, তেমনি ঘুমও আত্মার খাদ্য বিধায় ঘুম সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা সম্ভব নয়। এরই মাঝারি পরিমাণ হচ্ছে দৈনিক আট ঘন্টা। এর কম ঘুমালে মাঝে মাঝে দেহের স্থিরতা বিনষ্ট হয়। কেউ ক্রমান্বয়ে অনিদ্রার অভ্যাস গড়ে তুললে সেটা তার জন্যে ক্ষতিকর না-ও হতে পারে।

দিনের ওযিফার ষষ্ঠ সময় আসরের সময় থেকে শুরু হয়। সূরা আসরে আল্লাহ তাআলা وَالْعَصْرِ বলে এ সময়েরই কসম খেয়েছেন এবং وَعَشِيًّا وَحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ বাক্যের দু'রকম তফসীরের এক তফসীর অনুযায়ী عشى বলে এ সময়কেই বুঝানো হয়েছে। এ সময়ে আযান ও একামতের মাঝখানে চার রাকআত ব্যতীত কোন নামায নেই। সুতরাং ফরয সমাপনান্তে পূর্বোল্লিখিত চার প্রকার ওযিফায় মশগুল হওয়া উচিত এবং তা সূর্য ফেকাসে হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অব্যাহত রাখা কর্তব্য। এ সময়ে নামায নিষিদ্ধ বিধায় চিন্তাভাবনা সহকারে তেলাওয়াত করা উত্তম। এতে উপরোক্ত চারটি ওযিফারই সওয়াব অর্জিত হবে।

দিনের ওযিফার সপ্তম সময় সূর্য ফেকাসে হওয়ার সময় থেকে শুরু হয়। প্রথম সময়টি যেমন ছিল সূর্যোদয়ের পূর্বে, তেমনি এই শেষ সময়টি সূর্যাস্তের পূর্বে। আল্লাহ্ তাআলার এ উক্তিতে এ সময়ই বুঝানো হয়েছে– فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ হযরত হাসান বসরী

বলেন ঃ পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ দিনের শুরু ভাগের তুলনায় দিনের শেষ ভাগের সম্মান বেশী করতেন। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ পূর্ববর্তীরা দিনের শুরু ভাগকে দুনিয়ার জন্যে এবং শেষ ভাগকে আখেরাতের জন্যে নির্ধারিত রাখতেন। এ সময়ে বিশেষ তসবীহ্ ও এস্তেগফার মোস্তাহাব এবং প্রথম সময়ে লিখিত ওযিফা সাধারণভাবে মোস্তাহাব। সূর্যাস্তের পূর্বে সূরা ওয়াশ্‌শামস, সূরা ওয়াল্লাইল, ফালাক ও নাস পাঠ করা মোস্তাহাব। সূর্য ডুবতে থাকার সময় এস্তেগফার পড়তে থাকা ভাল। এর পর মুয়ায্‌যিনের আযান শুনে বলবে–

اَللّٰهُمَّ هٰذَا اِقْبَالُ لَيْلِكَ وَاِدْبَارُ نَهَارِكَ –হে আল্লাহ্, এটা তোমার রাত্রির আগমন ও দিনের নির্গমন। অতঃপর মুয়ায্‌যিনের জওয়াব দেবে এবং মাগরিবের নামাযে মশগুল হবে।

সূর্যাস্তের সাথে সাথে দিনের অবসান ঘটে। এখন বান্দার উচিত নিজের হিসাব নেয়া। কেননা, তার পথের একটি মনযিল অতিক্রান্ত হয়ে গেল। যদি সে দিনটি বিগত দিনের সমান হয়, তবে তার লোকসান হয়েছে বলতে হবে। আর যদি বিগত দিনের তুলনায় খারাপ হয়, তবে অভিশপ্ত বলতে হবে। কেননা, রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ যেদিন আমার কল্যাণের দিক দিয়ে অধিক ভাল না হয়, সেদিনে যেন আমার বরকত না হয়। সুতরাং যদি দেখ, সমগ্র দিন প্রচুর নেক কাজে অতিবাহিত হয়েছে, তবে এটা একটা সুসংবাদ। এজন্যে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা উচিত। আর যদি বিপরীত অবস্থা হয়, তবে রাত্রি দিনের স্থলবর্তী, যা কিছু ত্রুটি রয়ে গেছে, রাতে তা পূরণ করার সংকল্প করবে।

রাত্রির ওযিফার পাঁচটি সময়ের মধ্য থেকে প্রথম সময় সূর্যাস্তের পর থেকে পশ্চিমাকাশের লাল আভা দূর হওয়া পর্যন্ত। এর পরেই এশার সময় এসে যায়। এ সময়ের ওযিফা এই ঃ প্রথমে মাগরিবের নামায পড়বে। এর পর এশা পর্যন্ত নফল নামাযে মগ্ন থাকবে। আওয়াবীনও এ সময়েরই নামায, যা تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ আয়াতে বুঝানো হয়েছে। সেমতে হাসান বসরী (রহঃ) থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতে

আছে, জনৈক ব্যক্তি এ আয়াত সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন ঃ এতে মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী নামায বুঝানো হয়েছে। তোমরা এ নামায অপরিহার্য করে নাও। কেননা, এটা দিনের অনর্থক কর্মকাণ্ড দূর করে এবং তার পরিণাম শুভ করে।

রাত্রির ওযিফার দ্বিতীয় সময় এশার সময়ের সূচনা থেকে মানুষ নিদ্রা যাওয়ার সময় পর্যন্ত। এ সময় থেকেই অন্ধকার গাঢ় হতে থাকে। আল্লাহ্ তাআলা এ সময়ের কসম খেয়ে বলেছেন– وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ অর্থাৎ, রাত্রির কসম ও অন্ধকারের কসম, যা তাতে ঘনিয়ে আসে। এ সময়ের ওযিফা তিনটি। প্রথম এশার ফরয ছাড়া দশ রাকআত নামায পড়বে। চার রাকআত ফরযের পূর্বে, যাতে আযান ও একামতের মধ্যবর্তী সময় খালি না থাকে এবং ছয় রাকআত ফরযের পরে; প্রথমে দু'রাকআত ও পরে চার রাকআত। এসব রাকআতে কোরআনের বিশেষ আয়াত পাঠ করবে; যেমন সূরা বাকারার শেষ আয়াত, আয়াতুল করসী, সূরা হাদীদের শুরু এবং সূরা হাশরের শেষ। দ্বিতীয়ত তের রাকআত পড়বে। যার শেষে থাকবে বেতের। রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি রাতে বেশীর চাইতে বেশী এই পরিমাণ নামায পড়েছেন। হুশিয়ার ব্যক্তি রাত্রির শুরুতে এসব রাকআতের সময় নির্দিষ্ট করে নেয়। আর শক্ত সামর্থ্য ব্যক্তি রাত্রির শেষ দিকে এ নামায পড়ে, কিন্তু রাত্রির শুরুতে পড়াই সাবধানতা। কেননা, শেষ রাতে চোখ না খোলারও সম্ভাবনা থাকে। তবে শেষ রাতে উঠা অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেলে শেষ রাতে পড়াই উত্তম। এসব রাকআতে বিশেষ বিশেষ সূরা থেকে তিনশ' আয়াত পরিমাণ পাঠ করা উচিত, যেগুলো রসূলুল্লাহ (সাঃ) অধিকাংশ সময় পাঠ করতেন। উদাহরণতঃ সূরা ইয়াসীন, আলিফ-লাম-মীম সাজদা, দুখান, মুলক, যুমার ও ওয়াকেআ। তৃতীয়তঃ বেতের পাঠ করা। তাহাজ্জুদের অভ্যাস না থাকলে এটা ঘুমানোর পূর্বেই পড়ে নেয়া উচিত। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ আমাকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বেতের পাঠ না করে ঘুমাতে নিষেধ করেছেন। তাহাজ্জুদের অভ্যাস থাকলে বিলম্বে বেতের পড়া উত্তম।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ রাত্রির নফল নামায দু' দু'রাকআত। ভোর হয়ে যাওয়ার ভয় থাকলে এক রাকআত পড়ে বিজোড় করে নেবে।

বেতেরের পর এই দোয়া পড়া মোস্তাহাব ঃ

سُبْحَنَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ رَبِّ الْمَلَٰئِكَةِ وَالرُّوحِ جَلَّلْتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْعَظَمَةِ وَالْجَبَرُوتِ وَتَعَزَّزْتَ بِالْقُدْرَةِ وَقَهَرْتَ الْعِبَادَ بِالْمَوْتِ ـ

অর্থাৎ, আমি শাহানশাহ, অত্যন্ত পবিত্র, জিব্রাঈল ও ফেরেশতাগণের পরওয়ারদেগারের পবিত্রতা বর্ণনা করি। হে আল্লাহ, তুমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে মাহাত্ম্য দ্বারা আবৃত করে রেখেছ, তুমি আপন কুদরতে মহিমান্বিত হয়েছ এবং মৃত্যু দ্বারা বান্দাদেরকে পরাভূত করে রেখেছ।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) ফরয ছাড়া অধিকাংশ নামায বসে পড়তেন। তিনি বলতেন ঃ যে বসে বসে নফল নামায পড়ে, সে দাঁড়িয়ে পড়ার তুলনায় কম সওয়াব পাবে এবং যে শুয়ে শুয়ে পড়ে, সে বসে পড়ার তুলনায় অর্ধেক সওয়াব পাবে। এ থেকে জানা যায়, নফল শুয়ে পড়াও জায়েয।

রাত্রির ওযিফার তৃতীয় সময় হচ্ছে ঘুমানোর সময়। ঘুমকে ওযিফা মনে করাতেও কোন দোষ নেই। কেননা, যথাযথ আদবের প্রতি লক্ষ্য রেখে ঘুমালে ঘুমও এবাদতের মধ্যে গণ্য হয়। হাদীসে বর্ণিত আছে, বান্দা যদি ওযু সহকারে আল্লাহকে স্মরণ করে ঘুমাতে যায়, তবে জাগ্রত হওয়া পর্যন্ত তাকে নামায পাঠকারী লেখা হবে। হাদীসে আরও বলা হয়েছে, বান্দা ওযু সহকারে ঘুমালে তার রূহকে আরশ পর্যন্ত উঠানো হয়। এটা সাধারণ বান্দাদের জন্যে। অতএব আলেম ও স্বচ্ছ মনের অধিকারীদের জন্যে এরূপ হবে না কেন? তারা তো নিদ্রায় অনেক রহস্য অবগত হন। এজন্যেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ আলেমের নিদ্রা এবাদত এবং তার শ্বাস গ্রহণ তসবীহ্। হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি রাতে জেগে কি কর? তিনি বললেন ঃ আমি সমস্ত রাত্রি জাগ্রত থাকি। মোটেই ঘুমাই না।

কিছুক্ষণ পর পর কোরআন তেলাওয়াত করি। মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ) বললেন ঃ আমি প্রথমে ঘুমাই, এর পর জাগ্রত থাকি। নিদ্রার মধ্যে সওয়াবের নিয়ত তাই করি, যা জাগরণে কর। এর পর তাঁরা উভয়েই আপন আপন অবস্থা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করলে তিনি বললেন ঃ আবু মূসা, মুয়ায তোমার চেয়ে অধিক ফেকাহ্‌বিদ (আইনবিদ)।

ঘুমাবার আদব দশটি ঃ (১) ওযু ও মেসওয়াক করা। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ বান্দা যখন ওযু সহকারে ঘুমায় তখন তার রূহ আরশ পর্যন্ত উঠানো হয়। ফলে তার স্বপ্ন সত্য হয়ে থাকে। ওযু সহকারে না ঘুমালে তার রূহ আরশ পর্যন্ত পৌছতে পারে না। তখন সে বিক্ষিপ্ত স্বপ্ন দেখে। এরূপ স্বপ্ন সত্য হয় না। এ হাদীসে ওযুর অর্থ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা। অদৃশ্যের পর্দা সরে যাওয়ার মধ্যে অভ্যন্তরীণ পবিত্রতাই কার্যকর হয়ে থাকে।

(২) মেসওয়াক ও অযুর পানি শিয়রে রেখে শেষ রাতে উঠার নিয়ত করা। এর পর চোখ খুলতেই মেসওয়াক করে নেবে। জনৈক পূর্ববর্তী বুযুর্গ রাতে যতবার চোখ খুলত ততবারই মেসওয়াক করতেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সমগ্র রাতে কয়েকবার মেসওয়াক করতেন– প্রত্যেক ঘুমের সময় এবং প্রত্যেক জাগরণের সময় পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ ওযু করার মত পানি না পেলে কেবল ওযুর অঙ্গ পানি দ্বারা মুছে নিতেন। তাও না পেলে তারা কেবলামুখী হয়ে বসে যিকির, দোয়া ও ফিকিরে মশগুল থাকতেন। বলাবাহুল্য, এমতাবস্থায় এটাই তাহাজ্জুদের স্থলবর্তী। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি শেষ রাতে উঠার নিয়ত করে শয্যা গ্রহণ করে, এর পর সকাল পর্যন্ত তার চোখ না খোলে, সে তাহাজ্জুদ পড়ার সওয়াব পেয়ে যাবে, তার ঘুম আল্লাহর জন্য সদকা হবে।

(৩) কোন ব্যক্তির কোন ওসিয়ত করার থাকলে সে যখনই ঘুমাতে যাবে, তখনই ওসিয়তটি লেখে শিয়রে রেখে দেবে। কেননা, ঘুমের ভেতরও রূহ কবজ হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। ওসিয়ত ছাড়াই যে

ব্যক্তি মরে যায়, তাকে আলমে বরযখে কেয়ামত পর্যন্ত বলার অনুমতি দেয়া হয় না। মৃতরা তার যিয়ারতে আসে এবং কথাবার্তা বলে; কিন্তু সে বলে না। তখন তারা পরস্পরে বলে ঃ এই মিসকীন ওসিয়ত ছাড়া মরেছে। আকস্মিক মৃত্যুর আশংকায় ওসিয়ত করে দেয়া মোস্তাহাব। এটা আকস্মিক মৃত্যু শিথিল করে। কিন্তু যে ব্যক্তি মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত নয় এবং মানুষের হক আদায়ে গাফেল, তার জন্যে তা শিথিলকারক নয়।

(৪) সকল গোনাহ্ থেকে তওবা করে এবং মুসলমানদের প্রতি পরিষ্কার মন নিয়ে ঘুমাবে। মনে মনে কাউকে জ্বালাতন করার কথা স্মরণ করবে না এবং নিদ্রাভঙ্গের পর কোন গোনাহের ইচ্ছা করবে না। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি এমতাবস্থায় শয্যা গ্রহণ করে যে, কাউকে জ্বালাতন করার নিয়ত রাখে না এবং কারও প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে না, তার সকল গোনাহ্ মার্জনা করা হবে।

(৫) উৎকৃষ্ট বিছানা বিছিয়ে আরামপ্রিয় না হওয়া; বরং বিছানা বর্জন করবে; অথবা এ ব্যাপারে মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে। জনৈক বুযুর্গ বিছানা বিছানো মাকরূহ মনে করতেন এবং ঘুমের জন্যে বিছানা জৌলুস মনে করতেন। সুফ্‌ফাবাসী সাহাবায়ে কেরাম ঘুমাতে গিয়ে মাটিতে কিছুই বিছাতেন না। তারা বলতেন ঃ আমরা মাটি দিয়েই সৃজিত হয়েছি এবং মাটতেই মিশে যাব। তারা একে মনের নম্রতা ও বিনয়ের জন্যে অধিক কার্যকর মনে করতেন। সুতরাং কারও মন যদি এ কষ্ট সহ্য করতে সম্মত না হয়, তবে মাঝারি ধরনের বিছানা বিছিয়ে নেবে।

(৬) নিদ্রা প্রবল না হওয়া পর্যন্ত শয়ন করবে না এবং নিদ্রা জবরদস্তি টেনে আনবে না। হাঁ, যদি কেউ শেষ রাতে উঠার জন্যে নিদ্রার সাহায্য চায়, তবে চেষ্টা করে নিদ্রা আনতে দোষ নেই। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ নিদ্রা প্রবল হলেই নিদ্রা যেতেন, ক্ষুধা প্রবল হলেই খাদ্য গ্রহণ করতেন এবং প্রয়োজন হলেই কথা বলতেন। এ জন্যে আল্লাহ্ তাআলা তাঁদের শানে বলেন ঃ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (তারা রাত্রির সামান্য অংশে নিদ্রা যেত।) নিদ্রা যদি এত প্রবল হয় যে, নামায ও যিকিরে বাধা

সৃষ্টি করে; তবে ঘুমিয়ে থাকা উচিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে কেউ আরজ করল ঃ অমুক মহিলা রাতে নামায পড়ে। নিদ্রা প্রবল হলে সে একটি রশিতে ঝুলতে থাকে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এরূপ করা উচিত নয়। যতটুকু সম্ভব নামায পড়বে এবং নিদ্রা প্রবল হলে ঘুমিয়ে পড়বে। অন্য এক ব্যক্তি আরজ করল ঃ অমুক ব্যক্তি নামায পড়ে– নিদ্রা যায় না এবং রোযা রাখে, ইফতার করে না। তিনি বললেন ঃ আমি তো নামাযও পড়ি, নিদ্রাও যাই এবং রোযাও রাখি, ইফতারও করি। এটা আমার তরীকা। যে এই তরীকা থেকে মুখ ফেরায়, সে আমার দলভুক্ত নয়। তিনি আরও বলেন ঃ তোমরা এ ধর্মের সাথে মোকাবিলা করো না। এটা মজবুত ধর্ম। যে কেউ এর সাথে মোকাবিলা করবে, অর্থাৎ সাধ্যাতিরিক্ত কাজ নিজের জন্যে জরুরী করে নেবে, সে পরাভূত হবে এবং ধর্ম প্রবল থাকবে।

(৭) কেবলামুখী হয়ে ঘুমাবে। এটা দু'প্রকার– এক, চিত হয়ে শুয়ে মুখ কেবলার দিকে রাখা; যেমন মৃতকে শোয়ানো হয়। দুই, ডান পার্শ্বে শুয়ে মুখ এবং শরীরের সামনের অংশ কেবলার দিকে রাখা; যেমন লহদ ধরনের কবরে মৃতকে রাখা হয়।

(৮) শোয়ার সময় দোয়া করবে এবং বলবে ঃ بِاسْمِكَ رَبِّىْ وَضَعْتُ جَنْبِىْ وَبِكَ اَرْفَعُهٗ শোয়ার সময় বিশেষ বিশেষ আয়াত পাঠ করা মোস্তাহাব; যেমন আয়াতুল করসী, সূরা বাকারার শেষ আয়াত এবং নিম্নোক্ত আয়াত ঃ

وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِىْ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ وَّتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ .

অর্থাৎ, তোমাদের উপাস্য একক উপাস্য। কোন উপাস্য নেই তাঁকে ছাড়া, তিনি দয়াময়, অতিশয় মেহেরবান। নিশ্চয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃজনে, দিবারাত্রির পরিবর্তনে, নৌকায়, যা চলে সমুদ্রে মানুষের উপকারী সামগ্রী নিয়ে, আল্লাহ্ কর্তৃক অবতীর্ণ পানিতে, যা দ্বারা তিনি মৃত্তিকাকে মরে যাওয়ার পর জীবিত করেন এবং পৃথিবীতে সকল প্রকার প্রাণী ছড়িয়ে দেন, বায়ু ও মেঘমালার ঘূর্ণনে, যা আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে আজ্ঞাবহ হয়ে আছে– নিদর্শনাবলী রয়েছে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্যে।

কথিত আছে, যে কেউ শোয়ার সময় এই আয়াত পাঠ করে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে কালামে মজীদ মুখস্থ করিয়ে দেন। সে কখনও তা ভুলে না। এছাড়া সূরা আরাফের এই আয়াত পাঠ করবে–

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍۭ بِاَمْرِهٖ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ - اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ - وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا - وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ -

অর্থাৎ নিশ্চয় তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি পরিয়ে দেন রাতের উপর দিনকে এমতাবস্থায় যে, দিন দৌড়ে দৌড়ে রাতের পেছনে আসে। তিনি সৃষ্টি করেছেন সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজিকে তার আদেশের অনুগামী করে। জেনে রেখো, সৃষ্টি করা ও আদেশ দান করা তাঁরই কাজ। আল্লাহ বরকতময়। তিনি বিশ্বজগতের প্রভু। তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ডাক কাকুতি-মিনতিভরে এবং সঙ্গোপনে। তিনি সীমা লংঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। তোমরা পৃথিবীকে কুসংস্কারমুক্ত ও ঠিক করার পর তাতে অনর্থ সৃষ্টি করো না।

তাঁকে আহ্বান কর ভয় ও আশা সহকারে। নিশ্চয় আল্লাহর রহমত সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী। এর পর قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ থেকে সূরা বনী-ইসরাঈলের শেষ পর্যন্ত পাঠ করবে। এ আয়াত পাঠ করলে একজন ফেরেশতা ঘরে প্রবেশ করে তোমার হেফাযত করবে এবং মাগফেরাতের দোয়া করবে। এর পর সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করে উভয় হাতে ফুঁক দেবে এবং মুখমন্ডলে ও সমগ্র দেহে হাত বুলিয়ে নেবে। বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাই করতেন।

(৯) শোয়ার সময় এই ধ্যান করবে যে, ঘুম হল এক প্রকার মৃত্যু এবং জাগরণ এক প্রকার জীবন লাভ। সেমতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِىْ لَمْ تَمُتْ فِىْ مَنَامِهَا ـ

আল্লাহ প্রাণ হস্তগত করে নেন, যখন তাদের মৃত্যুর সময় হয়। আর যাঁর মরণের সময় হয়নি তার প্রাণ হস্তগত করেন নিদ্রায়।

আরও বলেন ঃ وَهُوَ الَّذِىْ يَتَوَفّٰكُمْ بِاللَّيْلِ

অর্থাৎ, তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমাদেরকে হস্তগত করে নেন রাতে। এসব আয়াতে নিদ্রাকে ওফাত (হস্তগত করা) নাম দেয়া হয়েছে। জীবন মৃত্যুর মাঝখানে নিদ্রা এমন, যেমন দুনিয়া আখেরাতের মাঝখানে আলমে বরযখ। লোকমান (আঃ) তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন ঃ বৎস, যদি মৃত্যুতে সন্দেহ কর, তবে ঘুমিয়ো না। তুমি যেভাবে ঘুমাও ঠিক সেভাবে মরে যাবে। আর যদি মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে সন্দেহ কর, তবে ঘুমের পর জাগ্রত হয়ো না। ঘুমের পর যেমন তুমি জাগ্রত হও, তেমনি মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হবে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ) যখন ঘুমাতেন তখন আপন গাল ডান হাতের উপর রাখতেন এবং মনে করতেন, আজই ওফাত পেয়ে যাবেন। তখন তিনি সব শেষে এই দোয়া করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكَهٗ ـ

(দোয়া অধ্যায়ে উল্লিখিত এ দোয়ার শেষ পর্যন্ত।)

(১০) জাগ্রত হওয়ার সময় দোয়া পড়া। যখনই কেউ ঘুম থেকে জাগ্রত হয় কিংবা পার্শ্ব পরিবর্তন করে, তখনই সেই দোয়া পড়া উচিত, যা রসূলুল্লাহ (সাঃ) পড়তেন। অর্থাৎ এই দোয়া–

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ ـ

অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি এক প্রবল পরাক্রান্ত, আকাশমন্ডলী, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর প্রভু, পরাক্রমশালী, ক্ষমাময়। এ বিষয়ের চেষ্টা করবে যেন নিদ্রার সময়ও সবশেষে অন্তরে আল্লাহ্র যিকির এবং জাগরণের সময়ও সর্বপ্রথম মনে আল্লাহর যিকির জারি থাকে। এটা মহব্বতের পরিচয়। সুতরাং যখন চোখ খুলবে এবং উঠতে চাইবে, তখন জাগরণের সেই দোয়া পড়বে, যার শুরু এভাবে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ ـ

রাত্রির ওযিফার চতুর্থ সময় অর্ধেক রাত অতিবাহিত হওয়ার পর থেকে ছয় ভাগের এক ভাগ বাকী থাকা পর্যন্ত। এ সময়ে তাহাজ্জুদের জন্যে উঠা উচিত। কেননা, তাহাজ্জুদ তাকেই বলে, যা 'হুজুদ' অর্থাৎ, নিদ্রার পরে হয়। আল্লাহ্ তা'আলা এ সময়ের কসম খেয়ে বলেছেন– وَاللَّيْلِ اِذَا سَجٰى অর্থাৎ, রাত্রির কসম, যখন তা স্থিতিশীল হয়। রাত্রির স্থিতিশীলতা তখন হয়, যখন কোন চক্ষু খোলা থাকে না, আল্লাহর সেই চক্ষু ছাড়া, যাকে তন্দ্রাও স্পর্শ করে না। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ রাত্রির কোন্ অংশটিতে দোয়া অধিক কবুল হয়? তিনি বললেন ঃ রাত্রির মাঝামাঝি অংশে। হযরত দাউদ (আঃ) আল্লাহর

দরবারে আরজ করলেন ঃ ইলাহী, আমি তোমার এবাদত করতে চাই। এর জন্যে সর্বোত্তম সময় কোন্‌টি? আল্লাহ তা'আলা ওহী পাঠালেন ঃ হে দাউদ, রাতের শুরুতেও উঠ না এবং রাতের শেষেও না। কেননা, যে রাতের শুরুতে জাগ্রত থাকে, সে শেষ রাতে ঘুমিয়ে থাকে। আর যে শেষ রাতে জাগ্রত থাকে, সে শুরুতে জাগে না। কাজেই তুমি রাতের ঠিক মাঝখানে এবাদত কর। এতে তুমি আমার সাথে একা থাকবে এবং আমি তোমার সাথে একা থাকব ও তোমার প্রয়োজন মেটাব। শেষ রাতের ফযীলত সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে, তখন আকাশে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতাপ অবতরণ করে। এ সময়ের ওযিফা এরূপ ঃ জাগরণের দোয়া শেষ করে পূর্বোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী আদব ও সুন্নতের প্রতি লক্ষ্য রেখে ওযু করবে। এর পর জায়নামাযে এসে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে এবং এই দোয়া পাঠ করবে ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَّالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَّسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا .

অর্থাৎ, এর পর দশ বার সোবাহানাল্লাহ, দশ বার আলহামদু লিল্লাহ এবং দশ বার লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে। এর পর বলবে ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ ذُو الْمَلَكُوْتِ وَالْجَبَرُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ وَالْجَلَالِ وَالْقُدْرَةِ .

অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাহাজ্জুদের সময় যে দোয়া পড়তেন, সেই দোয়া পড়বে ঃ

اللهم لك الحمد انت نور السموات والارض ولك الحمد انت بهاء السموات والارض ولك الحمد انت زين السموات والارض ولك الحمد انت قيام السموات والارض ومن فيهن ومن عليهن انت الحق وامنك الحق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والنشور حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم

حق اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت واليك انبت وبك خاصمت واليك حاكمت فاغفرلى ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت اللهم ات نفسى تقواها وزكها كما انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اهدنى لاحسن الاعمال فانه لايهدى لاحسنها الا انت واصرف عنى سيئها لايصرف عنى سيئها الا انت اسئلك مسئلة البائس المسكين وادعوك دعاء المضطر الذليل فلا تجعلنى بدعائك رب شقيا وكن بى رؤوفا رحيما يا خير المسئولين واكرم المعطين ۔

অর্থাৎ, হে আল্লাহ তোমারই প্রশংসা। তুমি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর আলো। তোমারই প্রশংসা। তুমি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৌন্দর্য। তোমারই প্রশংসা। তুমি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর শোভা। তোমারই প্রশংসা। তুমি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মেরুদন্ড, যারা এগুলোর মধ্যে আছে, যারা এগুলোর উপরে আছে– সকলের মেরুদন্ড। তুমি সত্য। তোমা থেকে সত্য উদ্ভাসিত। তোমার সাক্ষাৎ সত্য। জাহান্নাম সত্য। পুনরুত্থান সত্য। পয়গম্বরগণ সত্য এবং মুহাম্মদ (সাঃ) সত্য।

হে আল্লাহ, তোমারই জন্যে মুসলমান হয়েছি, তোমারই প্রতি ঈমান এনেছি, তোমারই উপর ভরসা করেছি, তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করেছি, তোমারই সাহায্যে (শত্রুদের সাথে) বিবাদ করেছি এবং তোমারই নিকট বিচারপ্রার্থী হয়েছি। অতএব আমাকে ক্ষমা কর যা আমি অগ্রে পাঠিয়েছি, যা পরে পাঠিয়েছি, যা গোপনে করেছি, যা প্রকাশ্যে করেছি এবং যা অপচয় করেছি। তুমিই অগ্রবর্তী, তুমিই পশ্চাৎবর্তী। তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। হে আল্লাহ, আমার নফসকে তাকওয়া দান কর, তাকে পবিত্র কর, যেমন তুমি উত্তম পবিত্রকারী। তুমি এর

অভিভাবক। তুমি এর প্রভু। হে আল্লাহ, আমাকে সুন্দরতম আমলের পথ দেখাও। সুন্দরতম আমলের পথ তুমি ব্যতীত কেউ দেখায় না। আমা থেকে আমার নফসের কুকর্ম ফিরিয়ে দাও। তুমি ব্যতীত কেউ এর কুকর্ম ফেরায় না। আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি বিপন্ন মিসকীনের মত এবং তোমার কাছে দোয়া করি অভাবগ্রস্ত লাঞ্ছিতের মত। অতএব আমাকে হে পরওয়ারদেগার! দোয়ায় বঞ্চিত করো না এবং আমার প্রতি মেহেরবান ও দয়ালু হও হে সর্বোত্তম প্রার্থিত সত্তা ও সম্ভ্রান্ততম দাতা।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন– রসূলে করীম (সাঃ) যখন রাতে উঠে নামায শুরু করতেন, তখন এই দোয়া করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ اِهْدِنِىْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِكَ اِنَّكَ تَهْدِىْ مَنْ تَشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ -

অর্থাৎ, হে আল্লাহ, জিবরাঈল, মিকাঈল ও ইসরাফীলের প্রভু, নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী, তুমিই তোমার বান্দাদের মধ্যে বিতর্কিত বিষয়ে মীমাংসা কর। আমাকে বিতর্কিত সত্যের দিকে পথ প্রদর্শন কর তোমার আদেশ দ্বারা। নিশ্চয় তুমি যাকে ইচ্ছা সরল পথ প্রদর্শন কর।

এর পর নামায শুরু করবে এবং ছোট দু'রাকআত পড়বে। এর পর দু'রাকআত যতদূর সম্ভব বড় পড়বে। প্রত্যেক দু'রাকআতে সালামের পর একশ' বার সোবহানাল্লাহ বলা মোস্তাহাব। এতে স্বস্তি পাওয়া যাবে এবং নামাযে আনন্দ বেশী হবে। সহীহ রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, রসূলে করীম (সাঃ) রাত্রের নামাযে প্রথমে দু'রাকআত হালকা পড়তেন, এর পর দু'রাকআত লম্বা পড়তেন, এর পর তৃতীয় দু'রাকআত দ্বিতীয় দু'রাকআতের তুলনায় ছোট এবং চতুর্থ দু'রাকআত তৃতীয় দু'রাকআতের

চেয়ে ছোট পড়তেন। এমনিভাবে তের রাকআত হয়ে যায়। হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাহাজ্জুদের নামাযে সশব্দে কেরাত পড়তেন, না নিঃশব্দে? তিনি বললেন ঃ কখনও সশব্দে পড়তেন আবার কখনও নিঃশব্দে।

রাতের ওযিফার পঞ্চম সময় হচ্ছে রাতের ছয় ভাগের শেষ এক ভাগ। একে সেহরীর সময় বলা হয়।

এ সময় সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ

অর্থাৎ, সেহরীর সময়ে তারা এস্তেগফার করে।

এর অর্থ কারও মতে নামায পড়া। কেননা, নামাযেও এস্তেগফার থাকে। এ সময়টি ফজরের নিকটবর্তী। এটা রাতের ফেরেশতাদের চলে যাওয়ার এবং দিনের ফেরেশতাদের আগমনের সময়। এ সময়ের ওযিফা চতুর্থ সময়ের ন্যায় নামাযই বটে। সোবহে সাদেক হয়ে গেলে রাতের ওযিফার সমাপ্তি ঘটে এবং দিনের সময় শুরু হয়।

মোট কথা, যারা আবেদ তথা এবাদতকারী, তাদের জন্যে সময়ের এই ক্রমবিন্যাস বর্ণিত হল। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ প্রত্যহ এগুলো ছাড়া আরও চারটি বিষয় মোস্তাহাব মনে করতেন– রোযা রাখা, সদকা দেয়া (যদিও সামান্য হয়), রোগীদের হালহকিকত জিজ্ঞেস করা এবং জানাযায় উপস্থিত হওয়া। হাদীসে বলা হয়েছে, যে কেউ এ চারটি কাজ একদিনে করে, তার গোনাহ ক্ষমা করা হবে। যদি এগুলোর মধ্যে ঘটনাক্রমে কোনটি করা হয় এবং কোনটি করার সুযোগ না হয়, তবে নিয়ত অনুযায়ী সবগুলোর সওয়াব পাবে। আগেকার লোকেরা সারাদিনে কোন কিছুই খয়রাত না করা খারাপ মনে করতেন, যদিও তা একটি খোরমা অথবা পিয়াজ অথবা রুটির টুকরাও হত। কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ কেয়ামতে মানুষ তার সদকার ছায়াতলে থাকবে– শেষ মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত। একবার হযরত আয়েশা (রাঃ) জনৈক ভিক্ষুককে একটি আঙ্গুর দিলেন। এতে সেখানে উপস্থিত সকলেই একে অপরের দিকে তাকাতে শুরু করল। হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন ঃ তোমাদের কি হল? এই

আঙ্গুরের বহু কণার ওযন আছে। অর্থাৎ, আল্লাহ বলেন ঃ যে ব্যক্তি এক কণা পরিমাণ সৎকাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে। সুতরাং এই আঙ্গুরে তো অজস্র কণা রয়েছে।

অবস্থাভেদে ওযিফার প্রকার ঃ জানা উচিত, যারা আখেরাতের চাষাবাদ করতে চায় এবং আখেরাতের পথ অবলম্বন করে, তারা সর্বমোট ছয় প্রকার লোক হতে পারে– আবেদ, আলেম, তালেবে এলেম, শাসক, পেশাজীবী ও একত্ববাদী। একত্ববাদী সে ব্যক্তি, যে সর্বদা এক আল্লাহ পাকের মধ্যে ডুবে থাকে– অন্য কিছুর দিকে ভ্রূক্ষেপ করে না। এখন তাদের সকলের ওযিফা আলাদা আলাদাভাবে বিস্তারিত জানা উচিত।

(১) আবেদ– অর্থাৎ, এমন ব্যক্তি যে কেবল এবাদতেই মগ্ন থাকে। এছাড়া তার অন্য কোন কাজ নেই। সে এবাদত ছেড়ে দিলে নিষ্কর্মা বসে থাকা ছাড়া উপায় নেই। তার জন্যে সময় ও ওযিফার ক্রমবিন্যাস তাই যা আমরা দিবারাত্রির সময়সমূহে বর্ণনা করেছি। তবে এতে সামান্য পরিবর্তন হওয়া দূষণীয় নয়। সে তার অধিকাংশ সময় কেবল নামাযে অথবা তেলাওয়াতে অথবা সোবহানাল্লাহ বলার মধ্যে ডুবিয়ে রাখবে। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কারও ওযিফা একদিনে বার হাজার বার সোবহানাল্লাহ বলা ছিল। কেউ ত্রিশ হাজার বার সোবহানাল্লাহ বলতেন। কারও কারও নিয়ম ছিল, তিনশ' রাকআত থেকে নিয়ে ছয়শ' ও হাজার রাকআত পর্যন্ত পড়া। বর্ণিত আছে, তাঁরা দিবারাত্রির মধ্যে কমপক্ষে একশ' রাকআত নামায পড়তেন। কোন কোন লোকের ওযিফা ছিল অধিক পরিমাণে কোরআন তেলাওয়াত করা। কেউ একদিনে এক খতম এবং কেউ দু'খতম করতেন বলে বর্ণিত আছে। আবার কেউ এক দিন অথবা সমগ্র রাত একই আয়াত নিয়ে চিন্তাভাবনায় অতিবাহিত করে দিতেন। কুরয ইবনে ছায়রা মক্কায় অবস্থানকালে এক দিনে সাত চক্করের সত্তর তওয়াফ করতেন এবং এমনিভাবে রাতে সত্তর তওয়াফ করতেন। এর সাথে সাথে দিবারাতে দু'খতম কোরআন তেলাওয়াতও করতেন। এখন হিসাব করলে দেখা যায়, দিবারাত্রির তওয়াফের মধ্যে প্রায় ত্রিশ ক্রোশ দূরত্ব হয়। প্রত্যেক সাত চক্করের পর তওয়াফের দু'রাকআত যোগ

দিলে দু'শ আশি রাকআত হয়। অতএব এটা যে খুব কষ্টের কাজ তা সহজেই অনুমেয়।

এসকল ওযিফার মধ্যে কোন্ ওযিফায় অধিকাংশ সময় ব্যয় করা উত্তম, এ প্রশ্নের জওয়াবে বলা যায়, নামাযে দাঁড়িয়ে চিন্তাভাবনা করে ও অর্থ বুঝে কোরআন পাঠ করার মধ্যে সকল ওযিফাই শামিল থাকে, কিন্তু এটা নিয়মিতভাবে করা কঠিন বিধায় প্রত্যেকের অবস্থা অনুযায়ী উত্তম ওযিফা বিভিন্নরূপ হবে। ওযিফার উদ্দেশ্য অন্তর শুদ্ধ ও পবিত্র করা এবং আল্লাহ্র যিকির দ্বারা অলংকৃত করা। সুতরাং প্রত্যেকেরই আপন অন্তরের প্রতি লক্ষ্য করা উচিত। যে ওযিফার প্রভাব অন্তরে বেশী প্রতিফলিত হয়, তাই নিয়মিতভাবে করা উচিত। যদি তাতে ক্লান্তি বোধ হয় তবে অন্য ওযিফা বদলে নেবে। হযরত ইবরাহীম আদহাম জনৈক আবদালের কাহিনী বর্ণনা করেন, তিনি এক রাতে নদীর কিনারে নামাযরত ছিলেন। হঠাৎ উচ্চ সুরে একটি তসবীহ তাঁর কানে এল। তিনি কাউকে না দেখে বললেন ঃ আমি ফেরেশতা এবং এই নদীতে নিয়োজিত আছি। আমি যেদিন সৃজিত হয়েছি সেদিন থেকে এই তসবীহ্ দ্বারা আল্লাহ্ পাকের পবিত্রতা বর্ণনা করে আসছি। আবদাল নাম জিজ্ঞেস করলে সে নিজের নাম মুহাল হায়ীল বলল। আবদাল বললেন ঃ এ তসবীহ্ পাঠ করার সওয়াব কি ? সে ফেরেশতা বলল ঃ যে ব্যক্তি এই তসবীহ্ একশ' বার পাঠ করবে, সে মৃত্যুর পূর্বে বেহেশতে আপন স্থান দেখে নেয় অথবা তাকে দেখানো হয় । তসবীহ্টি এই ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَلِيِّ الدَّيَّانِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الشَّدِيْدِ الْاَرْكَانِ سُبْحَانَ مَنْ يَذْهَبُ بِاللَّيْلِ وَيَاتِىْ بِالنَّهَارِ سُبْحَانَ مَنْ لَّا يَشْغَلُهُ شَانٌ عَنْ شَانٍ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْحَنَّانِ الْمَنَّانِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْمُسَبَّحِ فِىْ كُلِّ مَكَانٍ -

অর্থাৎ, আমি পবিত্রতা বর্ণনা করি প্রতিফলদাতা সুউচ্চ আল্লাহ্র । আমি পবিত্রতা বর্ণনা করি মজবুত রোকনবিশিষ্ট আল্লাহ্র। আমি পবিত্রতা

বর্ণনা করি সেই সত্তার যিনি রাতকে নিয়ে যান এবং দিনকে আনয়ন করেন। পবিত্রতা বর্ণনা করি সেই সত্তার, যাঁকে এক কাজ অন্য কাজ থেকে বিরত রাখে না। আমি পবিত্রতা বর্ণনা করি স্নেহময় ও অনুগ্রহময় আল্লাহ্র । আমি পবিত্রতা বর্ণনা করি আল্লাহ্র, যাঁর পবিত্রতা সর্বত্র বর্ণিত হয়।

সুতরাং এই তসবীহ অথবা অন্য কোন তসবীহর প্রভাব অন্তরে অনুভব করলে তাই নিয়মিত করে যাবে।

(২) **আলেম**– যে ফতোয়াদান, পাঠদান ও পুস্তক রচনার মাধ্যমে মানুষের উপকার করে, তাকে আলেম বলা হয়। তার ওযিফা আবেদের ওযিফা থেকে ভিন্ন হবে। কেননা, আলেমের জন্যে গ্রন্থ অধ্যয়ন করা, গ্রন্থ রচনা করা ও পাঠ দান করা জরুরী। এ সবের জন্যে সময় দরকার। ফরয ও সুন্নতের পর এসব কাজের চেয়ে বড় কিছুই নেই। এলেমের মধ্যে তো আল্লাহর যিকির নিয়মিত হয়ই; এছাড়া আল্লাহ্ তা'আলা ও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বাণী সম্পর্কে গভীর চিন্তাভাবনা করা হয়। মানুষের উপকার করা তথা তাদেরকে আখেরাতের পথ বলে দেয়া এরই মাধ্যমে হয়। আমাদের মতে, যে এলেমের মর্তবা এবাদতের উপরে, তা হল সেই এলেম, যা মানুষকে পরকালের ব্যাপারে উৎসাহিত করে এবং দুনিয়াতে সংসারবিমুখ করে দেয়। এমন এলেম আমাদের উদ্দেশ্য নয় যা দ্বারা অর্থ, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও জনপ্রিয় হওয়ার বাসনা বৃদ্ধি পায়। আলেমের জন্যেও সময় ভাগ করে নেয়া সমীচীন। কেননা, সমস্ত সময় শিক্ষায় ব্যাপৃত রাখা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। তাই আলেমের সময় এভাবে বন্টন হওয়া উচিত– ভোর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত সে সমস্ত ওযিফায় কাটাবে, যেগুলো আমরা দিনের ওযিফায় প্রথম সময়ে উল্লেখ করেছি। সূর্যোদয় থেকে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত কেউ আখেরাতের নিমিত্ত পড়তে চাইলে পাঠদানে ব্যয় করবে। এরূপ শিক্ষার্থী না থাকলে এ সময় ফিকিরে অতিবাহিত করবে এবং ধর্মীয় শিক্ষার দুরূহ বিষয়সমূহ নিয়ে চিন্তা করবে। দ্বিপ্রহর থেকে আসর পর্যন্ত রচনা ও অধ্যয়নে ব্যয় করবে । আসর থেকে সূর্য বিবর্ণ হওয়া পর্যন্ত কেউ তফসীর, হাদীস অথবা উপকারী এলেম পাঠ করলে তা শ্রবণে মশগুল

থাকবে। এর পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত এস্তেগফার ও তসবীহ্ পাঠে ব্যাপৃত থাকবে। রাতের সময় বণ্টনে আলেমের জন্যে তাই উত্তম, যা ইমাম শাফেয়ী করেছিলেন। তিনি রাতকে তিন ভাগে ভাগ করে একভাগে অধ্যয়ন ও পাঠদান করতেন, দ্বিতীয় ভাগে নামায পড়তেন এবং শেষ তৃতীয় ভাগে নিদ্রা যেতেন। এটা শীতকালে সম্ভব। গ্রীষ্মকালে সম্ভবতঃ এটা সহনীয় হবে না। তবে দিনের বেলায় যথেষ্ট ঘুমিয়ে নিলে হতে পারে।

(৩) তালেবে এলেম– এলেমের অন্বেষণে মশগুল থাকা যিকির ও নফল নামাযে ব্যাপৃত থাকার তুলনায় অনেক উত্তম। তাই আলেম ও তালেবে এলেমের সময় বণ্টন প্রায় একই রূপ। পার্থক্য এই যে, যখন আলেম উপকারদানে মশগুল থাকবে, তখন তালেবে এলেম উপকার গ্রহণে মশগুল থাকবে।

(৪) পেশাজীবী– তাকে পরিবার পরিজনের জন্যে উপার্জন করতে হয়। পরিবার-পরিজনকে উপবাসে রেখে সমস্ত সময় এবাদতে ডুবে থাকা তার জন্যে জায়েয নয়। সুতরাং তার উচিত কাজের সময় বাজারে যাওয়া এবং আপন পেশায় মশগুল হওয়া। তবে পেশায় আল্লাহ্র যিকির বিস্মৃত না হয়ে তসবীহ্ ইত্যাদি অব্যাহত রাখবে। এগুলো কাজ করার সাথেও সম্ভবপর। প্রয়োজন অনুযায়ী উপর্জন হয়ে গেলে উপরোল্লিখিত ওযিফা পালন করবে। যদি সারা দিন পেশায় লেগে থাকে এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত উপার্জন দান করে দেয়, তবে এটা ওযিফার চেয়ে উত্তম। কেননা, যে এবাদতের ফায়দা অন্যেরাও পায়, তা সেই এবাদত থেকে উত্তম, যার উপকার বিশেষভাবে এক ব্যক্তিই লাভ করে। সদকা-খয়রাতের নিয়তে উপার্জন করা এমন একটি এবাদত, যা মানুষকে আল্লাহ্র নৈকট্যশালী করে দেয়। এতে অন্যের উপকার হয় এবং মুসলমানদের দোয়া অর্জিত হয়। ফলে সওয়াব দ্বিগুণ-ত্রিগুণ হয়ে যায়।

(৫) শাসক– যেমন ইমাম, বিচারক, সাধারণ মানুষের ব্যাপারাদির নির্বাহী কর্মকর্তা। এরূপ ব্যক্তির জন্যে মুসলমানদের প্রয়োজন মেটানো এবং শরীয়ত অনুযায়ী খাঁটি নিয়তে তাদের স্বার্থ রক্ষা করা উল্লিখিত

ওযিফাসমূহের তুলনায় উত্তম। এরূপ শাসক ব্যক্তির জন্যে উপযুক্ত হচ্ছে দিনের বেলায় ফরয নামাযকে যথেষ্ট মনে করে জনসাধারণের অধিকার রক্ষায় নিয়োজিত থাকা এবং রাতের বেলায় উল্লিখিত ওযিফাসমূহ আদায় করা; যেমন হযরত ওমর (রাঃ) করতেন। তিনি বলতেন ঃ ঘুমের সাথে আমার কি সম্পর্ক থাকতে পারে? আমি দিনের বেলায় ঘুমালে মুসলমানদের অধিকার বিনষ্ট হয়, আর রাতের বেলায় ঘুমালে নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করা হয়।

(৬) **একত্ববাদী**– যে এক আল্লাহ পাকের মহিমায় ডুবে থাকে, এছাড়া তার অন্য কোন চিন্তাই থাকে না, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছুকে সে ভালবাসে না, অন্য কাউকে ভয় করে না এবং অন্য কারও কাছে রিযিক আশা করে না, সে কোন কিছু দেখলে তাতে কেবল আল্লাহ্ তাআলাই দৃষ্টিগোচর হয়। যে ব্যক্তি এমন স্তরে পৌঁছে যায়, তার সময় বন্টন করার প্রয়োজন নেই; বরং ফরয এবাদতের পর তার ওযিফা একটিই, তা হচ্ছে আল্লাহর সাথে সর্বাবস্থায় অন্তরকে হাযির রাখা। অর্থাৎ, তার মনে যা উদয় হয়; কানে যে আওয়াজ পড়ে এবং দৃষ্টিতে যা ভেসে উঠে, সবগুলোতে শিক্ষা ও ফিকির অর্জিত হতে হবে। এরূপ ব্যক্তির যাবতীয় অবস্থাই তার মর্তবা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়ে থাকে। ফলে তার মতে এবাদতে এবাদতে কোন পার্থক্য থাকে না। এরূপ লোকদের বেলায়ই আল্লাহ্ তাআলার এই উক্তি সত্য প্রতিপন্ন হয়।

وَاِذِ اعْتَزَلْتُمُوْهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ فَاْوٗٓا اِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ ـ

অর্থাৎ, তোমরা যখন তাদেরকে এবং তাদের উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ কর, তখন গুহায় গিয়ে বস। তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রভু রহমত ছড়িয়ে দেবেন।

নিম্নোক্ত আয়াতেও তাদের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে ঃ

اِنِّىْ ذَاهِبٌ اِلٰى رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ ـ

অর্থাৎ, আমি আমার পালনকর্তার দিকে যাচ্ছি, তিনি আমাকে পথ

প্রদর্শন করবেন। এটা সিদ্দীকগণের মর্তবার শেষ সীমা। দীর্ঘকাল ওযিফা জপ করার পরই মানুষ এ মর্তবায় উন্নীত হতে পারে।

উপরে যা কিছু বর্ণিত হল, সবগুলোই আল্লাহর দিকের পথ। আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰى سَبِيْلًا ـ

অর্থাৎ, বলুন, প্রত্যেকেই আপন তরীকায় আমল করে। অতঃপর কে অধিক হেদায়াতপ্রাপ্ত, তা আপনার পালনকর্তা জানেন।

হেদায়াতপ্রাপ্ত সকলেই, কিন্তু একজনের হেদায়াত অন্যজনের চেয়ে বেশী। এক হাদীসে বলা হয়েছে– ঈমানের ৩৩৩টি তরীকা রয়েছে। যে ব্যক্তি এগুলোর কোন একটি তরীকার সাক্ষ্য দিয়েও মৃত্যুবরণ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সারকথা, এবাদতের ক্ষেত্রে মানুষের তরীকা বিভিন্নরূপ হলেও সবগুলোই আল্লাহ পর্যন্ত পৌছার তরীকা। পার্থক্য কেবল নৈকট্যের স্তরে । যার মধ্যে আল্লাহর মারেফত বেশী, সে আল্লাহর বেশী নৈকট্যশীল। মারেফত বেশী তারই হবে যে আল্লাহর এবাদত বেশী করে। ওযিফার ব্যাপারে প্রত্যেক শ্রেণীর জন্যে মূল কথা হচ্ছে স্থায়ীভাবে করা। কেননা, ওযিফার উদ্দেশ্য অভ্যন্তরীণ অবস্থার পরিবর্তন। কোন আমল এক দু'বার করলে তার প্রভাব কমই হয়ে থাকে; বরং এর কোন প্রভাবই পরিলক্ষিত হয় না। এ কারণেই রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

احب الاعمال الى الله ادومها وان قل

অর্থাৎ, আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় আমল তাই যা পরিমাণে কম হলেও স্থায়ীভাবে করা হয়।

হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে প্রশ্ন করা হয়, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আমল কিরূপ ছিল? তিনি বললেন ঃ তাঁর আমল স্থায়ী ছিল। তিনি যখন কোন আমল করতেন, স্থায়ীভাবে করতেন। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা কোন এবাদতে অভ্যস্ত করে দেন, সে অতিষ্ঠ হয়ে তা ত্যাগ করলে আল্লাহ্ ভীষণ অসন্তুষ্ট হন।

মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী এবাদতের ফযীলত

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলার কাছে সর্বোত্তম নামায হচ্ছে মাগরিবের নামায। মুসাফির ও গৃহে বসবাসকারী কারও জন্যে এ নামায হ্রাস করা হয়নি। এর দ্বারা রাতের নামায শুরু এবং দিনের নামায সমাপ্ত করা হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি মাগরিবের নামাযের পর দু'রাকআত পড়বে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাতে দু'টি প্রাসাদ নির্মাণ করবেন। বর্ণনাকারী বলেন ঃ আমি জানি না সোনার প্রাসাদ বলেছেন না রূপার প্রাসাদ। আর যে ব্যক্তি এর পর চার রাকআত পড়বে, তার ত্রিশ বছরের অথবা চল্লিশ বছরের গোনাহ মাফ করা হবে। হযরত উম্মে সালামা ও হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যে কেউ মাগরিবের পর ছয় রাকআত পড়বে, তার জন্যে এসব রাকআত পূর্ণ এক বছরের এবাদতের সমান হবে। সায়ীদ ইবনে জুবায়র (রঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি মাগরিব ও এশার মাঝখানে জমাতের মসজিদে এ'তেকাফ করবে এবং নামায ও তেলাওয়াত ব্যতীত সকল প্রকার কথাবার্তা থেকে বিরত থাকবে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাতে দু'টি প্রাসাদ নির্মাণ করবেন। প্রত্যেক প্রাসাদের দূরত্ব একশ' বছরের পথ হবে। উভয় প্রাসাদের মধ্যস্থলে বৃক্ষ রোপণ করা হবে। এসব বাগানে সারা পৃথিবীর মানুষের স্থান সংকুলান হবে। আবদাল কুরয ইবনে দাররা বলেন ঃ আমি হযরত খিযিরকে বললাম ঃ আমাকে এমন কিছু বলুন যা আমি প্রতি রাত্রে করতে পারি। তিনি বললেন ঃ মাগরিবের নামায পড়ার পর তুমি এশা পর্যন্ত নামাযেই থাক এবং কারও সাথে কথা বলো না। প্রত্যেক দু'রাকআতের পর সালাম ফেরাও। প্রত্যেক রাকআতে একবার আলহামদু এবং তিন বার সূরা এখলাস পাঠ কর। অতঃপর এশার নামায শেষে আপন গৃহে চলে যাও এবং কারও সাথে কথা না বলে দু'রাকআত নামায পড়। প্রতি রাকআতে আলহামদু একবার এবং সূরা এখলাস সাত বার পড়। অতঃপর সালাম ফেরানোর পরে সেজদা কর এবং সাত বার

আল্লাহর কাছে মাগফেরাত প্রার্থনা কর। এর পর সাত বার এই দোয়া পাঠ কর ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ـ

অতঃপর সেজদা থেকে মাথা তুলে বসে যাও এবং হাত তুলে এই দোয়া পড় ঃ

يَا حَىُّ يَا قَيُّوْمُ يَا ذِى الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ يَا اِلٰهَ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ يَارَحْمٰنَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَرَحِيْمَهُمَا يَا رَبِّ يَارَبِّ يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ ـ

অর্থাৎ, হে চিরজীবী, হে চির বিরাজমান, হে প্রতাপ ও সম্মানের অধিকারী, হে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের মাবুদ, হে দুনিয়া ও আখেরাতের দাতা দয়ালু, হে রব, হে রব, হে আল্লাহ হে আল্লাহ।

এর পর দাঁড়িয়ে হাত তুলে এই দোয়াই কর। এর পর যেখানে ইচ্ছা কেবলামুখী হয়ে ডান পার্শ্বের উপর শুয়ে পড় এবং দরূদ পাঠ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়। আমি বললাম ঃ আপনি এই দোয়া কার কাছ থেকে শিখেছেন? তিনি বললেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছ থেকেই শিখেছি। কথিত আছে, যে ব্যক্তি এই দোয়া ও এই নামাযের প্রতি সুধারণাবশতঃ তা নিয়মিত পালন করবে, সে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার পূর্বে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে স্বপ্নে দেখবে। যারা এই আমল করেছে, তাদের কেউ কেউ স্বপ্নে দেখেছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করেছে। সেখানে পয়গম্বরগণের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে কথাবার্তাও হয়েছে।

রাত জাগরণ ও এবাদতের ফযীলত

এ সম্পর্কিত আয়াতগুলো এই ঃ

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ ـ

অর্থাৎ, আপনার পালনকর্তা জানেন, আপনি কখনও রাত্রির দুই তৃতীয়াংশ, কখনও অর্ধেক এবং কখনও এক তৃতীয়াংশ জাগরণ করেন।

إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَّأَقْوَمُ قِيلًا ـ

অর্থাৎ, এবাদতের জন্যে রাত জাগরণ কঠিন, অথচ অভিনিবেশ ও বুঝার পক্ষে অনুকূল।

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ অর্থাৎ, তাদের পার্শ্ব বিছানা থেকে আলাদা থাকে।

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَّقَائِمًا يَّحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوْ رَحْمَةَ رَبِّهِ ـ

অর্থাৎ, সে রাতের প্রহরসমূহে সেজদা করে ও দাঁড়িয়ে এবাদত করে, পরকালকে ভয় করে এবং পালনকর্তার রহমত আশা করে (সে কি তার সমান, যে এরূপ করে না)?

এর অনেক ফযীলত সম্পর্কে হাদীসেও বর্ণিত আছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ শয়তান তোমাদের একজনের গ্রীবায় নিদ্রাবস্থায় তিনটি গিরা লাগিয়ে দেয়। প্রত্যেক গিরায় একথা বলে ফুঁক দেয় যে, এখনও রাত অনেক বাকী, ঘুমিয়ে থাক। যদি লোকটি জাগ্রত হয় এবং আল্লাহকে স্মরণ করে, তবে একটি গিরা খুলে যায়। যদি ওযু করে, তবে দ্বিতীয় গিরা খুলে যায়। আর যদি নামায পড়ে, তবে তৃতীয় গিরাটিও খুলে যায়। সে সকালে হৃষ্টচিত্তে শয্যাত্যাগ করে। নতুবা মন্দ ও অলস হয়ে গাত্রোত্থান করে। একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে আলোচনা হয় যে,

অমুক ব্যক্তি ভোর পর্যন্ত সারা রাত ঘুমায়। তিনি বললেন ঃ তার কানে শয়তান পেশাব করে দেয়। এক হাদীসে আছে, শয়তানের কাছে একটি ঘ্রাণের বস্তু, একটি চাট্‌নি ও একটি অঞ্জন আছে। যখন সে কাউকে ঘ্রাণ দেয়, তখন তার অভ্যাস খারাপ হয়ে যায়। যখন চাটনি চাটায়, তখন তার মুখ ক্ষুরধার ও অশ্লীল হয়ে যায়। আর যখন কাউকে অঞ্জন লাগিয়ে দেয়, তখন রাতে ভোর পর্যন্ত নিদ্রায় বিভোর থাকে। হযরত জাবের (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

ان من الليل ساعة لايوافقها عبد مسلم سئل الله تعالى فيها خيرا الا اعطاه اياه ـ

অর্থাৎ, রাতের একটি মুহূর্ত আছে। তাতে কোন মুসলমান বান্দা আল্লাহর কাছে কল্যাণ প্রার্থনা করলে আল্লাহ্ তাকে তা দান করেন।

মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন, রাতের বেলায় অধিক পরিমাণে দাঁড়িয়ে নামায পড়ার কারণে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পদযুগল ফুলে যায়। লোকেরা তা দেখে আরজ করল ঃ আপনার তো অগ্রপশ্চাৎ সকল গোনাহ মাফ করে দেয়া হয়েছে। আপনি এত কষ্ট করেন কেন? তিনি বললেন ঃ আমি কি আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হব না? একবার তিনি হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-কে বললেন ঃ যদি তুমি চাও যে, জীবিতাবস্থায়, কবর ও পুনরুত্থানে তোমার প্রতি আল্লাহর রহমত থাকুক, তবে রাতে উঠে নামায পড় এবং এই নামায দ্বারা পালনকর্তার সন্তুষ্টি কামনা কর। হে আবু হোরায়রা, তুমি তোমার গৃহের কোণে নামায পড়। তোমার গৃহের নূর আকাশে ছোট বড় তারকার ন্যায় হবে। তিনি আরও বলেন ঃ রাতের এবাদত অপরিহার্য করে নাও। এটা পূর্ববর্তী ভাগ্যবানদের তরীকা। এর ফলে আল্লাহর নৈকট্য, গোনাহ থেকে দুরত্ব, রোগমুক্তি ও দুর্ভাগ্য থেকে অব্যাহতি লাভ হয়। আরও বলেন ঃ রাতে নামায পড়া যার অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়, সে যদি নিদ্রাধিক্যের কারণে কোনদিন নামায পড়তে না পারে, তবে এই নামাযের সওয়াব তার জন্যে লেখা হবে এবং লাভের মধ্যে সে ঘুমাবে। হযরত আবু যর (রাঃ)-কে রসূলুল্লাহ (সাঃ)

বলেন ঃ যদি তুমি সফরের ইচ্ছা কর, তবে তার জন্যে কি কিছু পাথেয় সংগ্রহ কর না? আবু যর বললেন ঃ জি হাঁ, করি। তিনি বললেন ঃ তা হলে কেয়ামতের সফর পাথেয় ছাড়া কিরূপে হবে? হে আবু যর, আমি কি তোমাকে এমন কথা বলব না, যা সেদিন তোমার কাজে লাগবে? আবু যর আরজ করলেন ঃ বলুন, আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক। তিনি বললেন ঃ কেয়ামত দিবসের প্রচন্ড উত্তাপ থেকে অব্যাহতির জন্যে একদিন রোযা রাখ, রাতের অন্ধকারে কবরের আতংক থেকে মুক্তির জন্যে দু'রাকআত নামায পড়, বড় বড় বিষয়ের জন্যে হজ্জ কর এবং কোন মিসকীনকে কিছু সদকা দাও, অথবা কোন হক কথাই বলে দাও অথবা কোন খারাপ বিষয় থেকে চুপ থাক।

বর্ণিত আছে, রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর পবিত্র আমলে এক ব্যক্তি এমন সময় উঠে নামায পড়ত ও কোরআন তেলাওয়াত করত, যখন মানুষ ঘুমে বিভোর হয়ে থাকত। সে এই বলে দোয়া করত– হে দোযখের প্রভু, আমাকে দোযখ থেকে অব্যাহতি দাও। একথা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে আলোচিত হলে তিনি বললেন ঃ লোকটি যখন এই দোয়া, করে তখন আমাকে খবর দিও। সেমতে তিনি সেখানে গমন করলেন এবং তার দোয়া শ্রবণ করলেন। সকাল হলে তিনি লোকটিকে বললেন ঃ মিয়া! তুমি আল্লাহ তাআলার কাছে জান্নাত চাও না কেন? সে আরজ করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আমার সে সাধ্য কোথায়? আমার আমল এই যোগ্য নয়। এ কথা বলার অল্প পরেই হযরত জিবরাঈল (আঃ) অবতরণ করলেন এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বললেন ঃ লোকটিকে বলে দিন, আল্লাহ তা'আলা তাকে দোযখ থেকে অব্যাহতি দিয়ে জান্নাতে দাখিল করেছেন। বর্ণিত আছে, হযরত জিবরাঈল রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বললেন ঃ আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ভাল লোক– যদি সে রাতে নামায পড়ে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আবদুল্লাহ ইবনে ওমরকে একথা জানালে তিনি ভবিষ্যতে রাত জাগরণ ও নামায অপরিহার্য করে নিলেন। সেমতে তাঁর গোলাম নাফে' বলেন ঃ তিনি রাতে নামায পড়তেন এবং আমাকে জিজ্ঞেস করতেন যে, সেহরীর সময় হল কি না? আমি বলতাম ঃ হয়নি।

তিনি আবার নামায পড়তেন। এভাবে আরও এক দু'বার প্রশ্নোত্তরের পরে আমি বলতাম ঃ হাঁ, হয়ে গেছে। তখন তিনি বসে সোবহে সাদেক পর্যন্ত এস্তেগফার করতে থাকতেন।

এক হাদীসে রসূলে আকরাম (সাঃ)-এরশাদ করেন ঃ আল্লাহ তাআলা সেই পুরুষের প্রতি রহম করুন, যে রাত জেগে নামায পড়ে, অতঃপর তার স্ত্রীকেও জাগ্রত করে এবং সে-ও নামায পড়ে। যদি স্ত্রী না উঠে তবে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়। আল্লাহ তাআলা সেই স্ত্রীলোকের প্রতি রহম করুন, যে রাত জেগে নামায পড়ে এবং নিজের স্বামীকেও জাগ্রত করে, অতঃপর সে-ও নামায পড়ে। যদি স্বামী না উঠে, তবে তার চোখে মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়। হযরত ওমর (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি রাত্রে ঘুমিয়ে পড়ে এবং তার ওযিফা অথবা ওযিফার কিছু অংশ আদায় করতে না পারে, সে যদি ফজর ও যোহরের মাঝামাঝি সময়ে তা কিছু অংশ আদায় করে নেয়, তবে তা রাত্রে আদায় করার মতই লিখিত হবে।

হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ)-এর অভ্যাস ছিল, রাত্রে যখন সকলেই ঘুমিয়ে পড়ত তখন তাঁর পড়ার আওয়াজ মৌমাছির গুন গুন শব্দের মত সকাল পর্যন্ত শুনা যেত। এক রাতে সুফিয়ান সওরী খুব পেট ভরে আহার করলেন, অতঃপর বললেন ঃ গাধাকে বেশী ঘাস দেয়া হলে কাজও বেশী নেয়া হয়। সুতরাং সকাল পর্যন্ত এবাদত করতে থাক।

হযরত হাসান বসরীকে কেউ জিজ্ঞাসা করল ঃ যারা তাহাজ্জুদ পড়ে তাদের মুখমন্ডল অন্যদের চেয়ে সুশ্রী হয় কেন? তিনি বললেন ঃ এর কারণ, তারা আল্লাহ তাআলার সাথে একান্তে থাকে। তাই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে নিজের নূরের কিছু অংশ পরিয়ে দেন।

আবদুল আজীজ ইবনে আবী রাওয়াদ গভীর রাত্রে নিজের শয্যার কাছে আসতেন, অতঃপর তার উপর হাত বুলিয়ে বলতেন ঃ তুমি নরম ঠিকই; কিন্তু আল্লাহর কসম, জান্নাতে তোমার চেয়েও নরম বিছানা রয়েছে। এর পর তিনি সমগ্র রাত নামাযে নিয়োজিত থাকতেন। হযরত

ফুযায়ল বলেন ঃ যখন রাত আমার সামনে আসে, তখন প্রথম প্রথম তার দৈর্ঘ্যের কথা ভেবে আমার ভয় লাগে, কিন্তু যখন আমি কোরআন পাঠ শুরু করে দেই, তখন আমার প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ার আগেই ভোর হয়ে যায়। হযরত হাসান বলেন ঃ মানুষ কোন গোনাহ্ করলে, তার কারণে রাত জাগরণ থেকে বঞ্চিত থাকে। ফুযায়ল বলেন ঃ তুমি যদি রাত্রে জাগ্রত থাকতে এবং দিনে রোযা রাখতে না পার, তবে বুঝে নিও যে, তুমি বঞ্চিত এবং তোমার গোনাহ্ অনেক হয়ে গেছে। রবী বলেন ঃ আমি ইমাম শাফেয়ীর গৃহে বহু রাত শয়ন করেছি। আমি লক্ষ্য করেছি, তিনি রাতে সামান্যই নিদ্রা যেতেন। আবুল জুয়াইরিয়া বলেন ঃ আমি হযরত ইমাম আবু হানীফার সাথে ছয় মাস অবস্থান করেছি। এ সময়ে কোন এক রাতে তিনি আপন পার্শ্ব মাটিতে লাগাননি। হযরত ইমাম আবু হানীফার নিয়ম ছিল, অর্ধ রাত এবাদত করা, কিন্তু একবার কিছু লোকের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় তারা পরস্পরে বলাবলি করল, এ লোকটি সারা রাত এবাদত করে। একথা শুনে তিনি মনে মনে বললেন ঃ তারা আমার এমন গুণ বর্ণনা করছে, যা আমার মধ্যে নেই। এর পর থেকে তিনি সারা রাত এবাদত শুরু করে দেন। রাতের জন্যে তাঁর কোন বিছানা থাকত না।

মালেক ইবনে দীনার এক রাতে এই আয়াত পাঠ করে করে ভোর করে দিয়েছিলেন ঃ

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ـ

অর্থাৎ, যারা অনেক গোনাহ্ উপার্জন করেছে তারা কি মনে করে, আমি তাদেরকে ঈমানদার ও সৎকর্মীদের মত করে দেব যাতে তাদের জীবনও মৃত্যু সমান সমান হবে? তাদের এই সিদ্ধান্ত খুবই মন্দ। মুগীরা ইবনে হাবীব বলেন ঃ আমি মালেক ইবনে দীনারকে দেখলাম, তিনি এশার পরে ওযু করলেন, অতঃপর জায়নামাযে দাঁড়িয়ে নিজের দাড়ি ধরলেন। তিনি অশ্রুপূর্ণ নয়নে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলতে শুরু করলেন ঃ

ইলাহী, মালেকের বার্ধক্যকে দোযখের জন্যে হারাম করে দাও। ইলাহী, তুমি তো জান কে জান্নাতে আর কে দোযখে থাকবে। এ দু'দলের মধ্যে মালেক কোন্ দলে? এ দু'গৃহের মধ্য থেকে মালেকের গৃহ কোন্‌টি? সকাল পর্যন্ত তিনি এমনিভাবে কাঁদতে থাকেন।

রাত জাগরণ সহজ হওয়ার উপায় ঃ প্রকাশ থাকে যে, রাত জাগরণ মানুষের জন্যে কঠিন ব্যাপার, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা যাদেরকে তওফীক দেন এবং যারা এর সহজ হওয়ার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ শর্তসমূহ পালন করে, তাদের জন্যে মোটেও কঠিন নয়। এর বাহ্যিক শর্ত চারটি ঃ

প্রথম, খাদ্য বেশী না খাওয়া। কেননা, বেশী খেলে পানি বেশী পান করবে। ফলে ঘুম বেশী হবে এবং জাগা দুরূহ হবে। জনৈক বুযুর্গ প্রত্যেক রাতে দস্তরখানের পাশে দাঁড়িয়ে বলতেন ঃ মূরীদগণ, বেশী খেয়ো না। বেশী খেলে পানি বেশী পান করবে এবং বেশী ঘুমাবে; এর পর মৃত্যুর সময় বেশী আফসোস করবে। মোট কথা, খাদ্যের বোঝা থেকে পাকস্থলী হালকা থাকা একটি মূল বিষয়।

দ্বিতীয়, দিনের বেলায় এমন কোন কষ্টের কাজ না করা, যা দ্বারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রভাবিত হয় এবং শিরা-উপশিরা শিথিল হয়ে যায়। কেননা, এর কারণেও বেশী ঘুম হয়।

তৃতীয়, সামান্য দিবা-নিদ্রা পরিত্যাগ না করা। রাত জাগরণের জন্যে এটা সুন্নত।

চতুর্থ, দিনের বেলায় সাধ্যমত গোনাহ থেকে দূরে থাকা। কেননা, গোনাহের কারণে অন্তর কঠিন হয়ে যায় এবং রহমত লাভের পথে অন্তরায় সৃষ্টি হয়। জনৈক ব্যক্তি হযরত হাসান (রাঃ)-কে বলল ঃ আমি আরামে নিদ্রা যাই। রাত জাগা পছন্দ করি। এজন্যে ওযুর পানি প্রস্তুত রাখি, কিন্তু কি কারণে যে জাগতে পারি না, তা বুঝি না। তিনি বললেন ঃ তোমার গোনাহ্ তোমাকে বিরত রাখে। হযরত সুফিয়ান বলেন ঃ আমি একটি গোনাহের কারণে পাঁচ মাস পর্যন্ত তাহাজ্জুদ থেকে বঞ্চিত ছিলাম। লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ সেই গোনাহটি কি ছিল? তিনি বললেন ঃ আমি এক ব্যক্তিকে কাঁদতে দেখে মনে মনে বলেছিলাম ঃ সে রিয়াকার।

মোট কথা, গোনাহমাত্রই অন্তরকে কঠোর করে দেয় এবং তাহাজ্জুদের পথে বাধা সৃষ্টি করে। বিশেষ করে হারাম খাদ্যের প্রভাব এ ব্যাপারে খুব বেশী হয়ে থাকে। অন্তরকে স্বচ্ছ করতে এবং সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করতে হালকা লোকমা যত প্রভাব বিস্তার করে, ততটা অন্য কোন উপায়ে হয় না। সাধকগণ নিজস্ব অভিজ্ঞতা এবং শরীয়তের সাক্ষ্যের আলোকে এ বিষয়টি যথাযথ উপলব্ধি করে থাকেন।

রাত জাগরণ সহজ হওয়ার অভ্যন্তরীণ শর্তও চারটি ঃ

প্রথম, মুসলমানদের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ, বেদআত ও জাগতিক চিন্তা-ভাবনা থেকে অন্তর পরিষ্কার হওয়া। যার অন্তর সাংসারিক চিন্তায় নিমজ্জিত থাকে, তার রাত জাগরণ নসীব হয় না। জাগলেও নামাযে মন লাগে না। চিন্তা-ভাবনাই তার মন আচ্ছন্ন করে রাখে।

দ্বিতীয়, মনের উপর ভয় প্রবল এবং বেঁচে থাকার আশা কম থাকা। কেননা, আখেরাতের ভয়াবহতা এবং দোযখের বিভিন্ন স্তরের কথা চিন্তা করলে ঘুম থাকতে পারে না। বর্ণিত আছে, সোহায়ব নামক বসরার জনৈক গোলাম সারা রাত জেগে থাকত। তার প্রভু তাকে বলল ঃ তোর সারা রাত জেগে থাকার কারণে দিনে কাজকর্ম বিঘ্নিত হয়। গোলাম বলল ঃ দোযখের কথা মনে হলে সোহায়বের ঘুম আসে না। অন্য এক গোলামকে কেউ সারারাত জেগে থাকার কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলল ঃ যখন আমি দোযখকে স্মরণ করি, তখন ভয় বেড়ে যায়। আর যখন জান্নাতের কথা স্মরণ করি, তখন আগ্রহ ধরে রাখতে পারি না। এ দো'টানার মধ্যে আমার ঘুম হয় না।

তৃতীয়, রাত জাগরণের ফযীলত সম্পর্কিত কোরআনী আয়াত, হাদীস ও মহান ব্যক্তিবর্গের উক্তিসমূহ পাঠ করে জাগরণের সওয়াব জানা, যাতে জান্নাতের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। বর্ণিত আছে, জনৈক বুযুর্গ ব্যক্তি জেহাদ থেকে বাড়ী ফিরলে তার স্ত্রী শয্যা তৈরী করে বসে রইল, কিন্তু তিনি মসজিদে গিয়ে সকাল পর্যন্ত নামাযে রত থাকলেন। সকালে স্ত্রী বলল ঃ আমি দীর্ঘ দিন ধরে তোমার অপেক্ষায় ছিলাম। এখন এসেও

সকাল পর্যন্ত নামাযেই কাটিয়ে দিলে? বুযুর্গ বললেন ঃ আমি জান্নাতের এক হুরের ঔৎসুক্যে জেগেছিলাম এবং বাড়ীঘর ও স্ত্রীর কথা বিস্মৃত হয়ে পড়েছিলাম।

চতুর্থ, আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি মহব্বত রাখা এবং এই বিশ্বাস প্রবল করা যে, এবাদতে যা বলা হয় তা পরওয়ারদেগারের সাথে সরাসরি কথা বলার শামিল। সুতরাং আল্লাহর প্রতি মহব্বত হলে তাঁর সাথে একান্তে থাকা পছন্দনীয় হবে এবং কথা বলে আনন্দ পাওয়া যাবে। এ আনন্দকে অবান্তর মনে করা উচিত নয়। কেননা, যুক্তি ও বর্ণনা এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। যুক্তি হচ্ছে, যে ব্যক্তি বাহ্যিক রূপলাবণ্যের ভিত্তিতে অন্যের প্রতি আসক্ত হয়, সে নির্জনে প্রেমাস্পদের সাথে থেকে ও তার সাথে প্রেমালাপ করে পরম আনন্দ অনুভব করে। সারা রাত তার ঘুম আসে না। যদি বল, সুশ্রী প্রেমাস্পদকে দেখে আনন্দ পাওয়া যায়। আল্লাহ্ তো দৃষ্ট হন না। এমতাবস্থায় কিরূপে আনন্দ পাওয়া যাবে? এর জওয়াব হচ্ছে, প্রেমাস্পদ সুন্দর পর্দার আড়ালে অথবা অন্ধকার গৃহে থাকলে সে নিকটেই আছে- একথা ভেবে আশেক আনন্দ পায়। সে এতেই সুখ অনুভব করে যে, মাশুকের কাছে প্রেম নিবেদন করতে পারছে এবং মাশুককে শুনিয়ে তাকে স্মরণ করতে পারছে। এক্ষেত্রে মাশুক জওয়াব না দিলেও নিজের মনের ভাব প্রকাশ করার সুযোগ পেয়ে আশেক পুলকিত হয়।

এই আনন্দের বর্ণনাভিত্তিক প্রমাণ হচ্ছে, যারা রাত জাগরণ করে, তারা এই আনন্দের কারণেই রাতকে খুব খাটো ও সংক্ষিপ্ত মনে করে দুঃখ করে থাকে। সেমতে জনৈক রাত জাগরণকারী বুযুর্গ বলেন ঃ আমি এবং রাত যেন ঘোড় দৌড়ের দু'টি ঘোড়া। ভোর পর্যন্ত কখনও রাত আমার আগে চলে যায় এবং আমাকে যিকির থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। অন্য একজন বলেন ঃ মাত্র এক ঘন্টা রাত হয়ে থাকে। এতে আমার দু'রকম অবস্থা হয়। যখন অন্ধকার আসতে দেখি, তখন আনন্দিত হই। এই আনন্দ পূর্ণতা লাভ করার আগেই ভোর হয়ে যাওয়ার দুঃখ ছাড়া অন্য কোন দুঃখ নেই। দেখতে দেখতে ভোর হয়ে যায়। ফুযায়ল ইবনে আয়ায বলেন, যখন সূর্য অস্ত যায়, আমার আনন্দের সীমা থাকে না এই ভেবে

যে, এখন পরওয়ারদেগারের সাথে নির্জনতা নসীব হবে। পক্ষান্তরে সূর্যোদয়ের সময় এই ভেবে দুঃখিত হই যে, এখন লোকজন আমার কাছে আসবে। আবু সোলায়মান দারানী বলেন ঃ ক্রীড়ামোদীরা ক্রীড়া-কৌতুকে থেকে যে আনন্দ পায়, রাত জাগরণকারীরা রাতের বেলায় তার চেয়ে বেশী আনন্দ পায়। রাত না থাকলে আমি কখনও দুনিয়াতে থাকা পছন্দ করতাম না। জনৈক আলেম বলেন ঃ দুনিয়াতে জান্নাতের নেয়ামতসমূহের সমতুল্য কোন কিছু নেই। তবে রাতের বেলায় কাকুতি-মিনতিকারীরা মোনাজাতের যে আনন্দ পায়, তা অবশ্য জান্নাতী নেয়ামতসমূহেরই অনুরূপ। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ মোনাজাতের আনন্দ দুনিয়ার নয়, জান্নাতের সামগ্রী। এটা আল্লাহ তা'আলা তাঁর ওলীদের জন্যে প্রকাশ করেছেন। অন্য কেউ এটা পায় না। ইবনে মুনকাদির বলেন ঃ দুনিয়া তিনটি আনন্দ অবশিষ্ট রয়েছে– রাত জাগরণ, ভাইদের সাথে সাক্ষাৎ এবং জামাতে নামায পড়া।

রাতের সময় বন্টন ঃ জানা উচিত, পরিমাণের দিক দিয়ে রাত জাগরণ সাত প্রকার হতে পারে।

প্রথম, সারা রাত জেগে থাকা। এটা বিশেষভাবে আল্লাহ তা'আলার এবাদতে আত্মনিবেদিত মহান ব্যক্তিবর্গের কাজ। রাত জাগরণই তাদের খোরাক। তারা অধিক জাগরণে ক্লান্ত হন না এবং দিনের বেলায় ঘুমান। কিছু সংখ্যক পূর্ববর্তী বুযুর্গের এটাই নিয়ম ছিল। তাঁরা এশার ওযূ দ্বারা ফজরের নামায পড়তেন। আবু তালেব মক্কী বর্ণনা করেন– সকলের জানা মতেই চল্লিশ জন তাবেয়ী এরূপ ছিলেন। তাঁদের কয়েকজন এমনও ছিলেন যে, চল্লিশ বছর পর্যন্ত এই আমল অব্যাহতভাবে করে গেছেন; যেমন মদীনার সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যিব ও সফওয়ান ইবনে সলীম, মক্কার ফুযায়ল ইবনে আয়ায ও ওয়াহাব ইবনুল ওরদ, ইয়ামানের তাউস ও ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ, কূফার রবী ইবনে খায়সাম ও হাকাম, সিরিয়ার আবী সোলায়মান দারানী ও আলী ইবনে বাকার, পারস্যের হাবীব আবু মোহাম্মদ ও আবু জাবের সালমানী, এছাড়া আরও অনেকে।

দ্বিতীয়, অর্ধ রাত জাগ্রত থাকা। এধরনের লোক পূর্ববর্তীদের মধ্যে অসংখ্য ছিলেন। এক্ষেত্রে উত্তম পন্থা হচ্ছে, রাতের প্রথম এক তৃতীয়াংশ এবং শেষ এক ষষ্ঠাংশ নিদ্রায় অতিবাহিত করা, যাতে এবাদত ও জাগরণ মধ্যস্থলে হয়।

তৃতীয়, রাত্রির এক তৃতীয়াংশ জাগ্রত থাকা। এ অবস্থায় রাত্রির প্রথমার্ধ এবং এক ষষ্ঠাংশ নিদ্রায় অতিবাহিত করা উত্তম। সর্বাবস্থায় শেষ রাত্রে ঘুমানো ভাল। এতে ফজরের সময় তন্দ্রা আসে না। এছাড়া শেষ রাত্রে ঘুমালে মুখমন্ডল ফেকাশে কম হয়। হযরত দাউদ (আঃ) এভাবেই রাত জাগরণ করতেন।

চতুর্থ, রাতের এক ষষ্ঠাংশ অথবা এক পঞ্চমাংশ জাগ্রত থাকা। এর জন্যে উত্তম রাতের শেষার্ধ থেকে জাগা।

পঞ্চম, জাগ্রত থাকার কোন সময় নির্দিষ্ট না করা। কেননা, রাতের পরিমাণ সঠিকভাবে পয়গম্বর ওহীর মাধ্যমে জানতে পারেন অথবা সৌরবিজ্ঞানীরা জানেন। এরূপ জাগরণের জন্যে সমীচীন হচ্ছে, প্রথম রাতে ঘুম আসা পর্যন্ত জাগ্রত থাকবে, এর পর যখন ঘুম ভাঙ্গবে, তখন উঠে এবাদত করবে। নিদ্রা প্রবল হলে আবার ঘুমিয়ে পড়বে। এই অবস্থায় এক রাতে দু'বার ঘুমানো ও দু'বার জাগা হবে। রাতের পরিশ্রম একেই বলে। এটাই সকল আমলের মধ্যে অধিক কঠিন ও শ্রেষ্ঠ। রসূলে করীম (সাঃ)-এর অভ্যাস তাই ছিল। হযরত ইবনে ওমর ও অন্যান্য প্রধান সাহাবায়ে কেরামের পন্থাও তাই ছিল।

রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর রাত জাগরণ পরিমাণের দিক দিয়ে একই রকম ছিল না। তিনি কখনও অর্ধ রাত, কখনও এক তৃতীয়াংশ, কখনও দু'তৃতীয়াংশ এবং কখনও এক ষষ্ঠাংশ জাগ্রত থাকতেন। সূরা মুযযাম্মিলের এ আয়াত থেকে তাই জানা যায়ঃ

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ -

অর্থাৎ, আপনার পালনকর্তা জানেন আপনি কখনও রাতের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ, কখনও অর্ধাংশ এবং কখনও এক তৃতীয়াংশ জাগ্রত থাকেন।

জনৈক সাহাবী বর্ণনা করেন- আমি সফরে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর রাতকালীন নামায ভালভাবে দেখেছি। তিনি এশার পর কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে জাগ্রত হন এবং আকাশের দিগন্তের দিকে তাকিয়ে رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا আয়াতটি اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادِ পর্যন্ত পাঠ করেন। অতঃপর বিছানা থেকে একটি মেসওয়াক বের করে মেসওয়াক করতঃ ওযু করেন। এর পর আমার জানামতে যতক্ষণ নামায পড়লেন, ততক্ষণ ঘুমিয়েছিলেন। এর পর ঘুমিয়ে পড়লেন। আমি দেখলাম, যতক্ষণ তিনি নামায পড়েছিলেন, ততক্ষণই ঘুমালেন। অতঃপর জাগ্রত হলেন। প্রথমবার যে আয়াত পাঠ করেছিলেন তাই পাঠ করলেন এবং প্রথমবার যা যা করেছিলেন, এবারও তাই করলেন।

ষষ্ঠ, চার রাকআত অথবা দু'রাকআত পড়ার পরিমাণ সময় জাগ্রত থাকা। এটাই রাত জাগরণের সর্বনিম্ন পরিমাণ। ওযু করা কঠিন হলে কেবলামুখী বসে কিছুক্ষণ যিকির ও দোয়ায় মশগুল থাকলে এরূপ ব্যক্তিকেও আল্লাহ তা'আলার কৃপায় তাহাজ্জুদ পড়ুয়াদের তালিকায় লেখে নেয়া হবে।

সপ্তম, যদি মাঝ রাতে উঠা কঠিন বোধ হয়, তবে মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময় এবং এশার পরবর্তী সময়কে এবাদত শূন্য ছেড়ে দেয়া উচিত নয়। অতঃপর এরূপ ব্যক্তি সোবহে সাদেকের পূর্বেই উঠে পড়বে। এভাবে রাতের উভয় প্রান্তে জাগরণ ও এবাদত হয়ে যাবে।

বছরের উৎকৃষ্ট দিন ও রাত ঃ প্রকাশ থাকে যে, বছরের পনেরটি রাত্রির ফযীলত বেশী। এসব রাত্রে জাগ্রত থাকা ও এবাদত করা তাকিদ সহকারে মোস্তাহাব।

এগুলোর মধ্যে ছয়টি রাত রমযান মাসেই রয়েছে। শেষ দশকের পাঁচটি বিজোড় রাত অর্থাৎ, রমযানের ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯ তারিখের রাত। এগুলোর মধ্যে শবে কদর তালাশ করা হয়। এর পর সতের তারিখের রাত । এ দিনেই বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইবনে যুবায়ের (রাঃ) বলেন ঃ এ রাতেই শবে কদর হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

অবশিষ্ট নয় রাত হল ঃ (১) মহররম মাসের প্রথম রাত, (২) আশুরার রাত, (৩) রজব মাসের প্রথম রাত, (৪) রজবের পনের তারিখের রাত, (৫) রজবের সাতাশ তারিখের রাত- শবে-মে'রাজ । এ রাতে একটি নামায হাদীসে বর্ণিত আছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি এ রাতে বার রাকআত নামায পড়বে, প্রত্যেক রাকআতে আলহামদু ও একটি সূরা পাঠ করবে, দু'রাকআতের পর আত্তাহিয়্যাতু ও সব শেষে সালাম ফেরাবে, এর পর একশ' বার সোবহানাল্লাহ্ ওয়ালহামদু লিল্লাহ্ ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার পড়বে, একশ' বার এস্তেগফার, একশ' বার দরূদ পড়ে নিজের জন্যে যা ইচ্ছা দোয়া করবে এবং সকালে রোযা রাখবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার সকল দোয়া কবুল করবেন, যদি তা গোনাহের দোয়া না হয়। (৬) শা'বান মাসের পনের তারিখের রাত। এ রাতে একশ' রাকআত নামায আছে। প্রত্যেক রাকআতে আলহামদুর পরে সূরা এখলাস দশ বার পড়বে। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ এ নামায তরক করতেন না। (৭) আরাফার রাত (৮-৯), দুই ঈদের রাত । রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি দুই ঈদের রাতে এবাদত করবে, তার অন্তর অন্তরসমূহের মৃত্যুর দিনে মরবে না।

বছরের উৎকৃষ্ট দিন ঊনিশটি। এসব দিনে ওযিফা পাঠ করা মোস্তাহাব। দিনগুলো এই ঃ (১) আরাফার দিন, (২) আশুরার দিন, (৩) রজবের সাতাইশ তারিখের দিন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যাক্তি রজবের সাতাইশ তারিখ রোযা রাখে, তার জন্যে আল্লাহ্ তাআলা ষাট মাসের রোযা লেখে দেন। এ দিনেই হযরত জিবরাঈল (আঃ) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে রেসালত নিয়ে অবতরণ করেছিলেন। (৪) রমযান মাসের সতের তারিখ। এটা বদর যুদ্ধের দিন। (৫) শাবান মাসের পনের তারিখ। (৬) জুমুআর দিন। (৭) ঈদের দিন, (৮-৬) যিলহজ্জ মাসের দশ দিন (আরাফার দিন পূর্বে উল্লিখিত হওয়ায় এ দিন বাদ)। কোরআনের ভাষায় এই দিনগুলোকে আইয়ামে মালুমাত বলা হয় এবং (১৭-১৯) তিন দিন আইয়ামে তাশরীকের অর্থাৎ, যিলহজ্জের ১১, ১২ ও ১৩

তারিখ। কোরআনের ভাষায় এগুলোকে আইয়ামে মাদুদাত বলা হয়।

হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যখন জুমুআর দিন ভালরূপে অতিবাহিত হয়, তখন সকল দিন ভালরূপে অতিবাহিত হয় এবং যখন রমযান মাস সহীহ সালামত থাকে, তখন সমগ্র বছর সহীহ সালামত থাকে। জনৈক আলেম বলেন ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে পাঁচ দিন নিজের আনন্দে মত্ত থাকবে, সে আখেরাতে আনন্দ পাবে না। এই পাঁচ দিন হচ্ছে– ঈদের দু'দিন, জুমুআর দিন, আরাফার দিন ও আশুরার দিন।

সপ্তাহের দিনগুলোতে উত্তম হচ্ছে বৃহস্পতিবার ও সোমবার। এ দু'দিন মানুষের আমলসমূহ আল্লাহ্ তা'আলার দিকে উত্তোলিত হয়। অবশ্য এসব বিষয়ের সম্যক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলরই রয়েছে।

আহার গ্রহণ

প্রকাশ থাকে যে, বুদ্ধিমানদের উদ্দেশ্য হচ্ছে জান্নাতে খোদায়ী দীদার লাভ করে ধন্য হওয়া । খোদায়ী দীদার পর্যন্ত পৌছার একমাত্র পথ হচ্ছে এলেম ও আমল তথা জ্ঞানার্জন ও কর্ম সম্পাদন। দৈহিক সুস্থতা ব্যতিরেকে এ দু'টি বিষয় অব্যাহতভাবে সক্রিয় রাখা অসম্ভব। ক্ষুধার সময়ে প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্য গ্রহণ করতে থাকলেই দৈহিক সুস্থতা নিশ্চিত হয়। এ কারণেই আগের কালের জনৈক বিশিষ্ট বুযুর্গ বলেন ঃ খাদ্য গ্রহণ করাও একটি এবাদত। বিশ্ব প্রতিপালকও এ বিষয়বস্তু ব্যক্ত করে বলেছেন ঃ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا (তোমরা পাক-পবিত্র বস্তু আহার কর এবং সৎকর্ম সম্পাদন কর।) সুতরাং যে ব্যক্তি এ উদ্দেশে খাদ্য গ্রহণে উদ্যত হয় যে, এর দ্বারা এলেম ও আমলে সাহায্য হবে এবং তাকওয়া অর্জনে সামর্থ্য অর্জিত হবে, তার উচিত খাদ্য গ্রহণে সংযত আচরণ করা। সে যেন নিজেকে এমনভাবে ছেড়ে না দেয়, যেমন চতুষ্পদ জন্তুসমূহ চারণভূমিতে নির্বিচারে ছেড়ে দেয়া হয়। কেননা, যে খাদ্য ধর্মের সহায়ক, তাতে ধর্মের নূর প্রকাশ পাওয়া দরকার। ধর্মের নূর হচ্ছে খাদ্য গ্রহণে সুন্নত ও আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা, যাতে কেউ তার ক্ষুধাকে শরীয়তের পাল্লায় ওজন করে খাদ্য গ্রহণে অগ্রসর হয় অথবা খাদ্য থেকে হাত গুটিয়ে নেয়, গোনাহ্ও দূরে সরিয়ে দেয় এবং সওয়াবও হাসিল করে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ মানুষ নিজের মুখে অথবা তার স্ত্রীর মুখে যে লোকমা দেয়, তাতে তাকে সওয়াব দেয়া হয়। এর সওয়াব তখন পাওয়া যাবে, যখন লোকমা দেয়া ধর্মের কারণে ও ধর্মের খাতিরে এবং তাতে খাদ্য গ্রহণের আদব ও সুন্নতের প্রতি লক্ষ্য রাখা হবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই নিম্নে আমরা খাওয়ার ফরয, সুন্নত, মোস্তাহাব, আদব ও প্রকার প্রকৃতি বলে দিচ্ছি।

প্রকাশ থাকে যে, আহার গ্রহণ চার প্রকারে হয়ে থাকে– এক, একা

খাওয়া, দুই, অনেক মানুষের সাথে খাওয়া, তিন, মেহমানদের সামনে খানা পেশ করা এবং চার, দাওয়াতে খাওয়া। তাই চারটি পরিচ্ছেদে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

একা খাওয়ার আদব

খাওয়ার পূর্বে সাতটি বিষয় জরুরী ঃ

(১) খাদ্যবস্তু স্বয়ং হালাল হওয়ার পর উপার্জনের দিক দিয়েও পাক-পবিত্র এবং সুন্নত ও তাকওয়ার পন্থা মোতাবেক হবে। শরীয়ত গর্হিত কোন পন্থায় এবং খেয়াল খুশীমত কোন উপায়ে উপার্জিত না হওয়া চাই। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র খাদ্য খাওয়ার আদেশ করেছেন। তিনি হত্যা নিষিদ্ধ করার পূর্বে অবৈধ পন্থায় উপার্জন সামগ্রী ভক্ষণ নিষিদ্ধ করেছেন, যাতে হারাম সামগ্রী অত্যন্ত মন্দ এবং হালাল সামগ্রী খুব বড় জ্ঞান করা হয়। সেমতে এরশাদ হয়েছে ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَاتَأْكُلُوٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَاتَقْتُلُوٓا اَنْفُسَكُمْ ـ

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ, পারস্পরিক সম্মতিক্রমে লেনদেন ছাড়া তোমরা পরস্পরের সম্পদ ভক্ষণ করো না এবং পরস্পরকে হত্যা করো না।

মোট কথা, পাক-পবিত্র হওয়াই খাদ্যবস্তুর মূল কথা। এটা ধর্মের ফরয ও মূলনীতিসমূহের অন্যতম।

(২) হাত ধৌত করা। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ

الوضوء قبل الطعام ينفى الفقر وبعده ينفع الهم ـ

খাওয়ার পূর্বে হাত ধৌত করা দারিদ্র্য এবং খাওয়ার পরে ধৌত করা দুঃখ দুশ্চিন্তা দূর করে। এক রেওয়ায়েতে আছে– খাওয়ার পূর্বে ও পরে হাত ধৌত করা নিঃস্বতা দূর করে। এর একটি কারণ, কাজকর্ম করলে

হাতে কিছু না কিছু ময়লা লেগে থাকে। তাই হাত ধৌত করা পরিচ্ছন্নতার পরিচায়ক। আরেক কারণ, খাওয়া ধর্ম কর্মে সাহায্য লাভের ইচ্ছায় একটি এবাদত। সুতরাং নামাযের আগে ওযুর ন্যায় এর আগেও কোন কিছু করা দরকার।

(৩) খাদ্যবস্তু এমন দস্তরখানের উপরে রাখবে, যা মাটিতে বিছানো থাকে। এটা দস্তরখান উঁচুতে বিছানো অপেক্ষা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কর্মের অধিক নিকটবর্তী। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে দস্তরখান এলে তিনি তা মাটিতে বিছাতেন। এটা বিনয় ও নম্রতার নিকটবর্তী। এটা না হলে খাদ্যবস্তু 'সফরা' নামক দস্তরখানে রাখবে। এতে সফরের কথা স্মরণ হয়। সফরের কথা স্মরণ হলে আখেরাতের সফর এবং তাকওয়ার পাথেয় সংগ্রহ করার কথা অন্তরে জাগ্রত হয়। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ রসূলে আকরাম (সাঃ) কখনও খাঞ্চা ও উপহার পরিবেশনের থালায় আহার করেননি। কেউ প্রশ্ন করল ঃ তা হলে কিসে আহার করতেন? তিনি বললেন ঃ দস্তরখানে। কেউ কেউ বলেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ)-এর পরে চারটি বস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে– উঁচু খাঞ্চা, চালুনি, ওশনান (সাবানের কাজ করে এমন এক প্রকার ঘাস) এবং উদরপূর্তিকরণ। প্রকাশ থাকে যে, আমরা দস্তরখানে খাওয়া উত্তম বলেছি, কিন্তু এটা বলি না যে, উঁচু দস্তরখানে খাওয়া মাকরূহ অথবা হারাম। কেননা, এরূপ নিষেধাজ্ঞা প্রমাণিত নেই। আমরা বলি, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পরে চারটি বিষয় আবিষ্কৃত হয়েছে। এর জওয়াব হচ্ছে, প্রত্যেক নবাবিষ্কৃত বেদআতই নিষিদ্ধ নয়; বরং সেই বেদআতই নিষিদ্ধ, যার বিপরীতে কোন সুন্নত প্রতিষ্ঠিত থাকে। উপরন্তু কারণাদি বদলে গেলে কোন কোন অবস্থায় বেদআত আবিষ্কার করা ওয়াজিব হয়ে থাকে। উঁচু দস্তরখানের কারণ শুধু এতটুকুই যে, খাদ্যকে মাটি থেকে উঁচুতে তোলা হয়, যাতে খাওয়া সহজ হয়। এ ধরনের বিষয়াদিতে মাকরূহ হওয়ার কোন কারণ নেই। সেমতে নবাবিষ্কৃত চারটি বস্তু একরূপ নয়। এগুলোর মধ্যে ওশনান উত্তম বস্তু। এতে পরিচ্ছন্নতা বিদ্যমান। হাত ধৌত করার উদ্দেশ্য পরিচ্ছন্নতা। ওশনান দ্বারা পরিচ্ছন্নতা উত্তমরূপে অর্জিত হয়। প্রথম যুগের মানুষের

এটা ব্যবহার না করার কারণ সম্ভবতঃ এই ছিল যে, তাদের এই অভ্যাস ছিল না অথবা এটা সুলভ ছিল না, অথবা তারা অধিক পরিচ্ছন্নতা অর্জনের তুলনায় বেশী গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্মে মশগুল থাকতেন। ফলে মাঝে মাঝে হাতও ধৌত করতেন না এবং রুমালের স্থলে পায়ের তলায় হাত মুছে নিতেন। এটা শরীয়তে অনুমোদিত যদি তাতে অধিক স্বাচ্ছন্দ্য অর্জনের নিয়ত না থাকে। উঁচু দস্তরখানে আহার করাও অনুমোদিত যদি তা খাওয়া সহজ করার উদ্দেশে হয় এবং অহংকার ও ঔদ্ধত্যের নিয়তে না হয়। এর পর উদরপূর্তিকরণের কথা থেকে যায়। এটা বিষয় চতুষ্টয়ের মধ্যে কঠোরতম বেদআত । কেননা, এ থেকে অনেক বড় রকমের কামনা বাসনা উৎপন্ন হয় এবং দেহের শিরা উপশিরা স্পন্দিত হয়, তাই এগুলোর পার্থক্য জানা কর্তব্য।

(৪) দস্তরখানে প্রথমে যে ভঙ্গিতে বসবে, শেষ পর্যন্ত সে ভঙ্গিতেই বসে থাকবে। রসূলে করীম (সাঃ) মাঝে মাঝে দু'জানু হয়ে উভয় পায়ের পিঠের উপর বসে আহার করতেন এবং কখনও ডান পা খাড়া রেখে বাম পায়ের উপর বসতেন। তিনি বলতেন ঃ আমি হেলান দিয়ে বসে খাই না। আমি তো একজন দাস মাত্র । তাই দাসের মতই খাই এবং দাসের মতই বসি। হেলান দিয়ে বসে পানি পান করা পাকস্থলীর জন্যেও ক্ষতিকর। শুয়ে ও হেলান দিয়ে খাওয়া মাকরূহ, কিন্তু বুট ইত্যাদি এভাবে খাওয়া মাকরূহ নয়। বর্ণিত আছে, হযরত আলী (রাঃ) চিৎ হয়ে শুয়ে ঢালের উপর 'কাক' (এক প্রকারের ক্ষুদ্রাকৃতি রুটি) রেখে খেয়েছেন। উপুড় হয়ে শুয়ে খাওয়ার কথাও এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে।

(৫) খাদ্য গ্রহণে আল্লাহর এবাদতে সামর্থ্য অর্জিত হওয়ার নিয়ত করবে, যাতে এ আহারের মধ্যেও আনুগত্যের বিষয় বহাল থাকে। খাদ্য গ্রহণে আনন্দ ও সুখ লাভের নিয়ত করবে না। ইবরাহীম ইবনে শায়বান বলেন ঃ আমি আশি বছর ধরে কোন বস্তু নিজের কামনা-বাসনার কারণে খাই না। এর সাথে সাথে কম খাওয়ার ইচ্ছাও পাকাপোক্ত করে নেবে। কেননা, উদরপূর্তি থেকে কম খেলেই এবাদতে সামর্থ্য অর্জনের নিয়ত সাচ্চা হবে। কারণ, উদরপূর্তি এবাদতের পরিপন্থী । তাই বেশী খাওয়ার

পরিবর্তে অল্পে সন্তুষ্ট থাকা অপরিহার্য। রসূলে পাক (সাঃ) বলেন ঃ

ما ملا ادمى وعاء اشر من بطنه حسب ابن ادم لقمان يقمن صلبه فان لم يفعل فثلث للطعام وثلث للشرب وثلث للنفس -

মানুষ নিজের উদরের চেয়ে অধিক মন্দ কোন পাত্র পূর্ণ করে না। আদম সন্তানের জন্যে কয়েকটি লোকমা যথেষ্ট, যা তার মেরুদন্ড সোজা রাখবে। যদি তা না করে, তবে উদরের এক তৃতীয়াংশ খাদ্য খাবে, এক তৃতীয়াংশ পানি পান করবে এবং অবশিষ্ট এক তৃতীয়াংশ শ্বাস নেয়ার জন্যে খালি রাখবে। উপরোক্ত নিয়তের মধ্যে এটাও অত্যাবশ্যক যে, যখন ক্ষুধা লাগবে তখনই খাওয়ার জন্যে হাত বাড়াবে। অর্থাৎ খাওয়ার পূর্ববর্তী বিষয়সমূহের মধ্যে ক্ষুধা লাগাও একটি জরুরী বিষয়। এর পর উদরপূর্তির আগেই হাত সরিয়ে নেবে। যে ব্যক্তি এরূপ করবে, সে চিকিৎসকের মুখাপেক্ষী হবে না। কম খাওয়ার উপকারিতা এবং আস্তে আস্তে খাদ্য হ্রাস করার পদ্ধতি তৃতীয় খন্ডের 'খাদ্য বাসনা দমন' অধ্যায়ে বর্ণিত হবে।

(৬) উপস্থিত খাদ্যের উপর সন্তুষ্ট থাকবে এবং রসনাতৃপ্তি, অধিক অন্বেষণ ও ব্যঞ্জনের অপেক্ষায় বসে থাকবে না। রুটি থাকতে ব্যঞ্জনের অপেক্ষা না করাই রুটির তাযীম। হাদীসে রুটির তাযীম করার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। মোট কথা, বেঁচে থাকা এবং এবাদতের সামর্থ্য অর্জিত হওয়ার মত খাদ্যে অনেক বরকত। একে হেয় মনে করা উচিত নয়; বরং সময় প্রশস্ত হলে রুটির সামনে বসে নামাযের অপেক্ষা করা উচিত নয়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ اذا حضر العشاء والعشاء فابدؤا بالعشاء -

রাতের খানা এবং এশার নামায উভয়টি একযোগে উপস্থিত হলে প্রথমে রাতের খানা খাও। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) মাঝে মাঝে ইমামের আওয়াজ শুনেও রাতের আহার ছেড়ে উঠতেন না। আর যদি খাওয়ার প্রতি বেশী আগ্রহ না থাকে এবং বিলম্বে খেলে ক্ষতিও না হয়, তবে প্রথমে নামায আদায় করাই উত্তম, কিন্তু যখন খানা এসে যায়, নামাযেরও তকবীর হয়, দেরীতে খেলে খানা ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে,

তখন প্রথমে খেয়ে নেয়া মোস্তাহাব। এর জন্যে সময় প্রশস্ত হওয়া শর্ত ; খাওয়ার আগ্রহ থাকুক বা না থাকুক । কেননা, হাদীসে খাওয়ার প্রতি আগ্রহের শর্ত নেই। এর এক কারণ, ক্ষুধায় দুর্বল না হলেও উপস্থিত খাদ্যের প্রতি মনে কিছু না কিছু লক্ষ্য থেকে যায় ।

(৭) খাওয়ার মধ্যে অনেক হাত আনার চেষ্টা করবে, যদিও আপন স্ত্রী পরিবার পরিজনের হাতই হয়। নবী করীম (সাঃ) বলেন ঃ

اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه অর্থাৎ, তোমরা সকলে সমবেত হয়ে আহার কর। এতে তোমাদের খাদ্যে বরকত হবে।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন– রসূলুল্লাহ (সাঃ) একা আহার করতেন না। তাই ছিল তাঁর নিয়ম। এক হাদীসে তিনি বলেন ঃ যে খাদ্যে অনেক হাত একত্রিত হয়, সেটাই উত্তম খাদ্য।

খাওয়ার সময়কার জরুরী আদবসমূহ হল– খাওয়ার শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ এবং শেষে আলহামদু লিল্লাহ বল। প্রতি লোকমায় বিসমিল্লাহ বললে তা আরও উত্তম হবে, যাতে খাওয়ার মোহ মানুষকে আল্লাহর যিকির থেকে গাফেল করে না দেয়। পথম লোকমায় 'বিসমিল্লাহ' দ্বিতীয় 'লোকমায়' বিসমিল্লাহির রাহমান এবং তৃতীয় লোকমায় বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম জোরে বলবে, যাতে অন্যদেরও স্মরণ হয়ে যায়। ডান হাতে খাবে এবং নেমক দ্বারা শুরু ও শেষ করবে। ছোট লোকমা মুখে দিয়ে উত্তমরূপে চিবাবে এবং একটি গলাধঃকরণ না করা পর্যন্ত অন্য লোকমার দিকে হাত বাড়াবে না। কোন খাদ্যের নিন্দা করবে না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন খাদ্যের দোষ বর্ণনা করতেন না। তিনি ভাল লাগলে খেতেন, নতুবা খেতেন না। ফলমূল ছাড়া অন্য খাদ্যে নিজের নিকটবর্তী স্থান থেকে খাবে। ফলমূলে অন্য দিকেও হাত প্রসারিত করলে দোষ নেই। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ তোমাদের কাছের দিক থেকে খাও, কিন্তু তিনি ফলমূলে অন্য দিকেও হাত বাড়াতেন। এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি বললেন ঃ ফল-মূল সব এক প্রকার নয়। থালার চারপাশ থেকে এবং খাদ্যের মাঝখান থেকে খাবে না; যেমন রুটির

মাঝখান থেকে খেয়ে কিনারা ছেড়ে দেয়া। বরং কিনারাসহ খাবে, রুটি কম হলে টুকরা টুকরা করে নেবে। ছুরি দিয়ে কাটবে না। হাদীসে এ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা আছে। হাদীসে আদেশ আছে, দাঁত দিয়ে গোশত কেটে কেটে খাও। রুটির উপর পেয়ালা ইত্যাদি রাখবে না– ব্যঞ্জন রাখলে দোষ নেই। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ রুটির তাযীম কর। আল্লাহ তা'আলা একে আকাশের বরকত থেকে নাযিল করেছেন। রুটি দ্বারা হাত মোছা বে-আদবী। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ লোকমা পড়ে গেলে তা তুলে নেবে এবং তাতে কিছু লাগলে তা দূর কর। পতিত খাদ্য শয়তানের জন্যে থাকতে দেবে না। খাওয়ার পর অঙ্গুলি না চাটা পর্যন্ত রুমাল দিয়ে হাত মুছবে না। কেননা, বরকত কোন্ খাদ্যে আছে তা কারও জানা নেই। গরম খাদ্যে ফুঁ দেয়া নিষিদ্ধ। খাওয়া সহজ না হওয়া পর্যন্ত সবর করবে। খোরমা বিজোড় সংখ্যক খাবে– সাত, এগার অথবা একুশ। খাঞ্চার মধ্যে খোরমা ও তার বীচি একত্রে রাখবে না। হাতেও একত্রিত করবে না; বরং বীচি হাতের তালুতে রেখে ফেলে দেবে। যে বস্তু খাওয়া খারাপ মনে করবে, সেটা পেয়ালায় রেখে দেবে না; বরং উচ্ছিষ্টের সাথে রেখে দেবে, যাতে কেউ ধোকায় পড়ে তা খেয়ে না ফেলে। আহারকালে বেশী পানি পান করবে না। তবে গলায় লোকমা আটকে গেলে অথবা সত্যিকার পিপাসা হলে পান করবে। কারও মতে এটা চিকিৎসা শাস্ত্রে মোস্তাহাব। এতে পাকস্থলী মজবুত হয়। পানি পান করার আদব হচ্ছে, ডান হাতে গ্লাস নিয়ে বিসমিল্লাহ্ বলে পান করবে। পাতলা চুমুকে আস্তে আস্তে পান করবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ পানি মুখে পান কর। বড় চুমুকে উপর্যুপরি পান করো না। এতে কলিজা রোগাক্রান্ত হয়। দাঁড়িয়ে ও শুয়ে পানি পান করবে না। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এভাবে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন। তবে তিনি দাঁড়িয়ে পানি পান করেছেন বলে যে বর্ণিত আছে, তা সম্ভবতঃ কোন ওযরের কারণে হবে। পানি পান করার পর রসূলে করীম (সাঃ) এই দোয়া পাঠ করেছেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَهُ عَذْبًا فُرَاتًا بِرَحْمَتِهٖ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا اُجَاجًا بِذُنُوْبِنَا ـ

অর্থাৎ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি একে সুপেয় ও তৃষ্ণা নিবারক করেছেন আপন রহমতে এবং একে আমাদের গোনাহের বিনিময়ে লবণাক্ত ও তিক্ত করেননি।

অনেক লোকের মধ্যে পানি বিতরণ করতে হলে ডান দিক থেকে শুরু করবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার দুধ পান করেন। তাঁর বাম দিকে ছিলেন হযরত আবু বকর (রাঃ) এবং একজন বেদুঈন, ডানদিকে হযরত ওমর (রাঃ) ছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) আরজ করলেন ঃ হুযুর, হযরত আবু বকরকে দিন, কিন্তু তিনি বেদুঈনকে দিয়ে বললেন ঃ ডান দিক হকদার, এর পর যে তার ডানে থাকবে সে পাবে। তিন শ্বাসে পানি পান করবে এবং সব শেষে 'আলহামদু লিল্লাহ' বলবে। শুরুতে বিসমিল্লাহ বলবে। 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু করা উত্তম। প্রথম শ্বাস নেয়ার পর 'আলহামদু লিল্লাহ' বলবে, দ্বিতীয় শ্বাস নেয়ার পর "আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন, আররাহমানির রাহীম" বলবে। এ পর্যন্ত প্রায় বিশটি আদব বর্ণিত হল। এগুলো হাদীস ও রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আমল থেকে জানা যায়।

খাওয়ার পরবর্তী আদবগুলো হচ্ছে ঃ উদরপূর্তির পূর্বেই হাত গুটিয়ে নেবে। অঙ্গুলিসমূহ চেটে রুমাল দিয়ে মুছে নেবে। এর পর হাত ধৌত করবে এবং দস্তরখান থেকে খাদ্যকণা চয়ন করে খেয়ে নেবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি দস্তরখানে পড়ে থাকা খাদ্য তুলে খেয়ে নেবে, সে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করবে এবং তার সন্তানরা সুস্থ থাকবে। এর পর দাঁত খেলাল করবে। খেলালের সাথে দাঁতের ফাঁক থেকে যা বের হবে তা গলাধঃকরণ করবে না; বরং ফেলে দেবে। হাঁ দাঁতের গোড়া থেকে জিহ্বার অগ্রভাগে যা আসবে, তা গিলে ফেলায় কোন দোষ নেই। খেলালের পর কুলি করবে। থালা চাটবে এবং তার পানি পান করে নেবে। কথিত আছে, যে থালা চাটে এবং তার ধোয়া পানি পান করে, সে এক গোলাম মুক্ত করার সওয়াব পায়। আর খাদ্যকণা চয়ন করা জান্নাতের হুরগণের মোহরানা। খানা খেয়ে মনে মনে আল্লাহর শোকর

করবে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ ـ

অর্থাৎ, তোমরা আমার দেয়া পরিচ্ছন্ন রিযিক ভক্ষণ কর এবং আল্লাহর শোকর কর। হালাল খাদ্য খেয়ে এই দোয়া পাঠ করবে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ بِنِعْمَتِهٖ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ وَتَنْزِلُ الْبَرَكَاتُ اَللّٰهُمَّ اَطْعِمْنَا طَيِّبًا وَّاسْتَعْمِلْنَا صَالِحًا ـ

অর্থাৎ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যাঁর নেয়ামত দ্বারা সৎকর্মসমূহ পূর্ণতা লাভ করে এবং বরকত অবতীর্ণ হয়। হে আল্লাহ, আমাদেরকে পরিচ্ছন্ন খাদ্য খাওয়ান এবং আমাদের দিয়ে সৎকর্ম করান। সন্দেহমুক্ত খাদ্য খেয়ে ফেললে এই দোয়া করা উচিত ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ اَللّٰهُمَّ لَاتَجْعَلْهُ قُوَّةً لَّنَا عَلٰى مَعْصِيَتِكَ ـ

অর্থাৎ, সমস্ত প্রশংসা সর্বাবস্থায় আল্লাহর। হে আল্লাহ, এ খাদ্যকে আপনার অবাধ্যতার জন্যে আমাদের শক্তি করবেন না।

আহারের পর কুল হুয়াল্লাহু আহাদ এবং লিঈলাফি কুরায়শ সূরাদ্বয় পাঠ করবে। প্রথমে দস্তরখান থেকে উঠবে না। অন্যের খাদ্য খেলে তার জন্যে এই দোয়া করবে–

اَللّٰهُمَّ اَكْثِرْ خَيْرَهٗ وَبَارِكْ لَهٗ فِيْمَا رَزَقْتَهٗ وَيَسِّرْ لَهٗ اَنْ يَّفْعَلَ فِيْهِ خَيْرًا وَقَنِّعْهُ بِمَا اَعْطَيْتَهٗ وَاجْعَلْنَا وَاِيَّاهُ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ـ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ, তার মাল বৃদ্ধি করুন, তাকে দেয়া রিযিকে বরকত দিন, যাতে সে তা থেকে খয়রাত করে। তাকে আপনার দানে তুষ্ট করুন এবং আমাকে ও তাকে শোকরকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন। কারও গৃহে রোযার ইফতার করলে এই দোয়া করবে–

اَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ وَاَكَلَ طَعَامَكُمُ الْاَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلٰئِكَةُ ـ

অর্থাৎ, তোমাদের কাছে রোযাদাররা ইফতার করুক। তোমাদের সজ্জনরা ভক্ষণ করুক এবং তোমাদের জন্যে ফেরেশতারা রহমতের দোয়া করুন।

সন্দেহযুক্ত খাদ্য খেয়ে ফেললে অনেক ক্ষমা প্রার্থনা ও দুঃখ করা উচিত যাতে অশ্রুজলে সেই অগ্নির উত্তাপ স্তিমিত হয়ে যায়, যা এরূপ খাদ্য খাওয়ার কারণে সামনে আসবে। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ

كل لحم نبت من حرام فالنار اولى ولى به ـ

অর্থাৎ, হারাম খাদ্যে উৎপন্ন মাংসের জন্যে অগ্নিই অধিক হকদার।

যে ব্যক্তি হারাম খেয়ে কান্নাকাটি করে, সে সেই ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম, যে হারাম খেয়ে নির্বিঘ্নে খেলাধুলায় মেতে থাকে। উদ্দেশ্য, কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত হওয়া ভাল।

দুধ পান করলে এই দোয়া পাঠ করবে–

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْمَا رَزَقْتَنَا وَزِدْنَا مِنْهُ ـ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ, আপনার দেয়া রিযিকে আমাদের জন্যে বরকত দিন এবং তা আরও বেশী দিন।

দুধ ছাড়া অন্য কিছু খেলে زِدْنَا مِنْهُ -এর স্থলে وَارْزُقْنَا خَيْرًا مِّنْهُ বলবে। কেননা উপরোক্ত দোয়া রসূলুল্লাহ (সাঃ) দুধের জন্যেই নির্দিষ্ট করেছেন। কেননা, দুধের উপকারিতা ব্যাপক। আহারের পর এ দোয়া পাঠ করাও মোস্তাহাব।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَاوَانَا سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا يَا كَافِىَ كُلِّ شَيْءٍ وَلَايَكْفِىْ مِنْهُ شَيْءٌ وَاَطْعَمْتَ مِنْ جُوْعٍ وَاَمِنْتَ مِنْ خَوْفٍ ذٰلِكَ اَلْحَمْدُ اَوَيْتَ مِنْ يَتِيْمٍ هَدَيْتَ مِنْ ضَلَالَةٍ

وَاَغْنَيْتَ مِنْ عَيْلَةٍ فَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا دَائِمًا طَيِّبًا نَافِعًا مُبَارَكًا فِيْهِ كَمَا اَنْتَ اَهْلُهُ وَمُسْتَحِقُّهُ. اَللّٰهُمَّ اَطْعَمْنَا طَيِّبًا فَاسْتَعْمِلْنَا صَالِحًا فَاجْعَلْهُ عَوْنًا لَنَا عَلٰى طَاعَتِكَ نَعُوْذُ بِكَ اَنْ نَسْتَعِيْنَ بِهٖ عَلٰى مَعْصِيَتِكَ.

অর্থাৎ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে আহার করিয়েছেন, পানি পান করিয়েছেন, আমাদের জন্যে যথেষ্ট হয়েছেন এবং জায়গা দিয়েছেন আমাদের সর্দার ও মওলাকে। হে প্রত্যেক বস্তুর জন্যে যিনি যথেষ্ট এবং তার জন্যে কেউ যথেষ্ট হয় না, আপনি আমাদেরকে ক্ষুধায় খাদ্য এবং ভয় থেকে নিরাপত্তা দিয়েছেন। অতএব আপনার জন্যে প্রশংসা। আপনি ঠিকানা দিয়েছেন এতীমকে, পথ প্রদর্শন করেছেন পথভ্রষ্টকে এবং ধনী করেছেন নিঃস্বকে। অতএব আপনার জন্যে প্রশংসা, অনেক প্রশংসা সদা সর্বদা, পবিত্র, উপকারী ও বরকতপ্রাপ্ত; যেমন আপনি এর হকদার। হে আল্লাহ, আপনি আমাদেরকে পবিত্র বস্তু আহার করিয়েছেন এবং আমাদের দিয়ে সৎকর্ম করিয়েছেন। অতএব একে আমাদের জন্যে আপনার এবাদতে সহায়ক করুন। একে আপনার অবাধ্যতায় সহায়ক করা থেকে আমরা আশ্রয় চাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সম্মিলিতভাবে খাওয়ার আদব

সম্মিলিতভাবে খাওয়ার আদব সাতটি ঃ

(১) সমাবেশে কোন ব্যক্তি অধিক বয়স অথবা অধিক গুণী হওয়ার দিক দিয়ে অগ্রাধিকারের হকদার হলে প্রথমে নিজে খাওয়া শুরু করবে না, কিন্তু নিজেই নেতা ও অনুসৃত হলে সকল মানুষ একত্রিত হতেই খাওয়া শুরু করবে এবং তাদেরকে অধিক অপেক্ষায় ফেলে রাখবে না।

(২) খাওয়ার সময় চুপচাপ থাকবে না। এটা অনারবদের অভ্যাস। বরং উত্তম কথাবার্তা এবং খাওয়ার ব্যাপারে সৎকর্মপরায়ণদের গল্প ইত্যাদি বলতে থাকবে।

(৩) আপন সঙ্গীর প্রতি নম্রতা প্রদর্শন করবে। অর্থাৎ যে পরিমাণ সে খায় তার চেয়ে বেশী খেতে সচেষ্ট হবে না। কেননা, খানা অভিন্ন হলে এবং সঙ্গী অপরের বেশী খাওয়ায় সম্মত না হলে বেশী খাওয়া হারাম। বরং সঙ্গীকে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত। সঙ্গী কম খেলে তাকে খেতে উৎসাহিত করবে এবং আরও খেতে বলবে।

(৪) এমনভাবে খাবে যাতে সঙ্গীর 'খাও' বলার প্রয়োজন না হয়। কোন কোন আদববিদ বলেন, যারা খায় তাদের মধ্যে সে ব্যক্তি উত্তম, যার সঙ্গীকে 'খাও' বলার কষ্ট স্বীকার করতে হয় না। অন্য কেউ দেখছে বলে আপন পছন্দের জিনিস খাওয়া ত্যাগ করা উচিত নয়। এটা এক প্রকার লৌকিকতা। হাঁ যদি সঙ্গীর প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাকে বেশী খাওয়ার সুযোগদানের উদ্দেশে কম খায়, তবে এটা উত্তম। অনুরূপভাবে অন্যের সাথে সহযোগিতা করার নিয়তে এবং অন্যকে উৎসাহিত করার ইচ্ছায় বেশী খাওয়াও ভাল। হযরত ইবনে মোবারক উৎকৃষ্ট খোরমা বন্ধুদের সামনে রাখতেন এবং বলতেন ঃ যে বেশী খাবে তাকে "এক বীচি এক দেরহাম" হিসাবে পুরস্কৃত করব। এর পর তিনি বীচি গণনা

করতেন। যার বীচি যত বেশী হত, তাকে সেই পরিমাণ দেরহাম দিতেন। এটা সংকোচ দূর করা এবং প্রফুল্লতা অর্জনের জন্যে করতেন। হযরত ইমাম জাফর সাদেক (রঃ) বলেন ঃ আমার বন্ধুদের মধ্যে সেই আমার কাছে অধিক প্রিয়, যে অধিক খায় এবং বড় বড় লোকমা নেয়। পক্ষান্তরে আমার কাছে সেই ব্যক্তি অধিক বোঝা, যার খাওয়ার ব্যাপারে আমাকে দেখাশুনা করতে হয়। তিনি আরও বলতেন, অন্যের সাথে মানুষের মহব্বত তখন ভালরূপে জানা যায়, যখন সে তার গৃহে গিয়ে নিঃসংকোচে খায়।

৫। থালার মধ্যে হাত ধৌত করা দোষের কথা নয়। একা খেলে থালায় থুথুও ফেলতে পারে, কিন্তু সমাবেশে এরূপ করা উচিত নয়। হযরত আনাস ইবনে মালেক ও সাবেত বানানী একবার এক ভোজসভায় একত্রিত হন। হাত ধোয়ার জন্যে থালা এলে হযরত আনাস (রাঃ) তা সাবেত বানানীর দিকে বাড়িয়ে দেন। তিনি হাত ধৌত করতে দ্বিধা করলে হযরত আনাস বললেন ঃ তোমার ভাই তোমার তাযীম করলে কবুল করা উচিত, অস্বীকার করা উচিত নয়। কেননা, তাযীম আল্লাহ্ তাআলা করান। বর্ণিত আছে, খলীফা হারূনুর রশীদ একবার অন্ধ আলেম আবু মোআবিয়াকে দাওয়াত করেন। খলিফা স্বহস্তে মেহমানের হাত ধুইয়ে দিয়ে বললেন ঃ আপনি জানেন কে আপনার হাত ধুইয়ে দিয়েছেন? আবু মোআবিয়া বললেন ঃ না। হারূনুর রশীদ বললেন, আমীরুল মুমিনীন আপনার হাত ধুইয়ে দিয়েছেন। আবু মোআবিয়া বললেন ঃ হে আমীরুল মুমিনীন, এলেমের তাযীম করেছেন আল্লাহ তাআলাও আপনার তাযীম করুন। যদি হাত ধোয়ার বাসনে কয়েক ব্যক্তি এক সাথে হাত ধুয়ে নেয়, তবে তাতে কোন দোষ নেই। এটা বিনয়ের নিকটবর্তী কাজ। এতে বেশী অপেক্ষাও করতে হয় না। পক্ষান্তরে একজনের হাত ধোয়া পানি ফেলে দেয়ার পরই অন্য একজন হাত ধুবে। বরং বাসনে পানি জমা হতে দেবে। রসূলে পাক (সাঃ) বলেন ঃ اجمعوا وضوءكم جمع الله شملكم তোমরা নিজেদের ওযুর পানি একত্রিত কর। আল্লাহ্ তোমাদের বিশৃংখলা

সুসংহত করবেন। কোন কোন হাদীসবিদ এখানে ওযুর পানির অর্থ করেছেন খাওয়ার পরবর্তী হাত ধোয়ার পানি। উদ্দেশ্য, হাত ধোয়ার পানি একত্রিত থাকবে।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ তাঁর আমেলগণকে লেখেন, মানুষের সামনে থেকে হাত ধোয়ার বাসন তখন উঠাতে হবে, যখন তা পানিতে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। এ ব্যাপারে কখনও অনারবদের মত করা হবে না। হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ সকলে মিলে এক বাসনে হাত ধৌত কর এবং অনারবদের অভ্যাস বর্জন কর। যে খাদেম হাত ধৌত করায়, কেউ কেউ তার দাঁড়িয়ে থাকা মাকরূহ এবং বসে বসে পানি ঢালা উত্তম বলেছেন। কেননা, এটা বিনয়ের নিকটবর্তী। কারও কারও মতে তার বসা খারাপ ও মাকরূহ। সেমতে বর্ণিত আছে, জনৈক খাদেম বসে বসে একজন বুযুর্গের হাত ধোয়ালে বুযুর্গ দাঁড়িয়ে গেলেন। কেউ দাঁড়ানোর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ আমাদের দু'জনের মধ্যে একজনের দাঁড়ানো জরুরী। আমাদের মতে যে হাত ধোয়ায়, তার দাঁড়ানো উত্তম। এতে হাত ধোয়ানো সহজ হয় এবং যে হাত ধোয়ায়, তার বিনয় প্রকাশ পায়।

(৬) সঙ্গে যারা খায় তাদের প্রতি তাকাবে না এবং তাদের খাওয়া দেখবে না। এরূপ করলে সঙ্গী লজ্জা বোধ করবে; বরং নিজের খাওয়ায় মশগুল থাকবে। যদি দেখা যায়, তুমি হাত গুটিয়ে নিলে অন্যরা খেতে দ্বিধা করবে, তবে তুমি তাদের পূর্বে হাত গুটিয়ে নেবে না; বরং তাদের সাথে অল্প অল্প খেতে থাকবে। তারা খুব খেতে থাকবে। তারা খুব খেয়ে নিলে শেষ পর্যায়ে তুমি ক্ষুধা পরিমাণে খেয়ে নেবে। কোন কারণবশতঃ খেতে না পারলে সকলের সামনে ওযর বলে দেবে, যাতে তারা খেতে লজ্জাবোধ না করে।

(৭) এমন কোন কাজ করবে না, যা অন্যের কাছে খারাপ লাগে। যেমন– থালায় হাত ঝাড়া এবং লোকমা নেয়ার সময় থালার উপর ঝুঁকে পড়া। মুখ থেকে কোন কিছু বের করতে হলে খাদ্যের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বাম হাতে বের করবে। যে টুকরা দাঁত দিয়ে কাটা হয়, তা শুরবায় রাখবে না এবং ঘৃণা লাগার মত কোন কাজ করবে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মেহমানদের সামনে খানা পেশ করা

প্রকাশ থাকে যে, মুসলমান ভাইয়ের সামনে খানা পেশ করার সওয়াব অনেক। হযরত ইমাম জাফর সাদেক বলেন ঃ যখন তোমরা ভাইদের সাথে দস্তরখানে বস, তখন অনেকক্ষণ পর্যন্ত বসে থাক। কেননা, তোমার বয়স থেকে এই মুহূর্তের হিসাব নেয়া হবে না। হযরত হাসান বসরী বলেন ঃ মানুষ নিজের এবং পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনের জন্য যা ব্যয় করে তার হিসাব অবশ্যই নেয়া হবে; কিন্তু ধর্মীয় ভাইদেরকে খাওয়ানোর জন্যে যে ব্যয়ভার বহন করে, তার কোন হিসাব হবে না। আল্লাহ্ তাআলা এর হিসাব নিতে লজ্জাবোধ করেন। এ সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। এক হাদীসে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ তোমাদের কারও সামনে যে পর্যন্ত দস্তরখান বিছানো থাকে এবং সে না উঠে, সেই পর্যন্ত ফেরেশতারা তার জন্যে রহমতের দোয়া করতে থাকে।

খোরাসানের জনৈক আলেম সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি তার সাক্ষাৎ প্রার্থীদের সামনে অনেক খাদ্য পেশ করতেন, যা তাদের দ্বারা খাওয়া সম্ভবপর হত না। তিনি বলতেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছ থেকে এই রেওয়ায়েত পেয়েছি, যখন মেহমানগণ খাওয়া শেষ করে হাত গুটিয়ে নেয়, তখন তাদের বাড়তি খাদ্য যে খাবে, কেয়ামতের দিন তার কাছ থেকে এ বাড়তি খাদ্য ভক্ষণের হিসাব নেয়া হবে না। তাই আমি মেহমানের সামনে অনেক খাদ্য পেশ করাকে ভাল মনে করি, যাতে বাড়তি খাদ্য আমি খেয়ে নেই। এক হাদীসে আছে– মানুষ তার ভাইদের সাথে যে খাদ্য খায়, তার কাছ থেকে সে খাদ্যের হিসাব নেয়া হয় না। এ কারণেই জনৈক বুযুর্গ লোকজনের সাথে বেশী খেতেন এবং একাকী কম খেতেন। এক হাদীসে আছে– তিনটি বিষয়ের হিসাব বান্দার কাছ থেকে নেয়া হবে না– সেহরীর খাদ্য, ইফতারের খাদ্য এবং যে খাদ্য মুসলমান ভাইদের সাথে খাওয়া হয়।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ যদি আমি এক সা' খাদ্যের জন্যে মুসলমান ভাইদেরকে একত্রিত করি, তবে তা আমার কাছে একটি ক্রীতদাস মুক্ত করার চেয়েও উত্তম। হযরত ইবনে ওমর বলতেন ঃ সফরে উৎকৃষ্ট পাথেয় থাকা এবং বন্ধুদের জন্যে ব্যয় করা মানুষের অন্যতম বদান্যতা। সাহাবায়ে কেরাম বলতেন ঃ খাওয়ার জন্যে একত্রিত হওয়া উত্তম চরিত্র। তাঁরা কোরআন তেলাওয়াতের জন্যে সমবেত হতেন এবং বিদায় হওয়ার সময় কিছু খেয়েই বিদায় হতেন। এক হাদীসে বলা হয়েছে– আল্লাহ্ তাআলা কেয়ামতের দিন বান্দাকে বলবেন ঃ হে ইবনে আদম, আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম। তুমি আমাকে অন্ন দাওনি। বান্দা বলবে ঃ ইলাহী, আপনি তো বিশ্বের পালনকর্তা, আমি আপনাকে অন্ন দেব কিরূপে? আল্লাহ বলবেন ঃ তোমার মুসলমান ভাই ভুখা ছিল। তুমি তাকে খেতে দাওনি। যদি তাকে খেতে দিতে তবে তা আমাকেই দেয়া হত। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ কেউ তোমার সাথে সাক্ষাৎ করতে এলে তার তাযীম কর। তিনি আরও বলেন ঃ জান্নাতে এমন বাতায়ন রয়েছে, যার ভেতর থেকে বাইরে এবং বাইরে থেকে ভেতরের সব কিছু পরিদৃষ্ট হয়। এ বাতায়ন তাদের জন্যে, যারা নরম কথাবার্তা বলে এবং নিরন্নকে অন্ন দেয়। রাতে মানুষ যখন নিদ্রিত থাকে, তখন তারা নামায পড়ে। তিনি আরও বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম, যে অপরকে খাওয়ায়। অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, যেব্যক্তি তার ভাইকে পেট ভরে খাওয়ায় এবং পিপাসা নিবৃত্ত করে পানি পান করায়, আল্লাহ তাআলা তাকে দোযখ থেকে সাত খন্দক দূরে রাখবেন। প্রত্যেক দু'খন্দকের মধ্যবর্তী দূরত্ব হবে পাঁচ'শ বছরের পথ।

মেহমান আসার ব্যাপারেও কিছু আদব রয়েছে। কারও কাছে গেলে যাওয়ার সময় আন্দাজ করে যাওয়া এবং যখন সে খেতে থাকে, তখন উপস্থিত হওয়া নিষিদ্ধ। আল্লাহ তাআলা বলেন–

لَاتَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّا اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِيْنَ اِنَاهُ ـ

অর্থাৎ, তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া না হলে তোমরা খাদ্য প্রস্তুতির

অপেক্ষা না করে আহারের জন্যে নবী গৃহে প্রবেশ করো না।

এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি এমন খাদ্যের দিকে যায়, যার জন্যে তাকে ডাকা হয়নি, সে যাওয়ার সময় ফাসেক হবে এবং হারাম খাবে, কিন্তু কেউ যদি ঘটনাক্রমে খাওয়ার সময়ে পৌঁছে যায় তবে তার জন্যে গৃহকর্তা অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত না খাওয়া সমীচীন। যদি মনে হয় গৃহকর্তা অন্তর দিয়েই সঙ্গে খাওয়াতে চায়, তবে তার সাথে শরীক হয়ে যাবে। আর শরমে পড়ে খাওয়াতে চায় বলে মনে হলে খাওয়া উচিত নয়। যদি কেউ ক্ষুধার্ত হয় এবং খাওয়ার উদ্দেশেই কোন ভাইয়ের কাছে যায়, তবে এতে কোন দোষ নেই। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও হযরত আবু বকর (রাঃ) এক সময় ক্ষুধার্ত ছিলেন। অতঃপর উভয়ে মিলে আবুল হায়সাম ইবনে কায়হান ও আবু আইয়ুব আনসারীর গৃহে চলে গেলেন কিছু খাওয়ার উদ্দেশে। এটাই ছিল পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের অভ্যাস। আওন ইবনে আবদুল্লাহ্ মসঊদীর তিনশ' ষাট জন বন্ধু ছিল। তিনি সারা বছর প্রত্যেকের বাড়ীতে একদিন করে থাকতেন। অন্য এক বুযুর্গের ত্রিশ জন বন্ধু ছিল। তিনি এক এক মাসে প্রত্যেকের বাড়ী থেকে বেড়িয়ে আসতেন। অন্য এক বুযুর্গের সাত জন বন্ধু ছিল। তিনি সপ্তাহের সাত দিন সাত জনের বাড়ীতে বেড়াতেন। তাবাররুকের নিয়তে এই বুযুর্গগণের খেদমত এবাদতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুতরাং কেউ যদি বন্ধুর গৃহে এসে তাকে না পায় এবং ভরসা রাখে, তার এখানে কিছু খেলে সে খুশী হবে, তবে সে বন্ধুর অনুমতি ছাড়াই সেখানে খেতে পারে। কেননা, অনুমতি সন্তুষ্টি বুঝার উদ্দেশেই দরকার হয়, বিশেষতঃ খাদ্যবস্তুর ক্ষেত্রে। কেউ কেউ মুখে পরিষ্কার অনুমতি দেয়, কিন্তু মনে সন্তুষ্ট থাকে না। এরূপ লোকের খাদ্য খাওয়া অনুমতি সত্ত্বেও মাকরূহ। বন্ধুদের গৃহে খাওয়া সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা أَوْ صَدِيقِكُمْ বলেছেন। অর্থাৎ, বন্ধুদের কাছে খেলেও কোন গোনাহ নেই। রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার হযরত বরীরার বাড়ীতে তশরীফ নিয়ে যান। বরীরা তখন বাড়ী ছিলেন না। সেখানে খয়রাতের খাদ্য বিদ্যমান ছিল। তিনি খেয়ে নিলেন এবং বললেন, সদকা তার ঠিকানায়

পৌঁছে গেছে। কারণ, রসূলুল্লাহ (সাঃ) জানতেন, বরীরা তাঁর খাওয়ার কথা জানতে পারলে আনন্দে বাগ বাগ হয়ে যাবেন। এদিক দিয়েই গৃহকর্তা প্রবেশের অনুমতি দেবে জানা থাকলে জিজ্ঞাসা করে প্রবেশ করা জরুরী নয়। জানা না থাকলে জিজ্ঞেস করে ঘরে ঢুকতে হবে। মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসে ও তাঁর সহচরগণ হযরত বসরীর গৃহে গেলে যা পেতেন, অনুমতি ছাড়াই খেয়ে ফেলতেন। তখন হাসান বসরী এসে এ অবস্থা দেখে বলতেন ঃ আমরা এমনই থাকতাম। বর্ণিত আছে, হযরত হাসান বসরী বাজারে ফলবিক্রেতার দোকানে দাঁড়িয়ে কখনও এই ঝুড়ি থেকে এবং কখনও ঐ ঝুড়ি থেকে শুকনা খোরমা বের করে খাচ্ছিলেন। এ দৃশ্য দেখে হেশাম বললেন ঃ হে আবু সায়ীদ, পরহেযগারীর ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? এই দোকানদারের মাল তার অনুমতি ছাড়াই খেয়ে যাচ্ছেন? হযরত হাসান বললেন ঃ আমার সামনে খাওয়া সম্পর্কিত আয়াতটি পাঠ কর তো। হেশাম সূরা নূরের আয়াতটি اَوْ صَدِيْقِكُمْ পর্যন্ত পাঠ করলেন এবং বললেন ঃ صَدِيْق বলে কি বুঝানো হয়েছে? হযরত হাসান বললেন ঃ এমন বন্ধু, যার দ্বারা মন সুখী হয় এবং যার প্রতি অন্তরের প্রশস্তি থাকে। একবার কিছু লোক হযরত সুফিয়ান সওরীর গৃহে গিয়ে তাঁকে পেলেন না। তারা ঘরের দরজা খুলে দস্তরখান নামিয়ে খেতে লাগলেন। ইতিমধ্যে সুফিয়ান সওরী এসে গেলেন। তিনি বললেন ঃ তোমরা আমাকে বুযুর্গগণের অভ্যাস স্মরণ করিয়ে দিলে। তাঁরাও এমনি করতেন। একবার কিছু লোক জনৈক তাবেয়ীর সাথে দেখা করতে গেল। তখন তাঁর কাছে খাওয়ার কিছুই ছিল না। তিনি এক বন্ধুর ঘরে গেলেন। বন্ধু ঘরে ছিলেন না। ভিতরে প্রবেশ করে দেখলেন, ব্যঞ্জন ও রুটি প্রস্তুত রয়েছে। তিনি সবগুলো এনে মেহমানদের সামনে রেখে দিলেন। বন্ধু বাড়ী ফিরে কিছুই পেলেন না। লোকেরা তাকে জানাল, অমুক ব্যক্তি নিয়ে গেছেন। তিনি বললেন ঃ ভালই করেছেন। পরে বন্ধুর সাথে দেখা হলে তাবেয়ী বললেন ঃ ভাই, তোমার মেহমান এলে আমার ঘরে যা পাও, নিয়ে যেয়ো।

এখন খানা পেশ করার আদব শুনুন। প্রথম কথা হচ্ছে, লৌকিকতা করবে না। যা উপস্থিত থাকে সামনে পেশ করে দেবে। কিছুই না থাকলে এবং পয়সাও না থাকলে এজন্যে ধার করবে না। যদি খান্না থাকে কিন্তু তা পেশ করতে মন না চায়, তবে পেশ করবে না। জনৈক বুযুর্গ এক দরবেশের কাছে গেলেন। দরবেশ তখন খানা খাচ্ছিলেন। তিনি বলতে লাগলেন ঃ যদি আমি এই খাদ্য ধার করে না আনতাম, তবে তোমাকেও খাওয়াতাম। জনৈক বুযুর্গের মতে লৌকিকতা হচ্ছে ধার করা খাদ্য দর্শনার্থীকে খাওয়ানো। ফুযায়ল বলতেন ঃ লোকেরা লৌকিকতার কারণে পারস্পরিক দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ করে দিয়েছে। এক ব্যক্তি তার ভাইকে দাওয়াত করে লৌকিকতা প্রদর্শন করে। এ কারণে সে পুনরায় তার কাছে আসে না। জনৈক বুযুর্গ বলেন কোন বন্ধু আমার কাছে এলে তা আমার জন্যে মোটেই কঠিন হয় না। কারণ, আমি তার জন্যে লৌকিকতা করলে এর অর্থ হবে, আমি বন্ধুর আগমনকে খারাপ মনে করি এবং বিরক্তিবোধ করি। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আমি বন্ধুর কাছে যেতাম। একদিন তাকে বললাম ঃ তুমি একা এরূপ উৎকৃষ্ট খাদ্য খাও না। আমিও খাই না। তা হলে আমরা একত্রে খেলে এরূপ উৎকৃষ্ট খাদ্য হবে কেন? এখন থেকে হয় তুমি লৌকিকতা পরিহার করবে, না হয় আমি এখানে আসা বন্ধ করে দেব। দু'টির একটি হওয়া উচিত। বন্ধুবর লৌকিকতা পরিহার করলেন এবং আমরা আজীবন একত্রে বসবাস করলাম। গৃহে যা কিছু থাকে সমস্তই পেশ করে দেয়া এবং পরিবার-পরিজনের জন্যে কিছু না রাখাও লৌকিকতা পরিহারের অন্তর্ভুক্ত। বর্ণিত আছে, জনৈক ব্যক্তি হযরত আলী (রাঃ)-কে দাওয়াত করলে তিনি তিনটি শর্তে দাওয়াত কবুল করলেন— (১) বাজার থেকে তাঁর জন্যে কিছু আনা যাবে না, (২) গৃহে যা আছে তা পেশ করতে বিরত না থাকা এবং (৩) পরিবার-পরিজনের জন্যে না রেখে পেশ করা যাবে না।

জনৈক বুযুর্গ গৃহে যত প্রকার খাদ্য থাকত, প্রত্যেক প্রকার থেকে কিছু কিছু পেশ করতেন। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আমরা জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্‌র কাছে গেলে তিনি আমাদের সামনে রুটি ও সিরকা পেশ করে

বললেন ঃ লৌকিকতা নিষিদ্ধ না হলে আমি তোমাদের জন্যে লৌকিকতা করতাম। অন্য এক বুযুর্গ বলেন ঃ কেউ স্বেচ্ছায় তোমার সাথে দেখা করতে এলে যা উপস্থিত থাকে, তাই পেশ করবে। আর যদি তাকে দাওয়াত করে আন তবে তোমার পক্ষে যা সম্ভব তাতে ত্রুটি রাখবে না। হযরত সালমান (রাঃ) বলেন ঃ আমাদের প্রতি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আদেশ, আমরা যেন মেহমানের জন্যে এমন বস্তু যোগাড় করতে সচেষ্ট না হই, যা আমাদের কাছে নেই; যা মৌজুদ থাকে, তাই যেন আমরা মেহমানের সামনে পেশ করি।

দ্বিতীয় আদব হচ্ছে, মেযবানের কাছে কোন নির্দিষ্ট খাদ্যের ফরমায়েশ করবে না। কেননা, মাঝে মাঝে ফরমায়েশকৃত বস্তু উপস্থিত করা কঠিন হয়। মেযবান যদি দু'খাদ্যের মধ্যে একটি পছন্দ করতে বলে তবে যেটি সহজলভ্য, সেটি পছন্দ করবে। এটাই সুন্নত। হাদীসে বর্ণিত আছে- রসূলে করীম (সাঃ)-কে যখনই দুটি বিষয়ের মধ্য থেকে একটি পছন্দ করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, তিনি সহজলভ্যটিই পছন্দ করেছেন। হযরত আবু ওয়ায়েল বলেন ঃ আমি এক বন্ধুকে সাথে নিয়ে হযরত সালমান (রাঃ)-এর সাথে দেখা করতে গেলাম। তিনি আমাদের সামনে যবের রুটি এবং কিছু বিস্বাদ নিমক পেশ করলেন। আমার বন্ধু বলল ঃ এই নিমকের সাথে পুদিনা হলে চমৎকার হত। হযরত সালমান (রাঃ) বাইরে গেলেন এবং নিজের ওযুর লোটা বন্ধক রেখে পুদিনা আনলেন। আহার সমাপনান্তে আমার বন্ধু বলল ঃ সেই আল্লাহর শোকর, যিনি আমাদেরকে তাঁর দেয়া রুজিতে অল্পে তুষ্টি দান করেছেন। হযরত সালমান বললেন ঃ যদি আল্লাহর দেয়া রুজিতে তুমি সন্তুষ্ট থাকতে, তবে আমার লোটা বন্ধক রাখতে হত না। এই নির্দিষ্ট খাদ্যের ফরমায়েশ না করা তখন, যখন মেহমান জানে, মেযবানের জন্যে এটি সরবরাহ করা কঠিন হবে অথবা সে ফরমায়েশকে খারাপ মনে করবে। আর যদি জানে ফরমায়েশ করলে মেযবান খুশী হবে এবং খাদ্যটিও সহজলভ্য, তবে এমতাবস্থায় ফরমায়েশ করা নিষিদ্ধ নয়। হযরত ইমাম শাফেয়ী বাগদাদে জাফরানীর গৃহে অবস্থানকালে এরূপ করেছিলেন। জাফরানীর নিয়ম ছিল, যত প্রকার খাদ্য তৈরী করা হত তার একটি তালিকা লেখে বাঁদীর হাতে

দিয়ে দিত। একদিন সেই তালিকা ইমাম শাফেয়ী নিয়ে নিজের কলম দ্বারা এক প্রকার খাদ্য অতিরিক্ত লেখে দিলেন। জাফরানী দস্তরখানে সেই খাদ্য দেখে বলল ঃ আমি তো এর অনুমতি দেইনি। এর পর সেই তালিকা সামনে এল, যাতে ইমাম শাফেয়ী নিজে লেখে দিয়েছিলেন। জাফরানী তাঁর লেখা দেখে আনন্দে আটখানা হয়ে গেল। আনন্দের আতিশয্যে সে বাঁদীকে তৎক্ষণাৎ মুক্ত করে দিল। ইমাম শাফেয়ী ফরমায়েশ করেছেন– এটাই ছিল তার আনন্দের কারণ।

জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আহার তিন প্রকার– (১) ফকীরদের সাথে আহার করা। এ সময় তাদেরকে নিজের উপর অগ্রাধিকার দেয়া উচিত। (২) ভাই-বন্ধুদের সাথে আহার করা। এসময় ক্রীড়া কৌতুক সহকারে খাওয়া ভাল। (৩) দুনিয়াদারদের সাথে খাওয়া। তাদের সাথে আদব সহকারে খাওয়া উচিত।

তৃতীয় আদব হচ্ছে, মেযবান মেহমান ভাইকে ফরমায়েশ করার অনুরোধ করবে, অতঃপর তার ফরমায়েশ পূর্ণ করবে। এটা খুব ভাল কথা এবং এতে সওয়াব ও ফযীলত অনেক। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে, তার মাগফেরাত হবে। আর যে তার মুসলমান ভাইকে তুষ্ট করে, সে যেন আল্লাহ্ তাআলাকে তুষ্ট করে। হযরত জাবের (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি তার ভাইকে সেই বস্তু খাওয়ায়, যা সে চায়, আল্লাহ তাআলা তার জন্যে দশ লক্ষ সওয়াব লেখেন এবং দশ লক্ষ পাপ তার আমলনামা থেকে দূর করে দেন। এছাড়া তার দশ লক্ষ মর্তবা উচ্চ করে দেন এবং তাকে ফেরদাউস, আদন ও খালা এই তিন জান্নাত থেকে খেতে দেন।

চতুর্থ আদব, আগন্তুককে একথা বলবে না যে, আপনার জন্যে খানা আনব কিনা; বরং খানা মৌজুদ থাকলে জিজ্ঞাসা না করেই তা সামনে পেশ করবে। সুফিয়ান সওরী বলেন ঃ তোমার ভাই তোমার সাথে দেখা করতে এলে তাকে একথা বলো না যে, কিছু খাবে অথবা খানা আনব? বরং জিজ্ঞাসা ব্যতিরেকেই খানা সামনে রেখে দাও। খেলে ভাল, নতুবা ফেরত নিয়ে যাবে। যদি খাওয়ানোর উদ্দেশ্য না থাকে, তবে তার সামনে

খাওয়ার কথা বর্ণনা করা উচিত নয়। হযরত সুফিয়ান বলেন ঃ আপন পরিজনকে নিজের খাদ্য না খাওয়ানোর উদ্দেশ্য থাকলে তাদের সামনে তা উল্লেখ করবে না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দাওয়াতের আদব

নিম্নে আমরা এ বিষয়বস্তুটি ছয়টি শিরোনামে বর্ণনা করছি ঃ

(১) দাওয়াতের ফযীলত ঃ রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ মেহমানের জন্যে লৌকিকতা করো না। এতে তাকে মন্দ মনে করা হবে। যে মেহমানকে মন্দ জ্ঞান করে, সে আল্লাহকে মন্দ জ্ঞান করে। আল্লাহ তাআলা তা পছন্দ করেন না। এক হাদীসে বলা হয়েছে– যে ব্যক্তি মেহমানের আপ্যায়ন করে না, তার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। একবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এক ব্যক্তির বাড়ীতে গেলেন। তার কাছে অনেক উট-গরু ছিল, কিন্তু সে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আপ্যায়ন করল না। এর পর তিনি এক মহিলার গৃহে গেলেন। তার কাছে ছাগপাল ছিল। সে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্যে একটি ছাগল যবেহ করল। তিনি উপস্থিত লোকদেরকে বললেন ঃ এ দুই ব্যক্তির তফাৎ দেখ। এই চরিত্র আল্লাহ্ তাআলার আয়ত্তাধীন। তিনি যাকে সদাচার দিতে ইচ্ছা করেন, দিয়ে দেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মুক্ত গোলাম আবু রাফে বর্ণনা করেন– একবার রসূলে পাক (সাঃ)-এর গৃহে মেহমান আগমন করলে তিনি আমাকে বললেন, অমুক ইহুদীর কাছে গিয়ে বল, আমার এখানে মেহমান এসেছে। আমাকে যেন কিছু আটা ধার দেয়। ইহুদী বলল ঃ আল্লাহর কসম, কোন বস্তু বন্ধক না রাখলে আমি ধার দেব না। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে একথা জানালে তিনি বললেন ঃ আমি আকাশে বিশ্বস্ত এবং পৃথিবীতে বিশ্বস্ত। সে আমাকে ধার দিলে অবশ্যই তা শোধ করতাম। আমার লৌহবর্মটি নিয়ে যাও এবং তার কাছে বন্ধক রাখ। হযরত ইবরাহীম (আঃ) মেহমান ব্যতীত আহার করতেন না। তিনি আহারের পূর্বে এক দুই ক্রোশ পর্যন্ত পথ চলে মেহমান তালাশ করতেন। এ

কারণেই তাঁর ডাকনাম হয়ে যায় "আবুয যায়ফান" (মেহমানওয়ালা)। তিনি খাঁটি নিয়তে মেহমানকে আপ্যায়ন করতেন বিধায় আজ পর্যন্ত মাকামে ইবরাহীমে অতিথিপরায়ণতা অব্যাহত রয়েছে। কোন রাত এমন যায় না যে, সেখানে তিন থেকে দশ ও একশ' মেহমান পর্যন্ত আহার না করে। এ মকামের ব্যবস্থাপকরা বলেন- এ পর্যন্ত কোন রাত মেহমান থেকে শূন্য যায়নি। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে কেউ প্রশ্ন করল ঃ ঈমান কি? তিনি বললেন ঃ আহার করানো এবং সালাম চর্চা করা। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, যে গৃহে মেহমান আসে না, তাতে ফেরেশতা প্রবেশ করে না। দাওয়াতের ফযীলত সম্পর্কিত অসংখ্য হাদীসের মধ্যে থেকে এ কয়টি উল্লেখ করেই এখন দাওয়াতের আদব বর্ণনা করছি।

প্রথম আদব ঃ মুত্তাকী-পরহেযগারদেরকে দাওয়াত করবে- পাপাচারীদেরকে নয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে যে-ই দাওয়াত করেছে, তিনি তার জন্যে এই দোয়া করেছেন- তোমার খাদ্য সৎলোকদের আহার্য হোক। এক হাদীসে আছে- পরহেযগার লোকদের ছাড়া অন্য কারও খাদ্য খাবে না। তোমার খাদ্যও যেন মুত্তাকী ছাড়া অন্য কেউ না খায়।

দ্বিতীয় আদব ঃ বিশেষভাবে ধনীদের দাওয়াত করবে না, বরং ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবাইকে দাওয়াত করবে। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ সেই ওলীমার খাদ্য সকল খাদ্যের মধ্যে নিকৃষ্ট, যাতে কেবল ধনীদের দাওয়াত করা হয়, ফকীরদের করা হয় না।

তৃতীয় আদব ঃ দাওয়াতে নিজের আত্মীয়দেরকে বাদ দেবে না। কারণ, তাদেরকে বাদ দিলে তারা বিচলিত হবে এবং আত্মীয়তা ছিন্ন হবে। এমনিভাবে বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিত জনের মধ্যে স্তরের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। কতককে অধিক গুরুত্ব দিলে অন্যরা মনঃক্ষুণ্ণ হবে।

চতুর্থ আদব ঃ গর্ব অহঙ্কারের নিয়তে দাওয়াত করবে না; বরং ভাইদের অন্তর আকৃষ্ট করা, সুন্নতের অনুসরণ করা এবং ঈমানদারদের মন তুষ্ট করার নিয়তে দাওয়াত করবে।

পঞ্চম আদব ঃ এমন ব্যক্তিকে দাওয়াত করবে না, যার সম্পর্কে জানা আছে যে, দাওয়াত কবুল করা তার জন্যে কঠিন।

ষষ্ঠ আদব ঃ এমন ব্যক্তিকেই দাওয়াত করবে, যার দাওয়াত কবুল

করা দাওয়াতকারী ভাল বলে জানে। হযরত সুফিয়ান বলেন ঃ যে ব্যক্তি কাউকে দাওয়াত করে অথচ তার দাওয়াত কবুল করা মনে মনে খারাপ জানে, তার দাওয়াত একটি গোনাহ। অপর পক্ষে এ দাওয়াত কবুল করলে তার উপর দু'গোনাহ হবে।

মুত্তাকী ব্যক্তিকে খাওয়ালে তার তাকওয়ায় এবং পাপাচারীকে খাওয়ালে তার পাপাচারে শক্তি যোগানো হয়। জনৈক দর্জি হযরত ইবনে মোবারককে জিজ্ঞেস করল ঃ আমি বাদশাহদের কাপড় সেলাই করি। এমতাবস্থায় আমি জালেমদের সাহায্যকারী নই তো? তিনি বললেন ঃ জালেমদের সাহায্যকারী তো তারা, যারা তোমার হাতে সুই-সুতা বিক্রি করে। তুমি তো স্বয়ং জালেম। সাহায্যকারী হওয়ার কথা কি জিজ্ঞেস কর?

দাওয়াত কবুল করা ঃ দাওয়াত কবুল করা সুন্নতে মোয়াক্কাদা। কতক জায়গায় মানুষ একে ওয়াজিবও বলে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

لو دعيت الى كراع لاجبت ولو اهدى الى ذراع لقبلت .

অর্থাৎ, যদি আমাকে কেউ ছাগলের পায়ের হাড় খেতে দাওয়াত করে, তবুও আমি অবশ্যই তাতে সাড়া দেব, আর যদি কেউ আমাকে খাসীর বাহু হাদিয়া দেয়, তবে আমি তা কবুল করব।

দাওয়াত কবুল করার আদব পাঁচটি ঃ

১। (ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য করবে না; অর্থাৎ, এমন যেন না হয় যে, ধনী দাওয়াত দিলে কবুল করবে এবং দরিদ্র দাওয়াত দিলে কবুল করবে না। এটা অহংকার বিধায় নিষিদ্ধ। এই অহংকারের কারণে অনেকে দাওয়াত কবুল করাই বাদ দিয়েছে। তারা বলে ঃ শুরবার অপেক্ষায় বসে থাকা একটি যিল্লতীর কাজ। কোন কোন অহংকারী আবার ধনীদের দাওয়াত কবুল করে এবং দরিদ্রের করে না। এটাও সুন্নতের খেলাফ। রসূলুল্লাহ (সাঃ) গোলাম, মিসকীন সকলের দাওয়াতই কবুল করতেন। একবার হযরত হাসান (রাঃ) কয়েকজন মিসকীনের কাছ দিয়ে গমন করেন। তারা তখন রুটির টুকরা মাটিতে ছড়িয়ে রেখে সকলেই বসে খাচ্ছিল। হযরত হাসান খচ্চরে সওয়ার হয়ে যাওয়ার সময় তাদেরকে সালাম করলেন। তারা সালামের জওয়াব দিয়ে বলল ঃ হে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দৌহিত্র, আসুন খানা খান। তিনি বললেন ঃ ভাল কথা, আল্লাহ

তা'আলা অহংকারীদেরকে পছন্দ করেন না। একথা বলে তিনি খচ্চর থেকে নামলেন এবং তাদের সাথে মাটিতে বসে আহার করলেন। এর পর সালাম করে খচ্চরে সওয়ার হলেন এবং বললেন ঃ আমি তোমাদের দাওয়াত কবুল করেছি। তোমরাও আমার দাওয়াত কবুল কর। তারা বলল ঃ উত্তম। তিনি তাদেরকে একটি দিন নির্দিষ্ট করে দিলেন। তারা সেদিন আগমন করলে তিনি উৎকৃষ্ট খাদ্য তাদের সামনে পেশ করেন এবং নিজেও তাদের সাথে বসে খেলেন।

যারা দাওয়াতকে যিল্লতীর কাজ বলে, তাদের জওয়াব, এটা সুন্নত বিরোধী কথা। বাস্তবে এরূপ নয়। কেননা, দাওয়াত কবুল করা তখনই যিল্লতী, যখন দাওয়াতকারী দাওয়াত কবুল করলে সন্তুষ্ট এবং অনুগ্রহভাজন না হয়; বরং দাওয়াতকে অন্যের উপর অনুগ্রহ মনে করে। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দাওয়াতে যাওয়ার কারণ এটাই ছিল যে, তিনি জানতেন, দাওয়াতকারী অনুগ্রহ স্বীকার করবে এবং ইহকাল পরকালে নিজের গৌরব ও মর্যাদা মনে করবে।

মোট কথা, দাওয়াত কবুল করার বিধান অবস্থাভেদে বিভিন্নরূপ। যদি মনে হয়, দাওয়াতকারী আহার করানো বোঝা মনে করে এবং কেবল গর্ব ও লৌকিকতার খাতিরে দাওয়াত করে, তবে তার দাওয়াত কবুল করা সুন্নত নয়; বরং কৌশলে এড়িয়ে যাওয়া উত্তম। জনৈক সুফী এরশাদ করেন ঃ এমন ব্যক্তির দাওয়াত খাও, যে মনে করে তুমি তোমার রিযিক খাচ্ছ এবং তোমার যে আমানত তাঁর কাছে ছিল, তা সে প্রত্যর্পণ করে অনুগ্রহভাজন হচ্ছে। সিররী সকতী (রহঃ) বলেন ঃ আমি এমন লোকমা অন্বেষণ করি, যাতে কোন গোনাহ আমার উপর না বর্তায় এবং কোন মানুষের অনুগ্রহ না থাকে। আবু তোরাব বখশী বলেন ঃ একবার আমার সামনে খাদ্য এলে আমি তা খেতে অস্বীকার করলাম। এর পর চৌদ্দ দিন ভুখা থাকতে হল। তখন জানলাম, এটা সেই অস্বীকারের শাস্তি।

(২) বেশী দূরে হওয়ার কারণে দাওয়াত খেতে অস্বীকার করবে না; যেমন দাওয়াতকারী নিঃস্ব হলে অস্বীকার করা উচিত নয়। বরং যতটুকু দূরত্ব সহ্য করার অভ্যাস আছে, ততটুকু দূরত্বে দাওয়াত হলে অস্বীকার করবে না। তওরাতে অথবা অন্য কোন ঐশী গ্রন্থে আছে– এক মাইল হেঁটে রোগীর অবস্থা জিজ্ঞেস কর, দুই মাইল চলে জানাযার সঙ্গে থাক, তিন মাইল চলে দাওয়াত কবুল কর এবং চার মাইল চলে এমন ভাইয়ের

সাথে সাক্ষাত কর, যে আল্লাহর সূত্রে ভাই। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যদি কেউ কোরাউল গামীমে আমাকে দাওয়াত করে, তবে আমি তা কবুল করব। কোরাউল গামীম মদীনা থেকে কয়েক ক্রোশ দূরে অবস্থিত একটি স্থানের নাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) রমযানে সেখানে পৌঁছে ইফতার করেছিলেন এবং সফরে এ স্থানেই নামাযে কসর করেছিলেন।

(৩) রোযাদার হওয়ার কারণে দাওয়াত অস্বীকার করবে না; বরং দাওয়াতে যাবে। যদি রোযা ভঙ্গ করলে দাওয়াতকারী খুশী হয়, তবে রোযা ভঙ্গ করবে। মুসলমানকে খুশী করার ইচ্ছায় রোযা ভঙ্গ করার মধ্যেও সেই সওয়াব কামনা করবে, যা রোযা রাখলে হত। এ বিধান নফল রোযার ক্ষেত্রে, কিন্তু যদি জানা যায়, সে লৌকিকতা প্রদর্শন হেতু রোযা ভঙ্গ করতে বলছে, তবে এড়িয়ে যাবে এবং রোযা ভঙ্গ করবে না। এক ব্যক্তি রোযার ওযর দেখিয়ে দাওয়াত খেতে অস্বীকার করেছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে বলেছিলেন ঃ তোমার ভাই তোমার জন্যে মেহনত করেছে, আর তুমি বলছ, তুমি রোযাদার। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ বন্ধু-বান্ধবের খাতিরে রোযা ভঙ্গ করা খুব চমৎকার পুণ্যের কাজ। সুতরাং এ নিয়তে রোযা ভঙ্গ করা এবাদত ও সদাচার বিধায় এ সওয়াব রোযার সওয়াবের চেয়ে বেশী।

(৪) যদি খাদ্য সন্দেহযুক্ত হয়, অথবা বিছানা হালাল উপায়ে উপার্জিত না হয়, অথবা রেশমী বিছানা হয়, অথবা থালা-বাসন রূপার হয়, অথবা প্রাণীর চিত্র ছাদে কিংবা প্রাচীরে লাগানো থাকে অথবা সেতার বাঁশী ও ক্রীড়া কৌতুকের সাজ-সরঞ্জাম থাকে অথবা গীবত, পরনিন্দা, অপবাদ, মিথ্যা ও প্রতারণা শুনতে হয়, অথবা এমনি প্রকার কোন বেদআত থাকে, তবে এসব কারণে দাওয়াত কবুল করবে না। এমতাবস্থায় দাওয়াত কবুল করা মোস্তাহাব থাকে না; বরং এসব বিষয়ের সম্ভাবনা থাকলে দাওয়াত হারাম ও মাকরূহ হওয়ার কারণ হয়ে থাকে। দাওয়াতকারী জালেম, বেদআতী, ফাসেক অথবা দুষ্ট প্রকৃতির লোক হলেও একই বিধান।

(৫) এক বেলা পেট ভরে খাবে দাওয়াত এই উদ্দেশে হওয়া উচিত নয়। এরূপ উদ্দেশ্য থাকলে এটা দুনিয়ার জন্যে আমল হবে। বরং দাওয়াত কবুল করার মধ্যে নিয়ত সঠিক রাখবে, যাতে আমলটি বিশেষভাবে আখেরাতের জন্যে হয়ে যায়। সঠিক নিয়ত অনেক প্রকারে

হতে পারে। উদাহরণতঃ সুন্নত অনুসরণের নিয়ত করবে অথবা এই নিয়ত করবে যে, দাওয়াত কবুল করলে আল্লাহ তাআলার নাফরমানী থেকে বেঁচে যাব। কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ من لم يجب الداعى فقد عصى الله ورسوله যে দাওয়াত কবুল করে না, সে আল্লাহ ও রসূলের নাফরমানী করে। অথবা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এরশাদ অনুযায়ী মুসলমান ভাইকে সম্মান করার নিয়ত করবে। কেননা, তিনি বলেন ঃ من اكرم اخاه المؤمن فكانما اكرم الله যে ব্যক্তি মুমিনকে সম্মান করে সে যেন আল্লাহকে সম্মান করে। অথবা মুমিনের মন সন্তুষ্টির নিয়ত করবে। যেমন হাদীসে আছে من سر مؤمنا فقد سر الله –যে মুমিনকে সন্তুষ্ট করে সে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে। অথবা এই নিয়ত করবে যে, দাওয়াত কবুল করলে কেউ তার প্রতি কুধারণা পোষণ করবে না এবং মুসলমানকে হেয় মনে করে দাওয়াত কবুল করেনি– এরূপ অপবাদ আরোপ করবে না। মোট কথা, এসবের মধ্যে যেকোন একটির নিয়ত করলে দাওয়াত করা এবাদতরূপে গণ্য হবে। আর যদি কেউ সবগুলো নিয়ত করে, তবে তা আরও উত্তম। জনৈক পূর্ববর্তী বুযুর্গ বলতেন ঃ আমি চাই, আমার প্রত্যেক আমলে একটি নিয়ত হোক, এমন কি পানাহারের মধ্যেও নিয়ত হোক। এ কারণেই রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ

انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرء ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه۔

অর্থাৎ, আমলসমূহ নিয়তের উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক ব্যক্তি তাই পায় যা সে নিয়ত করে। অতএব যার হিজরত আল্লাহ ও রসূলের দিকে হবে, তার হিজরত আল্লাহ ও রসূলের দিকেই থাকবে। আর যার হিজরত দুনিয়া পাওয়ার দিকে অথবা কোন মহিলাকে বিবাহ করার দিকে হবে, তার হিজরত তার দিকেই থাকবে, যার জন্যে সে হিজরত করবে।

নিয়ত কেবল আনুগত্য ও বৈধ কাজের মধ্যেই ফলদায়ক হয়–

নিষিদ্ধ কাজে ফলদায়ক হয় না। উদাহরণতঃ কেউ যদি সঙ্গীদেরকে খুশী করার নিয়তে মদ্যপান করে অথবা অন্য কোন হারাম কাজ করে, তবে এই নিয়ত উপকারী হবে না এবং এখানে একথা বলা ঠিক হবে না যে, আমলসমূহ নিয়তের উপর নির্ভরশীল। বরং যে জেহাদ একটি আনুগত্যের কাজ, তাতেও যদি কেউ গর্ব অথবা অর্থোপার্জনের নিয়ত করে, তবে তা আনুগত্যের কাজ থাকবে না।

দাওয়াত খাওয়ার জন্যে উপস্থিতির আদব ঃ প্রথমতঃ গৃহে এসে প্রধান স্থানে উপবেশন করবে না; বরং বিনয় প্রকাশ করবে। দ্বিতীয়তঃ উপস্থিত হতে অধিক দেরী করবে না যে, মানুষ অপেক্ষায় বসে থাকবে এবং এত শীঘ্রও আসবে না যে, দাওয়াতের সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুত করা সমাপ্তও না হয়। তৃতীয়তঃ ভিড়ের সময় এমনভাবে বসবে না যাতে অন্যের অসুবিধা হয়। বরং গৃহকর্তা কোথাও বসতে ইশারা করলে তার বিরুদ্ধাচরণ করবে না। যদি উপস্থিত কেউ তাযীমের জন্যে কোন উঁচু জায়গা বলে দেয়, তবে তখন বিনয় করা উচিত।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

ان من التواضع لله الرضاء بالدون من المجلس -

আল্লাহর জন্যে বিনয় এটাও যে, তুমি বসার জায়গা থেকে নিম্নস্তরে বসতে রাজি হয়ে যাবে। চতুর্থতঃ যে কক্ষে মহিলারা রয়েছে এবং পর্দা ঝুলানো রয়েছে, তার দরজার সামনে বসবে না। পঞ্চমতঃ যে জায়গায় খাদ্য এনে রাখা হয়, সেদিকে বেশী তাকাবে না। কারণ, এটা অধৈর্য ও লোভের পরিচায়ক। ষষ্ঠতঃ বসার সময় যে কাছে থাকে; তাকে সালাম করবে ও কুশল জিজ্ঞেস করবে। মেযবান মেহমানকে কেবলার দিক, পায়খানা ও ওযুর জায়গা বলে দেয়া উচিত। হযরত ইমাম মালেক হযরত ইমাম শাফেয়ীর সাথে তাই করেছিলেন। হযরত ইমাম মালেক খাওয়ার পূর্বে সর্বপ্রথম নিজে হাত ধৌত করেন এবং বলেন ঃ খাওয়ার পূর্বে প্রথমে গৃহকর্তার হাত ধোয়া উচিত। কেননা, সে মানুষকে দাওয়াত করে। তাই প্রথমে সে হাত ধুয়ে সকলকে খাওয়া শুরু করতে সাহায্য করবে, কিন্তু খাওয়া শেষে গৃহকর্তা সকলের পরে হাত ধুবে। সপ্তমতঃ দাওয়াতের স্থানে পৌঁছে গর্হিত কোন কিছু দেখলে যদি তা বন্ধ করতে সমর্থ হয় তবে বন্ধ করে দেবে। নতুবা মুখে তার নিন্দা বর্ণনা করে ফিরে যাবে। গর্হিত বিষয়

এগুলো ঃ রেশমী বিছানা, সোনা রূপার পাত্র ব্যবহার, প্রাচীরে চিত্র থাকা, গান বাজনা হওয়া, মহিলাদের খোলা মুখে উপস্থিতি ইত্যাদি, কিন্তু প্রাচীরে শোভা বর্ধনের জন্যে রেশমী কাপড় ঝুলানো হারাম নয়। কেননা, রেশমী বস্ত্র পরিধান করা পুরুষদের জন্যে হারাম।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

هذان حرام على ذكور امتى حل لاناثها এগুলো আমার উম্মতের পুরুষদের জন্যে হারাম এবং মহিলাদের জন্যে হালাল। প্রাচীরে রেশমী বস্ত্র থাকলে তা পুরুষদের সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয় না। প্রাচীর গাত্রে রেশমী বস্ত্র হারাম হলে কাবা শরীফের সৌন্দর্য বর্ধনও হারাম হত্। কাজেই একে মোবাহ্ বলা উত্তম।

আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ
قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ বলুন, আল্লাহর সৌন্দর্য কে নিষিদ্ধ করল?

খাদ্য আনার আদব ঃ প্রথমতঃ খাদ্য দ্রুত আনবে। এতে মেহমানের তাযীম হবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه যে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার মেহমানের তাযীম করে। অধিকাংশ মেহমান এসে গেলে এবং দু'একজন অনুপস্থিত থাকলে উপস্থিতদের খাতিরে দ্রুত খাদ্য পেশ করা অনুপস্থিতদের খাতিরে বিলম্বে খাওয়ানোর চেয়ে উত্তম। হাঁ, অনুপস্থিত ব্যক্তি ফকীর হলে অথবা পেছনে থেকে গেলে সে মনঃক্ষুণ্ণ হবে মনে হলে তার অপেক্ষা করায় দোষ নেই।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ
هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ اِبْرَاهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ -এর এক অর্থ এরূপও নেয়া হয়েছে যে, তাদের সামনে দ্রুত খাদ্য পেশ করাই ছিল তাদের তাযীম। অন্য একটি আয়াত এর দলীল। বলা হয়েছে ঃ

فَمَا لَبِثَ اَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيْذٍ অর্থাৎ, অতঃপর অবিলম্বে একটি ভাজা করা বাছুর নিয়ে এল। অন্যত্র বলা হয়েছে–

فَرَاغَ اِلٰى اَهْلِهٖ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِيْنٍ অর্থাৎ, সে গৃহাভ্যন্তরে

দৌড়ে গেল, নিয়ে এল একটি ঘৃতপক্ব বাছুর। এখানে راغ বলে দ্রুত যাওয়া বুঝানো হয়েছে।

কথিত আছে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) মাংসের একটি রান এনেছিলেন, কিন্তু দ্রুত এনেছিলেন বিধায় তাকে عجل বলা হয়েছে। হযরত হাতেম আসাম্ম (রঃ) বলেন ঃ পাঁচটি বিষয় ছাড়া তড়িঘড়ি করা শয়তানের কাজ। পাঁচটি বিষয় এই ঃ মেহমানকে খাওয়ানো, মৃতের কাফন দাফন করা, কুমারী কন্যাকে বিবাহ দেয়া, ঋণ শোধ করা এবং গোনাহ থেকে তওবা করা। এ পাঁচটি বিষয়ে তড়িঘড়ি করা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সুন্নত। দ্বিতীয়তঃ ক্রম অনুযায়ী খাদ্য পেশ করবে; অর্থাৎ, ফলমূল থাকলে তা প্রথমে পেশ করবে। কেননা, ফলমূল দ্রুত হজম হয় বিধায় এটা পাকস্থলীতে নীচে থাকার যোগ্য। কোরআন মজীদে বলা হয়েছে– وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ (এবং তাদের পছন্দনীয় ফলমূল), এ বাক্যেও বলা হয়েছে যে, ফলমূল প্রথমে পেশ করা উচিত। এর পর বলা হয়েছে– وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ আর পাখীর মাংস, যা তারা কামনা করবে। ফলমূলের পরে মাংস ও ছরীদ পেশ করা উত্তম। শুরবার সাথে রুটির টুকরা মিশ্রিত করে ছরীদ প্রস্তুত করা হয়। আরবে এ খাদ্য উৎকৃষ্ট খাদ্য হিসাবে গণ্য। হাদীসে আছে, হযরত আয়েশা (রাঃ) মহিলাদের মধ্যে এমন শ্রেষ্ঠ, যেমন অন্যান্য খাদ্যের মধ্যে ছরীদ। সকল খাদ্যের পরে কিছু মিষ্টান্ন হলে যাবতীয় উৎকৃষ্ট খাদ্যের সমাবেশ হয়ে যায়। উৎকৃষ্ট খাদ্যের ব্যাপারে কোরআনে এরশাদ হয়েছে– اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى (আমি তোমাদের প্রতি মান্না ও সালওয়া নাযিল করেছি।) এতে মান্না অর্থ মধু এবং সালওয়া বলে গোশত বুঝানো হয়েছে। গোশতকে সালওয়া বলার কারণ, গোশত থাকলে অন্য ব্যঞ্জন থেকে সান্ত্বনা (সালওয়ার আভিধানিক অর্থ) হয়ে যায় এবং অন্য কোন কিছু তার স্থলাভিষিক্ত হয় না। এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ سيد الادم لحم অর্থাৎ, গোশত ব্যঞ্জনের সর্দার। মান্না ও সালওয়া উল্লেখ করার পর আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ তোমরা আমার প্রদত্ত পরিচ্ছন্ন বস্তুসমূহ ভক্ষণ কর। এ থেকে বুঝা গেল, মিষ্টান্ন ও গোশত উভয়টিই উৎকৃষ্ট খাদ্য।

তৃতীয়তঃ খাদ্যের প্রকারসমূহের মধ্যে যেটি অধিক সুস্বাদু, সেটি প্রথমে পেশ করবে, যাতে যার ইচ্ছা, সে এটি পুরাপুরি খেয়ে নেয়। পূর্ববতীদের নিয়ম ছিল, তাঁরা সকল প্রকার খাদ্য একযোগে এনে রাখতেন, যাতে প্রত্যেকেই পছন্দসই খাদ্য খেতে পারে। গৃহকর্তার কাছে এক প্রকার ছাড়া অন্য খাদ্য না থাকলে সে তা বলে দিত, যাতে মেহমানরা তৃপ্ত হয়ে খেয়ে নেয় এবং কখনও উৎকৃষ্ট খাদ্যের অপেক্ষায় না থাকে। জনৈক শায়খ বলেন ঃ আমার সামনে সিরিয়ার জনৈক শায়খ এক প্রকার খাদ্য পেশ করলে আমি বললাম ঃ আমাদের ইরাকে এ খাদ্য সকলের শেষে পেশ করা হয়। তিনি বললেন ঃ আমাদের সিরিয়াতেও তাই নিয়ম। আসলে তিনি অন্য কোন প্রকার খাদ্য প্রস্তুত করাননি। তাই আমি খুব লজ্জা পেলাম। অন্য একজন বলেন ঃ আমরা কিছু সংখ্যক লোক এক দাওয়াতে উপস্থিত ছিলাম। গৃহকর্তা ছাগলের ভাজা করা মাথা শুরবাসহ পেশ করলেন। আমরা অন্য খাদ্য অথবা গোশতের অপেক্ষায় সেটি খেলাম না, কিন্তু অবশেষে গৃহকর্তা আমাদের সামনে হাত ধোয়ার পাত্র পেশ করলেন। তখন আমরা একে অপরের মুখ পানে তাকাতে লাগলাম। জনৈক রসিক বলে ফেললেন ঃ শরীর ছাড়া মাথা সৃষ্টি করার ক্ষমতা আল্লাহ্ তাআলারই রয়েছে। সে রাত আমরা ক্ষুধার্তই রয়ে গেলাম। এদিক দিয়ে সকল প্রকার খাদ্য একযোগে পেশ করা অথবা যা আছে তা বলে দেয়া মোস্তাহাব, যাতে মেহমানরা অপেক্ষা না করে।

চতুর্থতঃ যে পর্যন্ত মেহমান সকল প্রকার খাদ্য ভালরূপে খেয়ে হাত গুটিয়ে না নেয়, সে পর্যন্ত থালা তুলে নেয়া উচিত নয়। কেননা, কারও কারও হয় তো শেষে আসা খাদ্যটি পূর্বেকার খাদ্যসমূহের তুলনায় অধিক প্রিয় হতে পারে, অথবা তখনও তৃপ্ত না হয়ে আসতে পারে। থালা তুলে নিলে তাদের অসুবিধা হবে। সন্তোরী ছিলেন রসিক সুফী। তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি জনৈক দুনিয়াদার কৃপণের বাড়ীতে দাওয়াত খেতে যান। একটি ভাজা করা খাসী সামনে এলে মেহমানরা সেটি খণ্ডবিখণ্ড করে ফেলে। তা দেখে কৃপণ গৃহকর্তা অস্থির হয়ে গোলামকে বলে ঃ এই খাসীটি ছেলেদের জন্যে তুলে নিয়ে যা। গোলাম সেটি তুলে নিয়ে অন্দরে যেতে থাকলে সন্তোরী তার পেছনে পেছনে দৌড় দিলেন। কেউ জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাচ্ছেন, সন্তোরী বললেন ঃ ছেলেদের সাথে খাব। তখন গৃহকর্তা লজ্জিত হয়ে খাসীটি ফিরিয়ে আনল।

পঞ্চমতঃ এই পরিমাণ খাদ্য পেশ করবে। যা সকলের জন্যে যথেষ্ট হয়, কেননা, পর্যাপ্ত পরিমাণের কম পেশ করলে ভদ্রতা কলুষিত হবে এবং বেশী করলে বানোয়াট ও যশের জন্যে হবে; বিশেষতঃ যখন সবগুলো খেয়ে ফেলা মনে মনে পছন্দনীয় না হয়।

অবশ্য যদি অনেক খাদ্য এভাবে পেশ করে যে, সবগুলো খেয়ে ফেললে গৃহকর্তা খুশী হবে এবং কিছু রেখে দিলে বরকত মনে করবে, তবে অনেক খাদ্য পেশ করায় দোষ নেই। কেননা, হাদীসে আছে, এ খাদ্যের কোন হিসাব হবে না। হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম তাঁর দস্তরখানে অনেক খাদ্য হাযির করেছিলেন। সুফিয়ান সওরী বললেন ঃ হে আবু ইসহাক, এতে অপচয় হবে বলে আপনি আশংকা করেন না? ইবরাহীম বললেন ঃ খাদ্যের ব্যাপারে অপচয় নেই। মোট কথা, এ নিয়তে না হলে খাদ্যের প্রাচুর্য নিঃসন্দেহে লৌকিকতা। হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি গর্ব করে খাওয়ায়, তার দাওয়াত কবুল করতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। যতটুকু যথেষ্ট, ততটুকু পেশ করার কারণেই রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সম্মুখ থেকে কখনও বাড়তি খাদ্য তুলে নেয়া হয়নি। সাহাবায়ে কেরাম প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য তাঁর সামনে পেশ করতেন না এবং নিজেরাও খুব উদরপূর্তি করে খেতেন না। ফলে অল্প খাদ্যই যথেষ্ট হয়ে যেত। গৃহের লোকজনের জন্যে তাদের অংশ আলাদা করে রাখা উচিত। তাদেরকে যেন মেহমানদের কাছ থেকে উদ্বৃত্তের আশায় বসে থাকতে না হয়। যদি মেহমানের কাছে উদ্বৃত্ত না হয়, তবে তারা মনঃক্ষুণ্ন হবে এবং মেহমানদেরকে মন্দ শুনাবে। মেহমানকে এমন খাদ্য খাওয়ানো জরুরী নয়, যাকে অন্যরা খারাপ মনে করে। এটা মেহমানদের পক্ষে খেয়ানত। উদ্বৃত্ত খাদ্য মেহমানের নিয়ে যাওয়া উচিত নয়। হাঁ, যদি গৃহকর্তা মনের খুশীতে এর অনুমতি দেয় অথবা ইঙ্গিতদৃষ্টে তার আনন্দিত হওয়া বুঝা যায়, তবে নেয়ায় দোষ নেই। মেযবানের সম্মতি থাকলেও সকল মেহমানের মধ্যে যাতে ইনসাফ সহকারে বন্টন হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। অর্থাৎ, প্রত্যেকেই তার সামনের উদ্বৃত্ত খাদ্য নেবে। সঙ্গী রাজি হলে তার সামনের খাদ্যও নিতে পারবে।

দাওয়াত থেকে প্রত্যাবর্তনের আদব ঃ প্রথমতঃ মেযবান মেহমানের সাথে গৃহের দরজা পর্যন্ত যাবে। এটা সুন্নত এবং মেহমানের

তাযীম। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, হাদীসে মেহমানের তাযীম করার নির্দেশ আছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ মেহমানের সম্মান হচ্ছে গৃহের দরজা পর্যন্ত তার সাথে যাওয়া। হযরত আবু কাতাদা বলেন ঃ আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশীর দূত রসূলে করীম (সাঃ)-এর কাছে আগমন করলে তিনি স্বয়ং তার খেদমত করতে প্রস্তুত হন। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আমরা তার খেদমত করব। আপনি কষ্ট করবেন না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তা হয় না। নাজ্জাশী আমার সহচরদের তাযীম করেছিলেন। তাই আমি এর প্রতিদান দিতে চাই। মেহমানের পূর্ণ তাযীম হচ্ছে তার সামনে হাসিমুখে থাকা এবং আসা যাওয়ার সময় ও দস্তরখানে ভাল কথাবার্তা বলা। আওযায়ীকে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ মেহমানের তাযীম কি? তিনি বললেন ঃ হাসিমুখে থাকা ও উৎকৃষ্ট কথাবার্তা বলা। ইয়াযীদ ইবনে আবী যিয়াদ বলেন ঃ আমরা যখনই আবদুর রহমান ইবনে আবী লায়লার কাছে এসেছি, তিনি আমাদের সাথে কথাবার্তাও ভাল বলেছেন এবং খাদ্যও চমৎকার খাইয়েছেন।

দ্বিতীয়তঃ মেহমানের উচিত আদর আপ্যায়ন কম হয়ে থাকলেও মেযবানের কাছ থেকে আনন্দ চিত্তে বিদায় হওয়া। কেননা, এটা সচ্চরিত্র ও বিনয়ের অঙ্গ। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ মানুষ তার সচ্চরিত্র দ্বারা রোযাদার ও রাত জাগরণকারীর মর্যাদা অর্জন করে নেয়। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের মধ্য থেকে এক বুযুর্গের কাছে এক ব্যক্তি খানা খেয়ে যাওয়ার জন্যে লোক পাঠাল। বুযুর্গ তখন গৃহে ছিলেন না। পরে এসে শুনলেন, অমুক ব্যক্তি ডেকে পাঠিয়েছিল। সেমতে তিনি সেখানে গেলেন। তখন সকল মেহমান খানা খেয়ে চলে গিয়েছিল। গৃহকর্তা তাঁর কাছে এসে বলল ঃ এখন তো খাওয়া দাওয়া শেষ। বুযুর্গ জিজ্ঞেস করলেন ঃ কিছু বেঁচে গেছে? সে বলল ঃ না। বুযুর্গ বললেন ঃ এক আধ টুকরা রুটি থাকলেও নিয়ে এস। গৃহকর্তা বলল ঃ তাও নেই। বুযুর্গ বললেন ঃ পাতিল নিয়ে এস, মুছে নেই। গৃহকর্তা বলল ঃ পাতিল আমি ধুয়ে ফেলেছি। অতঃপর আল্লাহর শোকর বলে বুযুর্গ সেখান থেকে হাসি খুশী চলে এলেন। লোকেরা বলল ঃ ব্যাপার কি, যে ব্যক্তি আপনাকে কিছু খাওয়াল না, অথচ আপনি তার প্রতি সন্তুষ্ট? বুযুর্গ বললেন ঃ সে আমার সাথে ভাল কথা বলেছে। পরিষ্কার নিয়তেই সে আমাকে ডেকেছিল এবং পরিষ্কার

নিয়তেই বিদায় দিয়েছে। একেই বলে বিনয় ও সচ্চরিত্র । কথিত আছে, ওস্তাদ আবুল কাসেম জুনায়দকে একটি ছেলে চার বার এই বলে ডাকতে গিয়েছিল যে, আমার পিতা আপনাকে খেতে ডেকে পাঠিয়েছেন। ছেলেটির পিতা তাকে চার বারই খাওয়াবে না বলে সাফ জওয়াব দিয়ে দিল, কিন্তু তিনি প্রত্যেকবারই ছেলের কথায় চলে গেলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, ছেলেটি এই ভেবে খুশী হবে যে, আমার কথা মেনেছেন এবং তার পিতাও খুশী হবে যে, আমার সাফ জওয়াব শুনে চলে গেছেন। এঁরা ছিলেন পবিত্রাত্মা। আল্লাহর জন্যে বিনয়ে তাঁরা নত হয়ে যেতেন এবং তওহীদ নিয়েই প্রশান্ত থাকতেন। তাঁরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর প্রতিই লক্ষ্য করতেন না । কেউ হেয় মনে করলে তাঁরা মনঃক্ষুণ্ন হতেন না এবং কেউ তাযীম করলে প্রফুল্ল হতেন না। বরং প্রত্যেক বিষয়কে তাঁরা আল্লাহর পক্ষ থেকে মনে করতেন। এ কারণেই জনৈক বুযুর্গ বলতেন ঃ আমি দাওয়াত কবুল করি। কেননা, এতে জান্নাতের খাদ্য স্মরণ হয়। অর্থাৎ, দাওয়াতের খাদ্যের ন্যায় জান্নাতের খাদ্যও বিনা ক্লেশে অর্জিত হবে এবং তার কোন হিসাব নেয়া হবে না।

তৃতীয়তঃ মেযবানের সম্মতি ও অনুমতি ব্যতীত তার কাছ থেকে চলে যাবে না। সাধ্য পরিমাণে তার মনের দিকে খেয়াল রাখবে। মেহমান হয়ে গেলে তিন দিনের বেশী অবস্থান করবে না। কেননা, মেযবান বিরক্তিবোধ করে চলে যাওয়ার কথা বলার প্রয়োজন হতে পারে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

الضيافة ثلاثة ايام فما زاد صدقة অর্থাৎ, মেহমানী তিন দিন। এর বেশী হলে তা সদকা।

তবে গৃহকর্তা খাঁটি মনে অবস্থান করতে পীড়াপীড়ি করলে অবস্থান করা জায়েয। গৃহকর্তার কাছে মেযবানের জন্যে একটি বিছানা থাকা দরকার। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ এক বিছানা স্বয়ং পুরুষের জন্যে, এক বিছানা স্ত্রীলোকের জন্যে, এক বিছানা মেহমানের জন্যে এবং চতুর্থ বিছানা থাকলে তা হবে শয়তানের জন্যে।

(৬) পরিশিষ্ট ঃ ইবরাহীম নখয়ী (রহঃ) বলেন ঃ বাজারে খাদ্য খাওয়া নীচতা। তিনি একে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উক্তি বলে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু এর বিপরীতে একটি রেওয়ায়েত হযরত ইবনে ওমর

(রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আমলে চলাফেরা অবস্থায় খাওয়া দাওয়া করে নিতাম। জনৈক ব্যক্তি একজন খ্যাতনামা সুফীকে বাজারে খেতে দেখে কারণ জিজ্ঞেস করল। সুফী বললেন ঃ ক্ষুধা লাগবে বাজারে আর খাব গিয়ে ঘরে– এ কেমন কথা! লোকটি বলল ঃ তা হলে মসজিদে চলে যেতেন? সুফী বললেন ঃ আল্লাহ তাআলার গৃহে খাওয়ার জন্যে যাব– এটা আমার কাছে লজ্জার কথা।

উপরোক্ত পরস্পর বিরোধী দুটি বিষয়ের মধ্যে সমন্বয় এভাবে হবে যে, যারা বাজারে খাওয়া বিনয় মনে করে, তাদের জন্যে বাজারে খাওয়া ভাল। পক্ষান্তরে যারা একে লজ্জাহীনতা মনে করে, তাদের জন্যে মাকরূহ। সুতরাং এ বিধানটি মানুষের অভ্যাসভেদে বিভিন্ন রূপ হবে।

হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে– যে ব্যক্তি নিমক দিয়ে সকালের খানা শুরু করে, আল্লাহ তাআলা তার উপর থেকে সত্তর প্রকার বালা দূর করে দেন। যে ব্যক্তি প্রত্যহ একুশটি লাল কিশমিশ খায়, সে তার দেহে খারাপ কোন কিছু দেখবে না। মাংস খেলে মাংস বাড়ে। হালুয়া খেলে পেট বেড়ে যায় এবং অণ্ডকোষ ঝুলে পড়ে। গরুর মাংস রোগ, তার দুধ আরোগ্য, তার ঘি ওষুধ এবং চর্বি দেহ থেকে সমপরিমাণ রোগ দূর করে দেয়। কোরআন মজীদের তেলাওয়াত ও মেসওয়াক শ্লেষ্মা নিবারক। যে ব্যক্তি দীর্ঘ জীবন চায়, সে যেন সকালের খানা প্রাতঃকালে খায়, সন্ধ্যায় কম আহার করে এবং জুতা পরিধান করে।

হাজ্জাজ জনৈক চিকিৎসককে জিজ্ঞেস করল ঃ আমাকে এমন বিষয় বলে দিন, যা আমি মেনে চলি এবং লঙ্ঘন না করি। চিকিৎসক বলল ঃ মহিলাদের মধ্যে যুবতী ছাড়া কাউকে বিয়ে করবেন না। মাংস কেবল জওয়ান পশুর খাবেন। পাকা কলা ভালরূপে না পাকা পর্যন্ত খাবেন না। রোগ ছাড়া ওষুধ খাবেন না। যা খাবেন উত্তমরূপে চিবিয়ে খাবেন। সেই খাদ্য খাবেন যা মনে চায়। খেয়ে পানি পান করবেন না। আর পানি পান করে খাবেন না, প্রস্রাব পায়খানা আটকে রাখবেন না। দিনের খাদ্য খেয়ে নিদ্রা যাবেন এবং রাতের খাদ্য খেয়ে নিদ্রার পূর্বে পায়চারি করবেন, তা একশত কদম হলেও। জনৈক হাকীম তার পুত্রকে বলল ঃ সকালে কিছু খাওয়া ছাড়া বের হয়ো না। খাদ্যে সংযম সুস্থ ব্যক্তির জন্যে ক্ষতিকর, যেমন অসংযম রোগীর জন্যে ক্ষতিকর।

যে বাড়ীতে কেউ মারা যায়, সে বাড়ীতে খাদ্য পাঠানো মোস্তাহাব। সেমতে জাফর ইবনে আবী তালেবের মৃত্যু সংবাদ এলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ জাফরের গৃহের লোকজন মৃতকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে খাদ্য তৈরী করতে পারবে না। তাদের কাছে কিছু খাদ্য পাঠিয়ে দাও। কাজেই এটা সুন্নত।

জালেমের খাদ্য খাবে না। জোরজবরদস্তি করলে সামান্য খাবে। কথিত আছে, যুন্নুন মিসরী গ্রেফতার হয়ে কিছু দিন কয়েদখানায় অতিবাহিত করেন। তাঁর এক ধর্ম ভগ্নী সুতা কেটে কয়েদখানার দারোগার হাতে খানা প্রেরণ করলে তিনি তা খেলেন না। মুক্তি পাওয়ার পর সেই ভগ্নী এসে অভিযোগ করলে তিনি বললেন ঃ খাদ্য হালাল ছিল; কিন্তু জালেমের পাত্রে এবং তার হাতে এসে ছিল। তাই আমি খাইনি। অর্থাৎ, দারোগার মারফতে না এলে খেতাম। বলাবাহুল্য, এটা চূড়ান্ত পর্যায়ের তাকওয়া।

ফাতাহ্ মুসেলী (রঃ) একবার বিশরে হাফীর সাথে দেখা করতে গেলেন। বিশর দেরহাম বের করে খাদেম আহমদকে বললেন ঃ উৎকৃষ্ট খাদ্য ও ভাল ব্যঞ্জন কিনে আন। আহমদ বলেন ঃ আমি খুব পরিচ্ছন্ন রুটি, কিছু দুধ ও উৎকৃষ্ট খেজুর কিনে আনলাম এবং সবগুলো ফাতাহ্ মুসেলীর সামনে রেখে দিলাম। তিনি খেয়ে অবশিষ্ট খাদ্য সাথে নিয়ে গেলেন। অতঃপর বিশরে হাফী আমাকে বললেন ঃ আহমদ, আমি উৎকৃষ্ট খাদ্য আনতে বলেছিলাম কেন, জান? এর কারণ ছিল, উৎকৃষ্ট খাদ্য আন্তরিক শোকর ওয়াজিব করে। ফাতাহ আমাকে খেতে বলেননি। এর কারণ, মেযবানকে খেতে বলা মেহমানের জন্যে জরুরী নয়। অবশিষ্ট খাদ্য সাথে নিয়ে গেলেন কেন জান? এর কারণ, তাওয়াক্কুল বিশুদ্ধ হলে পাথেয় নেয়া ক্ষতিকর হয় না। তিনি যেন এসব মাসআলা তোমাকে শিক্ষা দিয়ে গেলেন। আবু আলী রুদবারী এক ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করেন, তিনি দাওয়াত করে এক হাজার বাতি জ্বালালেন। এক ব্যক্তি আপত্তি করে বলল ঃ আপনি অপব্যয় করেছেন। তিনি বললেন ঃ তুমি ভিতরে গিয়ে সে বাতিটি নিভিয়ে দাও যেটি আমি আল্লাহর ওয়াস্তে জ্বালিনি। সে ভিতরে গিয়ে শত চেষ্টা করল, কিন্তু একটি বাতিও নিভাতে পারল না। অবশেষে সে হার মানতে বাধ্য হল।

ইমাম শাফেয়ীর উক্তি অনুযায়ী খাওয়া চার প্রকার। এক, এক আঙ্গুল দিয়ে খাওয়া। এটা আল্লাহ তাআলার ক্রোধের কারণ। দুই, দু'আঙ্গুল দিয়ে খাওয়া। এটা অহংকার। তিন, তিন আঙ্গুলে খাওয়া। এটা সুন্নত তরীকা। চার, পাঁচ আঙ্গুল দিয়ে খাওয়া। এটা তীব্র লোভের পরিচায়ক।

চারটি বস্তু দেহকে দুর্বল করে- অধিক সহবাস, অধিক দুঃখ, প্রায়ই খালি পেটে পানি পান করা এবং বেশী পরিমাণে টক খাওয়া।

তিনটি বস্তু দৃষ্টি শক্তি প্রখর করে- কেবলামুখী হয়ে বসা, নিদ্রার সময় সুরমা লাগানো এবং সবুজ বনানী দেখা।

পয়গম্বরগণ চিৎ হয়ে শয়ন করেন। কেননা তাঁরা আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করেন। আলেম ও আবেদগণ ডান পার্শ্বে শয়ন করেন। রাজা-বাদশাহ্‌রা খাদ্য হজম হওয়ার জন্যে বাম পার্শ্বে শয়ন করেন। উপুড় হয়ে শয়ন করা শয়তানের কাজ।
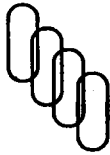
একাদশ অধ্যায়

বিবাহ

প্রকাশ থাকে যে, বিবাহ ধর্ম কাজে সহায়ক, শয়তানের চক্রান্ত থেকে আত্মরক্ষার সুদৃঢ় প্রাচীর এবং উম্মতের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান উপায়। এই সংখ্যাবৃদ্ধির মাধ্যমে নবী করীম (সাঃ) অন্যান্য পয়গম্বরের মোকাবিলায় গর্ব করবেন। এ দিক দিয়ে বিবাহের কারণাদি অনুসন্ধান, সুন্নতসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ এবং আদব সম্পর্কে আলোচনা খুবই সমীচীন। আমরা এর উদ্দেশ্য, প্রকার ও প্রয়োজনীয় বিধানাবলী তিনটি পরিচ্ছেদে বর্ণনা করছি।

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিবাহের ফযীলত ও বিবাহের প্রতি বিমুখতা

বিবাহের ফযীলত ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে আলেমগণ মতভেদ করেছেন। কেউ কেউ এর ফযীলত এমনি বর্ণনা করেন যে, বিবাহ করা আল্লাহর এবাদতের জন্যে নির্জনবাস অপেক্ষা উত্তম। কেউ ফযীলত স্বীকার করেন; কিন্তু নারী সহবাসের উদ্দীপনা না থাকলে এবাদতের জন্যে নির্জনবাসকে উত্তম বলেন। কেউ কেউ বলেন ঃ আমাদের এ যুগে বিবাহ না করাই শ্রেয়ঃ। আগেকার যুগে এর ফযীলত ছিল। তখন মহিলাদের বদভ্যাস ছিল না। এখন বাস্তব সত্য কি, তা পক্ষ ও বিপক্ষের হাদীস বর্ণনা এবং বিবাহের উপকারিতা ও অপকারিতা ব্যাখ্যা করার পরই জানা যাবে। তাই আমরা এ পরিচ্ছেদটি চার ভাগে বিভক্ত করছি।

বিবাহের ফযীলত ঃ এ সম্পর্কিত আয়াতগুলো এই ঃ وَانْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ (তোমাদের বিধবাদেরকে বিবাহ দাও।) এখানে صيغة الامر ব্যবহৃত হয়েছে, যাতে বিবাহ ওয়াজিব বুঝা যায়। وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ (স্বামীদেরকে বিয়ে করে নিতে তাদেরকে বাধা দিয়ো না।) এখানে বিয়েতে বাধাদান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পয়গম্বরগণের প্রশংসা ও গুণকীর্তনে এরশাদ হয়েছে ঃ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً (আমি আপনার পূর্বে অনেক রসূল প্রেরণ

করেছি এবং তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তান সন্ততি দিয়েছি ।) একথা অনুগ্রহ ও কৃপা প্রকাশের স্থলে বলা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর ওলীগণের প্রশংসাও করছেন, তারা তাঁর কাছে সন্তান সন্ততির জন্যে আবেদন করেন। সেমতে বলা হয়েছে–

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ـ

অর্থাৎ, যারা বলে, পরওয়ারদেগার, আমাদেরকে আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির তরফ থেকে চক্ষুর শীতলতা দান করুন এবং আমাদেরকে পরহেযগারদের অগ্রদূত করুন।

বলা হয়, আল্লাহ তাআলা তাঁর পবিত্র কিতাবে সেই পয়গম্বরগণেরই উল্লেখ করেছেন, যারা সপত্নীক ছিলেন। হাঁ, দুজন পয়গম্বর হযরত ইয়াহইয়া ও হযরত ঈসা (আঃ) এর ব্যতিক্রম। তাঁদের মধ্যে ইয়াহইয়া (আঃ) সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি বিবাহ করেছিলেন; কিন্তু সহবাস করেননি। কেবল বিবাহের ফযীলত অর্জন ও বিবাহের পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে বিবাহ করেছিলেন। হযরত ঈসা (আঃ) যখন পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করবেন, তখন বিবাহ করবেন এবং সন্তানাদিও হবে।

বিবাহের ফযীলত সম্পর্কিত হাদীসগুলো এই ঃ

النكاح سنتى فمن رغب عن سنتى فقد رغب عنى

অর্থাৎ, বিবাহ আমার সুন্নত। যে আমার সুন্নতের প্রতি বিমুখ হয়, সে আমার প্রতি বিমুখ হয়।

النكاح سنتى فمن احب فطرتى فليستن بسنتى

অর্থাৎ, বিবাহ আমার সুন্নত। যে আমার ধর্মকে মহব্বত করে, সে যেন আমার সুন্নত পালন করে।

تناكحوا تكثروا فانى اباهى بكم الامم يوم القيامة حتى بالسقط ـ

বিবাহ কর এবং অনেক সংখ্যক হয়ে যাও। আমি তোমাদেরকে নিয়ে কেয়ামতের দিন অন্য সকল উম্মতের উপর গর্ব করব। এমনকি

গর্ভপাতজনিত শিশুদের নিয়েও।

ومن رغب عن سنتى فليس منى وان من سنتى النكاح فمن احبنى فليستن بسنتى -

অর্থাৎ, যে আমার সুন্নতের প্রতি বিমুখ হয়, সে আমার দলভুক্ত নয়। বিবাহ আমার অন্যতম সুন্নত। অতএব, যে আমাকে মহব্বত করে, সে যেন আমার সুন্নত পালন করে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেন ঃ যে দারিদ্র্যের ভয়ে বিবাহ বর্জন করে, সে আমার দলভুক্ত নয়। এ হাদীসে যে কারণে বিবাহ থেকে বিরত থাকা হয়, সেই কারণের নিন্দা করা হয়েছে– বিবাহ বর্জনের নিন্দা করা হয়নি। আরও বলা হয়েছে, যে সামর্থ্য রাখে সে যেন বিবাহ করে। এক হাদীসে আছে–

من استطاع منكم بالباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لا فليصم فان الصوم له وجاء -

অর্থাৎ, যার যৌন সামর্থ্য আছে সে যেন বিবাহ করে। কারণ, এতে দৃষ্টি বেশী নত থাকে এবং লজ্জাস্থানের অধিক হেফাযত হয়। আর যে বিবাহ করতে না পারে সে যেন রোযা রাখে। কারণ, রোযা তার জন্যে খাসী হওয়ার শামিল।

এ থেকে জানা গেল, বিবাহের ফযীলতের কারণ হচ্ছে চক্ষু ও লজ্জাস্থান দূষিত হওয়ার আশংকা। খাসী হওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে রোযার কারণে কামভাব হ্রাস পাওয়া। এক হাদীসে আছে– যখন তোমার কাছে এমন কেউ আসে যার ধর্মপরায়ণতা ও বিশ্বস্ততায় তুমি সন্তুষ্ট, তখন তার বিবাহ করে দাও। এরূপ না করলে পৃথিবীতে গোলযোগ ও অনর্থ সৃষ্টি হবে। এখানে ফযীলতের কারণ গোলযোগের আশংকা বর্ণিত হয়েছে। আরও বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ওয়াস্তে নিজে বিবাহ করবে অথবা অন্যের বিবাহ করে দেবে, সে আল্লাহ্ তাআলার ওলী হওয়ার হকদার হয়ে যাবে। অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে– যে ব্যক্তি বিবাহ করে, সে তার অর্ধেক ধর্ম সংরক্ষিত করে নেয়। এখন বাকী অর্ধেকের জন্যে তার উচিত আল্লাহকে ভয় করা। এতেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, বিবাহের ফযীলতের

কারণ হচ্ছে বিরোধ থেকে বাঁচা এবং অনর্থ থেকে দূরে থাকা। কেননা, দুটি বস্তুই মানুষের ধর্ম বিনষ্ট করে– লজ্জাস্থান ও পেট। বিবাহ করলে লজ্জাস্থানের বিপদ থেকে বাঁচা যায়। আরও বলা হয়েছে– মৃত্যুর সাথে সাথে মানুষের সব আমল বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু তিনটি বিষয় বাকী থাকে। একটি হচ্ছে সৎ সন্তান। যে মৃত পিতার জন্যে দোয়া করে। বলাবাহুল্য, সন্তান হওয়ার উপায় বিবাহ ছাড়া কিছুই নয়।

বিবাহের ফযীলত সম্পর্কিত সাহাবায়ে কেরামের উক্তিসমূহ ঃ হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) বলেন ঃ ধর্মপরায়ণতা বিবাহে বাধা সৃষ্টি করে না। কেবল দুটি বিষয়ই বিবাহে বাধা দান করে– অক্ষমতা ও দুশ্চরিত্রতা। এতে তিনি বিবাহের বাধা দুটি বিষয়ে সীমিত করে দিয়েছেন। হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ বিবাহ না করা পর্যন্ত আবেদের এবাদত পূর্ণ হয় না। এর উদ্দেশ্য বিবাহ এবাদতের পরিশিষ্ট, কিন্তু বাহ্যতঃ তার উদ্দেশ্য এই মনে হয় যে, কামভাব প্রবল হওয়ার কারণে অন্তরের নিরাপত্তা বিবাহ ব্যতীত কল্পনীয় নয়। অন্তরের নিরাপত্তা ছাড়া এবাদত হতে পারে না। এ কারণেই তাঁর কয়েকজন গোলাম যখন বালেগ হয়ে যায়, তখন তাদেরকে একত্রিত করে তিনি বললেন ঃ তোমরা বিবাহ করতে চাইলে আমি বিবাহ করিয়ে দেব। কারণ, মানুষ যখন যিনা করে, তখন তার অন্তর থেকে ঈমান বের করে নেয়া হয়। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলতেন ঃ ধরে নেয়া যাক, আমার বয়সের মাত্র দশ দিন বাকী আছে, তবু বিবাহ করে নেয়াই আমার কাছে ভাল মনে হয়, যাতে আল্লাহ্ তাআলার সামনে অবিবাহিত গণ্য হয়ে না যাই। হযরত মুয়ায ইবনে জাবালের দুই স্ত্রী মহামারীতে মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং নিজেও মহামারীতে আক্রান্ত ছিলেন, কিন্তু এই অবস্থায়ও বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করে বলেছিলেন ঃ আল্লাহর সাথে অবিবাহিত হয়ে সাক্ষাৎ করতে আমার লজ্জা বোধ হয়। এ দুটি উক্তি থেকে বুঝা যায়, এ দুজন সাহাবীর মতে কামভাবের প্রাবল্য থেকে আত্মরক্ষা ছাড়া বিবাহের অন্যান্য ফযীলতও ছিল। হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) একাধিক বিবাহ করেছেন এবং বলতেন ঃ আমি কেবল সন্তানের জন্যে বিবাহ করি। জনৈক সাহাবী কেবল রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতই করতেন এবং রাতে তাঁর কাছেই থাকতেন। তিনি একদিন উক্ত সাহাবীকে বললেন ঃ তুমি বিয়ে কর না কেন? সাহাবী আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, একে তো আমি নিঃস্ব, কোন বিষয় আশয় নেই, দ্বিতীয়তঃ

আপনার খেদমত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব। রসূলুল্লাহ (সাঃ) চুপ হয়ে গেলেন। কিছুদিন পর আবার একথা বললে সাহাবী একই জওয়াব দিলেন, কিন্তু এবার সাহাবী মনে মনে চিন্তা করলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার মঙ্গল আমার চেয়ে বেশী বুঝেন। আমার জন্যে যা অধিক সমীচীন এবং আল্লাহর নৈকট্যের কারণ, তা তিনি জানেন। যদি তৃতীয় বার বলেন, তবে বিয়ে করে নেব। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তৃতীয় বার বললে সাহাবী আরজ করলেন ঃ আপনি আমার বিয়ে করিয়ে দেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ অমুক গোত্রে গিয়ে বল, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তোমাদেরকে আদেশ করেছেন তোমাদের মেয়ে আমার সাথে বিয়ে দিতে। সাহাবী আরজ করলেন ঃ হুযুর, আমার কাছে কিছু নেই। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামকে ডেকে বললেন ঃ তোমরা খেজুরের বীচি পরিমাণ স্বর্ণ সংগ্রহ করে তোমাদের এ ভাইকে দাও। সাহাবায়ে কেরাম তাই করলেন এবং এই সাহাবীকে সেই গোত্রে নিয়ে বিবাহ করিয়ে দিলেন। এর পর লোকের ওলীমা খাওয়ার বাসনা প্রকাশ করলে সাহাবীদের সকলে মিলে একটি ছাগলের ব্যবস্থা করে দেন। এ হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বার বার বিয়ে করতে বলা এ কথাই জ্ঞাপন করে যে, খোদ বিবাহের মধ্যে ফযীলত রয়েছে। এটাও সম্ভব যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর বিবাহের প্রয়োজন জানতে পেরেছিলেন।

কথিত আছে, পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে জনৈক আবেদ এবাদতে সমসাময়িক সকলকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। সে সময়ের পয়গম্বরের সামনে তার আলোচনা হলে পয়গম্বর বললেন ঃ যদি একটি সুন্নত বর্জন না করত, তবে সে চমৎকার ছিল বটে। আবেদ পয়গম্বরের কথা শুনে দুঃখিত হয়ে তাঁর খেদমতে হাযির হয়ে বলল ঃ আমি কোন্ সুন্নতটি বর্জন করেছি? পয়গম্বর বললেন ঃ তুমি বিবাহ বর্জন করেছ। আবেদ আরজ করল ঃ আমি বিবাহ নিজের উপর হারাম করিনি, কিন্তু আমি নিঃস্ব, আমার ব্যয়ভার অন্যে বহন করে। এ কারণে কেউ আমাকে কন্যা দান করে না। পয়গম্বর বললেন ঃ আমি তোমাকে আমার কন্যা দিচ্ছি। সেমতে আবেদের সাথে পয়গম্বর কন্যার বিয়ে হয়ে গেল। বিশর ইবনে হারেস (রহঃ) বলেন ঃ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল তিনটি বিষয়ে আমার উপর ফযীলত রাখেন। প্রথম, তিনি নিজের জন্যে ও অন্যের জন্যে হালাল রুজি অন্বেষণ করেন, আর আমি কেবল নিজের জন্যেই অন্বেষণ করি। দ্বিতীয়, তিনি বিবাহ

করার অবকাশ রাখেন; কিন্তু আমি এ ব্যাপারে সংকীর্ণ। তৃতীয়, তিনি জনগণের ইমাম।

কথিত আছে, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের পত্নী অর্থাৎ, আবদুল্লাহ জননী যেদিন ইন্তেকাল করেন, তার পরের দিন তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করে নেন এবং বলেন ঃ আমার মনে হয় যেন রাতে আমি অবিবাহিত। বিশরকে লোকে বলল, মানুষ আপনাকে বিবাহের সুন্নত বর্জনকারী বলে থাকে। বিশর বললেন ঃ আপত্তিকারীদেরকে বলে দাও, আমি ফরযের কারণে সুন্নত থেকে বিরত রয়েছি। পুনরায় কেউ তাঁর বিবাহের ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করলে তিনি বললেন ঃ এ আয়াত আমাকে বিবাহ থেকে বিরত রেখেছে– وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ মহিলাদেরও নিয়মানুযায়ী হক আছে, যেমন তাদের উপর স্বামীদের হক আছে। বর্ণিত আছে, বিশরকে মৃত্যুর পর স্বপ্নে দেখে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ আল্লাহ তাআলা আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? তিনি বললেন ঃ জান্নাতে আমার মর্যাদা উঁচু হয়েছে এবং পয়গম্বরগণের মর্তবার কাছে পৌঁছেছে; কিন্তু বিবাহিতদের মর্তবা পর্যন্ত পৌছেনি। সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়না বলেন ঃ অধিক পত্নী দুনিয়াদারী নয়। কেননা, হযরত আলী (রাঃ) অন্য সাহাবীগণের তুলনায় অধিক সংসারত্যাগী ছিলেন। অথচ তাঁর চার জন পত্নী ছিলেন।

বিবাহের প্রতি বিমুখ হওয়ার কারণ ঃ রসূলে করীম (সাঃ) বলেনঃ দুশ' বছর পরে মানুষের মধ্যে সেই উত্তম হবে, যে সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কম রাখবে। তার না স্ত্রী থাকবে, না বাচ্চা। তিনি আরও বলেন, এমন এক সময় আসবে যখন মানুষ তার স্ত্রী, পিতামাতা ও সন্তান-সন্ততির হাতে ধ্বংস হবে। তারা দারিদ্র্যের খোঁটা দেবে এবং তাকে এমন কাজ করতে বলবে, যা তার আয়ত্তাধীন নয়। ফলে সে এমন পথে পদচারণা করবে, যেখানে তার ধর্ম বরবাদ হবে। কাজেই সে ধ্বংস হয়ে যাবে। এক হাদীসে আছে– সন্তান-সন্ততি কম হওয়াও দুই ধনাঢ্যতার একটি। পক্ষান্তরে পরিবার-পরিজন বেশী হওয়াও দুই দারিদ্র্যের একটি। আবু সোলায়মান দারানী বলেন ঃ একা ব্যক্তি আমলের স্বাদ ও অন্তরের প্রশস্ততা যতটুকু পায়, সপত্নীক ব্যক্তি ততটুকু পায় না। একথাও তিনিই বলেন– আমি আমার সঙ্গীদের মধ্যে কাউকে পাইনি, যে

বিবাহ করার পর তার প্রথম মর্তবায় কায়েম রয়েছে। তিনি আরও বলেন ঃ তিনটি বিষয় যে অন্বেষণ করে সে দুনিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ে। এক, যে জীবিকা অন্বেষণ করে, দুই, যে কোন মহিলাকে বিয়ে করে এবং তিন, যে হাদীস লেখে। হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা যে বান্দার কল্যাণ করতে চান, তাকে অর্থকড়ি, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে মশগুল করেন না। একদল লোক এ উক্তি নিয়ে বিতর্ক করার পর সাব্যস্ত করে যে, এ অর্থকড়ি, স্ত্রী ও সম্পদ মোটেই থাকবে না; বরং উদ্দেশ্য এগুলো থাকবে ঠিকই; কিন্তু আল্লাহর পথে বাধা হবে না। এ বিষয়টিই আবু সোলায়মান দারানীর এই উক্তির মধ্যে পাওয়া যায়, অর্থকড়ি, স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি যে বস্তুই তোমাকে আল্লাহর পথে বাধা দেয়, তাই তোমার জন্যে অলক্ষুণে। মোট কথা, যারা বিবাহ থেকে বিরত হওয়ার কথা বলেছেন, তারা সর্বাবস্থায় বলেননি; বরং একটি শর্তাধীনে বলেছেন। বিবাহের ফযীলতও সর্বাবস্থায় এবং শর্তাধীনে বর্ণিত আছে। তাই বিবাহের উপকারিতা ব্যাখ্যা করা আমাদের জন্যে জরুরী হয়ে পড়েছে।

বিবাহের উপকারিতা ঃ সন্তান হওয়া, কামপ্রবৃত্তি নিবারণ করা, ঘরকন্নার ব্যবস্থা করা, দল বৃদ্ধি করা, মহিলাদের সাথে থাকার ব্যাপারে আত্মিক সাধনা করা– সংক্ষেপে এই পাঁচটি বিষয় হচ্ছে বিবাহের উপকারিতা। এখন প্রত্যেকটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানা দরকার।

(১) সন্তান হওয়া ঃ সবগুলোর মধ্যে এটাই মূল। মানব বংশ অব্যাহত রাখার উদ্দেশেই বিবাহ প্রবর্তিত হয়েছে, যাতে জগৎ মানবশূন্য হয়ে না যায়। নর ও নারীর মধ্যে নিহিত কাম-বাসনা সন্তান হওয়ার একটি সূক্ষ্ম ব্যবস্থা। যেমন জন্তুকে জালে আবদ্ধ করার জন্যে দানা ছড়িয়ে দেয়া হয়, তেমনি নর নারীর সহবাসস্পৃহা সন্তান লাভের একটি উপায়। খোদায়ী শক্তি এসব ঝামেলা ছাড়াই মানব সৃষ্টি করতে সক্ষম ছিল; কিন্তু খোদায়ী প্রজ্ঞা এটাই চেয়েছে যে, ঘটনাবলী কারণাদির মধ্যেই সীমিত থাকুক। যদিও এর প্রয়োজন ছিল না; কিন্তু আপন কুদরত জাহির করা, বিস্ময়কর কারিগরি সম্পন্ন করা এবং স্বীয় পূর্ব ইচ্ছা, নির্দেশ ও কলমের লিখন অনুযায়ী অস্তিত্ব দান করার জন্যে এ ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়েছে। কামপ্রবৃত্তি থেকে মুক্ত অবস্থায় সন্তান লাভের উপায় হিসেবে বিবাহ করলে তা চারি প্রকারে সওয়াবের কারণ হয়, যা বিবাহের ফযীলতের মূল কথা। এমনকি এগুলোর কারণেই বুযুর্গগণ অবিবাহিত অবস্থায় আল্লাহ তাআলার

সামনে যাওয়া পছন্দ করেননি। প্রথম, সন্তান লাভের চেষ্টা করা আল্লাহ তাআলার মর্জির অনুকূল। কেননা, এতে মানব জাতির অস্তিত্ব অবশিষ্ট থাকে। দ্বিতীয় ঃ এতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি মহব্বত পাওয়া যায়। কেননা, যে সংখ্যাধিক্য নিয়ে তিনি গর্ব করতেন, এ চেষ্টা তারই অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয়, মৃত্যুর পর সৎকর্মপরায়ণ সন্তানের দোয়া আশা করা যায়। চতুর্থ, কচি বয়সে সন্তান মারা গেলে সে সুপারিশকারী হবে বলে আশা করা যায়। এই প্রকার চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রথম প্রকারটি সর্বাধিক সূক্ষ্ম এবং জনাসাধারণের বোধগম্যতার ঊর্ধ্বে। অথচ আল্লাহ তাআলার অভূতপূর্ব কারিগরি ও বিধানাবলী সম্পর্কে যারা সম্যক জ্ঞাত, তাদের মতে এটাই সর্বাধিক শক্তিশালী ও সঠিক প্রকার। এর প্রমাণ, যদি কোন মনিব তার গোলামকে বীজ, কৃষিক্ষেত্র সরবরাহ করে এবং গোলামও সে কাজ করতে সক্ষম হয়, তবে গোলাম অলসতা করে কৃষিকাজের সাজসরঞ্জাম বেকার ফেলে রাখলে এবং বীজ নষ্ট করে দিলে অবশ্যই মনিবের ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির পাত্র হবে। এখন দেখা দরকার, আল্লাহ তাআলা মানুষকে কি সরবরাহ করেছেন? তিনি মানুষকে যুগল সৃষ্টি করেছেন, নরকে প্রজননযন্ত্র ও অণ্ডকোষ দিয়েছেন এবং কটিদেশে বীর্য সৃষ্টি করে তা শিরা উপশিরায় প্রবাহিত হওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। অপর দিকে নারীর গর্ভাশয়কে বীর্য ধারণের পাত্র করেছেন। এর পর নর নারী উভয়ের উপর কামপ্রবৃত্তি ও যৌনবাসনা চাপিয়ে দিয়েছেন। এসব আয়োজন স্পষ্ট ভাষায় স্রষ্টার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে। যদি আল্লাহ তাআলা রসূলের (সাঃ) মুখে আপন উদ্দেশ্য বর্ণনা নাও করতেন, তবুও বুদ্ধিমানদের জন্যে এসব আয়োজন ও সাজসরঞ্জামের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বুঝে নেয়া কঠিন ছিল না, কিন্তু আল্লাহ তাআলা স্বীয় রসূল (সাঃ)-এর মুখে এ উদ্দেশ্য প্রকাশ করেছেন। তিনি এরশাদ করেন ঃ تناكحوا تناسلوا তোমরা পরস্পরে বিবাহ কর এবং বংশ বিস্তার কর। এমতাবস্থায় যে ব্যক্তি বিবাহ থেকে বিরত থাকবে সে কৃষিকাজে বিমুখ, বীজ ধ্বংসকারী এবং আল্লাহ তাআলার আয়োজন ব্যর্থকারী হিসেবে গণ্য হবে। সে প্রকৃতির সেই উদ্দেশ্য ও রহস্যের খেলাফ করবে, যা সৃষ্টি অবলোকন করে হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

এ কারণেই শরীয়ত সন্তান হত্যা করতে এবং জীবিত কবরস্থ করতে কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছে। কেননা, এটাও অস্তিত্ব পূর্ণ হওয়ার পরিপন্থী। সার কথা, যে বিবাহ করে, সে এমন একটি বিষয় পূর্ণ করতে

সচেষ্ট হয়, যা পূর্ণ করা আল্লাহ্ তাআলার পছন্দনীয়। পক্ষান্তরে যে বিবাহ থেকে বিরত থাকে, সে এমন বস্তুকে বিনষ্ট ও বেকার করে দেয়, যা বিনষ্ট করা আল্লাহ্ তাআলার কাছে অপছন্দনীয়। এছাড়া সে সেই বংশের গতি স্তব্ধ করে দেয়, যা আল্লাহ্ তাআলা হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে তার অস্তিত্ব পর্যন্ত অব্যাহত রেখেছিলেন এবং সে নিজেই কৌশল করে, যাতে তার মৃত্যুর পর সন্তান-সন্ততি তার স্থলাভিষিক্ত না হয়। যদি বিবাহের কারণ যৌন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করাই হত, তবে হযরত মুয়ায মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে বলতেন না যে, আমাকে বিবাহ করাও, যাতে আল্লাহ্ তাআলার কাছে অবিবাহিত অবস্থায় না যাই। এখানে প্রশ্ন হয়, তখন তাঁর সন্তানের আশা ছিল না, তবুও বিবাহের বাসনা করার কারণ কি ছিল? এর জওয়াব, সন্তান সহবাসের ফলে হয়। সহবাসের কারণ যৌনস্পৃহা। এটা বান্দার ইচ্ছাধীন নয়। যৌনস্পৃহায় গতিবেগ সঞ্চার করে, কেবল এমন বিষয় মওজুদ করাই বান্দার ইচ্ছাধীন। এটা সর্বাবস্থায় হতে পারে। সুতরাং যে বিবাহ করে সে তার দায়িত্ব পূর্ণ করে। অবশিষ্ট বিষয়গুলো তার আয়ত্তের বাইরে। এ কারণেই পুরুষত্বহীন ব্যক্তির জন্যেও বিবাহ করা মোস্তাহাব। বিবাহ সন্তান লাভের উপায়, এর দ্বিতীয় কারণ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মহব্বত ও সন্তুষ্টি অর্জনে সচেষ্ট হওয়া। যে বস্তু দ্বারা তিনি গর্ব করবেন, তার প্রাচুর্য বিবাহ দ্বারাই হয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) একথা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন এবং হযরত ওমর (রাঃ)-এর কার্য থেকেও তা বুঝা যায়। বর্ণিত আছে, তিনি একাধিক বিবাহ করেছেন। তিনি বলতেন ঃ আমি সন্তানের জন্যে বিবাহ করি। হাদীসে বর্ণিত বন্ধ্যা নারীর নিন্দা থেকেও একথা বুঝা যায়।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ গৃহের কোণের মাদুর বন্ধ্যা নারীর তুলনায় উত্তম। তিনি আরও বলেন ঃ خير نسائكم الولود الودود –যে নারী সন্তান প্রসব করে এবং ভালবাসে, সে তোমাদের উত্তম স্ত্রী। আরও বলা হয়েছে– কৃষ্ণাঙ্গ সন্তান প্রসবকারিণী নারী সুন্দরী বন্ধ্যা নারী অপেক্ষা উত্তম। এসব রেওয়ায়েত থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়, বিবাহের ফযীলতে সন্তান চাওয়ারও দখল আছে। কেননা, সুন্দরী স্ত্রী পুরুষের পবিত্রতা কায়েম রাখা, দৃষ্টি নত রাখা এবং কাম-বাসনা চরিতার্থ করার জন্যে অধিক শোভনীয়। এতদসত্ত্বেও সন্তানের দিকে লক্ষ্য করে কৃষ্ণাঙ্গী মহিলাকে তার উপর অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

তৃতীয় কারণ– মৃত্যুর পর সৎ সন্তান থাক, যে পিতার জন্যে দোয়া করবে। হাদীসে আছে, সন্তানের দোয়া পিতার সামনে নূরের খাঞ্চায় রেখে পেশ করা হয়। কোন কোন লোক বলে, মাঝে মাঝে সন্তান সৎ হয় না। এটা বাজে কথা। কেননা, ধর্মপরায়ণ মুসলমানের সন্তান প্রায়শঃ সৎ-ই হবে; বিশেষতঃ যখন তাকে উত্তমরূপে লালন-পালন করা হয় এবং ভাল কাজে নিয়োজিত রাখা হয়। সারকথা, সৎ হোক কিংবা অসৎ, সর্বাবস্থায় ঈমানদারের দোয়া পিতা-মাতার জন্যে উপকারী হয়ে থাকে। সন্তান সৎকাজ করে দোয়া করলে পিতা তার সওয়াব পাবে। কেননা, সন্তান তার উপার্জন, কিন্তু অসৎ কাজ করলে পিতাকে তজ্জন্যে জওয়াবদিহি করতে হবে না। কেননা, কোরআনে বলা হয়েছে ঃ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى

একজনের পাপের বোঝা অন্য জনে বহন করবে না।

উপরোক্ত বিষয়টিই আল্লাহ তা'আলা এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَىْءٍ

অর্থাৎ, আমি মিলিয়ে দেব তাদের সাথে তাদের সন্তানদেরকে এবং তাদের কোন আমল হ্রাস করব না। অর্থাৎ, তাদের আমল হ্রাস না করে অতিরিক্ত অনুগ্রহস্বরূপ তাদের সন্তানকে তাদের সাথে সংযুক্ত করে দেব।

চতুর্থ কারণ– অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান পূর্বে মারা গেলে পিতামাতার জন্যে সুপারিশকারী হবে। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ সন্তান তার পিতামাতাকে জান্নাতের দিকে টেনে নেবে। কোন কোন হাদীসে বলা হয়েছে– সন্তান পিতামাতার কাপড় ধরবে, যেমন আমি তোমার কাপড় ধরছি। আরও বলা হয়েছে– সন্তানকে জান্নাতে প্রবেশ করতে বলা হবে। সে জান্নাতের দরজায় পৌঁছে থেমে যাবে এবং রাগ করে বলবে ঃ আমার পিতামাতা সঙ্গে থাকলে আমি জান্নাতে যাব। তখন আদেশ হবে– তার পিতামাতাকে তার সাথে জান্নাতে দাখিল কর। অন্য হাদীসে আছে, কেয়ামতের ময়দানে হিসাব-নিকাশের জন্যে সন্তানরা সমবেত হলে ফেরেশতাদেরকে আদেশ করা হবে ঃ তাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাও। সন্তানরা জান্নাতের দরজায় আসবে। তাদেরকে বলা হবে– মুসলমানের সন্তানরা, তোমরা ভিতরে এস। তোমাদের কোন হিসাব-কিতাব নেই। সন্তানরা বলবে ঃ আমাদের পিতামাতা কোথায়? ফেরেশতারা বলবে ঃ তারা তোমাদের মত নয়। তাদের পাপকর্ম আছে। তাদের হিসাব-নিকাশ

আছে। একথা শুনে সন্তানরা হঠাৎ গোঁ ধরবে এবং জান্নাতের দরজায় ফরিয়াদ করতে থাকবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্ত্বেও জিজ্ঞেস করবেন ঃ এই ফরিয়াদ কিসের? ফেরেশতারা বলবে ঃ ইলাহী, এরা মুসলমানদের সন্তান। এরা বলে ঃ আমরা পিতামাতাকে সঙ্গে না নিয়ে জান্নাতে যাব না। আল্লাহ্ তা'আলা আদেশ করবেন– এই দলের মধ্যে যাও এবং তাদের পিতামাতার হাত ধরে জান্নাতে দাখিল কর। এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

من مات له اثنان من الولد فقد احتظر محتظرا من النار .

অর্থাৎ, যার দু'সন্তান মারা যায়, তার মধ্যে ও জাহান্নামের অগ্নির মধ্যে একটি প্রাচীর অন্তরায় হয়ে যাবে। আরও আছে–

من مات له ثلاثة لم يبلغوا الحنث ادخله الله الجنة بفضل رحمته اياهم قيل يا رسول الله واثنان قال واثنان .

অর্থাৎ, যার তিনটি সন্তান বালেগ হওয়াব পূর্বে মারা যায়, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন সন্তানদের প্রতি অতিরিক্ত রহমতস্বরূপ। কেউ প্রশ্ন করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! দু'জন মারা গেলে? তিনি বললেন ঃ দু'জন মারা গেলেও তাই হবে।

জনৈক বুযুর্গকে লোকেরা বিবাহ করতে বলত, কিন্তু তিনি কিছুদিন পর্যন্ত অস্বীকার করতে থাকেন। একদিন ঘুম থেকে উঠে বলতে লাগলেনঃ আমাকে বিবাহ করিয়ে দাও। লোকেরা তাঁকে বিয়ে করিয়ে দিল এবং বিয়ে করার খাহেশ হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করল। বুযুর্গ বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা হয়তো আমাকে ছেলে দেবেন এবং শৈশবে তার মৃত্যু হবে। ফলে পরকালে সে আমার উপকারে আসবে। এর পর বললেন ঃ আমি স্বপ্নে দেখেছি যেন কেয়ামত কায়েম হয়েছে। সকলের সাথে আমিও কেয়ামতের ময়দানে দন্ডায়মান। পিপাসায় আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত। অন্য সবই পিপাসায় তেমনি কাতর। এর পর দেখি, কিছু সংখ্যক শিশু কাতার ডিঙ্গিয়ে চলে আসছে। তাদের মাথায় নূরের রুমাল এবং হাতে রূপার পাত্র ও স্বর্ণের গ্লাস। তারা এক একজনকে পানি পান করিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ছে এবং অনেককে ছেড়েও চলেছে। আমি এক শিশুর দিকে হাত বাড়িয়ে বললাম ঃ পিপাসায় আমার শোচনীয় অবস্থা। আমাকে পানি পান

করাও। সে বলল ঃ আমরা মুসলমানদের সন্তান– শৈশবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলাম।

কোরআনে বলা হয়েছে وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ তোমরা নিজেদের জন্যে অগ্রে প্রেরণ কর।

এর এক অর্থ এরূপও করা হয়েছে, এখানে উদ্দেশ্য শিশুদেরকে অগ্রে প্রেরণ করা। মোট কথা, উপরোক্ত চারটি কারণ থেকেই জানা গেল, বিবাহের ফযীলত বেশীর ভাগ এ কারণেই যে, এটা সন্তান লাভ করার উপায়।

বিবাহের দ্বিতীয় উপকারিতা হচ্ছে, শয়তানের চক্রান্ত থেকে হেফাযতে থাকা, কামস্পৃহা দমিত রাখা এবং দৃষ্টি নত রাখা। এতে করে লজ্জাস্থান সংরক্ষিত হয়ে যায়। হাদীসে এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। বলা হয়েছে– যে বিবাহ করে সে তার অর্ধেক ধর্ম বাঁচিয়ে নেয়। অতঃপর বাকী অর্ধেকের জন্যে আল্লাহকে ভয় করা উচিত। এ উপকারিতা প্রথম উপকারিতার তুলনায় কম। কেননা, কামস্পৃহার বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে বিবাহ যথেষ্ট; কিন্তু যে ব্যক্তি সন্তান লাভ তথা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে বিবাহ করে, সে মর্তবায় সেই ব্যক্তির উপরে, যে কেবল কামস্পৃহার বিপদাপদ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে বিবাহ করে। তবে কামস্পৃহা সন্তান লাভে সহায়ক হয়ে থাকে। এতে আর একটি রহস্য বিদ্যমান যে, কামস্পৃহা চরিতার্থ করার মধ্যে এমন আনন্দ রয়েছে, যা চিরস্থায়ী হলে তার সমতুল্য কোন আনন্দ নেই। এ আনন্দ জান্নাতে প্রতিশ্রুত আনন্দের সন্ধান দেয়। এটা উদ্রেক করার কারণ, যে আনন্দের স্বাদ জানা থাকে না, তার প্রতি উৎসাহিত করা অনর্থক হয়ে থাকে। উদাহরণতঃ পুরুষত্বহীন ব্যক্তিকে নারী সম্ভোগের উৎসাহ দেয়া মোটেই উপকারী নয়। সুতরাং স্বাদ জানার জন্যেই মানুষের মধ্যে কামস্পৃহা সৃষ্টি করা হয়েছে, যাতে সে জান্নাতে একে চিরস্থায়ী করতে আগ্রহী হয়, যা আল্লাহ্ তাআলার এবাদতের উপর নির্ভরশীল। এখন আল্লাহ্ তাআলার প্রজ্ঞা ও রহমত চিন্তা করা দরকার যে, এক কামস্পৃহার মধ্যে তিনি বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দু'প্রকার জীবন নিহিত রেখেছেন। বাহ্যিক জীবন এভাবে যে, কামস্পৃহার মাধ্যমে মানুষের বংশ বিস্তার অব্যাহত থাকে। এটাও মানব জাতির জন্যে এক প্রকার স্থায়িত্ব। আর আভ্যন্তরীণ জীবন

হচ্ছে পারলৌকিক জীবন, যার কারণ কামস্পৃহাই হয়ে থাকে। অর্থাৎ, কামস্পৃহার দ্রুত অবসান দেখে মানুষ চিরস্থায়ী ও পূর্ণাঙ্গ আনন্দ লাভের ফিকির করে এবং সেটা অর্জন করার জন্যে এবাদতে উদ্বুদ্ধ হয়। অতএব কামস্পৃহার কারণেই যেন জান্নাতের নেয়ামত হাসিলের সাধনা করা সহজ হয়ে যায়। সারকথা, কামোদ্দীপনা দমন হেতু বিবাহ করা শরীয়তে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেই ব্যক্তির জন্যে, যে অক্ষম ও পুরুষত্বহীন নয়। অধিকাংশ মানুষই এরূপ। এটা গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণ, কামস্পৃহা প্রবল হলে এবং তা দমন করার মত তাকওয়ার শক্তি না থাকলে মানুষ কুকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এ আয়াতে এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে–

إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ .

অর্থাৎ, এমনটি না করলে পৃথিবীতে অনর্থ ও মহাগোলযোগ হবে।

কামস্পৃহা প্রবল হওয়ার সময় তাকওয়ার বাধা থাকলেও এর পরিণতি হবে, মানুষ কেবল বাহ্যিক অঙ্গকে বিরত রাখবে অর্থাৎ, দৃষ্টি নত ও লজ্জাস্থান সংরক্ষিত রাখবে; কিন্তু অন্তরকে কুমন্ত্রণা ও কুচিন্তা থেকে বাঁচানো তার ক্ষমতার বাইরে থাকবে। তার মনে এ ব্যাপারে দ্বন্দ্ব থাকবে এবং সহবাসের চিন্তাভাবনা হবে। মাঝে মাঝে এটা নামাযের ভেতরে উপস্থিত হতে পারে এবং নামাযের মধ্যে এমন কল্পনা আসতে পারে যা মানুষের কাছে বলা লজ্জার কারণে সম্ভবপর নয়। আল্লাহ্ তাআলা মনের অবস্থা জানেন। মনই মুরীদের জন্যে আখেরাতের পথে চলার একমাত্র পুঁজি। কাজেই মনে কুচিন্তা থাকা খুবই খারাপ। সদা-সর্বদা রোযা রাখলেও কুমন্ত্রণার মূল উৎপাটিত হয় না। হাঁ, রোযা রাখতে রাখতে দেহ দুর্বল এবং মেজাজ খিটখিটে হয়ে গেলে কুমন্ত্রণা দূর হওয়া সম্ভবপর। এসব কারণেই হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ আবেদের এবাদত বিবাহ দ্বারাই পূর্ণতা লাভ করে। কামস্পৃহার প্রাধান্য একটি ব্যাপক মসিবত। কম মানুষই এ থেকে মুক্ত থাকে। لَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا আমাদেরকে এমন বোঝা বহন করতে দিয়ো না, যার শক্তি আমাদের নেই। –এ আয়াতের তফসীরে হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন ঃ এখানে কামোদ্দীপনা বুঝানো হয়েছে ঃ خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا –মানুষ দুর্বল সৃজিত হয়েছে –এ আয়াতের তফসীরে হযরত মুজাহিদ বলেন ঃ এখানে দুর্বল অর্থ যে নারী সম্ভোগের ব্যাপারে সবর করে না। হযরত কাইয়াস

বলেন ঃ যখন মানুষের পুরুষাঙ্গ উত্তেজিত হয়, তখন তার দুই তৃতীয়াংশ বুদ্ধি লোপ পায়। কেউ বলেন ঃ তার তৃতীয়াংশ দ্বীনদারী বরবাদ হয়ে যায়। নাওয়াদেরুত্তাফসীরে বর্ণিত আছে, مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ অন্ধকারের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি যখন তা ঘনীভূত হয় –এ আয়াতের তফসীরে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এখানে উদ্দেশ্য পুরুষাঙ্গ উত্তেজিত হওয়া। মোট কথা, এটা এমন এক বিপদ, যা উত্তেজিত হলে তার মোকাবিলা জ্ঞানবুদ্ধি এবং দ্বীনদারীও করতে পারে না। এদিকেই ইশারা করা হয়েছে এই হাদীসে–

ما رايت من ناقصات عقل ودين اغلب لذى الباب منكن ۔

অর্থাৎ, নারীদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে– আমি এমন কোন স্বল্প বুদ্ধি ও স্বল্প দ্বীনওয়ালা দেখিনি, যে বুদ্ধিমানদের উপর তোমাদের চেয়ে অধিক প্রবল হয়ে যায়।

রসূলে করীম (সাঃ) দোয়ায় বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِىْ وَبَصَرِىْ وَقَلْبِىْ وَشَرِّ مَنِيِّىْ ۔

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই আমার কানের, আমার চোখের, আমার অন্তরের এবং আমার বীর্যের অনিষ্ট থেকে। এখন বুঝা উচিত, যে বিষয় থেকে রসূলে পাক (সাঃ) আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন, অন্য ব্যক্তি সে বিষয়ে অবহেলা কিরূপে করতে পারে?

বিবাহের তৃতীয় উপকারিতা হচ্ছে চিত্তবিনোদন এবং এর দ্বারা এবাদতে শক্তি সঞ্চয়। কেননা, মন এবাদত থেকে সব সময় পলায়নপর থাকে। এটা তার মজ্জাবিরোধী। সুতরাং মনকে সদাসর্বদা তার খেলাফ কাজে লাগিয়ে রাখলে সে অবাধ্য হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে মাঝে মাঝে বিনোদনের মাধ্যমে তাকে সুখ দিলে সে খুশী থাকবে। নারীর সাথে চিত্তবিনোদনে এমন সুখ পাওয়া যায়, যা সকল ক্লেশ দূর করে দেয়। সুতরাং বৈধ বিষয় দ্বারা মনকে সুখ দেয়া জরুরী। কেননা, আল্লাহ বলেনঃ

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا ۔

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে, যাতে সে তার কাছে অবস্থান করে।

হযরত আলী মুর্তযা (রাঃ) বলেন ঃ এক মূহূর্ত হলেও মনকে সুখ দাও। কেননা, যখন মনকে দিয়ে বলপূর্বক কাজ নেয়া হয়, তখন মন অন্ধ হয়ে যায়। বিবাহের চতুর্থ উপকারিতা হচ্ছে, ঘরকন্নার ব্যবস্থাপনা তথা রান্নাবান্না করা, ঝাড় দেয়া, বিছানা করা ও থালাবাসন মাজা। কেননা, গৃহে পুরুষ একা থাকলে এসব কাজ করা তার জন্যে কঠিন হবে। এতে তার অনেক সময় নষ্ট হবে। ফলে এলেম ও আমলের জন্যে অবসর পাবে না। এদিক দিয়ে সাধ্বী নারী ঘরকন্নার ব্যবস্থাপনা করে তার স্বামীর ধর্মকর্মে সহায়তা করে। এ কারণেই আবু সোলায়মান দারানী বলেন ঃ সাধ্বী সুনিপুণা স্ত্রী নিয়ে সংসার করা দুনিয়াদারীর মধ্যে গণ্য হয় না। কেননা, তার মাধ্যমে পুরুষ আখেরাতের কাজ করার সময় পায়।

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً ـ

অর্থাৎ, পরওয়ারদেগার, আমাদেরকে দুনিয়াতে পুণ্য দান কর।

–এ আয়াতের তফসীরে মুহাম্মদ ইবনে কা'ব বলেন ঃ এখানে দুনিয়ার পুণ্য বলে সুশীলা সুনিপুণা স্ত্রী বুঝানো হয়েছে। হযরত ওমর (রাঃ) বলতেন ঃ বান্দাকে ঈমানের পর ভাগ্যবতী স্ত্রীর চেয়ে উত্তম কোন কিছু দেয়া হয়নি। স্ত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ এমন আশীর্বাদ হয়ে থাকে যে, কোন দান তাদের বিনিময় হতে পারে না। আবার কতক এমন গলার বেড়ী হয় যে, তাদের কাছ থেকে কোন মুক্তিপণের বিনিময়েও রেহাই পাওয়া যায় না। রসূলে আকরাম (সাঃ)-এরশাদ করেন ঃ হযরত আদম (আঃ)-এর উপর আমার শ্রেষ্ঠত্ব দু'টি বিষয়ে– এক, তাঁর স্ত্রী অবাধ্যতার কাজে তাঁর মদদগার ছিল। আর আমার পত্নী আল্লাহ তাআলার আনুগত্যমূলক কাজে আমার সাহায্য করে। দ্বিতীয়, তাঁর শয়তান কাফের ছিল আর আমার শয়তান মুসলমান হয়ে গেছে। সে ভাল কাজ ছাড়া কিছু আদেশ করে না। মোট কথা, এটাও এমন এক উপকারিতা, যা সৎলোকেরা কামনা করে, কিন্তু এ উপকারিতার পূর্বশর্ত হচ্ছে, দু'পত্নী থাকা চলবে না। কেননা, দু'পত্নী থাকলে প্রায়ই পারিবারিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং জীবন নিরানন্দ হয়ে যায়।

বিবাহের পঞ্চম উপকারিতা, এতে নফসের বিরুদ্ধে সাধনা করা হয়।

কেননা, পরিবার-পরিজনের হক আদায় করা, তাদের আচার-আচরণ মনের বিরোধী হলেও সবর করা, তাদের জন্যে কষ্ট করা, তাদের সংশোধনের চেষ্টা করা, তাদেরকে ধর্মের পথ বলে দেয়া, তাদের খাতিরে হালাল উপার্জনে অক্লান্ত শ্রম স্বীকার করা এবং তাদের লালনপালন করা– এসবই অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ কাজ। কেননা, এগুলো প্রজাপালন ও রাজ্যশাসনতুল্য। স্ত্রী ও পুত্র-পরিজন হচ্ছে প্রজা। প্রজার হেফাযত উচ্চস্তরের কাজ। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

يوم من وال عادل افضل من عبادة سبعين سنة -

অর্থাৎ, ন্যায়পরায়ণ শাসকের একদিন সত্তর বছর এবাদত অপেক্ষা উত্তম।

বলাবাহুল্য, যে ব্যক্তি নিজের ও অপরের সংশোধনে আত্মনিয়োজিত, সে সেই ব্যক্তির চেয়ে উত্তম, যে কেবল নিজের সংশোধনে মশগুল। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি উৎপীড়ন সহ্য করে, সে তার মত নয়, যে নিজেকে স্বাচ্ছন্দ্য ও আরামে মত্ত রাখে। মোট কথা, স্ত্রী-পুত্র পরিজনের চিন্তাভাবনা করা আল্লাহর পথে জেহাদ করার মতই। তাই বিশরে হাফী (রাহঃ) বলেছিলেন ঃ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল আমার উপর তিন বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব রাখেন। তন্মধ্যে একটি, তিনি নিজের জন্যে ও অপরের জন্যে হালাল রুজি অন্বেষণ করেন। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে ঃ মানুষ পরিবার-পরিজনের জন্যে যা ব্যয় করে তা খয়রাততুল্য। মানুষ সেই লোকমারও সওয়াব পায় যা সে তার স্ত্রীর মুখে তুলে দেয়। এক বুযুর্গ জনৈক আলেমের কাছে বললেন ঃ আল্লাহ তাআলা আমাকে প্রত্যেক আমল থেকে কিছু অংশ দিয়েছেন, এমন কি, হজ্জ জেহাদ ইত্যাদি থেকেও। আলেম বললেন ঃ তোমাকে আবদালের আমল তো দেয়াই হয়নি। বুযুর্গ জিজ্ঞেস করলেন ঃ আবদালের আমল কি উত্তর হল– হালাল উপার্জন করা এবং পরিবার-পরিজনের জন্যে ব্যয় করা। ইবনে মোবারক যখন তাঁর ভাইদের সাথে জেহাদে ছিলেন, তখন একদিন বললেন ঃ তোমরা সেই আমল জান কি, যা আমাদের এই জেহাদ অপেক্ষা উত্তম, তারা বললেন ঃ না, আমরা জানি না। তিনি বললেন ঃ আমি জানি। প্রশ্ন হল ঃ সেটা কি? তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি সন্তানওয়ালা হওয়া সত্ত্বেও কারও কাছে কিছু চায় না, রাতে জেগে ছা-বাচ্চাদেরকে তৃপ্ত দেখে এবং তাদেরকে আপন কাপড় দ্বারা ঢেকে দেয়, তার আমল আমাদের এই

জেহাদের চেয়ে উত্তম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

من حسنت صلاته وكثر عياله وقل ماله ولم يغتب المسلمين كان معى فى الجنة كهاتين ـ

অর্থাৎ, যার নামায ভাল হয়, পরিবার-পরিজন বেশী হয়, অর্থসম্পদ কম হয় এবং যে মুসলমানদের পশ্চাৎ নিন্দা করে না, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।

অন্য এক হাদীসে আছে–

ان الله يحب الفقير المتعفف بالعيال

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ নিঃস্ব, সংযমী, পরিজনশীলকে ভালবাসেন।

হাদীসে আরও আছে– বান্দার গোনাহ অনেক হয়ে গেলে আল্লাহ তা'আলা তাকে পরিবার-পরিজনের চিন্তায় লিপ্ত করে দেন, যাতে তার গোনাহ দূর হয়ে যায়। জনৈক পূর্ববর্তী বুযুর্গ বলেন ঃ কিছু গোনাহ এমন আছে, তাঁর কাফফারা পরিবার-পরিজন ছাড়া অন্য কিছু নয়। এ সম্পর্কে এক হাদীসে আছে, কিছু গোনাহ এমন আছে, যা জীবিকা উপার্জনের চিন্তা ছাড়া অন্য কোন কিছু দূর করতে পারে না।

রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

من كان له ثلث بنات فانفق عليهن واحسن اليهم حتى يغنيهن الله عنه اوجب الله له الجنة البتة الا ان يعمل ما لايغفرله ـ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তির তিনটি কন্যা সন্তান থাকে এবং সে তাদের ভরণপোষণ করে ও ততদিন তাদের দেখাশোনা করে, যতদিন আল্লাহ্ তাদেরকে স্বনির্ভর করে না দেন, আল্লাহ তাআলা তার জন্যে নিশ্চিতরূপে জান্নাত ওয়াজিব করে দেন, কিন্তু সে ক্ষমার অযোগ্য কোন গোনাহ করলে ভিন্ন কথা।

কথিত আছে, জনৈক বুযুর্গ তার স্ত্রীর সাথে খুব সম্প্রীতি সহকারে বসবাস করতেন। অবশেষে একদিন স্ত্রী মারা গেল। লোকেরা তাঁকে দ্বিতীয় বিবাহ করতে বললে তিনি বললেন ঃ না, আমার মানসিক শান্তির জন্যে একজনই যথেষ্ট ছিল। এর কিছুদিন পর বুযুর্গ বললেন ঃ স্ত্রীর মৃত্যুর

এক সপ্তাহ পরে আমি স্বপ্নে দেখলাম, যেন আকাশের দরজা উম্মুক্ত করে কিছু লোক অবতরণ করছে এবং একে অপরের পেছনে শূন্যে চলে আসছে। যখন একজন আমার নিকটে নামে, তখন আমাকে দেখে তার পেছনের জনকে বলে ঃ অলক্ষুণে এ ব্যক্তিই। পেছনের জন বলে, হাঁ। এমনিভাবে তৃতীয় জন চতুর্থ জনকে বলে এবং সে হাঁ বলে। আমি ভয়ে তাদেরকে ব্যাপার কি জিজ্ঞেস করতে পারি না। অবশেষে সকলের পরে এক বালক আমার কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় আমি বললাম ঃ মিয়া, সে হতভাগা কে, যার দিকে তোমরা ইশারা করছ? বালকটি বলল ঃ সে তুমি। আমি বললাম, এর কারণ কি? সে বলল ঃ যারা আল্লাহর পথে জেহাদ করে, আমরা তাদের আমলের সাথে তোমার আমল উপরে নিয়ে যেতাম, কিন্তু এক সপ্তাহ ধরে আমাদের প্রতি আদেশ হয়েছে যাতে আমরা তোমার আমল জেহাদে পশ্চাৎপদ ব্যক্তিদের আমলের সাথে লিপিবদ্ধ করি। আমরা জানি না তুমি নতুন কি কান্ড করেছ, যার কারণে এই আদেশ হয়েছে। এর পর সেই বুযুর্গ তার সঙ্গীদেরকে বিবাহ করিয়ে দিতে বললেন এবং অবশিষ্ট জীবন স্ত্রী-পরিজনের সাথে অতিবাহিত করলেন।

বর্ণিত আছে, কিছু লোক পয়গম্বর হযরত ইউনুস (আঃ)-এর গৃহে মেহমান হল। তিনি মেহমানদের আদর আপ্যায়নের জন্যে যখন অন্দরে আসা-যাওয়া করতেন, তখনই স্ত্রী তাঁর সাথে দুর্ব্যবহার করত এবং কটু কথা বলত, কিন্তু তিনি চুপ থাকতেন। মেহমানরা তাঁর এই সহনশীলতা দেখে অবাক হল। তিনি বললেন ঃ অবাক হবেন না। কেননা, আমি আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করেছিলাম, পরকালে আমাকে যে শাস্তি দেয়ার আছে তা দুনিয়াতেই দিয়ে দিন। এতে এরশাদ হল, তোমার শাস্তি অমুক ব্যক্তির কন্যা। তাকে বিবাহ করে নাও। সেমতে আমি তাকে বিবাহ করেছি। আপনারা যে দুর্ব্যবহার দেখলেন, তাতে আমি সবর করি। এসব বিষয়ে সবর করলে ক্রোধ দমিত এবং অভ্যাস সংশোধিত হয়। কেননা, যে ব্যক্তি একা অথবা কোন সদাচারীর সঙ্গী হয়ে থাকে, তার নফসের মালিন্য ফুটে উঠে না এবং অভ্যন্তরীণ নষ্টামি প্রকাশ পায় না। তাই এ ধরনের ঝামেলায় ফেলে নিজেকে পরীক্ষা করা এবং সবরের অভ্যাস গড়ে তোলা আধ্যাত্ম পথের পথিকের জন্যে অপরিহার্য। এতে তার অভ্যাস সুষম এবং অন্তর নিন্দনীয় বিষয়াদি থেকে পাকসাফ হয়ে যাবে।

পরিবার পরিজনের জন্যে সবর করাও একটি এবাদত। মোট কথা, এটাও বিবাহের একটি উপকারিতা, কিন্তু এ থেকে কেবল দু'প্রকার বক্তিই উপকৃত হতে পারে- (১) যে সাধনা, কঠোর পরিশ্রম ও চরিত্র সংশোধনের ইচ্ছা করে, তার জন্যে এর মাধ্যমে সাধনার পথ জানা হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। অথবা, (২) যে ব্যক্তি চিন্তাভাবনা ও অন্তরের গতিবিধি থেকে মুক্ত এবং কেবল বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা নামায, রোযা, হজ্জ ইত্যাদি করে নেয়, এরূপ ব্যক্তির জন্যে স্ত্রী, পরিবার পরিজনের জন্যে হালাল উপার্জন এবং তাদের লালন পালন দৈহিক এবাদতের চেয়ে উত্তম। কেননা, দৈহিক এবাদতের ফায়দা অপরে পায় না। আর যে ব্যক্তি মূল মজ্জার কি দিয়ে সংশোধিত চরিত্রের অধিকারী অথবা পূর্ব সাধনার কারণে যার অভ্যাস মার্জিত, তার জন্যে এই উপকারিতার উদ্দেশে বিবাহ করা জরুরী নয়। কেননা, প্রয়োজনীয় সাধনা ও কঠোর পরিশ্রম তার অর্জিতই রয়েছে।

বিবাহের কারণে সৃষ্ট বিপদাপদ ঃ প্রথম বিপদ হালাল রুজি-রোজগারে অক্ষম হওয়া। এটা সর্বাধিক মারাত্মক বিপদ। কেননা, প্রত্যেকেই হালাল রুজি-রোজগার করতে পারে না, বিশেষতঃ বর্তমান যুগে যখন জীবন যাপন পদ্ধতি ক্রমশই অধঃপতিত হচ্ছে, তখন মানুষ বিবাহ করলে বিবাহের কারণে অর্থের অন্বেষণও বেশী হবে। সে হারাম দ্বারা পরিবার-পরিজনকে খাওয়াতে বাধ্য হবে। ফলে নিজেও ধ্বংস হবে এবং অন্যকেও ধ্বংস করবে। পক্ষান্তরে যে অবিবাহিত, সে এই বিপদ থেকে মুক্ত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরূপ হয় হয় যে, পরিবার-পরিজন বিশিষ্ট ব্যক্তি মন্দ জায়গায় ঢুকে পড়ে এবং স্ত্রীর মনোবাঞ্ছা পূরণের পেছনে পড়ে ইহকালের বিনিময়ে স্বীয় পরকাল বিক্রি করে দেয়। এক হাদীসে আছে বান্দাকে দাঁড়িপাল্লার নিকটে দাঁড় করা হবে। তার কাছে পাহাড়সম পুণ্য থাকবে। তখন তাকে পরিবার পরিজনের দেখাশুনা ও খেদমত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে এবং অর্থ সম্পদের অবস্থা জিজ্ঞেস করা হবে, কি উপায়ে উপার্জন করেছে এবং কিসে ব্যয় করেছে, অবশেষে এসব দাবী পূরণ তার সমস্ত পুণ্য নিঃশেষ হয়ে যাবে। তার কাছে কোন পুণ্যই থাকবে না। তখন ফেরেশতারা সজোরে বলবে- এই ব্যক্তির পরিবার-পরিজন দুনিয়াতে তার সমস্ত নেকী খেয়ে ফেলেছে। আজ সে তার আমলের বিনিময়ে বন্ধক হয়ে গেছে।

কথিত আছে, কেয়ামতে সর্বপ্রথম মানুষকে যারা জড়িয়ে ধরবে, তারা হবে তার পরিবার-পরিজন। তারা তাকে আল্লাহ্ তাআলার সামনে দাঁড় করিয়ে বলবে ঃ ইলাহী, তার কাছ থেকে আপনি আমাদের প্রতিদান নিন। আমরা যা জানতাম না, সে আমাদেরকে তা বলেনি এবং আমাদের অজ্ঞাতে আমাদেরকে হারাম খাইয়েছে। এর পর তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নেয়া হবে। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা যখন কোন বান্দা দ্বারা পাপ কাজ করাতে চান, তখন দুনিয়াতে তার উপর দংশনকারী আযাব চাপিয়ে দেন, যে তাকে দংশন করতে থাকে। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ কোন ব্যক্তি পরিবার পরিজন মূর্খ হওয়ার চেয়ে বড় কোন গোনাহ্ নিয়ে আল্লাহ্ তাআলার কাছে যাবে না। মোট কথা, এ বিপদটি এমন ছড়িয়ে পড়েছে যে, এ থেকে কম লোকই মুক্ত হবে। হাঁ, যার কাছে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত অথবা হালাল উপায়ে উপার্জিত যথেষ্ট পরিমাণ ধন-সম্পদ রয়েছে এবং সে অল্পে তুষ্ট ও অধিক ধন-সম্পদ অন্বেষণ থেকে বিরত, সে এই বিপদ থেকে বেঁচে থাকতে পারে। ইবনে সালেম (রহঃ)-কে কেউ বিবাহ করার ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি জওয়াব দিলেন ঃ আমাদের এ যুগে বিবাহ করা তার জন্যেই উত্তম, যার কামস্পৃহা গাধার মত প্রবল। গাধা মাদীকে দেখলে শত পিটুনি খেয়েও তার কাছ থেকে সরে না। পক্ষান্তরে যার নফস তার আয়ত্তে থাকে, তার জন্যে বিবাহ না করা উত্তম।

বিবাহের দ্বিতীয় বিপদ হচ্ছে পরিবার-পরিজনের হক আদায় করতে, তাদের আচার অভ্যাসে সবর করতে এবং তাদের পীড়নে সহনশীল হতে অক্ষমতা। এ বিপদটি প্রথম বিপদের তুলনায় কম। কেননা, এতে সক্ষম হওয়া প্রথমটিতে সক্ষম হওয়ার তুলনায় সহজ। নারীদের সাথে সম্প্রীতি বজায় রাখা, তাদের হক আদায় করা, হালাল রুজি অন্বেষণের মত কঠিন নয়, কিন্তু এতে অবশ বিপদাশংক্যা আছে। কেননা, স্ত্রী, পুত্র-পরিজন প্রজাতুল্য। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার প্রজাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول - মানুষ যাদের ভরণ পোষণ করে তাদের হক নষ্ট করা গোনাহগার হওয়ার জন্যে যথেষ্ট। বর্ণিত আছে, যেব্যক্তির পরিবার-পরিজনের কাছ থেকে পলায়ন করে, সে সেই পলাতক গোলামের মত, যে তার প্রভুর কাছ থেকে পলায়ন করে। পরিবার পরিজনের মধ্যে ফিরে না আসা পর্যন্ত

তার নামায রোযা কিছুই কবুল হয় না। আর যে ব্যক্তি তার পরিবার পরিজনের হক আদায় করতে অক্ষম, সে তাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকলেও পলাতক গোলামেরই মত। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন ঃ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও। এতে নিজেকে এবং পরিবার পরিজনকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে বলা হয়েছে। মানুষ কখনও নিজের হকও আদায় করতে পারে না। এমতাবস্থায় বিবাহ করলে তার উপর দ্বিগুণ হক ওয়াজিব হয়ে যাবে। নিজের সাথে অন্যও শামিল হবে। এ কারণেই জনৈক বুযুর্গ বিবাহ করতে আপত্তি করেন এবং বলেন ঃ আমি নিজেকে নিয়েই ব্যতিব্যস্ত। এর উপর অন্যকে কিরূপে সংযুক্ত করি। অনুরূপভাবে হযরত ইব্রাহীম আদহাম বিবাহ করতে অস্বীকৃত হন এবং বলেন ঃ আমি নিজের কারণে কোন মহিলাকে বিপদে ফেলতে চাই না। অর্থাৎ, তার হক আদায় করতে এবং তার উপকার করতে আমি অক্ষম। বিশরে হাফীও এমনি ওযর পেশ করে বলেছিলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলার এই উক্তি আমার বিবাহের পথে বাধা– وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ নারীদেরও তেমনি হক রয়েছে, যেমন তাদের কাছে অন্যের হক রয়েছে।

সারকথা, এটাও একটা ব্যাপক বিপদ, যদিও প্রথম বিপদের তুলনায় এর ব্যাপকতা কম। এ বিপদ থেকে এমন ব্যক্তিই নিরাপদ থাকবে যে বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান, নারী চরিত্র সম্পর্কে অভিজ্ঞ, তাদের কটু কথায় ধৈর্যশীল এবং তাদের হক আদায় করতে আগ্রহী, কিন্তু এখন তো অধিকাংশ লোক নির্বোধ, কটুভাষী, কঠোর স্বভাব এবং বেইনসাফ, যদিও নিজের জন্যে খুব ইনসাফ প্রত্যাশী। এরূপ লোকদের জন্যে অবিবাহিত থাকাই অধিক নিরাপদ।

বিবাহের তৃতীয় বিপদ, স্ত্রী-পুত্র পরিজন মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত রাখে এবং দুনিয়াদারীর দিকে ঝুঁকিয়ে দেয়। এ বিপদটি প্রথমোক্ত দু'বিপদের তুলনায় কম ব্যাপক। এ বিপদে মানুষের অবস্থা এই দাঁড়ায় যে, সে পরিবার পরিজনের জীবিকা নির্বাহের জন্যে অগাধ সাজ-সরঞ্জাম সঞ্চয় করতে ও তা রেখে যেতে সচেষ্ট হয়। বলাবাহুল্য, যেসব বিষয় আল্লাহর স্মরণে বাধা সৃষ্টি করে তা পরিবার পরিজন হোক

অথবা অর্থ-সম্পদ হোক, সমস্তই অমঙ্গলজনক হয়ে থাকে। আমাদের উদ্দেশ্য এই নয় যে, এসব বিষয় তাকে কোন নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত করে দেবে। কেননা, এটা তো প্রথম ও দ্বিতীয় বিপদে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে; বরং উদ্দেশ্য, স্ত্রী পুত্র পরিজনের কারণে মানুষ বৈধ বস্তু দ্বারা বিলাসব্যসন, হাসি-তামাশা ও উপভোগে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। বিবাহের কারণে এ ধরনের ব্যস্ততা বহুলাংশে বেড়ে যায়। মন এগুলোতে ডুবে যায় সকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হয়ে গেলেও মানুষ আখেরাতের চিন্তা ও প্রস্তুতি গ্রহণের ফুরসত পায় না। এরূপ ক্ষেত্রেই হযরত ইব্রাহীম আদহাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি নারীর হাঁটুর সাথে হাঁটু মিলিয়ে বসে থাকতে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তার দ্বারা কিছুই হতে পারে না। আবু সোলায়মান দারানী বলেন ঃ যে ব্যক্তি বিবাহ করে, সে দুনিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ে। অর্থাৎ, বিবাহ দুনিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ার কারণ হয়।

এ পর্যন্ত বিবাহের উপকারিতা ও অপকারিতা পূর্ণরূপে বর্ণিত হল। এখন কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্যে বিবাহ করা উত্তম, না অবিবাহিত থাকা উত্তম, তা সর্বাবস্থায় বলা যায় না। কেননা, এসব বিষয় থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়া যায় না। বরং নির্দিষ্ট ব্যক্তির কর্তব্য হবে এসব উপকারিতা অপকারিতাকে কষ্টিপাথর মনে করে তাতে নিজের অবস্থা পরখ করা। যদি নিজের মধ্যে অপকারিতা না পায় এবং উপকারিতা বিদ্যমান থাকে, তবে জেনে নেবে, বিবাহ করাই তার জন্যে উত্তম। উদাহরণতঃ যদি তার কাছে হালাল অর্থসম্পদ বিদ্যমান থাকে, সে সচ্চরিত্রবান হয়, এমন পাকা দ্বীনদার হয় যে, বিবাহের কারণে আল্লাহ্র স্মরণে পার্থক্য হবে না এবং সর্বোপরি যৌবনের কারণে কামস্পৃহা দমিত করার প্রয়োজন থাকে, তবে তার জন্যে বিবাহ করা নিশ্চিতরূপেই উত্তম। আর যদি এসব উপকারিতা অনুপস্থিত থাকে এবং অপকারিতা বিদ্যমান থাকে, তবে নিঃসন্দেহে অবিবাহিত থাকা, তার জন্যে শ্রেয়। পক্ষান্তরে যদি উপকারিতা ও অপকারিতা উভয়টি বিদ্যমান থাকে, যেমন– আমাদের যুগে এটাই প্রবল, তবে ন্যায়ের মানদণ্ডে পরিমাপ করতে হবে যে, উপকারিতা দ্বারা তার দ্বীনদারী কি পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে এবং অপকারিতা দ্বারা ক্ষতি কতটুকু হবে, যদি প্রবল ধারণা একদিকে হয়ে যায়, তবে সেই অনুযায়ী মীমাংসায়

উপনীত হবে। উদাহরণতঃ দুটি উপকারিতা অধিক প্রকাশমান– সন্তান হওয়া এবং কামস্পৃহা দমিত হওয়া। তদনুরূপ বিপদও দুটি অধিক দেখা যায়, একটি হারাম উপার্জনের প্রয়োজন এবং অপরটি আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত হওয়া। এখন আমরা চারটিকেই একটি অপরটির বিপরীতে ধরে নিয়ে বলি, যদি কোন ব্যক্তি কামস্পৃহার কষ্টে না থাকে এবং বিবাহের উপকারিতা কেবল সন্তান হওয়াই হয়, তবে উল্লিখিত দুটি অপকারিতা বিদ্যমান থাকলে তার জন্যে অবিবাহিত থাকাই উত্তম। কেননা, যে বিষয়ে আল্লাহর স্মরণে বাধা হয়, তার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই এবং হারাম উপার্জনেও কল্যাণ নেই। এ দুটি অপকারিতার কারণে যে ক্ষতি হবে, তা কেবল সন্তানের জন্যে চেষ্টা করার উপকারিতা দ্বারা পূরণ হবে না কেননা, সন্তানের জন্যে বিবাহ করলে সন্তানের জীবন যাপনের ব্যাপারেও চেষ্টা করা হয়, কিন্তু এই জীবন একটি অনিশ্চিত বিষয়। অথচ দ্বীনদারীতে অপকারিতার ক্ষতি নিশ্চিত। দ্বীনদারীকে নির্বিঘ্ন রাখার মধ্যেই কল্যাণ। কেননা, দ্বীনদারী হচ্ছে পুঁজি। এটা নষ্ট হয়ে গেলে আখেরাতের জীবন বরবাদ হয়ে যায়। বলাবাহুল্য সন্তানের কল্যাণ উপরোক্ত দুটি বিপদের একটিরও বিপরীত হতে পারে না। তবে যদি সন্তানের সাথে কামস্পৃহা দমিত করার প্রয়োজনও অধিকতর প্রবল হয় তবে দেখতে হবে, বিবাহ না করলে যদি যিনায় লিপ্ত হওয়ার আশংক্ষা থাকে, তবে তার জন্যে বিবাহ করা উত্তম। কেননা, যে দুতরফা বিপদে ফেঁসে গেছে– বিবাহ না করলে যিনায় লিপ হবে এবং করলে হারাম উপার্জন করবে। উভয়েরর মধ্যে হারাম উপার্জন যিনার তুলনায় কম মারাত্মক। যদি বিশ্বাস রাখে যে, সে বিবাহ না করলে যিনায় লিপ্ত হবে না, কিন্তু দৃষ্টি নত রাখতে সক্ষম হবে না, তবে বিবাহ না করা ভাল। কেননা পর নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা এবং হারাম উপার্জন করা উভয়টি হারাম হলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তা এই যে, হারাম উপার্জন সব সময় হয় এবং এর কারণে সে নিজে এবং পরিবারের সকলেই গোনাহগার হয়, কিন্তু কুদৃষ্টি কদাচিত হয় এবং এ কারণে বিশেষভাবে সে নিজেই গোনাহগার হয়, অন্য কেউ তাতে শরীক হয়। এছাড়া এটা দ্রুত শেষও হয়ে যায়। কুদৃষ্টি যদিও চোখের যিনা, কিন্তু হারাম খাওয়ার তুলানায় এটা দ্রুত মাফ হতে পারে। তবে

যদি কুদৃষ্টির কারণে যিনায় লিপ্ত হবার ভয় থাকে, তবে তার অবস্থাও যিনায় লিপ্ত হবার ভয়ের মতই। মোট কথা, উপরোক্ত বিপদসমূহকে উপকারিতার সাথে তুলনা করে তদনুযায়ী সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত। যেব্যক্তি এসব রহস্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হবে, তার জন্যে পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের বর্ণিত বিভিন্নমুখী অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন হবে না। কেননা, বিবাহের প্রতি উৎসাহ এবং অনীহা অবস্থাভেদে উভয়টিই সঠিক। এখন যদি প্রশ্ন করা হয় যে, বিপদাপদ মুক্ত ব্যক্তির জন্যে এবাদতের উদ্দেশে অবিবাহিত থাকা উত্তম, না বিবাহ করা উত্তম, তবে এর জওয়াবে আমরা বলি, তার জন্যে উভয়টিই উত্তম। কেননা বিবাহ স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে এবাদতের পরিপন্থী নয়, বরং এ দৃষ্টিতে পরিপন্থী যে, এতে অর্থ উপার্জনের প্রয়োজন দেখা দেয়। সুতরাং হালাল পথে অর্থ উপার্জনে সক্ষম হলে বিবাহও উত্তম। কারণ, দিবারাত্র চব্বিশ ঘণ্টা এবাদত করা এবং এক মুহূর্তও আরাম না করা সম্ভবপর নয়। যদি ধরে নেয়া যায় যে, এক ব্যক্তি সর্বক্ষণ অর্থোপার্জনে ব্যয়িত হয় এবং পাঞ্জেগানা ফরয নামায, পানাহার ও প্রস্রাব পায়খানার সময় ছাড়া নফল এবাদতের জন্যে কোন সময় থাকে না, তবে তার জন্যেও বিবাহ করা ভাল। কেননা, হালাল অর্থোপার্জন, স্ত্রী পুত্র পরিজনের খেদমত, সন্তান লাভের প্রয়াস এবং নারী স্বভাবে সবর করার মধ্যেও নানা প্রকার এবাদত নিহিত রয়েছে, যার সওয়াব নফল এবাদতের চেয়ে কম নয়। পক্ষান্তরে যদি সে এমন লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয, যারা জ্ঞান, চিন্তাভাবনা ও অন্তরের ভ্রমের মাধ্যমে এবাদত করে এবং বিবাহ করলে এবাদতে বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকে, তাহলে তার জন্যে বিবাহ না করা উত্তম।

যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, বিবাহ করা উত্তম হলে হযরত ঈসা (আঃ) বিবাহ করলেন না কেন এবং আল্লাহর এবাদত উত্তম হলে হযরত রসূলে মকবুল (সাঃ) এত অধিক বিবাহ করলেন কেন, তবে এর জওয়াব এই যে, যেব্যক্তি সক্ষম, উচ্চ সাহসী এবং অধিক শক্তির অধিকারী, তার জন্যে উভয় বিষয়ই উত্তম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) চূড়ান্ত পর্যায়ের শক্তি ও সাহসের অধিকারী ছিলেন তাই তিনি উভয় মাহাত্ম অর্জন করেছেন, অর্থাৎ, নয় পত্নীর স্বামী হওয়া সত্ত্বেও তিনি আল্লাহর এবাদতে মশগুল ছিলেন এবং

বিবাহ তাঁর জন্যে এবাদতে প্রতিবন্ধক হয়নি। যেমন জগতের বড় বড় দার্শনিকদের জন্যে প্রস্রাব-পায়খানার কাজ পার্থিব চিন্তাভাবনায় বাধা সৃষ্টি করে না, তারা বাহ্যতঃ প্রস্রাব পায়খানার কাজে মশগুল থাকেন এবং তাঁদের অন্তর আপন অভীষ্ট কর্মে নিমজ্জিত থাকে তেমনি রসূলে পাক (সাঃ)ও আপন উচ্চ মর্যাদার কারণে দুনিয়ার কাজকর্ম করার সাথে সাথে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত থাকতেন এবং এতে কোন বাধা অনুভব করতেন না। এ কারণেই এমন সময়েও তাঁর প্রতি ওহী নাযল হত, যখন তিনি নিজের পত্নীর সাথে শয্যায় থাকতেন। অন্য কোন ব্যক্তির জন্যে এই মর্যাদা ধরে নেয়া সম্ভব, কিন্তু সাথে সাথে একথাও বুঝতে হবে যে, নর্দমা সামান্য খড়কুটা দ্বারা বন্ধ হয়ে যেতে পারে, কিন্তু সমুদ্রে এ কারণে কোন পরিবর্তন আসতে পারে না। তাই রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অনুরূপ অন্যকে মনে করা অনুচিত। হযরত ঈসা (আঃ)-এর বিবাহ না করার কারণ, তিনি নিজের ক্ষমতার পতি লক্ষ্য করে সাবধানতা অবলম্বন করেছেন। অথবা সম্ভবতঃ তাঁর অবস্থা এমন ছিল যে, তাতে পারিবারিক ব্যস্ততা ক্ষতিকর হত অথবা তাতে বিবাহ ও এবাদত উভয়টি একত্রে সম্পাদন করা সম্ভবপর ছিল না। তাই তিনি এবাদতের পথই বেছে নিয়েছেন।
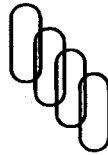
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিবাহ বন্ধনের শর্ত চতুষ্টয়

প্রথম ওলী তথা অভিভাবকের অনুমতি। মহিলার কোন অভিভাবক না থাকলে শাসনকর্তার অনুমতি তার স্থলবর্তী হবে। দ্বিতীয় মহিলা প্রাপ্ত বয়স্কা বা পূর্ব বিবাহিতা হলে তার সম্মতি। যদি কুমারী হয় এবং পিতা অথবা দাদা ছাড়া অন্য কেউ অভিভাবক হয়, তাহলেও মহিলার অনুমতি শর্ত। তৃতীয়তঃ দু'জন সাক্ষীর উপস্থিতি, যারা বাহ্যতঃ বিশ্বাস্ত হবে, অর্থাৎ, অপকর্মের তুলনায় সৎকর্ম বেশী করে এমন । যদি এমন দুজন সাক্ষী উপস্থিত থাকে, যাদের অবস্থা জানা নেই, তবুও বিবাহ হয়ে যাবে। চতুর্থ ইজাব ও কবুল হওয়া।

বিবাহ বন্ধনের আদব ঃ প্রথমতঃ পাত্রীর অভিভবকের সাথে পূর্বাহ্নে যোগাযোগ স্থাপন করবে, কিন্তু পাত্রী ইদ্দতে থাকলে পয়গাম দেবে না। ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পর পয়গাম দেবে। অনুরূপভাবে যদি অন্য কেউ বিবাহের পয়গাম দিয়ে থাকে, তবে তার মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত পয়গাম দেবে না। হাদীসে এ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা আছে। দ্বিতীয়তঃ পূর্বে খোতবা হবে এবং ইজাব কবুলের সাথে হামদ ও নাত থাকবে। উদাহরণতঃ ওলী বলবে- আলহামদু লিল্লাহ ওয়াস্‌সালাতু আলা রসূলিল্লাহ্, আমি নিজের অমুক কন্যাকে তোমার বিবাহে দিলাম। বর বলবে- আলহামদু লিল্লাহ ওয়াস সালাতু আলা রসূলিল্লাহ্, আমি এই মোহরানার বিনিময়ে তার বিবাহ কবুল করলাম। মোহরানা নির্দিষ্ট ও কম হওয়া বাঞ্ছনীয়। হামদ ও নাত খোতবার পূর্বেও মোস্তাহাব। তৃতীয়তঃ কনে কুমারী হলে বরের হাল অবস্থা কনের শ্রুতিগোচর করা উচিত। কেননা, এটা পারস্পরিক সম্প্রীতি ও ভালবাসার জন্যে উপযুক্ত। এ কারণেই বিবাহের পূর্বে কনে দেখে নেয়াও মোস্তাহাব। চতুর্থত ঃ দুজন সাক্ষী ছাড়া আরও কিছু সৎলোকের বিবাহ মজলিসে উপস্থিত থাকা উচিত। পঞ্চমতঃ বিবাহে সুন্নত পালন, দৃষ্টি নত রাখা, সন্তান লাভ করা এবং এর বর্ণিত উপকারিতাসমূহের নিয়ত করবে- কেবল মনের কামনা চরিতার্থ করা লক্ষ্য না হওয়া কর্তব্য। অন্যথায় এই বিবাহ দুনিয়ার কাজে গণ্য হবে। মনের কামনা থাকা উপরোক্ত তিনটি নিয়তের পরিপন্থী নয়।

অধিকাংশ এবাদতকর্ম মনের খাহেশের অনুকূল হয়ে যায়। মোস্তাহাব হল বিবাহ মসজিদে ও শওয়াল মাসে করা। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে আমার বিবাহও শওয়াল মাসে হয় এবং আমরা প্রথম শওয়াল মাসেই মিলিত হই।

কনের অবস্থা ঃ কনের অবস্থা সম্পর্কে দু'প্রকার বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রথম, বিবাহের পরিপন্থী বিষয়াদি থেকে কনে মুক্ত কিনা তা দেখার দরকার এবং দ্বিতীয়, দেখা উচিত, তাকে বিবাহ করলে জীবন সুন্দরভাবে অতিবাহিত হবে কিনা এবং উদ্দেশ্য হাসিল হবে কিনা।

নিম্নে বিবাহের পরিপন্থী বিষয়াদি বর্ণিত হচ্ছে ঃ

১। অন্য কোন ব্যক্তির বিবাহিত স্ত্রী হওয়া। ২। অন্য স্বামীর কাছে থেকে তালাকপ্রাপ্তির পর অথবা স্বামীর মৃত্যুর পর তার ইদ্দতে থাকা। ৩। মুখে কোন কুফরী কলেমা উচ্চারণ করার কারণে ধর্মত্যাগী হওয়া। ৪। অগ্নিপূজারী হওয়া। ৫। মূর্তিপূজারী ও যিনদীক হওয়া অর্থাৎ কোন ঐশী গ্রন্থ ও পয়গম্বরের সাথে সম্পর্কযুক্ত না হওয়া। এমন নারীও এর অন্তর্ভুক্ত, যার মাযহাব হচ্ছে হারাম বস্তুকে হালাল মনে করা অথবা এমন বিষয়ে বিশ্বাস করা, যার বিশ্বাসীকে শরীয়ত কাফের বলে। এ ধরনের কোন নারীকে বিবাহ করা দুরস্ত নয়। ৬। যে সকল আত্মীয়কে বিবাহ করা হারাম, কনে তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া অর্থাৎ মা, নানী, দাদী, কন্যা, পৌত্রী, দৌহিত্রী, বোন, ভাতিজী, ভাগ্নেয়ী ও তাদের সকলের সন্তান, ফুফু ও খালা হওয়া। ৭। দুধ পান করার কারণে হারাম হওয়া। বলাবাহুল্য, আত্মীয়তার কারণে যাদেরকে বিবাহ করা হারাম, দুধ পান করার কারণেও সেসব আত্মীয় হারাম, কিন্তু পাঁচ বারের কম দুধ পান করলে ইমাম শাফেয়ীর মতে হারাম হয় না। (ইমাম আবু হানীফার মতে একবারেও হারাম হয়ে যায়।) জামাতা হওয়ার করণে হারাম হওয়া। উদাহরণতঃ বর ইতিপূর্বে কনের কন্যা, পৌত্রী অথবা দৌহিত্রীকে বিবাহ করে থাকলে এমতাবস্থায় এই কনেকে বিবাহ করতে পারে না। কেননা, কোন নারীকে কেবল বিবাহ করলেই তার মা, দাদী প্রমুখ হারাম হয়ে যায়। আর যদি সহবাসও করে, তবে তার সন্তানও হারাম হয়ে যায়। অথবা এমন কনে হওয়া, যাকে বরের পিতা অথবা পুত্র ইতিপূর্বে বিবাহ করেছে। এরূপ কনেও বরের জন্যে হারাম। ৯। কনের পঞ্চম স্ত্রী হওয়া। অর্থাৎ, বরের বর্তমানে চার

স্ত্রী রয়েছে। সুতরাং পঞ্চম মহিলাকে বিবাহ করা জায়েয নয়। ১০। বরের বিবাহে পূর্ব থেকে কনের ভগিনী, অথবা ফুফু অথবা খালা থাকা। কেননা, এমন দু'মহিলাকে এক সাথে বিবাহে রাখা হারাম, যাদের মধ্যে এমন আত্মীয়তা বিদ্যমান যে, একজনকে পুরুষ ধরে নিলে অন্যজনের সাথে তার বিবাহ জায়েয হয় না। ১১। এই কনেকে পূর্বে এই বরের তিন তালাক দেয়া। এরূপ তালাকপ্রাপ্তা কনে এই বরের জন্যে হালাল নয়, যে পর্যন্ত অন্য কোন পুরুষ তাকে বিবাহ করে তার সাথে সহবাস করার পর তালাক না দেবে। ১২। হজ্জ অথবা ওমরার এহরাম বাঁধা। বর ও কনের মধ্য থেকে যেকোন একজন এহরাম বাঁধলে এহরাম শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের বিবাহ জায়েয হবে না। ১৩। কনের পূর্ব বিবাহিতা অপ্রাপ্ত বয়স্কা হওয়া। এরূপ কনের বিবাহ প্রাপ্তবয়স্কা হওয়ার পরেই জায়েয হবে। ১৪। কনের পূর্ববিবাহিতা এতীম হওয়া। এরূপ কনের বিবাহও প্রাপ্তবয়স্কা হওয়ার পরই, জায়েয হবে।

এখন সুন্দর জীবন যাপন ও উদ্দেশ্য হাসিল হওয়ার জন্যে কনের যেসমস্ত সদগুণের প্রতি লক্ষ্য করা উচিত, সেগুলো বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ

প্রথম, কনের সতী ও দ্বীনদার হওয়া উচিত। এটি মূল গুণ। এদিকে খেয়াল রাখা খুবই জরুরী। কেননা, কনে যদি নীচ জাত, অসতী ও কম দ্বীনদার হয়, তবে বরের দুর্ভোগের অন্ত থাকবে না। সমাজে তার মুখ কাল হবে এবং তার জীবন তিক্ত হয়ে যাবে। যদি সে আত্মসম্মানী হয়, তবে আজীবন বিপদ ও দুঃখে পতিত থাকবে। আর যদি মুখ বুজে থাকে, তবে নিজের দ্বীনদারী ও ইযযত কলংকিত হবে। অসতী হওয়ার সাথে যদি কনে সুন্দরীও হয়, তবে তো ঘোর বিপদ। কেননা, বর তাকে বিচ্ছিন্ন করাও পছন্দ করবে না এবং তার অপকর্ম সইতেও পারবে না। তার অবস্থা সেই ব্যক্তির মতই হবে, যে রসূলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে এসে আরজ করেছিল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার স্ত্রী কোন স্পর্শকারীর হাতকে ফিরিয়ে দেয় না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তুমি তাকে তালাক দিয়ে দাও। সে আরজ করল ঃ আমি তাকে ভালবাসি। তিনি বললেন ঃ তবে তাকে থাকতে দাও। এ হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) থাকতে দাও বলেছেন। কেননা, তিনি আশংকা করেছেন, এ ব্যক্তি তালাক দিয়ে দিলে আসক্তির কারণে তার পশ্চাদ্ধাবন করবে এবং নিজেও বরবাদ হয়ে যাবে। আর যদি কনের দ্বীনদারী এমন খারাপ হয় যে, সে স্বামীর অর্থ-সম্পদ

বিনষ্ট করে, তাহলেও জীবন দুর্বিষহ হবে। কেননা, স্বামী তার কাণ্ড কারখানায় চুপ থাকলে এবং নিষেধ না করলে তার গোনাহে শরীক হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا তোমরা নিজেদেরকে এবং পরিবার-পরিজনকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও। ফলে অসমীচীন কর্মে নিষেধ করা এ আয়াতদৃষ্টে জরুরী। পক্ষান্তরে নিষেধ করলে এবং ঝগড়াবিবাদ করলে জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠবে। অন্য এক হাদীসে আছে, যেব্যক্তি কোন নারীকে তার অর্থ সম্পদ ও রূপলাবণ্যের কারণে বিবাহ করে, তাকে তার অর্থসম্পদ ও রূপ থেকে বঞ্চিত করা হয়। আর যে তার দ্বীনদারীর কারণে বিবাহ করে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে অর্থসম্পদ ও রূলাবন্যে উভয়টি দান করেন। আরও বলা হয়েছে– রূপ-লাবণ্যের কারণে নারীকে বিবাহ করোনা। হয় তো তার রূপলাবণ্যই তাকে ধ্বংস করে দেবে। ধনসম্পদের কারণেও বিবাহ করবে না। হয় তো তার ধন-সম্পদই তাকে অবাধ্য করে দেবে। বরং বিবাহ দ্বীনদারীর কারণে করা উচিত। দ্বীনদারীর উপর বেশী জোর দেয়ার কারণ, দ্বীনদার নারী স্বামীর দ্বীনদারীতে সহায়ক হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে দ্বীনদার না হলে স্বামীকেও দ্বীনদারী থেকে ফিরিয়ে নেয়।

দ্বিতীয় গুণ সদাচারী হওয়া। যেব্যক্তি স্বাচ্ছন্দ্যে ও দ্বীনদারীতে সাহায্য প্রত্যাশা করে, তার জন্যে সদাচারিণী স্ত্রী একটি বড় আর্শীর্বাদ। কেননা, স্ত্রী প্রগলভ, কটুভাষিণী ও কঠোর স্বভাব হলে তার দ্বারা উপকারের চেয়ে অপকারই বেশী হবে। স্ত্রীদের কটু কথায় সবর করা এমন একটি বিষয়, যা দ্বারা ওলীগণের পরীক্ষা নেয়া হয়। জনৈক আরব বলেন ঃ ছয় প্রকার নারীকে বিবাহ করো না– আন্নানা, মান্নানা, হান্নানা, হাদ্দাকা, বাররাকা ও শাদ্দাকা।

"আন্নানা" সেই নারীকে বলা হয় যে সর্বদা কাতরায় ও হায় আফসোস করতে থাকে এবং রোগিনী হয়ে থাকে। এরূপ নারীর বিবাহে কোন বরকত নেই।

"মান্নানা" সেই নারীকে বলা হয়, যে স্বামীর প্রতি প্রায়ই অনুগ্রহ প্রকাশ করে বলে, আমি তোমার জন্যে এই করেছি সেই করেছি।

"হান্নানা" সেই নারীকে বলা হয়, যে তার পূর্ব স্বামীর প্রতি অথবা তার সন্তানদের প্রতি আসক্ত থাকে।

"হাদ্দাকা" সেই নারীকে বলা হয় যে সবকিছুর উপরই লোভ পোষণ করে এবং তা পেতে চায়। এর পর তা ক্রয় করার জন্যে স্বামীকে তাগিদ দেয়।

"বাররাকা" হেজাযীদের পরিভাষায় সেই নারীকে বলা হয়, যে সারাদিন কেবল সাজসজ্জা ও প্রসাধনে মেতে থাকে। আর ইয়ামানীদের পরিভাষায় সেই নারীকে বলা হয়, যে খেতে বসে রাগ করে এবং একাই খায়। প্রত্যেক বস্তু থেকে নিজের অংশা আলাদা করে রাখে।

"শাদ্দাকা" সেই নারীকে বলে, যে খুব বকবক করে।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ যেসকল অভ্যাস পুরুষের জন্য মন্দ সেগুলো নারীর জন্য প্রশংসনীয়। এ জাতীয় অভ্যাস হচ্ছে কৃপণতা, অহংকার ও ভীরুতা। কেননা, নারী কৃপণ হলে নিজের ও স্বামীর অর্থসম্পদ বাঁচিয়ে রাখবে। অহংকারী হলে প্রত্যেকের সাথে নম্র ও মোহনীয় কথাবার্তা বলতে ঘৃণা করবে। আর ভীরু হলে সবকিছুকে ভয় করে চলবে, গৃহের বাইরে যাবে না এবং স্বামীর ভয়ে অপব্যয়ের স্থান থেকে দূরে থাকবে।

তৃতীয় গুণ রূপলাবণ্য। এ গুণটিও এজন্যে কাম্য যে, এর ফলে স্বামী যিনা থেকে মুক্ত থাকে। স্ত্রী কুশ্রী হলে মানুষ স্বভাবতই অতৃপ্ত থাকে। এছাড়া যার মুখমণ্ডল সুশ্রী হবে, তার চরিত্রও ভাল হয়। এটাই সাধারণ নিয়ম। আমরা পূর্বে লেখেছি যে, কনের দ্বীনদারীর প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরী এবং রূপলাবণ্যের কারণে তাকে বিবাহ করা উচত নয়। এর অর্থ এই নয় যে, রূপলাবণ্যের প্রতি লক্ষ্য করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বরং উদ্দেশ্য এই যে, যখন দ্বীনদারীর অভাব হয়, তখন কেবল রূপলাবণ্যে আসক্ত হয়ে বিবাহ করা উচিত নয়। কেননা, শুধু সুন্দরী হওয়া বিবাহে উৎসাহিত করে ঠিক, কিন্তু দ্বীনদারীর ব্যাপারে শিথিল করে দেয়। তবে রূপলাবণ্যের কারণে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রায়ই মহব্বত ও সম্প্রীতি থাকে বিধায় এটাও লক্ষ্যণীয় বিষয়। মহব্বতের কারণাদি বিবেচনা করাতে শরীয়তও নির্দেশ দিয়েছে। এ কারণেই বিবাহের পূর্বে কনেকে দেখে নেয়া মোস্তাহাব। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা তোমাদের অন্তরে যখন কোন মহিলাকে বিবাহ করার আগ্রহ সৃষ্টি করে দেন, তখন তোমাদের উচিত তাকে দেখে নেয়া। কেননা, এটা পারস্পরিক প্রেম-প্রীতির জন্যে উপযোগী। তিনি

আরও বলেন ঃ

ان فى اعين الانصار شيئا فاذا اراد احدكم ان يتزوج منهن فلينظر اليهن .

অর্থাৎ, আনসারদের চোখে কিছু আছে। যখন তোমাদের কেউ তাদের কাউকে বিবাহ করতে চায়, তখন তাকে দেখে নেয়া উচিত। কথিত আছে, আনসাররা ক্ষীণদৃষ্টি ছিলেন। কেউ বলেন ঃ তাদের চোখ ছোট ছিল। পূর্ববর্তী কোন কোন বুযুর্গ এমন ছিলেন, যাঁরা অভিজাত পরিবারে বিবাহ করলেও পাত্রী দেখে নিতেন। আ'মাশ বলেন ঃ পূর্বে না দেখে যে বিবাহ করা হয় তার পরিণতি হয় দুঃখ কষ্ট। বলাবাহুল্য, প্রথম দৃষ্টিতে তো চরিত্র ও দ্বীনদারী জানাই যায় না– কেবল বাহ্যিক সৌন্দর্য জানা যায়। এ থেকে বুঝা গেল যে, রূপলাবণ্যের প্রতি খেয়াল রাখাও শরীয়তে কাম্য। বর্ণিত আছে, হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে এক ব্যক্তি চুলে খেযাব লাগিয়ে বিবাহ করে নেয়। কয়েকদিন পর তার খেযাব সরে গেলে শ্বশুরালয়ের লোকেরা খলীফার কাছে নালিশ করে বসে যে, তারা যুবক মনে করে তার কাছে বিবাহ দিতে সম্মত হয়েছিল। খলীফা লোকটিকে শাস্তি দিলেন এবং বললেন ঃ তুমি মানুষকে বিভ্রান্ত করেছ। বর্ণিত আছে, হযরত বেলাল ও হযরত সোহায়ব রূমী (রাঃ) এক আরব পরিবারে গিয়ে বিবাহের প্রস্তাব দেন। গৃহকর্তা তাদের পরিচয় জিজ্ঞেস করলে হযরত বেলাল বললেন ঃ আমি বেলাল এবং সে আমার ভাই সোহায়ব। আমরা পথভ্রষ্ট ছিলাম, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন। আমরা গোলাম ছিলাম, আল্লাহ আমাদেরকে মুক্ত করেছেন। আমরা নিঃস্ব ছিলাম, আল্লাহ আমাদেরকে ধনবান করেছেন। আপনারা আমাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করলে আলহামদু লিল্লাহ আর অস্বীকার করলে সোবহানাল্লাহ। অতঃপর তাদেরকে বলা হলঃ আপনাদের বিবাহ হয়ে যাবে। হযরত সোহায়ব হযরত বেলালকে বললেন ঃ হায়, তুমি আমাদের ত্যাগ ও কঠোর পরিশ্রমের কথাও উল্লেখ করতে পারতে, যা আমরা রসূলে করীম (সাঃ)-এর সঙ্গে থেকে আনজাম দিয়েছি! হযরত বেলাল বললেন ঃ চুপ থাক। আমরা সত্য কথা বলে দিয়েছি। এ সততাই বিবাহ সম্পন্ন করেছে। বাহ্যিক রূপলাবণ্য ও আভ্যন্তরীণ চরিত্র উভয়ের মধ্যে ধোঁকা হতে পারে। রূপলাবণ্যের ধোঁকা

দেখার মাধ্যমে দূর করা মোস্তাহাব। চারিত্রিক ধোঁকা দোষগুণ শুনার মাধ্যমে দূর হতে পারে। তাই বিবাহের পূর্বে উভয় কাজ সেরে নেয়া উচিত, কিন্তু দোষগুণ ও চরিত্র মাধুর্য কেবল বুদ্ধিমান, সত্যবাদী এবং বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ব্যক্তিকেই জিজ্ঞাসা করা উচিত। সে যেন কনের পক্ষ না হয় এবং শত্রুও না হয়। কেননা, ইদানীং বিবাহপূর্ব বিষয়াদিতে এবং কনের গুণ বর্ণনার ব্যাপারে মানুষের মন স্বল্পতা ও বাহুল্যপ্রবণ হয়ে গেছে। এসব ব্যাপারে সত্য কথা বলে এরূপ লোকের সংখ্যা খুবই কম। বর্তমানে প্রবঞ্চনা ও বিভ্রান্ত করার প্রচলন অত্যন্ত বেড়ে গেছে।

মোট কথা, যেব্যক্তি কেবল সুন্নত আদায়, সন্তানলাভ ও ঘরকন্নার জন্যে বিবাহ করতে চায়, সে যদি রূপলাবণ্যের প্রতি উৎসাহী না হয়, তবে এটা সংসারবিমুখতার অধিক নিকটবর্তী। কেননা, রূপলাবণ্যও একটি পার্থিব বিষয়, যদিও মাঝে মাঝে এবং কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে এটা দ্বীনদারীতে সহায়ক হয়। হযরত আবু সোলায়মান দারানী বলেন ঃ সংসারবিমুখতা সবকিছুতেই হয়, এমনকি স্ত্রীর মধ্যেও হয়। সংসারবিমুখতা অবলম্বন করার জন্যে মানুষ কোন বৃদ্ধাকে বিবাহ করতে পারে। মালেক ইবনে দীনার বললেন ঃ মানুষ এতীম ও নিঃস্ব মহিলাকে বিবাহ করে না, যাকে খাওয়ালে পরালে সওয়াব পাওয়া যায়, ভরণপোষণ সহজ হয় এবং সামান্যতে সন্তুষ্ট থাকে; বরং তারা দুনিয়াদারদের কন্যাকে বিবাহ করে, যে সর্বদা নতুন নতুন কামনা বাসনা উপস্থিত করে বলে, আমাকে অমুক শাড়ী পরাও, অমুক বস্তু খাওয়াও। ইমাম আহমদ দু'ভগিনীর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন, তাদের মধ্যে বুদ্ধিমতী কোন্‌টি, তাঁকে উত্তরে বলা হয় ঃ যে বুদ্ধিমতী, তার চোখ নেই। তিনি বললেন ঃ আমি এই অন্ধকেই বিবাহ করব। মোট কথা, যেব্যক্তি আনন্দের জন্যে নয়, বরং প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশে বিবাহ করতে চায়, তার নিয়মনীতি এরূপই হওয়া উচিত, কিন্তু যেব্যক্তি আনন্দ ব্যতীত দ্বীনদারী ঠিক রাখতে পারে না, তার রূপলাবণ্য দেখা উচিত। কারণ, বৈধ বিষয় দ্বারা আনন্দ লাভ করা দ্বীনদারীর একটি দুর্গ। কথিত আছে, সুন্দরী, চরিত্রবতী, কালকেশী আনতনয়না, গৌরবর্ণা ও স্বামী নিবেদিতা স্ত্রী কেউ পেয়ে গেলে সে যেন বেহেশতের হুর পেয়ে যায়। কেননা, আল্লাহ তাআলা জান্নাতীদের পত্নীদেরকে এসব বিশেষণেই বিশেষিত করেছেন। বলা হয়েছে ঃ خَيْرَاتٌ

حِسَانٌ অর্থাৎ, চরিত্রবতী, সুন্দরী। قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ আনতনয়না। عُرُبًا اَتْرَابًا সোহাগিনী ও সমবয়স্কা। حُوْرٌ عِيْنٌ অপ্সরা আয়তলোচনা। বলাবাহুল্য, এসব বৈশিষ্ট্যের কারণে আনন্দ পূর্ণতা লাভ করে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

خير نسائكم من اذا نظر اليها زوجها سرته واذا امرها اطاعته واذا غاب عنها حفظته فى نفسها وما له ـ

অর্থাৎ, তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে সেই উত্তম, যাকে দেখে তার স্বামী আনন্দিত হয়, যে স্বামীর আদেশ পালন করে, স্বামীর অনুপস্থিতিতে নিজের হেফাযত করে এবং স্বামীর ধনসম্পদ দেখাশুনা করে। বলাবাহুল্য, সোহাগিনী স্ত্রীকে দেখেই স্বামী আনন্দিত হয়।

চতুর্থ গুণ হচ্ছে, মোহরানা কম হওয়া। রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, তারাই উত্তম স্ত্রী, যাদের চেহারা-নমুনা ভাল এবং মোহরানা কম। তিনি সীমাতিরিক্ত মোহরানা নির্ধারণ করতে নিষেধ করেছেন এবং নিজে কোন কোন বিবাহ দশ দেরহাম ও গৃহের আসবাবপত্রের বিনিময়ে করেছেন। গৃহের আসবাবপত্রের মধ্যে ছিল একটি আটা পেষার যাঁতা, একটি মাটির কলসী ও একটি নরম গদি। তিনি কোন বিবির বিবাহে যব দ্বারা ওলীমা করেছেন, কোন বিবির ওলীমা খোরমা দ্বারা এবং কোন বিবির ওলীমা ছাতু দ্বারা করেছেন। হযরত ওমর (রাঃ) অধিক মোহরানা ধার্য করতে নিষেধ করে বলতেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজেও চারশ' দেরহামের অধিক মোহরানার বিনিময়ে বিবাহ করেননি এবং নিজের কন্যাগণের বিবাহেও এর বেশী মোহরানা ধার্য করেননি। যদি অধিক মোহরানা ধার্য করার মধ্যে কোন মাহাত্ম্য থাকত তবে রসূলুল্লাহ (সাঃ) সবার আগে তা করতেন। কতিপয় সাহাবী বিবাহে এ পরিমাণ স্বর্ণ মোহরানা হিসাবে ধার্য করেন, যার মূল্য পাঁচ দেরহামের বেশী ছিল না। হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যিব (রাঃ) আপন কন্যার বিবাহ হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর সাথে দু'দেরহামের বিনিময়ে দেন। তিনি রাতের বেলায় আপন কন্যাকে নিয়ে তার গৃহের দ্বারে পৌঁছে দিয়ে আসেন এবং সাত দিন পর কন্যার কাছে গিয়ে তার কুশলাদি জিজ্ঞেস করেন। সকল ইমামের মাযহাব পালন করার নিয়তে মোহরানা দশ দেরহাম ধার্য করলে কোন ক্ষতি নেই। হাদীসে আছে, স্ত্রী তখন মোবারক হয় যখন তাড়াতাড়ি বিবাহ হয়,

তাড়াতাড়ি সন্তান হয় এবং মোহরানা কম হয়। আরও আছে, সেই স্ত্রীর মধ্যে বরকত বেশী যার মোহরানা সবচেয়ে কম। স্ত্রীর পক্ষ থেকে মোহরানা বেশী হওয়া যেমন মাকরূহ, তেমনি পুরুষের পক্ষ থেকে স্ত্রীর ধন-সম্পদের খবর নেয়াও মাকরূহ। ধনসম্পদের লোভে বিবাহ করা উচিত নয়। সুফিয়ান সওরী (রহঃ) বলেন ঃ যখন কেউ বিবাহ করে এবং জিজ্ঞেস করে, কনের কি কি ধন-সম্পদ আছে, তখন বুঝে নেবে সে চোর। স্বামী কোন উপহার শ্বশুরালয়ে প্রেরণ করলে এই নিয়ত করবে না যে, এর বদলে সেখান থেকে বেশী পাওয়া যাবে। তদ্রূপ কনের পরিবারের লোকজন কিছু পাঠালেও এরূপ নিয়ত করবে না। বেশী পাওয়ার নিয়ত করা খুবই খারাপ। তবে উপহার পাঠানো মোস্তাহাব ও পারস্পরিক সম্প্রীতির কারণ। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ تهادوا وتحابوا (একে অপরকে হাদিয়া পাঠাও এবং পারস্পরিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি কর।) এতে বেশী পেতে চাওয়া আল্লাহ তাআলার এই নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত ঃ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ অর্থাৎ, অধিক পাওয়ার নিয়তে দিয়ো না। মোট কথা, বিবাহে এ ধরনের কাজ মাকরূহ ও বেদআত। এটা ব্যবসা ও জুয়ার মত এবং এতে বিবাহের উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়।

পঞ্চম গুণ– কনের বন্ধ্যা না হওয়া। যদি বন্ধ্যাত্ব জানা যায়, তবে সেই কনেকে বিবাহ করবে না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ عليكم بالولود অর্থাৎ, এমন কনেকে বিবাহ করবে, যে সন্তান দেয় এবং স্বামী আসক্তা হয়। সুতরাং কনের পূর্বে বিবাহ না হওয়ার কারণে যদি সে বন্ধ্যা কি না তা জানা না যায়, তবে স্বাস্থ্যবতী ও যুবতী হওয়ার প্রতি লক্ষ্য করবে। কারণ, এ দু'টি গুণ কনের মধ্যে থাকলে তার সন্তান দেয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

ষষ্ঠ গুণ– কুমারী হওয়া। হযরত জাবের (রাঃ) এক পূর্ব বিবাহিতা মহিলাকে বিবাহ করলে রসূলে করীম (সাঃ) তাকে বলেছিলেন ঃ কুমারী মেয়েকে বিবাহ করলে না কেন, এতে তুমি তার প্রতি এবং সে তোমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকত। স্ত্রী কুমারী হওয়ার উপকারিতা তিনটি ঃ (১) স্ত্রীর মনে স্বামীর প্রতি ভালবাসা ও মহব্বত জন্মে। এছাড়া প্রথম পরিচিতজনের সাথে মন লাগে। যে নারী পূর্বে একজন পুরুষের সঙ্গ লাভ করে আসে এবং অবস্থা দেখে-শুনে আসে, পূর্ব পরিচিত বিষয়াদির

বিপরীতে কোন কিছুতে রাজি না হওয়া তার জন্যে বিচিত্র নয়। এটাই দ্বিতীয় স্বামীকে খারাপ মনে করার কারণ হয়ে যেতে পারে। (২) কুমারী স্ত্রীকে স্বামী মহব্বত করে। কেননা, যে নারীকে অন্য কেউ স্পর্শ করে, তার প্রতি স্বামীর মনে স্বভাবগতভাবে ঘৃণা থাকে। মনে এ ধারণা উদয় হতেই স্বামীর মন ভারী হয়ে যায়। এ ব্যাপারে কোন কোন লোক অত্যধিক আবেগপ্রবণ হয়ে থাকে। (৩) কুমারী হলে স্ত্রী প্রথম স্বামীকে স্মরণ করে না। এ স্মরণও জীবনে এক প্রকার তিক্ততা সৃষ্টি করে। প্রথম প্রিয়জনের প্রতি যে মহব্বত হয়, প্রায়শঃ সেটাই সর্বাধিক পাকাপোক্ত হয়।

সপ্তম গুণ– অভিজাত বংশের অর্থাৎ, দ্বীনদার ও সৎ পরিবারের কনে হওয়া। কেননা, এরূপ পরিবারের মেয়েরা আপন সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষায় মনোযোগী হয়। যে নারী স্বয়ং শিষ্ট ও বিনীত নয়, সন্তানদেরকে সুন্দরভাবে শিষ্ট ও বিনীত করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ اياكم وخضراء الدمن অর্থাৎ, তোমরা গোবরের স্তূপের শাক-সব্জি থেকে বেঁচে থাক। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ গোবরের স্তূপের শাক-সব্জি কি? তিনি বললেন ঃ সুন্দরী নারী, যে নীচ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। তিনি আরও বলেন ঃ নিজের বীর্যের জন্যে ভাল নারী পছন্দ কর। কেননা, আত্মীয়তার শিরা পিতামাতার চরিত্র সন্তানের মধ্যে টেনে আনে।

অষ্টম গুণ– কনের নিকট সম্পর্কীয়া না হওয়া। এটা কামস্পৃহা হ্রাস করে। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ নিকট সম্পর্কীয়া নারীকে বিবাহ করো না, দুর্বল সন্তান জন্মগ্রহণ করবে। কামস্পৃহা দুর্বল হওয়াই সন্তান দুর্বল হওয়ার কারণ। কেননা, কামস্পৃহা দৃষ্টি ও স্পর্শ শক্তি থেকে উদ্দীপ্ত হয়। নারী নতুন ও অপরিচিতা হলে এই শক্তি জোরদার হয়। যে নারী সর্বদা এক সময় দৃষ্টির সামনে থাকে, তাকে দেখতে দেখতে মানুষ নিস্পৃহ হয়ে যায় এবং পূর্ণ আকর্ষণ থাকে না। ফলে কামস্পৃহাও উদ্দীপ্ত হয় না।

মোট কথা, কনের উপরোক্ত গুণসমূহের কারণে তাকে বিবাহ করার আগ্রহ জন্মায়। বরের স্বভাব-চরিত্র ভালরূপে যাচাই করে নেয়া কনের অভিভাবকেরও কর্তব্য। অভিভাবকের উচিত, কনের প্রতি স্নেহপরবশ হওয়া এবং এমন ব্যক্তির সাথে তাকে বিবাহ না দেয়া, যার দৈহিক গঠনে

কোন ক্রুটি আছে, অথবা যার স্বভাব-চরিত্র ভাল নয় অথবা যে দ্বীনদারীতে দুর্বল অথবা স্ত্রীর হক আদায়ে অক্ষম অথবা বংশগত দিক দিয়ে কনের সমকক্ষ নয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ কনেকে বিবাহ দেয়ার মানে তাকে বাঁদী করা। অতএব নিজের কন্যাকে কোথায় দিচ্ছ তা দেখে নাও। কনের জন্যে সাবধানতা অবলম্বন করা খুবই জরুরী। কেননা, বিবাহের কারণে সে এমন বন্দিদশায় পড়ে যা থেকে রেহাই পেতে পারে না। পুরুষ এরূপ নয়। সে সর্বাবস্থায় তালাক দিতে সক্ষম। যখন কোন ব্যক্তি তার কন্যার বিবাহ কোন জালেম, পাপাচারী, বেদআতী অথবা মদখোরের সাথে দেয়, তখন সে নিজের দ্বীনদারীতে কলংক লেপন করে এবং আল্লাহ তা'আলার ক্রোধের পাত্র হয়। কেননা, সে আত্মীয়তার অধিকার ক্ষুণ্ন করে এরূপ পাত্রের হাতে কন্যাদান করে। এক ব্যক্তি হযরত হাসান বসরী (রঃ)-এর খেদমতে আরজ করল ঃ কয়েকজন লোক আমার কন্যার জন্যে বিবাহের পয়গাম পাঠিয়েছে। আমি কার সাথে তাকে বিবাহ দেব। তিনি বললেন ঃ তাদের মধ্যে যেব্যক্তি খোদাভীরু, তার সাথে বিবাহ দাও। কেননা, সে তোমার কন্যাকে ভালবাসবে এবং খাতির সমাদর করবে। সে তোমার কন্যাকে অপছন্দ করলেও জুলুম করবে না। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি পাপাচারীর হাতে কন্যাদান করে, সে আত্মীয়তা ছিন্ন করে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পারস্পরিক জীবন যাপনের আদব

স্বামীর করণীয় আদব ঃ যেসকল আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা স্বামীর জন্যে জরুরী, নিম্নে সেগুলো বিস্তারিত উল্লেখ করা হল।

প্রথম আদব ওলিমা, এটা মোস্তাহাব। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফের গায়ে হলুদের চিহ্ন দেখে জিজ্ঞেস করলেন- এটা কি? তিনি আরজ করলেন, আমি এক মহিলাকে বিয়ে করেছি এবং খোরমার বীচি পরিমাণ স্বর্ণ মোহরানা সাব্যস্ত করেছি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ بارك الله لك اولم ولو بشاة মোবারক হোক। একটি ছাগল দিয়ে হলেও ওলীমা কর। রসূলে করীম (সাঃ) হযরত সফিয়্যাকে বিয়ে করার পর খোরমা ও ছাতু দিয়ে ওলীমা করেন। স্বামীকে মোবারকবাদ দেয়া মোস্তাহাব। যেব্যক্তি তার কাছে আসবে, সে এরূপ বলবে ঃ

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا بِخَيْرٍ ـ

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাকে মোবারক করুন, তোমার প্রতি বরকত নাযিল করুন এবং তোমাদের মধ্যে পুণ্য কাজে মতৈক্য সৃষ্টি করে দিন।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলতেন- فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت হালাল ও হারামের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে দফ বাজানো ও হৈচৈ করা। আরও বলা হয়েছে-

اعلنوا هذا النكاح واجعلوه فى المساجد واضربوا عليه بالدفوف ـ

এ বিবাহ ঘোষণা কর, একে মসজিদে সম্পন্ন কর এবং এর জন্যে দফ্ বাজাও।

রবী বিনতে মোয়াওভেয রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার কাছে বাসর রাত্রির ভোরে এসে আমার শয্যায় বসে গেলেন। আমাদের কয়েকজন বালিকা দফ বাজাচ্ছিল এবং বদর যুদ্ধে আমার পরিবারের

নিহত ব্যক্তিদের কীর্তিগাথা আবৃত্তি করছিল। তাদের একজন এমনও বলে ফেলল, আমাদের মধ্যে একজন নবী আছেন, যিনি আগামীকাল যা ঘটবে তা জানেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে একথা বলতে বারণ করে বললেন ঃ পূর্বে যা বলছিলে, তাই বল।

দ্বিতীয় আদব স্ত্রীর সাথে সদাচরণ করা এবং দয়াপরবশ হয়ে তাদের নিপীড়ন সহ্য করা। কেননা, তাদের জ্ঞানবুদ্ধি অপূর্ণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ অর্থাৎ, মহিলাদের সঙ্গে সদাচরণ সহকারে জীবন যাপন কর। ওফাতের সময় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওসিয়ত ছিল তিনটি বিষয়। সেগুলো বলতে বলতেই তাঁর কণ্ঠস্বর স্তিমিত হয়ে যাচ্ছিল। তিনি বলছিলেন "

الصلوة الصلوة وما ملكت ايمانكم لا تكلفوهم ما لايطيقون الله الله فى النساء انهن عوان فى ايديكم اخذتموهن بعهد الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله -

অর্থাৎ, নামায কায়েম কর, নামায কায়েম কর। তোমরা যেসকল গোলাম ও বাঁদীর মালিক, তাদেরকে তাদের সাধ্যাতীত কাজ করতে বলো না। স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। তারা তোমাদের হাতে বন্দী। তোমরা তাদেরকে আল্লাহর সাথে অঙ্গীকারের মাধ্যমে গ্রহণ করেছ এবং তাদের লজ্জাস্থান আল্লাহর কলেমা উচ্চারণ করে হালাল করেছ।

এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে- যেব্যক্তি তার স্ত্রীর অসদাচরণে সবর করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে এই পরিমাণ সওয়াব দেবেন, যে পরিমাণ হযরত আইউব (আঃ)-কে তাঁর বিপদের কারণে দিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে যে স্ত্রী তার স্বামীর বদমেযাজীতে সবর করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ফেরাউন-পত্নী আছিয়ার সমান সওয়াব দান করবেন। প্রসঙ্গতঃ স্মরণ রাখা দরকার, স্ত্রীর সাথে সদাচরণের অর্থ স্ত্রী পীড়ন না করলে সদাচরণ করা নয়; বরং অর্থ হচ্ছে, স্ত্রীর পীড়নের জওয়াবে সদাচরণ করা। স্ত্রী রাগ করলে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অনুসরণে তার রাগ সহ্য করা। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিবিগণও তাঁর সামনে রাগ করতেন এবং তাঁদের কেউ কেউ সারাদিন তাঁর সাথে কথা বলতেন না। তিনি এসব বিষয় নীরবে সহ্য করতেন এবং তাঁদের সাথে কঠোর ব্যবহার করতেন না। হযরত ওমর

(রাঃ)-এর পত্নী একবার তাঁর কথার জওয়াব দিলে তিনি রাগতস্বরে বললেন ঃ হে উদ্ধত, তুমি আমার কথার জওয়াব দিচ্ছ। পত্নী বললেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিবিগণও তাঁর কথার জওয়াব দেন। অথচ রসূলুল্লাহ (সাঃ) তোমার চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ। হযরত ওমর বললেন ঃ হাফসা জওয়াব দিয়ে থাকলে সে খুব খারাপ করেছে। অতঃপর তিনি কন্যা হাফসাকে সম্বোধন করে বললেন ঃ হে হাফসা, সিদ্দীকের কন্যা হবার লোভ করো না। সে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আদরিণী। তুমি কখনও রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কথার জওয়াব দেবে না।

বর্ণিত আছে, পবিত্র বিবিগণের একজন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বুকে হাত রেখে তাঁকে ধাক্কা দেন। এ জন্যে তাঁর মা তাঁকে শাসালে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে বললেন ঃ ছাড়, তাকে কিছু বলো না। এই পত্নীরা তো এর চেয়ে বড় কান্ডও করে! একবার রসূলে করীম (সাঃ) ও হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর মধ্যে কিছু কথা কাটাকাটি হলে তাঁরা উভয়েই হযরত আবু বকরের কাছে বিচারপ্রার্থী হন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আয়েশাকে বললেন ঃ তুমি আগে বলবে, না আমি বলব। হযরত আয়েশা আরজ করলেন ঃ আপনি বলুন, কিন্তু সত্য সত্য বলবেন। একথা শুনে হযরত আবু বকর (রাঃ) কন্যা আয়েশাকে সজোরে এক চপেটাঘাত করে বললেন ঃ তুই কি বলছিস, হযরত কি সত্য ছাড়া মিথ্যা বলতে পারেন। হযরত আয়েশা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আশ্রয় চাইলেন এবং তাঁর পেছনে গিয়ে লুকালেন। রসূলে করীম (সাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে বললেন ঃ আমরা তোমাকে এজন্যে ডাকিনি এবং তুমি এরূপ করবে এটাও আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না। একবার কোন এক কথায় রাগান্বিত হয়ে হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, আপনিই বলেন, আপনি পয়গম্বর। রসূলুল্লাহ (সাঃ) মুচকি হেসে তা সহ্য করে নিলেন। রসূলে আকরাম (সাঃ) হযরত আয়েশাকে বলতেন ঃ আয়েশা, আমি তোমার রাগ ও সন্তুষ্টি বুঝে নিতে পারি। তিনি আরজ করলেন ঃ আপনি তা কেমন করে বুঝতে পারেন? তিনি বললেন ঃ যখন তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাক, তখন কসম খেতে গিয়ে বল– মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আল্লাহর কসম, আর রাগের অবস্থায় বল– ইবরাহীম (আঃ)-এর আল্লাহর কসম। হযরত আয়েশা আরজ করলেন ঃ আপনি ঠিকই বলেছেন। আমি কেবল আপনার নামটিই বর্জন করি।

কথিত আছে, ইসলামে সর্বপ্রথম যে প্রেম হয়, তা ছিল রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও হযরত আয়েশা (রাঃ-এর মধ্যকার প্রেম। তিনি হযরত আয়েশাকে বলতেন ঃ আমি তোমার সাথে এমন যেমন আবু সূরা তার স্ত্রী উম্মে সূরার সাথে ছিল, কিন্তু আমি তোমাকে তালাক দিব না। (শামায়েলে তিরমিযীতে বর্ণিত উম্মে সূরার হাদীসটি সুবিদিত। তা একদিন এগার জন মহিলা হযরত আয়েশার কাছে সমবেত হয়ে নিজ নিজ স্বামীর অবস্থা বর্ণনা করল। এই এগার জনের মধ্যে উম্মে সরাও ছিল। তার স্বামী তার সাথে অনেক সদ্ব্যবহার করেছিল এবং অবশেষে তালাক দিয়েছিল। হযরত আয়েশা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এই মহিলাদের বিস্তারিত কাহিনী বর্ণনা করেছিলেন। তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে একথা বলেছিলেন।) রসূলুল্লাহ (সাঃ) পত্নীদেরকে বলতেন ঃ তোমরা আয়েশার ব্যাপারে আমাকে পীড়ন করো না। আল্লাহর কসম, আমার কাছে যখন ওহী আসে, তখন আমি তার লেপের নীচে থাকি। (অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে কারও কাছে এরূপ হয়নি।) হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) নারী ও শিশুদের প্রতি সবার তুলনায় অধিক দয়াশীল ছিলেন।

তৃতীয় আদব, পীড়ন সহ্য করা সত্ত্বেও স্ত্রীদের সাথে হাসি তামাশা ও আনন্দ করবে। এতে তাদের মন প্রফুল্ল হবে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিয়ম ছিল, তিনি বিবিগণের সাথে ব্যঙ্গ-কৌতুক করতেন এবং কাজে ও চরিত্রে তাদের স্তরে নেমে যেতেন। এমন কি বর্ণিত আছে, তিনি হযরত আয়েশার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতাও করেছেন। একদিন হযরত আয়েশা দৌড়ে জিতে গেলেন। এর পর একদিন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) দৌড়ে এগিয়ে গেলেন এবং বললেন ঃ আয়েশা! (রাঃ) এটা সেদিনের প্রতিশোধ। হাদীসে আছে, অন্য সব মানুষের তুলনায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বিবিগণের সাথে অধিক আনন্দ করতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ একদিন আমি আবিসিনিয়ার লোকদের আওয়ায শুনলাম। তারা আশুরার দিন খেলাধুলা করছিল। রসূলে করীম (সাঃ) আমাকে বললেন ঃ তুমি কি তাদের খেলা দেখতে চাও। আমি বললাম ঃ হাঁ। তিনি খেলোয়াড়দেরকে ডাকলেন। তারা হাযির হলে তিনি দরজার উভয় কপাটের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং নিজের হাত কপাটের উপরে ছড়িয়ে দিলেন। আমি আমার চিবুক তাঁর হাতের উপর রেখে খেলা দেখতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর রসূলুল্লাহ্

(সাঃ) বললেন ঃ আয়েশা, আর কত। আমি দুই কিংবা তিন বার বললামঃ আর একটু রাখুন। অতঃপর তিনি এরশাদ করলেন ঃ আয়েশা, আর না। এবার শেষ কর। আমি, বললাম ঠিক আছে, চলুন । তার পর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) খেলোয়াড়দেরকে ইশারা করলে তারা চলে গেল। এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا والطفهم باهله

মুমিনদের মধ্যে অধিক কামেল মুমিন সে ব্যক্তি, যার অভ্যাস ভাল এবং সে পরিবার পরিজনের প্রতি অধিক কৃপাশীল। এক হাদীসে আছে- خيركم خيركم لنسائه وانا خيركم لنسائي তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে ব্যক্তি, যে তার স্ত্রীদের জন্যে সর্বোত্তম । আমি আমার স্ত্রীদের জন্যে তোমাদের চাইতে উত্তম।

হযরত ওমর (রাঃ) কঠোর চিত্ত হওয়া সত্ত্বেও বলেন ঃ পুরুষের উচিত নিজের ঘরে শিশুদের মত থাকা। যখন তার কাছে কোন জিনিস চাওয়া হয় তখন পুরুষ হয়ে যাবে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত জাবেরকে বলেছিলেন, – কুমারী নারীকে বিবাহ করলে না কেন, যাতে তুমি তার সাথে কৌতুক করতে এবং সে তোমার সাথে আনন্দ করতো।

চতুর্থ আদব, স্ত্রীর চাহিদার এত বেশী অনুসরণ করবে না যাতে তার মেযাজ বিগড়ে যায় এবং তার সামনে নিজের কোন ভয়ভীতি না থাকে বরং এতে সমতার প্রতি লক্ষ্য রাখবে। খারাপ কিছু দেখলে তাতে কখনও সম্মত হবে না। স্ত্রী শরীয়ত অথবা ভদ্রতা বিরোধী কোন কিছু করলে তৎক্ষণাৎ ক্রোধ প্রকাশ করবে। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি স্ত্রৈণ অর্থাৎ, স্ত্রী যা চায় তাই করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে উপুড় করে দোযখে ফেলে দেবেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, স্ত্রীদের মর্জির বিপরীত কাজ কর, এতে বরকত হয়। তিনি আরও বলেন ঃ স্ত্রীদের সাথে পরামর্শ কর এবং তারা যে পরামর্শ দেয় তার বিপরীত কর। হাদীসে আছে- স্ত্রীর গোলাম ধ্বংস হোক। এর কারণে, স্ত্রীর খাহেশের বিষয়াদিতে তার আনুগত্য করলে তার গোলামী করা হবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে স্ত্রীর মালিক করেছেন, কিন্তু সে নিজেকে তার গোলাম করে দিয়েছে। ফলে ব্যাপার উল্টে গেছে। সে কোরআনে বর্ণিত শয়তানের এই উক্তিরও আনুগত্য করেছে- وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ -

অর্থাৎ, আমি মানুষকে আদেশ করব, তারা আল্লাহ্র সৃষ্টিকে পাল্টে দিক। পুরুষের হক ছিল অনসৃত হওয়ার– অনুসারী হওয়ার নয়। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা পুরুষদেরকে নারীদের উপর শাসক সাব্যস্ত করেছেন। যেমন বলা হয়েছে–

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ অর্থাৎ, পুরুষরা স্ত্রীদের উপর শাসক। সুতরাং স্ত্রীদের লাগাম সামান্য শিথিল করে দিলে তারা পুরুষদেরকে কয়েক হাত হেঁচড়ে নিয়ে যাবে। পক্ষান্তরে লাগাম টেনে রাখলে এবং জায়গা মত কঠোর হলে স্ত্রীরা আয়ত্তে থাকবে। ইমাম শাফেয়ী বলেন ঃ তিনটি বস্তু এমন রয়েছে, তুমি তাদের সম্মান করলে তারা তোমাকে অপদস্থ করবে এবং তুমি অপদস্থ করলে তারা তোমান সম্মান করবে। তাদের মধ্যে একটি হচ্ছে স্ত্রী , দ্বিতীয়টি খাদেম এবং তৃতীয়টি নিবর্তী। ইমাম শাফেয়ীর উদ্দেশ্য, যদি কেবল সন্মান কর এবং মাঝে মাঝে নরমের সাথে সাথে শক্ত না হও, শক্ত কথা না বল, তবে নিঃসন্দেহে মাথায় চড়ে বসবে। মোট কথা, আকাশ ও পৃথিবী সমতা এবং মধ্যবর্তিতার উপরই প্রতিষ্ঠিত। মধ্যবর্তিতা থেকে সামান্য বিচ্যুত হলে ব্যাপার উল্টে যায়। তাই বুদ্ধিমানের উচিত হল স্ত্রীর সাথে আনুকূল্য ও বিরোধিতায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করা এবং প্রত্যেক ব্যাপারে সত্যের অনুসরণ করা, যাতে তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকা যায়। কেননা, স্ত্রীদের কলাকৌশল অত্যন্ত মন্দ এবং তাদের অনিষ্ট প্রকাশ্য। তাদের মানসিকতায় অসদাচরণ ও জ্ঞানবুদ্ধির স্বল্পতা প্রবল। এতে সমতা তখনই আসবে, যখন নরম ও শক্ত উভয় প্রকার ব্যবহার তাদের সাথে করা হয়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ তিনটি বিপদ থেকে আশ্রয় চাইবে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে দুশ্চরিত্রা নারী । সে বার্ধক্যের পূর্বেই বৃদ্ধ করে দেয়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বিবিগণ ছিলেন মহিলাদের মধ্যে সর্বোত্তম । তাঁদের সম্পর্কে তিনি বলেছেন ঃ انتن صواحبات يوسف তোমরা ইউসুফ (আঃ)-এর সহচরী। (রসূলুল্লাহ্ [সাঃ] ওফাতের পূর্বে যখন রোগশয্যায় শায়িত ছিলেন এবং নামায পড়ানোর শক্তি তাঁর ছিল না, তখন এরশাদ করেন ঃ আবু বকরকে নামায পড়াতে বল। এতে হযরত আয়েশা আপত্তি করে বলেন ঃ আমার পিতা কোমলচিত্ত। মানুষ আপনার স্থান শূন্য দেখে তিনি স্থির থাকতে পারবেন না। তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) উপরোক্ত বাক্য

উচ্চারণ করেন। অর্থাৎ, তুমি যে আবু বকরকে নামায পড়াতে নিষেধ করছ, এটা সত্য পরিহার করে খেয়াল-খুশীর দিকে ঝুঁকে পড়ার শামিল।) এক হাদীসে আছে–

لا يفلح قوم تملكهم امراة -

অর্থাৎ, যে সম্প্রদায়ের মালিক নারী, তার কল্যাণ হবে না।

পঞ্চম আদব, স্ত্রীদের প্রতি কুধারণায় তাদের গোপন বিষয়ের অনুসন্ধানে বাড়াবাড়ি করবে না। রসূলে করীম (সাঃ) স্ত্রীদের গোপন বিষয়সমূহের পেছনে পড়তে বারণ করেছেন। কোন কোন রেওয়ায়েত অনুযায়ী তিনি স্ত্রীদের সামনে হঠাৎ উপস্থিত হতে বারণ করেছেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এক সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে মদীনায় প্রবেশের পূর্বে বললেন ঃ রাতের বেলায় স্ত্রীদের কাছে যাবে না। এই আদেশ উপেক্ষা করে দুই ব্যক্তি বাড়ি গিয়ে অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি দেখতে পেল। প্রসিদ্ধ এক হাদীসে আছে–

المراة كالضلع ان قومته كسرته فدعه تستمتع به على عوج

অর্থাৎ, নারী পাঁজরের অস্থির ন্যায় বাঁকা। একে সোজা করতে চাইলে ভেঙ্গে যাবে। অতএব বাঁকা অবস্থায়ই এর দ্বারা উপকৃত হও। নারী চরিত্র সংশোধনের উদ্দেশে এ কথাটি বলা হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আরও বলছেন ঃ

ان من الغيرة يبغضها الله عزوجل وهى غيرة الاهل على اهله من غير ريبة -

অর্থাৎ, কোন কোন আত্মসম্মানবোধ আল্লাহ্ তা'আলা অপছন্দ করেন। তাহল স্ত্রীর উপর পুরুষের আত্মসম্মানবোধ, যা কোন সন্দেহ ছাড়াই হয়। কেননা, এরূপ আত্মসম্মনবোধের উৎস হচ্ছে কুধারণা, যা করা নিষিদ্ধ। আত্মসম্মানবোধ যথাস্থানে প্রশংসনীয়। মানুষের মধ্যে তা অবশ্যই থাকা উচিত। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহর আত্মসম্মানবোধ রয়েছে। মুমিনের আত্মসম্মানবোধ রয়েছে। মানুষের উপর আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা আল্লাহর আত্মসম্মানবোধ। তিনি আরও বলেন ঃ সা'দের আত্মসম্মান দিয়ে তোমরা কি কর? আল্লাহর কসম, আমি সা'দের তুলনায়

অধিক আত্মসম্মানের অধিকারী। আল্লাহ্ তাআলা আমার চেয়ে অধিক আত্মসম্মান রাখেন। এই আত্মসম্মানের কারণেই তিনি বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ পাপাচার হারাম করেছেন। আল্লাহ তাআলার তুলনায় অন্য কারও আপত্তি করা অধিক পছন্দনীয় নয়। এ কারণেই তিনি সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা রসূল প্রেরণ করেছেন। তারীফও তাঁর চেয়ে অধিক অন্য কেউ পছন্দ করে না। এ কারণেই তিনি জান্নাতের ওয়াদা দিয়েছেন। এক হাদীসে বলা হয়েছে, আমি মেরাজ রজনীতে জান্নাতের ভেতরে একটি প্রাসাদ দেখেছি। তার আঙ্গিনায় একটি বাঁদী ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই প্রাসাদ কার। কেউ জওয়াব দিল ঃ ওমরের। আমি তার অভ্যন্তরভাগ দেখতে চাইলাম, কিন্তু হে ওমর, তোমার আত্মসম্মানবোধের কথা মনে পড়ে গেল। হযরত ওমর কেঁদে ফেললেন এবং বললেন ঃ আমি কি আপনাকে আত্মসম্মানবোধ দেখাব? হযরত হাসান বসরী বলতেন ঃ কাফেরদের গা ঘেঁষে চলার জন্যে তোমরা স্ত্রীদেরকে বাজারে পাঠিয়ে দাও! যার আত্মসম্মানবোধ নেই, সে ধ্বংস হোক।

আত্মসম্মানবোধের প্রয়োজন তখন হয় না, যখন স্ত্রীর কাছে বেগানা পুরুষ আসে না এবং স্ত্রী বাজারে বের হয় না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার হযরত ফাতেমা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ নারীর জন্যে উত্তম কি, তিনি বললেন ঃ উত্তম, সে বেগানা পুরুষকে দেখবে না এবং কোন বেগানা পুরুষও তাকে দেখবে না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন ঃ এমন জওয়াব দেবে না কেন, কেমন বাপের মেয়ে! সাহাবায়ে কেরাম প্রাচীরের ছিদ্র বন্ধ করে দিতেন, যাতে মহিলারা পুরুষদেরকে না দেখে। হযরত মুয়ায (রাঃ) তাঁর স্ত্রীকে আলো আসার ছিদ্র দিয়ে বাইরে তাকাতে দেখে শাস্তি দিয়েছেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলতেন ঃ স্ত্রীদেরকে উৎকৃষ্ট পোশাক দিয়ো না, তা হলে গৃহ মধ্যে থাকবে। কারণ এই, মহিলারা ছন্নছাড়া অবস্থায় বাইরে যাওয়া পছন্দ করে না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ মহিলার গৃহ মধ্যে থাকার অভ্যাস গড়ে তুলুক। তিনি শুরুতে মহিলাদেরকে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। বর্তমানে বৃদ্ধাদের ছাড়া অন্যদের জন্যে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি না থাকা উত্তম। বরং এটা সাহাবায়ে কেরামের আমলেও সঙ্গত ছিল না। তাই হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওফাতের পর মহিলারা যেসব বিষয় উদ্ভাবন করেছে, তা যদি তিনি জানতেন তবে তাদেরকে বাইরে যেতে

অবশ্যই নিষেধ করতেন। একবার হযরত ইবনে ওমর এ হাদীসটি বর্ণনা করলেন– لاتمنعوا اماء الله مساجد الله অর্থাৎ, আল্লাহ্র বাঁদীদেরকে অর্থাৎ, মহিলাদেরকে মসজিদে যেতে বারণ করো না। তখন তাঁর পুত্র বলে উঠল ঃ আল্লাহর কসম, আমরা বারণ করব। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) তৎক্ষণাৎ পুত্রকে প্রহার করলেন এবং ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন ঃ আমি বলি রসূলুল্লাহ (সাঃ) এমন বলেন। আর তুই কিনা তা অমান্য করছিস। এর অর্থ কি, তাঁর পুত্রের এই বিরোধিতার কারণ ছিল, পরিবর্তিত অবস্থা তাঁর জানা ছিল। ইবনে ওমরের ক্রুদ্ধ হওয়ার কারণ, বাহ্যতঃ কোন কারণ বর্ণনা না করেই পুত্র হাদীসের বিপরীত উক্তি করেছিল। অনুরূপভাবে রসূলুল্লাহ (সাঃ) মহিলাদেরকে বিশেষভাবে ঈদের নামাযে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন, তাও স্বামীদের অনুমতি দেয়ার শর্ত সাপেক্ষে। বর্তমান যুগেও সতী-সাধ্বী নারীদের স্বামীর অনুমতিক্রমে বাইরে যাওয়া জায়েয, কিন্তু না যাওয়াতেই সাবধানতা বেশী। নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া মহিলাদের বাইরে যাওয়া উচিত নয়। তামাশা ও অনাবশ্যক কাজের জন্যে মহিলাদের বাইরে যাওয়া সাধারণ ভদ্রতারও পরিপন্থী। এতে মাঝে মাঝে অনর্থও সৃষ্টি হয়। এর পর বাইরে গেলে পুরুষদের দিক থেকে দৃষ্টি নত রাখবে। আমরা বলি না, নারীর মুখমণ্ডলও নারীর জন্যে গোপনীয়, বরং ফেতনার অবস্থায় পুরুষের মুখমণ্ডল দেখা হারাম। ফেতনার ভয় না থাকলে হারাম নয়। কেননা, পূর্ববর্তী যুগে পুরষরা সর্বদাই খোলামেলা চলাফেরা করেছে এবং মহিলারা অবগুণ্ঠন লাগিয়ে বের হয়েছে। পুরুষদের মুখমণ্ডল মহিলাদের জন্যে গোপনীয় হলে পুরুষদেরকেও অবগুণ্ঠন ব্যবহার করার নির্দেশ দেয়া হত।

ষষ্ঠ আদব, স্ত্রীদের প্রয়োজনীয় ব্যয় বহনে সমতা বজায় রাখবে। অর্থাৎ, এতে সংকীর্ণতাও অবলম্বন করবে না এবং অপব্যয়ও করবে না, বরং মধ্যম পর্যায়ে খরচপত্র দেবে। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا তোমরা খাও, পান কর এবং অপব্যয় করো না। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে– وَلَاتَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ অর্থাৎ, হাতকে ঘাড়ের সাথে বেঁধে রেখো না এবং পুরোপুরি খুলতে দিয়ো না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ خيركم خيركم لاهله তোমাদের মধ্যে সে লোক উত্তম, যে তার পরিবার-পরিজনের

জন্যে উত্তম। অন্য এক হাদীসে তিনি বলেন ঃ এক দীনার তুমি জেহাদে ব্যয় করবে, এক দীনার গোলাম মুক্ত করার কাজে ব্যয় করবে, এক দীনার কোন মিসকীনকে সদকা দেবে এবং এক দীনার পরিবার-পরিজনের জন্যে ব্যয় করবে। এগুলোর মধ্যে অধিক সওয়াব সে দীনারের হবে, যা তুমি পরিবার-পরিজনের জন্যে ব্যয় করবে। কথিত আছে, হযরত আলী (রাঃ)-এর চার কন্যা ছিলেন। তিনি তাঁদের প্রত্যেকের জন্যে প্রতি চার দিনে এক দেরহাম গোশত ক্রয় করতে দিতেন।

নিজে উৎকৃষ্ট খাদ্য খাবে এবং পরিজনকে তা থেকে খাওয়াবে না, গৃহকর্তার জন্যে এটা সমীচীন নয়, এটা বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। যদি গৃহকর্তার এরূপ একা খাওয়াই কাম্য হয়, তবে গোপনে খাওয়া উচিত। অন্যদের সামনে এরূপ খাদ্যের আলোচনা করাও উচিত নয়, যা তাদেরকে খাওয়ানো উদ্দেশ্য নয়। যখন খেতে বসবে, তখন ঘরের সকলকে সঙ্গে নিয়ে বসবে। হযরত সুফিয়ান সওরী বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা ও তাঁর ফেরেশতাগণ সে ঘরের লোকজনের প্রতি রহমত প্রেরণ করেন, যারা একত্রে বসে আহার করে।

সপ্তম আদব, পুরুষের পক্ষে হায়েযের বিধানাবলী শেখা উচিত, যাতে এ দিনগুলোতে কি কি বিষয় থেকে বেঁচে থাকা ওয়াজিব, তা জানা যায়। স্ত্রীকেও শিক্ষা দেয়া দরকার, হায়েযের সময়কার কোন্ কোন্ নামাযের কাযা পড়তে হবে এবং কোন্ কোন্ নামাযের কাযা পড়তে হবে না। কেননা, কোরআন শরীফে স্ত্রীকে দোযখ থেকে বাঁচানোর জন্যে পুরুষদের প্রতি এই বলে নির্দেশ রয়েছে, قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا (নিজেদেরকে এবং পরিবার পরিজনকে দোযখ থেকে রক্ষা কর।) অতএব স্ত্রীকে আহলে সুন্নতের বিশ্বাসসমূহ শিক্ষা দেয়া পুরুষের জন্যে অপরিহার্য। যদি স্ত্রী বেদআতে কান দিয়ে থাকে, তবে তা তার মন থেকে দূর করবে। দ্বীনদারীর ব্যাপারে অলসতা করলে তাকে আল্লাহর আযাবের ভয় দেখাবে এবং হায়েয ও এস্তেহাযার প্রয়োজনীয় মাসআলা বলে দেবে। মাসআলা শেখার জন্যে স্বামী যথেষ্ট হলে এর জন্য কোন আলেমের কাছে যাওয়া স্ত্রীর জন্যে বৈধ নয়। পুরুষ স্বল্প জ্ঞান হলেও যদি কোন মুফতীর কাছ থেকে স্ত্রীর প্রশ্নের জওয়াব এনে দিতে পারে, তবুও তার জন্যে বাইরে

যাওয়া জায়েয নয়। অন্যথায় স্ত্রীর বাইরে যাওয়া এবং জিজ্ঞেস করে নেয়া জায়েয; বরং ওয়াজিব। এমতাবস্থায় স্বামী নিষেধ করলে গোনাহগার হবে। যদি স্ত্রী ফরযগুলো শিখে নেয়, তবে অধিক শিক্ষার জন্যে স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে কোন ওয়াজের মসলিসে যাওয়া জায়েয নয়। স্ত্রী হায়েয এস্তেহাযার কোন বিধান না জানার কারণে পালন করে না এবং স্বামীও শিক্ষা দেয় না, এমতাবস্থায় স্বামী স্ত্রীর সাথে যাবে। নতুবা গোনাহে তার অংশীদার হবে।

অষ্টম আদব, একাধিক স্ত্রী থাকলে স্বামী তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত সমতা প্রতিষ্ঠা করবে এবং কারও দিকে বেশী ঝুঁকে পড়বে না। যদি সফরে একজনকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হয় তবে লটারিযোগে নির্ধারণ করবে। লটারিতে যার নাম আসে, তাকেই সাথে নিয়ে যাবে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এরূপ করতেন। কোন স্ত্রীর পালা বাদ পড়লে তার কাযা করবে। এটা ওয়াজিব। বেশী স্ত্রী থাকলে ন্যায়বিচারের বিধানাবলী জেনে নেয়া দরকার। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

من كان له امراتان فمال الى احدهما دون الاخرى جاء يوم القيامة واحد شقيه مائل -

অর্থাৎ, যার দু'স্ত্রী থাকে, অতঃপর সে একজনকে বাদ দিয়ে অন্যজনের দিকে ঝুঁকে পড়ে, সে কেয়ামতের দিন এমতাবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তার এক পার্শ্ব ঝুঁকে থাকবে।

বলাবাহুল্য, স্বামীর উপর কেবল খরচ দেয়া ও শয়ন করার মধ্যে ন্যায়বিচার করা ওয়াজিব– ভালবাসা ও সহবাসে ওয়াজিব নয়। কেননা, এটা মানুষের এখতিয়ার বহির্ভূত ব্যাপার। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْآ اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ অর্থাৎ, আন্তরিক মহব্বতে ন্যায়বিচার করতে তোমরা কস্মিনকালেও সক্ষম হবে না। এটা তোমাদের সাধ্যের বাইরে। যদিও তোমরা এটা করতে আগ্রহী হও। সহবাসও আন্তরিক মহব্বতের অনুগামী। রসূলে করীম (সাঃ) বিবিগণকে খরচপত্র দেয়া ও রাতে সঙ্গে থাকার ব্যাপারে ন্যায়বিচার করতেন এবং বলতেন ঃ ইলাহী, যে বিষয় আমার আয়ত্তে তাতে আমি এই চেষ্টা করেছি। এখন যে বিষয়ের মালিক আপনি এবং যা আমার আয়ত্তাধীন

নয়, তাতে ন্যায়বিচার করার সাধ্য আমার নেই। অর্থাৎ, আন্তরিক ভালবাসা আমার ইচ্ছাধীন নয়। হযরত আয়েশা (রাঃ) সব বিবির তুলনায় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অধিক প্রিয় ছিলেন। সবাই একথা জানতেন। শেষ রোগশয্যায় তাঁর খাট প্রত্যহ সেই বিবির গৃহে পৌঁছে দেয়া হত, যার পালা থাকত। তিনি রাতে সেখানে থাকতেন এবং জিজ্ঞেস করতেন, সকালে আমি কোথায় থাকব? এতে একজন বিবি বুঝে নিলেন, তাঁর উদ্দেশ্য হযরত আয়েশার পালার দিন জিজ্ঞেস করা। এর পর সকল বিবি মিলে আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আমরা আপনাকে অনুমতি দিলাম, আপনি আয়েশার ঘরেই থাকুন। প্রতি রাতে আপনাকে এক এক জায়গায় পৌঁছানোর কারণে আপনার কষ্ট হয়। তিনি বললেন ঃ তোমরা কি সবই এতে রাজি? বিবিগণ বললেন ঃ হাঁ, আমরা সবাই রাজি। অতঃপর তিনি বললেন ঃ তোমরা আমাকে আয়েশার গৃহে নিয়ে চল। কোন স্ত্রী নিজের পালা অন্য স্ত্রীকে দান করে দিলে এবং স্বামীও তাতে সম্মত থাকলে অন্যের হক প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। সেমতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত সওদাকে বয়োবৃদ্ধ হওয়ার কারণে তালাক দিতে ইচ্ছা করলে তিনি নিজের পালা হযরত আয়েশাকে দিয়ে দেন এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে আবেদন করেন ঃ আমাকে তালাক দেবেন না, যাতে কেয়ামতে আপনার বিবিগণের দলে আমার হাশর হয়। তাঁর এই আবেদন গৃহীত হয় এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) তার জন্যে কোন পালা নির্দিষ্ট করতেন না; বরং হযরত আয়েশার পালা হত দু'রাত এবং অন্যদের এক এক রাত।

নবম আদব, যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কলহ হয় এবং বনিবনার কোন উপায় অবশিষ্ট না থাকে, তবে স্বামীর পরিবারের একজন ও স্ত্রীর পরিবারের একজন– এই দুই জন সালিস বসবে। উভয় সালিস তাদের অবস্থা দেখবে। যদি তারা পুনর্মিলন চায়, তবে পুনর্মিলন করিয়ে দেবে। হযরত ওমর (রাঃ) স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আপোষ করানোর জন্যে এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করেন। সে আপোষ না করিয়ে ফিরে এলে তিনি তাকে শাসিয়ে বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা বলেছেন– إِنْ يُّرِيْدَا إِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا। স্বামী-স্ত্রী সংশোধন চাইলে আল্লাহ তাআলা উভয়ের মধ্যে বনিবনা সৃষ্টি করে দেবেন। অথচ তুমি আপোষ না করিয়েই ফিরে এলে? লোকটি পুনরায় গেল এবং নিয়ত ঠিক করে স্বামী-স্ত্রীর সাথে নম্রভাবে কথাবার্তা বলল। ফলে পুনর্মিলন সক্ষম হয়ে গেল। এটা তখন, যখন

উভয়ের পক্ষ থেকে কিংবা স্বামীর পক্ষ থেকে অবাধ্যতা হয়। আর যদি বিশেষভাবে স্ত্রীর পক্ষ থেকে অবাধ্যতা হয়, তবে স্বামী স্ত্রীর উপর প্রবল বিধায় তার উচিত শাসন করা এবং বল প্রয়োগে স্ত্রীকে বাধ্য করা। অনুরূপভাবে যদি স্ত্রী নামায না পড়ে, তবে স্বামী জবরদস্তি তাকে নামায পড়াবে, কিন্তু শাসনে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। তা হচ্ছে, প্রথম উপদেশ দেবে এবং আখেরাতের আযাব ও নিজের শাস্তির বিষয়ে সতর্ক করবে। এটা উপকারী না হলে শয্যায় স্ত্রীর দিকে পিঠ ফিরিয়ে শয়ন করবে অথবা একই ঘরে থেকে নিজের বিছানা আলাদা করে নেবে। তিন রাত পর্যন্ত তাই করবে। যদি তাও কার্যকর না হয়, তবে স্ত্রীকে এমনভাবে মারধর করবে, যাতে কষ্ট তো হয়, কিন্তু জখম হবে না এবং হাড্ডি ভাঙ্গবে না। মুখে মারবে না। এটা নিষিদ্ধ! জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করল ঃ স্ত্রীর হক কি? তিনি বললেন ঃ যখন স্বামী খাবে, স্ত্রীকে খাওয়াবে এবং যখন নিজে পরবে, তখন স্ত্রীকে পরাবে। যদি মারার প্রয়োজন হয় তবে নির্মমভাবে মারবে না। আলাদা শয়ন করলে একই ঘরে শয়ন করবে। স্ত্রীর কোন দ্বীনদারীর ব্যাপারে রাগ করলে দশ-বিশ দিন অথবা এক মাস পর্যন্ত স্ত্রীর কাছে শয়ন বর্জন করা স্বামীর জন্যে জায়েয। রসূলুল্লাহ (সাঃ)ও এমন করেছেন। একবার উম্মুল মুমিনীন হযরত যয়নব (রাঃ)-এর কাছে তিনি কিছু উপহার প্রেরণ করেন। হযরত যয়নব তা ফেরত পাঠিয়ে দেন। এর পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) যে বিবির ঘরেই তশরীফ রাখতেন, তিনিই আরজ করতেন ঃ যয়নব আপনার কদর করেনি। আপনার দেয়া উপহার সে প্রত্যাখ্যান করেছে। এতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) সকল বিবিকে সতর্কবাণী শুনিয়ে পূর্ণ একমাস তাঁদের সাথে রাগ করে রইলেন। এর পর তাঁদের কাছে গেলেন।

দশম আদব হচ্ছে সহবাস সংক্রান্ত আদব। সহবাসে মোস্তাহাব হচ্ছে বিসমিল্লাহ বলে সূরা এখলাস পাঠ করবে এবং আল্লাহু আকবার ও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ে এই দোয়া করবে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا ذُرِّيَّةً اِنْ كُنْتَ قَدَّرْتَ اَنْ تَخْرُجَ ذٰلِكَ مِنْ صُلْبِىْ ـ

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ তোমাদের কেউ যখন স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, তখন এই দোয়া পড়বে–

إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ اللّٰهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرُّهُ الشَّيْطَانُ ـ

অর্থাৎ, আল্লাহ, আমাকে আলাদা রাখ শয়তান থেকে এবং শয়তানকে আলাদা রাখ তোমার দেয়া সন্তান থেকে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন সন্তান জন্ম নিলে এই দোয়ার বরকতে শয়তান তার কোন ক্ষতি করবে না। এর পর বীর্যস্খলনের সময় নিকটবর্তী হলে ঠোঁট না নাড়িয়ে মনে মনে এই দোয়া পড়বে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا وَّجَعَلَهُ نَسَبًا وَّصِهْرًا ـ

অর্থাৎ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি বীর্য দ্বারা মানব সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে আত্মীয় ও বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। সহবাসের সময় নিজেকে এবং স্ত্রীকে কোন বস্তু দ্বারা আবৃত করে নেয়া উচিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজের মস্তক ঢেকে নিতেন এবং বিবিকে বলতেন ঃ গাম্ভীর্য সহকারে থাক। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যখন স্বামী-স্ত্রী সহবাস করতে চায়, তখন যেন গাধার মত উলঙ্গ না হয়। সহবাসের পূর্বে প্রেমালাপ ও চুম্বন করা উচিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ তোমাদের কেউ যেন স্ত্রীর উপর চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় পতিত না হয়; বরং স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রথমে দূত বিনিময় হওয়া উচিত। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! দূত বিনিময় কি? তিনি বললেন ঃ চুম্বন ও প্রেমালাপ। অন্য এক হাদীসে আছে– তিনটি বিষয় পুরুষের অক্ষমতার পরিচায়ক। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে আলাপ না করে, প্রীতি সৃষ্টি না করে, কাছে শয়ন না করেই স্ত্রী অথবা বাঁদীর সাথে সহবাস শুরু করা এবং নিজের প্রয়োজন সেরে নেয়া ও স্ত্রীর প্রয়োজন অপূর্ণ রেখে দেয়া।

তিন রাতে সহবাস করা মাকরূহ– মাসের প্রথম ও শেষ রাতে এবং পনর তারিখের রাতে । কোন কোন আলেম জুমুআর দিন ও জুমুআর রাতে সহবাস করা মোস্তাহাব বলেছেন। পুরুষের বীর্যস্খলন হলে কিছুক্ষণ এমনিভাবে থেমে থাকবে, যাতে স্ত্রীর প্রয়োজনও পূর্ণ হয়ে যায়। কেননা, মাঝে মাঝে স্ত্রীর বীর্যস্খলন বিলম্বে হয়। তখন পুরুষের সরে যাওয়া তার পীড়ার কারণ হয়। একযোগে বীর্যস্খলন হওয়াকে স্ত্রী ভাল মনে করে। স্বামীর উচিত প্রতি চার দিনে একবার সহবাস করা। অবশ্য এর চেয়ে

বেশী কমও হতে পারে। তবে এ ব্যাপারে স্ত্রীর চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। কেননা স্ত্রীকে সতী পুণ্যবতী রাখা স্বামীর উপর ওয়াজিব। হায়েযের দিনগুলোতে এবং পরে গোসল করার পূর্বে সহবাস করবে না। কোরআন পাকে এর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। কথিত আছে, এতে সন্তান কুষ্ঠগ্রস্ত হয়। হায়েযের দিনগুলোতে সহবাস ছাড়া স্ত্রীর সমগ্র শরীর ভোগ করা জায়েয। পেছনের দিক অর্থাৎ, মলদ্বার দিয়ে সহবাস করা নাজায়েয। কেননা, হায়েযওয়ালী স্ত্রীর সাথে সহবাস করা নোংরামির কারণে হারাম। মলদ্বারে সহবাস করলে সর্বাবস্থায় নোংরামি হয়ে থাকে। সুতরাং এর নিষেধাজ্ঞা ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাসের নিষেধাজ্ঞার চেয়ে অধিকতর কঠোর। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ -এর অর্থ, যখন ইচ্ছা আপন শস্যক্ষেত্রে আস। এই অর্থ নয় যে, যেদিক দিয়ে ইচ্ছা আস। হায়েযের দিনগুলোতে নাভি থেকে হাঁটুর উপর পর্যন্ত কাপড় বেঁধে রাখা স্ত্রীর জন্যে মোস্তাহাব। হায়েযের দিনগুলোতে স্ত্রীর সাথে আহার করা ও সাথে শয়ন করা জায়েয। সহবাসের পর পুনরায় সহবাস করতে চাইলে জননেন্দ্রিয় ধুয়ে নেয়া উচিত। রাতের শুরুভাগে সহবাস করা মাকরূহ। কেননা, এতে নাপাক অবস্থায় শয়ন করতে হয়। সহবাসের পর ঘুমাতে অথবা কিছু খেতে চাইলে নামাযের ওযুর মত ওযু করে নেয়া সুন্নত। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করলাম ঃ আমাদের কেউ নাপাক অবস্থায় নিদ্রা যেতে পরে কি না? তিনি বললেন ঃ হাঁ, যদি ওযু করে নেয়। এক্ষেত্রে ওযু ছাড়া নিদ্রা যাওয়ার অনুমতিও রয়েছে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ) নাপাক অবস্থায় পানিতে হাত না লাগিয়ে ঘুমিয়ে থাকতেন।

সহবাসের অন্যতম আদব হচ্ছে বাইরে বীর্যস্খলন না ঘটানো; বরং বীর্যস্খলন গর্ভাশয়ের মধ্যেই হওয়া উচিত। আল্লাহ যাকে সৃষ্টি করতে চাইবেন সে তো সৃষ্টি হবেই। এমতাবস্থায় বীর্যস্খলন প্রত্যাহার করায় কি লাভ? এর পর বাইরে বীর্যস্খলন ঘটানো বৈধ কি না, এ ব্যাপারে আলেমগণের চারটি বিভিন্ন মাযহাব রয়েছে। কোন কোন আলেম সর্বাবস্থায় একে বৈধ বলেন। কেউ কেউ সর্বাবস্থায় হারাম বলেন। কারও মতে স্ত্রীর সম্মতিক্রমে বৈধ এবং সম্মতি ছাড়া অবৈধ। কোন কোন আলেম বলেন, এটা বাঁদীর সঙ্গে বৈধ এবং স্বাধীন নারীর সাথে অবৈধ।

আমাদের মতে বিশুদ্ধ মাযহাব হচ্ছে, এ কাজটি বৈধ এবং উত্তম দিক বর্জনের অর্থে মাকরূহ। এটা তেমনি মাকরূহ, যেমন বলা হয়, যিকির ও নামায ব্যতীত মসজিদে চুপচাপ বসে থাকা মাকরূহ। এটা মাকরূহ তাহরীমীও নয়, তানযিহীও নয়। কেননা, এর নিষেধাজ্ঞা কোরআন হাদীসে প্রমাণিত নেই।

অতঃপর জানা উচিত, গর্ভপাত করা এবং জীবন্ত শিশু প্রোথিত করা পাপ। কেননা, এতে একটি বিদ্যমান বস্তুর উপর অত্যাচার চালানো হয়। এর পর বিদ্যমান হওয়ারও কয়েকটি স্তর আছে।

(১) বীর্য গর্ভাশয়ে পতিত হওয়া এবং স্ত্রীর বীর্যের সাথে মিলে জীবন লাভের যোগ্য হওয়া। এমতাবস্থায় একে নষ্ট করা পাপ। (২) যদি এটা মাংসপিণ্ড হয়ে যায়, তখন নষ্ট করা পাপ পূর্বের তুলনায় বেশী। (৩) যদি সন্তান পূর্ণাঙ্গ হয়ে যায় এবং তাতে প্রাণ সঞ্চার হয় তখন নষ্ট করা আরও বড় পাপ। (৪) যদি সন্তান জীবিতাবস্থায় মাতৃগর্ভে থেকে আলাদা হয়ে যায়, তখন নষ্ট করা সর্বাধিক অন্যায় কাজ।

আমরা গর্ভাশয়ে বীর্য পতিত হওয়াকে অস্তিত্ব লাভের প্রাথমিক স্তর বলেছি– পুরুষাঙ্গ থেকে বীর্যস্খলনকে বলিনি। এর কারণ ভ্রূণ কেবল পুরুষের বীর্যের দ্বারা তৈরী হয় না; বরং পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের বীর্যের সংমিশ্রণে অথবা পুরুষের বীর্য ও হায়েযের রক্তের সংমিশ্রণে তৈরী হয়। জনৈক বিশ্লেষক লেখেছেন, মাংসপিণ্ড আল্লাহ তাআলার আদেশে হায়েযের রক্ত দ্বারা গঠিত হয়। এর সাথে রক্তের সম্পর্ক দুইয়ের সাথে দুধের সম্পর্কের অনুরূপ। হায়েযের রক্ত জমাট হওয়ার জন্যে পুরুষের বীর্যের সংমিশ্রণ জরুরী; যেমন দুধ জমাট বাঁধার জন্যে জমাট দইয়ের সংমিশ্রণ শর্ত। মোট কথা, বীর্য জমাট হওয়ার কাজে নারীর বীর্য একটি স্তম্ভ এবং নারী-পুরুষ উভয়ের বীর্য সন্তানের অস্তিত্ব লাভের জন্যে এমন, যেমন ক্রয়-বিক্রয়ের অস্তিত্ব লাভে এক পক্ষের প্রস্তাব ও অপর পক্ষের গ্রহণ হয়ে থাকে। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি বিক্রয়ের প্রস্তাব করে এবং অপর পক্ষ তা গ্রহণ না করে, তবে অপর পক্ষকে বিক্রয় ভেঙ্গে দেয়ার দোষে দোষী বলা হবে না। হাঁ, প্রস্তাব ও গ্রহণ উভয়টি হয়ে যাওয়ার পর মুখ ফিরিয়ে নেয়া বিক্রয় ভঙ্গ করা বলা হবে। পুরুষের পৃষ্ঠদেশে বীর্য থাকলে যেমন সন্তান সৃষ্টি হয় না, তেমনি পুরুষাঙ্গ থেকে বের হওয়ার পরেও সন্তান সৃষ্টি হয়

না, যে পর্যন্ত নারীর বীর্য অথবা হায়েযের রক্তের সাথে মিশ্রিত না হয়। এখন প্রশ্ন হতে পারে, বাইরে বীর্যস্খলন উপরোক্ত কারণে মাকরূহ না হলেও কুনিয়তের কারণে মাকরূহ হবে। কেননা খারাপ নিয়তেই এ ধরনের কাজ করা হয়, যাতে কিছু গোপন শেরকের লেশ থাকে। এর জওয়াব, পাঁচ প্রকার নিয়ত এ কাজের কারণ হয়ে থাকে।

প্রথম নিয়ত বাঁদীদের বেলায়। তা হচ্ছে, পুরুষ দেখে, বাঁদীর গর্ভ থেকে সন্তান হলে বাঁদী মুক্ত হওয়ার যোগ্য হয়ে যায়। ফলে সম্পদ হাতছাড়া হয়ে যাবে। তাই এমন উপায় করা প্রয়োজন যাতে বাঁদী চিরকাল তার বাঁদী থাকে। বলাবাহুল্য, আপন মালিকানা বিনষ্ট হওয়ার কারণাদি দূর করা নিষিদ্ধ নয়।

দ্বিতীয় নিয়ত স্ত্রীর রূপ-লাবণ্য ও স্বাস্থ্য অটুট রাখা; যাতে সে স্বাস্থ্যবতী ও প্রাণবন্ত থাকে। কেননা, প্রসব বেদনার মধ্যে অনেক বিপদাশংকা থাকে। বলাবাহুল্য, এ ধরনের নিয়তও নিষিদ্ধ নয়।

তৃতীয় নিয়ত সন্তানের সংখ্যাধিক্যের কারণে ব্যয় বেড়ে যাওয়ার আশংকা করা। এটাও নিষিদ্ধ নয়, যাতে মানুষকে অধিক আমদানীর শ্রম স্বীকার করতে এবং অবৈধ আমদানীর পথে পা বাড়াতে না হয়। কেননা, সাংসারিক ব্যয় কম থাকা দ্বীনদারীর জন্য সহায়ক। তবে وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا বাক্যে আল্লাহ রিযিকের যে ওয়াদা করেছেন, তার উপর ভরসা করার মধ্যেই রয়েছে মাহাত্ম্য ও পূর্ণতা। সুতরাং এই তৃতীয় প্রকার নিয়ত করলে একটি মহৎ ও উত্তম বিষয় বর্জন করা হয়, কিন্তু পরিণামের দিকে লক্ষ্য করে আমরা এটা নিষিদ্ধ বলতে পারি না।

চতুর্থ নিয়ত হচ্ছে এ বিষয়ের আশংকা যে, কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তাদেরকে বিবাহ দিতে হবে এবং কাউকে জামাতা করার কলংক অর্জন করতে হবে। এ কলংকের ভয়ে আরবরা কন্যা সন্তানকে হত্যা করত এবং জীবন্ত পুঁতে ফেলত। এ নিয়ত অবশ্যই মহাপাপ। এ নিয়তে কেউ গর্ভাশয়ের বাইরে বীর্যস্খলন ঘটালে সে গোনাহগার হবে।

পঞ্চম নিয়ত স্বয়ং স্ত্রীর বাধাদান। সে গর্ভাশয়ের অভ্যন্তরে বীর্যস্খলনে সম্মত হয় না। কারণ, সে নিজেকে ইযযতের অধিকারিণী মনে করে,

অতিমাত্রায় পরিচ্ছন্ন থাকতে চায় এবং প্রসব বেদনা, নেফাস ও স্তন্যদান থেকে সযত্নে বেঁচে থাকে। এ ধরনের নিয়ত খুবই গর্হিত। খারেজী সম্প্রদায়ের মহিলাদের এরূপ অভ্যাস ছিল। হযরত আয়েশা (রাঃ) বসরায় তশরীফ নিয়ে গেলে এমনি এক মহিলা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে এলে তিনি তাকে কাছেই আসতে দেননি।

মোট কথা, জন্মশাসন দূষণীয় নয় যদি তা সঠিক নিয়তে করা হয়। এখন প্রশ্ন হয়, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ من ترك النكاح مخافة العيال فليس منا যেব্যক্তি সন্তান সন্ততির ভয়ে বিবাহ বর্জন করে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। অথচ আপনি বিবাহ বর্জন ও বাইরে বীর্যস্খলনকে একই রূপ বলেন এবং সন্তানের ভয়ে একে মাকরূহ বলেন না! এর জওয়াব, আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়– এর অর্থ, সে আমাদের অনুরূপ এবং আমাদের পথ ও সুন্নতের অনুসারী নয়। আমাদের সুন্নত হচ্ছে উত্তম কাজ করা। আবার প্রশ্ন হয়, অন্যত্র রসূলুল্লাহ (সাঃ) এ কাজকে ذالك الواد الخفى (গোপন সন্তান প্রোথিতকরণ) বলেছেন, এর পর وَاِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ আয়াতখানি তেলাওয়াত করেছেন। এটি সহীহ হাদীসের রেওয়ায়েত। এর জওয়াব, সহীহ রেওয়ায়েতে এর বৈধতাও বর্ণিত হয়েছে। কাজেই উপরোক্ত রেওয়ায়েত দ্বারা মাকরূহে তাহরীমী হওয়া প্রমাণিত হয় না। আরও প্রশ্ন হয়, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ বাইরে বীর্যস্খলন ঘটানো ক্ষুদ্রাকারের জীবন্ত প্রোথিতকরণ। আমরা এর জওয়াবে বলি, হযরত ইবনে আব্বাসের এই উক্তি একটি 'কিয়াস' তথা অনুমান। তিনি অস্তিত্বকে নিশ্চিত ধরে নিয়ে তা দূর করা ক্ষুদ্রাকারের জীবন্ত প্রোথিতকরণ বলেছেন। এই কিয়াস দুর্বল। তাই হযরত আলী (রাঃ) এটা শুনে মেনে নেননি এবং বলেন, কয়েকটি স্তর অতিক্রম করা ছাড়া জীবন্ত প্রোথিতকরণ প্রমাণিত হয় না। এর পর তিনি এই আয়াত পাঠ করেন, যাতে স্তরগুলো বর্ণিত হয়েছে–

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَأْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ.

অর্থাৎ, আমি মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর তাকে বীর্যের আকারে এক সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি। এর পর আমি বীর্যকে জমাট রক্তরূপে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছি, এর পর সেই মাংসপিণ্ড থেকে অস্থি সৃষ্টি করেছি, অতঃপর অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি। অবশেষে তাকে এক নতুন সৃষ্টিরূপে দাঁড় করিয়েছি। এর পর তিনি وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ আয়াতটি পাঠ করলেন। সুতরাং হযরত ইবনে আব্বাসের উপরোক্ত কিয়াস কিরূপে শুদ্ধ হতে পারে? কেননা বোখারী ও মুসলিমে হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে–

كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقران ينزل ـ

অর্থাৎ, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আমলে যখন কোরআন নাযিল হচ্ছিল, তখন আমরা আযল (বাইরে বীর্যস্খলন) করতাম। অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে–

كنا نعزل فبلغ ذلك نبى الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا ـ

অর্থাৎ, আমরা আযল করতাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এই সংবাদ পৌছলে তিনি আমাদেরকে নিষেধ করেননি।

হযরত জাবের থেকে আর একটি সহীহ্ রেওয়ায়েত রয়েছে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করল ঃ আমার একটি বাঁদী আছে। সে খেদমত করে এবং বৃক্ষে পানি দেয়। আমি তার সাথে সহবাস করি, কিন্তু আমি চাই না, তার গর্ভ সঞ্চার হোক।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ

اعزل عنها ان شئت فانه سياتيها ما قدرلها ـ

অর্থাৎ, তুমি ইচ্ছা করলে তার সাথে আযল কর, কিন্তু যা তার ভাগ্যে নির্ধারিত রয়েছে তা আসবেই। কয়েকদিন পর লোকটি আবার এসে আরজ করল ঃ আমার সে বাঁদী গর্ভবতী হয়ে গেছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আমি তো পূর্বেই বলেছিলাম, তার ভাগ্যে লেখা সন্তান অবশ্যই আসবে। এসব রেওয়ায়েত বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে।

একাদশ আদব সন্তান সংক্রান্ত। প্রথম, ছেলে সন্তান হলে অধিক খুশী এবং কন্যা সন্তান হলে মনঃক্ষুণ্ণ হবে না। কেননা, কেউ জানে না তার জন্যে এতদুভয়ের মধ্যে কোন্‌টি মঙ্গলজনক; বরং গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, কন্যা সন্তানের মধ্যে নিরাপত্তা ও সওয়াব অধিক। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তির একটি কন্যা থাকে এবং সে তাকে উত্তমরূপে শিক্ষা দান করে, লালন-পালন করে ও তার উপর আল্লাহ্ প্রদত্ত নেয়ামত সম্পূর্ণ করে, সেই কন্যা তার জন্যে ডানে বামে দোযখের আড়াল হয়ে তাকে জান্নাতে পৌঁছাবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি দুটি কন্যা সন্তান লাভ করে এবং তারা যতদিন পিতার কাছে থাকে, ততদিন পিতা তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করে, সেই কন্যাদ্বয় তাকে জান্নাতে দাখিল করবে। অন্য এক রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ)-এরশাদ করেন ঃ যেব্যক্তি বাজার থেকে নতুন বস্তু আপন সন্তানদের জন্যে কিনে আনে, সে যেন তাদের জন্যে খয়রাত নিয়ে আসে। তার উচিত এই বস্তু পুত্রদের পূর্বে কন্যাদের মধ্যে বন্টন শুরু করা। কেননা, যেব্যক্তি কন্যাকে খুশী করে, সে যেন আল্লাহ তা'আলার ভয়ে ক্রন্দন করে। যে আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করে, আল্লাহ তার উপর দোযখ হারাম করে দেন। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

من كانت له ثلاث بنات او اخوات نصبر على لاواتهن وصنواتهن ادخله الله الجنة بفضل رحمة اياهن -

অর্থাৎ, যেব্যক্তির তিনটি কন্যা সন্তান অথবা বোন থাকে এবং তাদের বিপদাপদ ও নির্মমতায় সবর করে, আল্লাহ তাকে কন্যাদের প্রতি করুণা করার কল্যাণে জান্নাতে দাখিল করবেন। এক ব্যক্তি আরজ করল ঃ যদি দু'কন্যা থাকে? তিনি বললেন ঃ দু'কন্যার ক্ষেত্রেও একই অবস্থা হবে। এক ব্যক্তি বলল ঃ একজন হলে? তিনি বললেন ঃ একজন হলেও।

দ্বিতীয়, ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর শিশুর কানে আযান দেবে। হযরত রাফে (রাঃ)-এর পিতা বর্ণনা করেন ঃ হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর গর্ভ থেকে হযরত হাসান (রাঃ) ভূমিষ্ঠ হলে রসূলে করীম (সাঃ) তাঁর কানে আযান দিয়েছেন। আমি এ দৃশ্য স্বচক্ষে দেখছি। আরও বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন–

من ولد له مولود فاذن فى اذنه اليسرى دفعت عنه ام الصبيان -

অর্থাৎ, যার কোন সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, অতঃপর সে তার বাম কানে আযান দেয়, সেই সন্তান 'উম্মুছ ছিবইয়ান' রোগের আক্রমণ থেকে মুক্ত থাকে। যখন শিশুর মুখ খোলে, তখন সর্বপ্রথম তাকে কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' শিক্ষা দেয়া এবং সপ্তম দিনে খতনা করা মোস্তাহাব। এ সম্পর্কে একটি হাদীস বর্ণিত আছে।

তৃতীয়, শিশুর উত্তম নাম রাখবে। এটাও শিশুর হক্ক। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন– اذا سميتم فعبدوا অর্থাৎ, যখন নাম রাখ, তখন যেন নামের প্রথম অংশ 'আবদ' (বান্দা) হয়। احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার সর্বাধিক প্রিয় নাম হচ্ছে আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান। سموا باسمى ولاتكنوا بكنيتى অর্থাৎ, তোমরা আমার নামে নাম রাখ। তবে আমার ডাকনামে ডাকনাম রেখো না। আলেমগণ বলেন ঃ এ নিষেধাজ্ঞা কেবল রসূলে করীম (সাঃ)-এর আমলে ছিল। তখন তাঁকে 'আবুল কাসেম' নামে ডাকা হত। এখন অন্যের জন্যে এই নাম রাখা দূষণীয় নয়। তবে তাঁর নাম ও ডাকনাম এক ব্যক্তির জন্যে একত্রিত করা উচিত নয়, হাদীসে এ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। কেউ কেউ বলেন ঃ এই নিষেধাজ্ঞাও কেবল তাঁর আমলে ছিল। এক ব্যক্তির ডাকনাম ছিল আবু ঈসা (ঈসার বাপ)। রসূলুল্লাহ (সাঃ) শুনে বললেন ঃ ঈসা (আঃ)-এর তো বাপ ছিল না। এ থেকে জানা গেল, আবু ঈসা নাম রাখা মাকরূহ। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ে যায়, তারও নাম রাখা উচিত। আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ বলেন ঃ আমি শুনেছি গর্ভপাতের সন্তান কেয়ামতের দিন পিতার পেছনে পেছনে ফরিয়াদ করবে এবং বলবে, তুমি আমাকে নামহীন ছেড়ে দিয়ে নষ্ট করেছ। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ একথা শুনে বললেন ঃ তা কেমন করে হবে? পিতা তো জানতেও পারে না যে, গর্ভপাতজনিত সন্তান ছেলে না মেয়ে। এমতাবস্থায় সে কিরূপে নাম রাখবে? জওয়াবে আবদুর রহমান বললেন ঃ অনেক নাম আছে, যা পুরুষ ও নারী উভয়েরই হতে পারে; যেমন আম্মারা, তালহা, ওতবা ইত্যাদি। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

انكم تدعون يوم القيامة باسمائكم واسماء ابائكم فاحسنوا اسمائكم -

অর্থাৎ, কেয়ামতের দিন তোমরা তোমাদের নামে ও তোমাদের পিতার নামে আহূত হবে। অতএব তোমরা সুন্দর সুন্দর নাম রাখ। কারও নাম খারাপ থাকলে তা বদলে দেয়া মোস্তাহাব। রসূলে করীম (সাঃ) 'আছ' (পাপী) -এর নাম পাল্টে আবদুল্লাহ রেখেছিলেন। হযরত যয়নব (রাঃ)-এর নাম ছিল বাররাহ। নবী করীম (সাঃ) বললেন ঃ তুমি নিজেই নিজেকে ভাল বল। উল্লেখ্য, 'বাররাহ' অর্থ নিরপরাধ। এর পর তিনি এই নাম পাল্টে যয়নব রাখলেন।

চতুর্থ, সন্তান জন্ম গ্রহণের পর আকীকা করবে। পুত্রের জন্যে দু'টি ছাগল এবং কন্যার জন্য একটি ছাগল জবাই করবে। আকীকার জন্তু নর হোক কিংবা মাদী, তাতে কিছু আসে যায় না। হযরত আয়েশা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন, রসূলে করীম (সাঃ) পুত্রের আকীকায় দুটি ছাগল এবং কন্যার আকীকায় একটি ছাগল জবাই করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বর্ণিত আছে, তিনি হযরত ইমাম হাসান (রাঃ)-এর আকীকায় একটি ছাগল জবাই করেন। এ থেকে জানা গেল, এক ছাগল জবাই করলেও ক্ষতি নেই। ভূমিষ্ঠ শিশুর চুলের ওজনের সমপরিমাণ সোনা অথবা রূপা খয়রাত করা সুন্নত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত ইমাম হুসাইন (রাঃ)-এর জন্মের সপ্তম দিন হযরত ফাতেমা (রাঃ)-কে এরশাদ করেন ঃ তার চুল মুণ্ডন করে চুলের সমপরিমাণ রূপা সদকা করে দাও। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ আকীকার জন্তুর হাড়া ভাঙ্গা উচিত নয়।

পঞ্চম, সন্তানের কণ্ঠ তালুতে খোরমা অথবা মিষ্টি মেখে দেবে। আবু বকর তনয়া হযরত আসমা (রাঃ) বলেন ঃ কোবায় আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়র আমার গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হলে আমি তাকে এনে রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর কোলে তুলে দিলাম। তিনি একটি খোরমা চিবিয়ে তার রস আবদুল্লাহর মুখে দিলেন। তাই সর্বপ্রথম তার পেটে যা পড়ে, তা ছিল রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর লালা মোবারক। এর পর তিনি তার তালুতে খোরমা মেখে দিলেন এবং বরকতের দোয়া করলেন । মুহাজিরদের মধ্যে সর্বপ্রথম শিশু সে-এই জন্মগ্রহণ করেছিল। তাই তার জন্মগ্রহণে

মুসলমানদের আনন্দের সীমা ছিল না; কেননা, লোকেরা বলাবলি করতো যে, ইহুদীরা তোমাদের উপর জাদু করেছে। তোমাদের সন্তান সন্ততি হবে না।

দ্বাদশ আদব তালাক সংক্রান্ত। প্রথম, তালাক একটি বৈধ কাজ, কিন্তু বৈধ কাজসমূহের মধ্যে আল্লাহ তাআলার কাছে এর চেয়ে অধিক অপছন্দনীয় দ্বিতীয়টি নেই। এটা তখনই বৈধ হয়, যখন এর দ্বারা অন্যায় উৎপীড়ন উদ্দেশ্য না থাকে, অর্থাৎ, স্ত্রীকে তালাক দেয়া একটি উৎপীড়ন। অপরকে উৎপীড়ন করা জায়েয নয়; কিন্তু স্ত্রী দোষী হলে অথবা স্বামীর তালাক দেয়ার প্রয়োজন হলে জায়েয হবে।

সেমতে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۔

অর্থাৎ, স্ত্রীরা যদি তোমাদের অনুগত হয় তবে বিচ্ছিন্নতার পথ তালাশ করো না।

যদি স্বামীর পিতা পুত্র বধূকে মন্দ মনে করে, তবে তাকে তালাক দিয়ে দেয়া উচিত। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন ঃ আমি এক মহিলাকে বিয়ে করেছিলাম। হযরত ওমর (রাঃ) তাকে অপছন্দ করতেন এবং আমাকে তালাক দিতে বলতেন। আমি এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অভিমত চাইলে তিনি বললেন ঃ হে ইবনে ওমর, স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দাও। এ হাদীস থেকে জানা যায়, পিতার হক অগ্রে, কিন্তু এটা তখন, যখন পিতার অপছন্দ করাটা কুউদ্দেশ্যপ্রণোদিত না হয়। যেমন হযরত ওমরের মত পিতার হক নিঃসন্দেহে অগ্রে। স্ত্রী যদি স্বামীকে পীড়ন করে অথবা তার পরিবারকে খারাপ বলে, তবে স্ত্রী দোষী। তেমনি যদি দুশ্চরিত্র হয় ও দ্বীনদার না হয়, তা হলেও দোষী। কোরআনে আছে- وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ (মহিলারা বের হবে না; কিন্তু যদি কোন সুস্পষ্ট নির্লজ্জ কাজ করে।) এ আয়াতের তফসীরে হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ স্ত্রী পরিবারের লোকজনকে মন্দচারী বললে এবং স্বামীকে কষ্ট দিলে এও তার নির্লজ্জ কাজ। যদিও এ বিষয়বস্তুটি ইদ্দত সম্পর্কিত; কিন্তু এর দ্বারা আসল উদ্দেশ্য বুঝা যায়। যদি উৎপীড়ন স্বামীর পক্ষ থেকে হয়, তবে স্ত্রীর উচিত কিছু অর্থসম্পদ দিয়ে স্বামীর কবল থেকে মুক্তি লাভ করা। স্ত্রীকে যে পরিমাণ অর্থসম্পদ

দেয়া হয়েছে, তার চেয়ে বেশী নেয়া এক্ষেত্রে স্বামীর জন্যে মাকরূহ। স্ত্রীর পক্ষ থেকে অর্থসম্পদ দেয়ার কথা এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে ঃ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ (স্ত্রী মুক্তিপণস্বরূপ যা দেয়, তাতে তাদের উভয়ের কোন গোনাহ নেই।) মোট কথা, স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে যতটুকু পায়, সে পরিমাণ অথবা তার চেয়ে কম মুক্তিপণ দেয়া উচিত। স্ত্রী অহেতুক তালাক প্রার্থনা করলে সে গোনাহগার হবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ ايما امراة سألت زوجها طلاقها من غير باس لم ترح رائحة الجنة অর্থাৎ, যে স্ত্রী কোন ভয় ও প্রয়োজন ছাড়া স্বামীর কাছে তালাক প্রার্থনা করে, সে জান্নাতের ঘ্রাণ পর্যন্ত পাবে না। অন্য এক রেওয়ায়েতে فالجنة عليها حرام –তার উপর জান্নাত হারাম বলা হয়েছে।

তালাক দেয়ার ব্যাপারে স্বামীর উচিত চারটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা– (১) যে তোহ্র তথা হায়েয থেকে পাক থাকার সময়ে স্ত্রীর সাথে সহবাস করেনি, সেই তোহরে তালাক দেয়া। কেননা, যে তোহরে সহবাস হয়ে গেছে, সে তোহরে তালাক দেয়া বেদআত ও হারাম। যদিও তালাক হয়ে যায়। কেননা, এমতাবস্থায় স্ত্রীর ইদ্দত দীর্ঘ হয়ে যায়। সুতরাং কেউ এরূপ তালাক দিলে তার উচিত রুজু করা। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) তার স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দিলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত ওমরকে বললেন ঃ তাকে রুজু করতে বল। এর পর যখন তার স্ত্রী হায়েয থেকে পাক হবে, এর পর আবার যখন হায়েয হবে ও আবার পাক হবে, তখন ইচ্ছা করলে তালাক দেবে। নতুবা থাকতে দেবে। এখানে হযরত ইবনে ওমরকে দু'তোহ্র অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে, যাতে রুজু করার উদ্দেশ্য কেবল তালাক দেয়া না হয়ে যায়। (২) তালাক দেবে, দুই অথবা তিন তালাক এক সাথে দেবে না। কেননা, ইদ্দতের পর এক তালাক দ্বারাও সেই উপকার হয়, যা তিন তালাক দ্বারা হয়; অর্থাৎ, স্ত্রী বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়, কিন্তু এক তালাক দেয়ার মধ্যে আরও দু'টি উপকার আছে। এক, যদি তালাক দেয়ার পর স্বামী অনুতপ্ত হয়, তবে ইদ্দতের দিনগুলোতে রুজু করতে পারে। দুই, ইদ্দতের পর আবার এই স্ত্রীকে নতুনভাবে বিবাহ করতে পারে। যদি তিন তালাক দেয়ার পর অনুতপ্ত হয়, তবে হালাল করার প্রয়োজন হবে এবং দীর্ঘ দিন অপেক্ষা করতে হবে।

হালাল একটি নিন্দনীয় কাজ। এতে অপরের স্ত্রীর মধ্যে নিয়ত লেগে থাকে এবং তার তালাকের অপেক্ষা করা হয়। তিন তালাকই এসব অনিষ্টের কারণ। এক তালাক দিলে উদ্দেশ্যও সাধিত হয়ে যায় এবং অনিষ্টও হয় না। তবে তিন তালাক একত্রে দেয়া হারাম নয়; বরং এসব অনিষ্টের কারণে মাকরূহ। (৩) সম্প্রীতির পরিবেশে তালাক দেবে এবং নির্মমতা ও ঘৃণা সহকারে তালাক দেবে না। আকস্মিক বিরহের কারণে স্ত্রীর যে কষ্ট হবে, তা দূর করার জন্যে হাদিয়াস্বরূপ স্ত্রীকে কিছু দিয়ে তার মন খুশী করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمَتِّعُوهُنَّ অর্থাৎ, যে স্ত্রীর বিবাহে মোহরানা উল্লেখ করা হয়নি তাকে 'মুতআ' দেয়া ওয়াজিব। (৪) বিবাহ ও তালাক উভয় ক্ষেত্রে স্ত্রীর গোপনীয়তা প্রকাশ করবে না। এ সম্পর্কে হাদীসে শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছে। জনৈক বুযুর্গ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি স্ত্রীকে তালাক দিতে চাইলে লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করল- স্ত্রীর প্রতি আপনার সন্দেহ কি? তিনি বললেন ঃ বুদ্ধিমান ব্যক্তি আপন স্ত্রীর গোপন রহস্য ফাঁস করে না। এর পর যখন তিনি তালাক দিয়ে দিলেন, তখন জিজ্ঞেস করা হল, আপনি তাকে কেন তালাক দিলেন? তিনি বললেন ঃ আমি বেগানা স্ত্রীর গোপন তথ্য কেন প্রকাশ করব? মোট কথা, স্বামীর উপর স্ত্রীর যেসকল হক রয়েছে, এ পর্যন্ত সেগুলো বর্ণিত হল।

স্ত্রীর উপর স্বামীর হক ঃ এক্ষেত্রে চূড়ান্ত কথা, বিবাহ প্রকারান্তরে বাঁদী হওয়ার নামান্তর বিধায় স্ত্রী যেন স্বামীর বাঁদী হয়ে যায়। সুতরাং স্বামীর আনুগত্য করা সর্বাবস্থায় তার উপর ওয়াজিব। স্ত্রীর উপর স্বামীর হক যে বেশী, এ সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

ايما امراة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة -

অর্থাৎ, যে স্ত্রী এমতাবস্থায় মারা যায় যে, তার স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

কোন এক ব্যক্তি সফরে যাওয়ার সময় স্ত্রীকে বলে গেল ঃ উপর তলার কক্ষ থেকে নীচে নামবে না। নীচে তার পিতা বসবাস করত। ঘটনাক্রমে সে অসুস্থ হয়ে পড়ল। স্ত্রী নীচে পিতার কাছে নামার অনুমতি চেয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে লোক পাঠালে তিনি বললেন ঃ স্বামীর আদেশ পালন কর। শেষ পর্যন্ত পিতা মারা গেলে সে আবার অনুমতি

প্রার্থনা করল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আবার বললেন ঃ স্বামীর আদেশ পালন কর। ফলে পিতা সমাধিস্থও হয়ে গেল; কিন্তু সে নীচে নামল না। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই মহিলাকে বলে পাঠালেন ঃ তুমি যে স্বামীর আদেশ পালন করেছ, এর বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তোমার পিতার মাগফেরাত করেছেন। অন্য এক হাদীসে আছে ঃ

اذا صلت المراة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها دخلت جنة ربها ـ

অর্থাৎ, যখন স্ত্রী পাঞ্জেগানা নামায পড়ে, রমযান মাসের রোযা রাখে, আপন গুপ্ত অঙ্গের হেফাযত করে এবং স্বামীর আনুগত্য করে, তখন সে তার পালনকর্তার জান্নাতে প্রবেশ করবে।

এ হাদীসে স্বামীর আনুগত্যকে ইসলামের রোকনসমূহের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) মহিলাদের আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন ঃ গর্ভবতী নারী, সন্তান প্রসবকারিণী নারী, দুগ্ধদানকারিণী নারী, সন্তানদের প্রতি দয়াশীলা নারী, স্বামীর সাথে যে অসদাচারণ করে, যদি তা না করত, তবে তাদের মধ্যে যারা নামাযী, তারা জান্নাতে প্রবেশ করত। এক হাদীসে তিনি বলেন ঃ

اطلعت فى النار فاذا اكثر اهلها النساء فقلن لم يا رسول الله قال يكثرن اللعن ويكفرن العشيرة ـ

অর্থাৎ, আমি দোযখে উঁকি দিয়ে দেখলাম, তার অধিকাংশ বাসিন্দাই মহিলা। মহিলারা আরজ করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, এর কারণ কি ? তিনি বললেন ঃ মহিলারা অভিসম্পাত বেশী করে এবং স্বামীদের না-শোকরী করে।

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, আমি জান্নাতে উঁকি দিয়ে দেখলাম, তাতে পুরুষ জান্নাতীদের তুলনায় মহিলাদের সংখ্যা খুব নগণ্য। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ মহিলারা কোথায়? উত্তর হল ঃ দু'টি লাল বস্তু তাদের জান্নাতে আসার পথে বাধা হয়েছে। একটি স্বর্ণ ও অপরটি জাফরান। অর্থাৎ, অলংকার ও রঙ্গিন পোশাক। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ কোন এক যুবতী রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরজ করল ঃ ইয়া

রসূলাল্লাহ্, আমি যুবতী। মানুষ আমার কাছে বিবাহের প্রস্তাব দেয়, কিন্তু বিবাহ আমার কাছে ভাল লাগে না। এখন জানতে চাই, স্ত্রীর উপর স্বামীর হক কি? তিনি বললেন ঃ ধরে নেয়া যাক, স্বামীর আপাদমস্তক পুঁজে ভর্তি। যদি স্ত্রী এই পুঁজ চেটে নেয়, তবুও তার শোকর আদায় করতে পারবে না। মহিলা বলল ঃ আমি বিবাহ করব কি? তিনি বললেন ঃ করে নাও। বিবাহ করা উত্তম । হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ খাসআম গোত্রের জনৈকা মহিলা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে এসে আরজ করল ঃ আমি স্বামীহীনা, বিবাহ করতে চাই। এখন স্বামীর হক কি, জানতে চাই। তিনি বললেন ঃ স্বামীর এক হক, সে যদি উটের পিঠে থেকেও সহবাস করার ইচ্ছা প্রকাশ করে, তবে স্ত্রী অস্বীকার করতে পারবে না। আরেক হক, কোন বস্তু তার গৃহ থেকে তার অনুমতি ব্যতীত কাউকে দেবে না। দিলে তুমি রোযা রেখে কেবল ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্তই থাকবে। তোমার রোযা কবুল হবে না। যদি তুমি স্বামীর আদেশ ছাড়া ঘর থেকে বের হও, তবে ঘরে ফিরে না আসা পর্যন্ত এবং তওবা না করা পর্যন্ত ফেরেশতারা তোমার প্রতি অভিসম্পাত করতে থাকবে। এক হাদীসে আছে–

لو امرت احد ان يسجد لاحد لامرت المراة ان تسجد لزوجها -

অর্থাৎ, যদি আমি কাউকে সেজদা করার নির্দেশ করতাম, তবে অবশ্যই স্ত্রীকে নির্দেশ করতাম যেন সে তার স্বামীকে সেজদা করে।

এরূপ বলার কারণ, স্ত্রীর উপর স্বামীর হক বেশী । রসূলে আকরাম (সাঃ) আরও বলেন ঃ স্ত্রী আল্লাহ্র পবিত্র সত্তার অধিকতর নিকটবর্তী তখন হয়, যখন সে তার কক্ষের অভ্যন্তরে থাকে। স্ত্রীর পক্ষে গৃহের আঙ্গিনায় নামায পড়া মসজিদে নামায পড়া অপেক্ষা উত্তম। আর কক্ষের ভেতরকার কক্ষে নামায পড়া কক্ষের ভেতরে নামায পড়ার তুলনায় শ্রেয়ঃ। এটা বলার কারণ, স্ত্রীর অবস্থার উৎকৃষ্টতা ও অপকৃষ্টতা পর্দার উপর নির্ভরশীল। সুতরাং যে অবস্থায় পর্দা বেশী হবে, সে অবস্থাই তার জন্যে উত্তম। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ المراة عورة فاذا خرجت استشرفها الشيطان (নারী হল নগ্নতা । সে যখন বের হয়

তখন শয়তান উঁকি দিয়ে দেখে।) তিনি আরও বলেন ঃ স্ত্রীর দশটি নগ্নতা রয়েছে। সে যখন বিবাহ করে তখন স্বামী একটি নগ্নতা ঢেকে দেয়। আর যখন সে মারা যায়, তখন কবর দশটি নগ্নতা আবৃত করে দেয়। মোট কথা, স্বামীর হক স্ত্রীর উপর অনেক। তন্মধ্যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ দুটি– একটি আত্মরক্ষা ও পর্দা এবং অপরটি প্রয়োজনাতিরিক্ত জিনিসপত্র দাবী না করা এবং স্বামীর উপার্জন হারাম হলে তা থেকে বেঁচে থাকা। সেমতে পূর্ববর্তীকালে নারীর অভ্যাস তাই ছিল। তখন কোন পুরুষ সফরে গেলে তার স্ত্রী ও কন্যারা তাকে বলত ঃ খবরদার! হারাম উপার্জন করবে না। আমরা ক্ষুধা ও কষ্টে সবর করব; কিন্তু দোযখের আগুনে সবর করতে পারব না। সে যুগের এক ব্যক্তি সফরের ইচ্ছা করলে তার প্রতিবেশীদের মনে সন্দেহ হল। সবাই তার স্ত্রীকে বলল ঃ তুমি তার সফরে সম্মত হচ্ছ কেন? সে তো তোমার খরচের জন্যে কিছুই রেখে যাচ্ছে না! স্ত্রী বলল ঃ আমি আমার স্বামীকে যেদিন থেকে দেখেছি, ভক্ষকই পেয়েছি– রিযিকদাতা পাইনি। আমার পালনকর্তা আমার রিযিকদাতা। এখন ভক্ষক চলে যাবে এবং রিযিকদাতা আমার কাছে থাকবে। রাবেয়া বিনতে ইসমাঈল আহমদ ইবনে আবুল হাওয়ারীর কাছে নিজের বিবাহের পয়গাম দিলে এবাদতের কারণে তিনি তা অপছন্দ করেন এবং বলেন ঃ স্ত্রীর খাহেশ আমার নেই। আমি এবাদতেই মগ্ন থাকতে চাই। রাবেয়া বললেনঃ আমি আমার অবস্থায় তোমার চেয়ে অধিক মগ্ন রয়েছি। পুরুষের খাহেশ আমার নেই, কিন্তু আমি আমার পূর্ব স্বামীর কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে অনেক ধন সম্পদ পেয়েছি। আমি চাই তুমি এসব ধন-সম্পদ তোমার সঙ্গীদের মধ্যে ব্যয় কর এবং তোমার মাধ্যমে আমি সজ্জনদের পরিচয় লাভ করি। আহমদ বললেন ঃ আমি আগে আমার ওস্তাদের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নেই। অতঃপর তিনি হযরত সোলায়মান দারানীর কাছে ঘটনা বর্ণনা করলেন। তিনি রাবেয়ার কথা শুনে বললেন ঃ তাকে বিয়ে করে নাও। সে আল্লাহর ওলী। কেননা, এরূপ কথাবার্তা ওলীরা বলেন। আহমদ বলেন ঃ ইতিপূর্বে ওস্তাদ আমাকে বিবাহ করতে বারণ করতেন এবং বলতেন, আমাদের সঙ্গীদের মধ্যে যে কেউ বিয়ে করেছে, সে-ই বদলে গেছে। এর পর আমি রাবেয়াকে বিয়ে

করলাম। এই রাবেয়াও সিরিয়ায় তেমনি ছিল, যেমন ছিল বসরায় রাবেয়া বসরী।

স্বামীর ধনসম্পদ অযথা ব্যয় না করা স্ত্রীর অন্যতম কর্তব্য; বরং সে স্বামীর ধনসম্পদের হেফাযত করবে। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ স্ত্রীর জন্যে হালাল নয় যে, সে স্বামীর গৃহ থেকে তার অনুমতি ছাড়া কোন খাদ্যবস্তু অন্যকে দেবে। তবে খারাপ হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকলে কাঁচা খাদ্য সামগ্রী দিতে পারে। যদি স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রী কাউকে খাওয়ায়, তবে সওয়াব স্বামী নেবে এবং গোনাহ স্ত্রীর উপর থাকবে। পিতামাতার উপর কন্যা সন্তানের হক তাদেরকে অপরের সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং স্বামীর সাথে সদ্ভাবে বসবাস করার শিক্ষা দেবে। বর্ণিত আছে, আসমা বিনতে খারেজা করারী তাঁর কন্যার বিয়ের সময় তাকে এরূপ উপদেশ দান করেন ঃ যে গৃহে তুমি এসেছিলে, এখন সেখান থেকে বের হয়ে এমন শয্যায় যাচ্ছ, যে সম্পর্কে তুমি ওয়াকিফহাল ছিলে না। তুমি এমন ব্যক্তির কাছে থাকবে, যার সাথে পূর্ব থেকে পরিচয় ছিল না। অতএব তুমি তার পৃথিবী হবে। ফলে সে তোমার আকাশ হবে। তুমি তার জন্যে শান্তির কারণ হলে সে তোমার সুখের কারণ হবে। তুমি তার বাঁদী হলে সে তোমার গোলাম হয়ে থাকবে। স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তার কাছে যাবে না যে, তোমাকে ঘৃণা করে এবং দূরেও থাকবে না যে, দ্রুত ভুলে যায়; বরং সে তোমার কাছে থাকলে তুমি তার নিকটে থাকবে। সে আলাদা থাকলে তুমি দূরে থাকবে। তার নাক, কান ও চোখের দিকে লক্ষ্য রাখবে। সে যেন তোমার কাছ থেকে সুগন্ধি ছাড়া অন্য কিছুর ঘ্রাণ না পায়। সে যখন শুনে তখন যেন তোমার কাছ থেকে ভাল কথা শুনে এবং যখন দেখে তখন যেন ভাল কিছু দেখে।

স্ত্রীর আদবসমূহের মধ্যে একশ' কথার এক কথা, স্ত্রী আপন গৃহে বসে চরকায় সূতা কাটা ইত্যাদি কাজে ব্যস্ত থাকবে। ছাদে আরোহণ করে এদিক ওদিক তাকাবে না। প্রতিবেশীদের সাথে কথা কম বলবে এবং নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া তাদের গৃহে যাবে না। স্বামীর উপস্থিতিতে ও অনুপস্থিতিতে তার সম্মান করবে। প্রত্যেক কাজে তার সন্তুষ্টি কামনা করবে। নিজের ব্যাপারে ও স্বামীর ধন-সম্পদের ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা

করবে না। স্বামীর অনুমতিক্রমে গৃহ থেকে বের হলেও পুরাতন কাপড়-চোপড়ে আবৃতা হয়ে বের হবে। সড়কের মধ্যস্থলে ও বাজার থেকে বেঁচে চলবে। সর্বপ্রযত্নে নিজের অবস্থার উন্নতি ও ঘর-কন্নায় নিয়োজিত থাকবে এবং নামায-রোযার সাথে সম্বন্ধ রাখবে। স্বামীর কোন বন্ধু দরজায় আওয়াজ দিলে যদি স্বামী গৃহে না থাকে, তবে তার সাথে কোন কথা না বলাই নিজের স্বামীর আত্মমর্যাদার দাবী। স্বামীকে আল্লাহ তা'আলা যা কিছু দিয়েছেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকবে। খুব সেজেগুজে থাকবে এবং স্বামী সম্ভোগ করতে চাইলে তজ্জন্যে সর্বাবস্থায় প্রস্তুত থাকবে। সন্তানদের প্রতি স্নেহমমতা করবে। স্বামীর কথার প্রত্যুত্তর দেবে না। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আমার পূর্বে জান্নাতে যাওয়া প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে হারাম করেছেন, কিন্তু আমি এক মহিলাকে দেখব সে জান্নাতের দরজার দিকে আমার আগে আগে যেতে থাকবে। আমি জিজ্ঞেস করব, ব্যাপার কি, এই মহিলা আমার আগে যাচ্ছে? আমাকে বলা হবে; হে মুহাম্মদ (সাঃ)! এ মহিলা সুন্দরী রূপবতী ছিল। তার দুটি এতীম শিশু ছিল। সে তাদের ব্যাপারে সবর করেছে। ফলে তার যে দুর্দশা হওয়ার ছিল, তাই হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তার এই আত্মত্যাগ পছন্দ করে তাকে এই মর্যাদা দান করেছেন। স্ত্রীর অন্যতম আদব হচ্ছে, স্বামীর সাথে আপন রূপ-লাবণ্য নিয়ে গর্ব না করা এবং স্বামী কুশ্রী হওয়ার কারণে তাকে হেয় মনে না করা। আসমায়ী বলেন ঃ আমি জঙ্গলে গিয়ে একজন নেহায়েত রূপসী মহিলাকে দেখলাম। সাথে তার স্বামীকে দেখলাম চরম কুশ্রী কদাকার। আমি মহিলাকে বললাম ঃ আশ্চর্যের বিষয়, তুমি এমন ব্যক্তির স্ত্রী হয়ে সুখী আছ! সে বলল ঃ চুপ কর। তুমি ভুল করছ। আসল ব্যাপার হচ্ছে সম্ভবতঃ সে তার স্রষ্টার সন্তুষ্টির কোন কাজ করেছে, যার বিনিময়ে আমাকে লাভ করেছে। আর খুব সম্ভব আমার দ্বারা স্রষ্টার মর্জির খেলাফ কোন কাজ হয়েছে, যার শাস্তিস্বরূপ আমি এই স্বামী পেয়েছি। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা আমার জন্যে যা পছন্দ করেছেন তাতে আমি সন্তুষ্ট থাকব না কেন? আসমায়ী বলেন ঃ মহিলা আমাকে সম্পূর্ণ নিরুত্তর করে দিল। স্ত্রীর অন্যতম আদব, সে কোন অবস্থাতেই স্বামীকে পীড়ন করবে না। হযরত মোয়ায ইবনে

জাবালের রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

لاتؤذى امراة زوجها فى الدنيا الا قالت زوجته من الحور العين لاتوذينه قاتلك الله فانما هو عندك رحيل يوشك ان يفارقك الينا ـ

অর্থাৎ. দুনিয়াতে যখন কোন স্ত্রী তার স্বামীকে পীড়ন করে, তখন তার বেহেশতী হুর স্ত্রী দুনিয়ার স্ত্রীকে বলে ঃ তুমি ধ্বংস হও। তুমি তাকে পীড়ন করো না। সে-তো তোমার কাছে মুসাফির। সত্বরই তোমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমাদের কাছে চলে আসবে। স্বামী মারা গেলে স্ত্রীর কর্তব্য হবে তার জন্যে চার মাস দশ দিনের বেশী শোক প্রকাশ না করা। এটা বিবাহের অন্যতম হক। স্ত্রী এই চার মাস দশ দিন সুগন্ধি ও সাজসজ্জা থেকে বেঁচে থাকবে। যয়নব বিনতে আবু সালামা বলেন ঃ আমি আবু সুফিয়ানের মৃত্যুর পর তার কন্যা উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবীবা (রাঃ)-এর কাছে গেলাম। তিনি হলুদ রঙের সুগন্ধি এনে আপন গালে মালিশ করলেন এবং বললেন ঃ আল্লাহর কসম, আমার সুগন্ধির কোন প্রয়োজন ছিল না; কিন্তু আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি–

لايحل لامرة تؤمن بالله واليوم الاخر ان لا تحد على ميت اكثر من ثلثه ايام الاعلى زوج اربعة اشهر وعشرة ـ

অর্থাৎ, আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে– এমন কোন মহিলার জন্যে মৃতের কারণে তিন দিনের বেশী শোক পালন করা বৈধ নয়, কিন্তু স্বামী মারা গেলে চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে। শোক পালনকালে স্ত্রী মৃত স্বামীর গৃহেই থাকবে। বাপের বাড়ী চলে যাওয়া জায়েয নয়। স্ত্রীর অন্যতম আদব, স্বামীর গৃহে যেসব কাজ সম্পাদন করা তার জন্যে সম্ভব, সেগুলো অম্লান বদনে করবে। হযরত আসমা বিনতে আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) বর্ণনা করেন–

হযরত যোবায়রের সাথে আমার বিবাহ হলে তাঁর কোন ধন-সম্পদ ছিল না। না ছিল কোন গোলাম, না ছিল বাঁদী। কেবল একটি ঘোড়া ও পানি আনার জন্যে একটি উট ছিল। ফলে আমিই তার ঘোড়াকে ঘাস

পানি দিতাম এবং উটের জন্যে খোরমার বীচি কুটে খাবার দিতাম। পানি ভরে আনতাম এবং মশক সেলাই করতাম। এ ছাড়া আটা পিষতাম এবং দু'ক্রোশ দূর থেকে মাথায় বহন করে বীচি আনতাম। অবশেষে আমার পিতা হযরত আবু বকর (রাঃ) আমার কাছে একটি বাঁদী পাঠিয়ে দিলেন। এতে আমি অনেক কাজকর্ম থেকে মুক্তি পাই। একদিন আমার মাথায় বীচির বস্তা ছিল, তখন পথিমধ্যে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হল। সাহাবীগণও তাঁর সাথে ছিলেন। তিনি আমাকে নিজের পেছনে সওয়ার করিয়ে নেয়ার জন্যে আপন উষ্ট্রীকে বসার জন্যে ইশারা করলেন, কিন্তু পুরুষদের সাথে চলতে আমি লজ্জাবোধ করলাম এবং আমার স্বামীর আত্মমর্যাদাবোধ স্মরণ করলাম। কারণ, তিনি অত্যন্ত আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার লজ্জা আঁচ করে চলে গেলেন। বাড়ি ফিরে আমি আমার স্বামী যোবায়রের কাছে এ ঘটনা ব্যক্ত করলে তিনি বললেন ঃ আল্লাহর কসম, তুমি যে মাথায় বীচি বহন করেছ, এটা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে সওয়ার হওয়ার তুলনায় আমার জন্যে কঠিনতর।

জীবিকা উপার্জন

প্রকাশ থাকে যে, পরম প্রভু ও কারণাদির স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা পরকালকে প্রতিদান ও শাস্তির কেন্দ্র সাব্যস্ত করেছেন এবং ইহকালকে করেছেন মেহনত ও উদ্যম সহকারে কর্মতৎপর হয়ে উপার্জন করার স্থান। কেবল পরকালীন চিন্তায় ব্যস্ত থাকার মধ্যেই ইহলৌকিক তৎপরতা সীমিত নয়; বরং জীবিকার চিন্তাও পরকালীন চিন্তার উপায় ও সহায়ক। সেমতে اَلدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الْاٰخِرَةِ (দুনিয়া আখেরাতের শস্যক্ষেত্র) কথাটি প্রবাদ বাক্যের মতই প্রসিদ্ধ। ইহকাল থেকেই ক্রমান্বয়ে পরকালের পর্যায় আসে। আজকাল দুনিয়ার মানুষ এ ক্ষেত্রে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত– এক শ্রেণীর মানুষ জীবিকার মধ্যে এমনই বিভোর যে, পরকালের কথা ভুলেও চিন্তা করে না। এরা বিধ্বস্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্তদের দল। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক পরকালের কর্মব্যস্ততায় জীবিকা থেকে উদাসীন। এরা উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছতে সক্ষম হবে। তৃতীয় শ্রেণীর লোক সমতার খুব নিকটবর্তী; অর্থাৎ, জীবিকার কাজকর্ম পরকালের জন্যেই করে। এরা মধ্যপন্থী ও মধ্যবর্তী সম্প্রদায়। বলাবাহুল্য, যেব্যক্তি জীবিকা অন্বেষণে নিজের জন্যে সততার পথ অপরিহার্য করে নেয় না, সে কখনও মধ্যবর্তিতার স্তর লাভ করতে সক্ষম হবে না এবং যে পর্যন্ত জীবিকা অন্বেষণে শরীয়তের আদবসমূহের অনুসারী হবে না, তার জন্যে দুনিয়া কখনও আখেরাতের ওসিলা হবে না। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এখানে ব্যবসা-বাণিজ্য ও পেশার আদবসমূহ, উপার্জনের প্রকার ও পন্থাসমূহ পাঁচটি পরিচ্ছেদে বিস্তারিত বর্ণনা করার প্রয়াস পাচ্ছি।

প্রথম পরিচ্ছেদ

জীবিকা উপার্জনের ফযীলত

পবিত্র কোরআন ও হাদীসে জীবিকা উপার্জনের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এ সম্পর্কিত আয়াতসমূহ নিম্নরূপ ঃ

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا অর্থাৎ, এবং আমি দিনকে করেছি

জীবিকা আহরণের সময়। অনুগ্রহ প্রকাশ প্রসঙ্গে কথাটি বলা হয়েছে।

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ অর্থাৎ, এতে নিহিত রেখেছেন তোমাদের জীবিকা কিন্তু তোমরা কমই শোকর কর।

এ আয়াতে জীবিকাকে নেয়ামত বলা হয়েছে এবং এর জন্যে শোকর তলব করা হয়েছে।

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কৃপা (জীবিকা) অন্বেষণ করবে- এতে তোমাদের কোন গোনাহ নেই।

وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ অর্থাৎ, তোমার সাথে রয়েছে এমন লোক যারা যমীনে ভ্রমণ করে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণ করে।

فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ অর্থাৎ, অতঃপর ছড়িয়ে পড় পৃথিবীতে এবং অন্বেষণ কর আল্লাহর অনুগ্রহ।

এ সম্পর্কিত হাদীসসমূহ এই-

من الذنوب لايكفرها الا الهم فى المعيشة অর্থাৎ, কিছু গোনাহ আছে, যাকে জীবিকা উপার্জনের চিন্তাই দূর করতে পারে।

التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع الصديقين والشهداء অর্থাৎ, সত্যপরায়ণ ব্যবসায়ীকে কেয়ামতের দিন সিদ্দীক ও শহীদগণের সাথে একত্রিত করা হবে।

من طلب الدنيا حلا لا تعففا عن المسئلة وسعيا على عياله وتعطفا على جاره لقى الله ووجهه كالقمر ليلة البدر ـ

অর্থাৎ, যেব্যক্তি হালাল উপায়ে দুনিয়া অর্জন করে হাত পাতা থেকে বাঁচার জন্যে, সন্তান-সন্ততির সুখের চেষ্টা করার জন্যে এবং প্রতিবেশীর

প্রতি দয়া করার জন্যে, সে পূর্ণিমার রাতের আলোকোদ্ভাসিত চাঁদের ন্যায় মুখমন্ডল নিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ করবে।

একদিন রসূলে আকরাম (সাঃ) সাহাবীগণের সাথে বসে ছিলেন, এমন সময় জনৈক যুবক, সুঠাম কর্মতৎপর সাহাবীকে ভোরবেলায় কাজকর্মে মশগুল দেখে সকলেই বলল ঃ হায়, তার যৌবন ও কর্মতৎপরতা যদি আল্লাহর পথে ব্যয়িত হত! রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এরূপ বলো না। কেননা, সে যদি নিজেকে হাত পাতা থেকে বাঁচানোর জন্যে কাজকর্ম করে, তবে সে আল্লাহর পথেই রয়েছে। আর যদি সে নিজের বৃদ্ধ পিতা মাতা ও দুর্বল শিশুদের খাতিরে কাজকর্ম করে, যাতে অভাবগ্রস্ত না হয়, তবুও সে আল্লাহর পথেই ব্যস্ত রয়েছে। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি মানুষের প্রতি অমুখাপেক্ষী হওয়ার জন্যে কোন কাজকর্ম করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে অবশ্যই পছন্দ করেন। আর যেব্যক্তি মানুষের কাছ থেকে খেদমত নেয়ার উদ্দেশে এলেম শিক্ষা করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে অপছন্দ করেন। এক হাদীসে আছে- আল্লাহ তা'আলা পেশাজীবী ঈমানদারকে ভালবাসেন। এক হাদীসে বলা হয়েছে-

احل ما اكل الرجل من كسبه (মানুষ যা খায়, তার মধ্যে সর্বাধিক হালাল হচ্ছে তার উপার্জন)। আরও বলা হয়েছে-তোমরা ব্যবসাবাণিজ্য কর। কেননা, এতেই রয়েছে রিযিকের দশটি অংশের মধ্যে নয়টি। বর্ণিত আছে, হযরত ঈসা (আঃ) এক ব্যক্তিকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি কাজ কর? সে বলল ঃ আল্লাহ্ তা'আলার এবাদত করি। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন ঃ তোমার ভরণ-পোষণ কে করে? সে বলল ঃ আমার এক ভাই। তিনি বললেন ঃ তোমার ভাই তোমার চেয়ে বেশী এবাদতকারী। রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ আমার জানা মতে তোমাদেরকে যেসব কাজ জান্নাতের নিকটবর্তী এবং দোযখ থেকে দূরবর্তী করে দেয়, সেগুলো সম্পাদনের আদেশ আমি তোমাদেরকে না দিয়ে ছাড়িনি। পক্ষান্তরে আমার জানা মতে, যেসব কাজ তোমাদেরকে জান্নাত থেকে দূরে সরিয়ে দোযখের নিকটবর্তী করে, সেগুলো থেকে নিষেধ করতেও আমি কসুর করিনি। জিবরাঈল (আঃ) আমার মনে একথা জাগিয়ে দিয়েছেন যে, কোন ব্যক্তি বিলম্বে হলেও তার রিযিক পুরোপুরি লাভ না করা পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না; অতএব তোমরা

আল্লাহকে ভয় কর এবং উত্তম পন্থায় রিযিক অন্বেষণ কর। এ হাদীসে উত্তম পন্থায় রিযিক অন্বেষণ করতে বলা হয়েছে। একথা বলা হয়নি যে, রিযিক অন্বেষণ করো না। হাদীসের শেষাংশে বলা হয়েছে, বিলম্বে রিযিক প্রাপ্তি যেন আল্লাহর অবাধ্য হয়ে রিযিক অন্বেষণ করার কারণ না হয়ে যায়। কেননা, আল্লাহ তা'আলার কাছে যা আছে, তা তার অবাধ্যতার মাধ্যমে পাওয়া যায় না। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে ঃ বাজার আল্লাহ তা'আলার দস্তরখান। যেব্যক্তি এখানে আসবে, সে কিছু না কিছু নেবে। আরও বলা হয়েছে ঃ খড়ির বোঝা পিঠে বহন করে জীবিকা উপার্জন করা কোন ধনী ব্যক্তির কাছে হাত পাতা অপেক্ষা উত্তম; ধনী ব্যক্তি কিছু দান করুক বা না করুক। অন্য এক হাদীসে আছে–

من فتح على نفسه بابا من السوال فتح الله عليه سبعين بابا من الفقر -

অর্থাৎ, যেব্যক্তি নিজের সামনে সওয়ালের একটি দ্বার উন্মুক্ত করে, আল্লাহ তার সামনে দারিদ্র্যের সত্তরটি দ্বার উন্মুক্ত করে দেন।

এ সম্পর্কে বুযুর্গগণের উক্তি এই ঃ লোকমান হাকীম তাঁর পুত্রকে বললেন ঃ বৎস, হালাল উপার্জন দ্বারা নিঃস্বতা দূর করবে। কেননা, যে ফকীর হয়ে যায়, তার মধ্যে তিনটি বিষয় সৃষ্টি হয়–(এক) দ্বীনদারীতে তরলতা, (দুই) জ্ঞানবুদ্ধির দুর্বলতা এবং (তিন) ভদ্রতার অবসান। এই তিনটি বিষয়ের চেয়েও মারাত্মক হল মানুষ তাকে ঘৃণা করে।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ রিযিক অন্বেষণ থেকে হাত গুটিয়ে বসে থাকা এবং আল্লাহ আমাকে রিযিক দাও বলা উচিত নয়। কেননা, তুমি জান, আসমান থেকে স্বর্ণ ও রৌপ্য বর্ষিত হয় না। যায়েদ ইবনে সালামা নিজের ক্ষেতে বৃক্ষ রোপণ করছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) তাঁকে দেখে বললেন ঃ তুমি চমৎকার কাজ করছ। মানুষের কাছ থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে যাওয়া উচিত। এতে তোমার দ্বীনদারী অধিক সংরক্ষিত থাকবে এবং এভাবেই তুমি মানুষের প্রতি অধিক কৃপা করতে পারবে। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ যখন কাউকে দেখি সে বেকার– দুনিয়ার কাজও করে না এবং দ্বীনের কাজও করে না, তখন আমার খুবই খারাপ লাগে।

হযরত ইবরাহীম নখয়ীকে কেউ প্রশ্ন করল ঃ বলুন, সাধু ব্যবসায়ী আপনার অধিক পছন্দনীয়, না সেই ব্যক্তি, যে এবাদতের জন্যে মুক্ত হয়ে আছে? তিনি বললেন ঃ আমি সাধু ব্যবসায়ীকে অধিক ভালবাসি। কেননা, সে জেহাদে লিপ্ত রয়েছে। শয়তান তাকে কখনও মাপে, কখনও ওজনে, কখনও গ্রহণে এবং কখনও প্রদানে ধোঁকা দিতে চায়। সে শয়তানের সাথে লড়াই করে। তার আনুগত্য করে না। এ ক্ষেত্রে হযরত হাসান বসরীর বিচার বিপরীত। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ আমি বাজারে যাওয়া ও পরিবারের জন্যে ক্রয়-বিক্রয় করার জায়গা ছাড়া অন্য কোন জায়গায় মৃত্যুবরণ করা আনন্দদায়ক মনে করি না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার পশুপক্ষীর আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ

تغدوا خماصا وتروح بطانا

অর্থাৎ, পাখীরা সকাল বেলায় ক্ষুধার্ত উঠে এবং সন্ধ্যায় পেট ভরে নেয়। উদ্দেশ্য, রিযিকের অন্বেষণে পাখীরাও সকাল বেলায় এদিক ওদিক বেরিয়ে যায়।

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাহাবীগণ স্থলপথে ও নদীপথে ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন এবং খেজুর বাগানের পরিচর্যা করতেন। তাঁদের অনুসরণ যথেষ্ট। আবু কালাবা (রহঃ) এক ব্যক্তিকে বললেন ঃ আমি যদি তোমাকে জীবিকা উপার্জনে নিয়োজিত দেখি, তবে তা মসজিদের কোণে বসে থাকতে দেখার চেয়ে উত্তম। আওযায়ী হযরত ইবরাহীম আদহামের সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে দেখেন, তাঁর মাথায় খড়ির বোঝা। তিনি বললেন ঃ হে আবু ইসহাক, এত পরিশ্রম করেন কেন? আপনার খেদমতের জন্যে তো আপনার ভাই-ই যথেষ্ট। হযরত ইবরাহীম আদহাম জওয়াব দিলেন ঃ হে আবু আমর, আমার সাথে এ ব্যাপারে কথা বলো না। আমি শুনেছি, যেব্যক্তি হালাল অন্বেষণে কোন অপমানের জায়গায় দাঁড়ায়, তার জন্যে জান্নাত নির্ধারিত হয়ে যায়। আবু সোলায়মান দারানী (রহঃ) বলেন ঃ তুমি হাত, পা গুটিয়ে রাখবে এবং অন্য ব্যক্তি তোমাকে খাওয়াবে, আমাদের মতে এর নাম এবাদত নয়; বরং প্রথমে দু'রুটির চিন্তা কর, এর পর এবাদত কর। মোট কথা, এ পর্যন্ত শরীয়তমতে হাত পাতার নিন্দা এবং অপরের খেদমতের উপর ভরসা করার অনিষ্ট বর্ণিত হল।

যেব্যক্তির কাছে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ধন-সম্পদ নেই, উপার্জন করা ও ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়া তার কোন গতি নেই। এখন কিছু বিপরীত উক্তি শুনা দরকার। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ আমার প্রতি আল্লাহ তা'আলা এই আদেশ করেননি যে, আমি ধন দৌলত সঞ্চয় করি এবং একজন ব্যবসায়ী হয়ে যাই; বরং আমার প্রতি এই প্রত্যাদেশ হয়েছে–

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السَّاجِدِيْنَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ ـ

অর্থাৎ, আপনি আপনার পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করুন, সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান এবং মৃত্যুর আগমন পর্যন্ত নিজ পালনকর্তার এবাদত করুন।

অনুরূপভাবে হযরত সালমান ফারেসীকে কেউ বলল ঃ আপনি আমাকে অন্তিম উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ হজ্জ অথবা পালনকর্তার মসজিদ নির্মাণ করা অবস্থায় তোমাদের কারও মৃত্যু হোক বা না হোক, ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা মানুষের কাছ থেকে দলীলের টাকা নেয়া অবস্থায় যাতে কারও মৃত্যু না হয়, সেজন্যে তওবা করা দরকার।

এই বৈপরীত্যের জওয়াব, এসব হাদীসের সমন্বয় সাধন অবস্থার বিস্তারিত আলোচনার উপর নির্ভরশীল। আমরা একথা বলি না যে, ব্যবসা-বাণিজ্য সবকিছু থেকে সর্বাবস্থায় উত্তম; বরং আমাদের উদ্দেশ্য প্রয়োজনাতিরিক্ত ধন-সম্পদের ভান্ডার গড়ে তোলার লক্ষ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য করা মন্দ। কেননা, এতে দুনিয়ার দিকে সর্বতোভাবে মনোনিবেশ করতে হয়, যার মোহ যাবতীয় গোনাহের মূল। এর সাথে যদি মানুষের কাছ থেকে করও আদায় করা হয়, তবে তা জুলুম ও পাপাচারের অন্তর্ভুক্ত। হযরত সালমান ফারেসীর উক্তিতে এ ধরনের বাণিজ্যই উদ্দেশ্য, কিন্তু নিজের ও সন্তান-সন্ততির ভরণ-পোষণে যথেষ্ট হয়– এই পরিমাণ ধন দৌলত পাওয়ার লক্ষ্যে ব্যবসা করলে তা হাত পাতা অপেক্ষা উত্তম। চার ব্যক্তির জন্যে কোন পেশা না করা উত্তম। প্রথম, যেব্যক্তি শারীরিক এবাদতে আবেদ। দ্বিতীয়, যেব্যক্তি আধ্যাত্মিক জ্ঞানে এবং এলমে হাল ও এলমে কাশফে অন্তরের আমল অর্জন করেছে। তৃতীয়, যে বাহ্যিক

আলেম মানুষের দ্বীনদারীতে সহায়ক কাজকর্মে মশগুল; যেমন মুফতী, মুফাসসির ও মোহাদ্দেস। চতুর্থ, যেব্যক্তি মানুষের জাগতিক কল্যাণ সাধনে ব্যাপৃত এবং তাদের প্রয়োজনীয় বিষয়াদির দায়িত্বে নিয়োজিত; যেমন শাসনকর্তা, বিচারপতি প্রমুখ। এই চার প্রকার লোকের জন্যে উপার্জনে মশগুল হওয়ার তুলনায় নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে যাওয়া উত্তম। তারা বায়তুল মাল থেকে নয়; বরং আলেম ও ফকীহদের জন্যে ওয়াকফকৃত তহবিল থেকে নিজেদের ভরণ-পোষণ নেবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মধ্যে উপরোক্ত চারটি গুণ আরও অনেক বর্ণনাতীত গুণসহ বিদ্যমান ছিল। তাই তাঁকে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করার এবং সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আদেশ করা হয়েছে– ব্যবসায়ীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আদেশ করা হয়নি। এ কারণেই হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) যখন খেলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন, তখন সহচরগণ তাঁকে ব্যবসা ছেড়ে দেয়ার পরামর্শ দিলেন। কেননা, ব্যবসা করলে মুসলমানদের কাজ করার মত অবসর পাওয়া যেত না। তাই তিনি বায়তুল মাল থেকে প্রয়োজন পরিমাণে অর্থ নিতেন। পরে ওফাত নিকটবর্তী হলে তিনি ওসিয়ত করেন, যে পরিমাণ অর্থ তিনি নিয়েছেন সেই পরিমাণ অর্থ যেন বায়তুল মালে ফেরত দেয়া হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজনীয় শর্তাবলী

এই পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তুগুলো জানা যে কোন উপার্জনশীল মুসলমানের জন্য ওয়াজিব। কেননা, হাদীসে যে বলা হয়েছে– জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয, এর উদ্দেশ্যও সেই জ্ঞান, যার প্রয়োজন পড়ে। তাই যেব্যক্তি এ পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তু জ্ঞাত হবে, সে যেসব বিষয় ব্যবসা-বাণিজ্য ফাসেদ করে দেয়, সেগুলো জানতে পারবে এবং আদান-প্রদানে সেসব বিষয় থেকে বেঁচে থাকতে পারবে। যদি কোন খুঁটিনাটি দুরূহ বিষয় সামনে আসে, তবে জিজ্ঞেস করে না জানা পর্যন্ত সেই বিষয় থেকে বিরত থাকতে পারবে। কেননা, ফাসেদকারী কারণসমূহ সংক্ষেপে না জানলে সে কিরূপে বুঝবে যে, বিরত থাকা ও জিজ্ঞেস করা কখন ওয়াজিব? যদি কোন আদান-প্রদানকারী বলে যে, সে প্রথমে জ্ঞান অর্জন করবে না; বরং আপন কাজ করে যাবে এবং যখন কোন দুরূহ ব্যাপার সামনে আসবে, তখনই তার মাসআলা জিজ্ঞেস করে নেবে, তবে এ ব্যক্তিকে জওয়াব দেয়া হবে যে, যখন তুমি ফাসেদকারী বিষয়সমূহ সংক্ষেপে জানবে না, তখন কিরূপে বুঝবে, এ বিষয়টি জিজ্ঞাসা করার যোগ্য? তুমি তো শুদ্ধ ও বৈধ মনে করেই আদান-প্রদান করে যাবে। অথচ প্রকৃতপক্ষে তাও হবে অবৈধ। এ কারণেই হযরত ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বাজারে ঘুরাফেরা করতেন এবং কোন কোন ব্যবসায়ীকে চাবুক মেরে বলতেন ঃ আমাদের বাজারসমূহে তারাই ক্রয়-বিক্রয় করবে, যারা মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হবে। অন্যথায় জ্ঞাত অথবা অজ্ঞাতসারে সুদ খেয়ে বসবে। নিম্নে বিভিন্ন ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ আমরা আলাদাভাবে তুলে ধরেছি।

হালাল ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রথম রোকন–ক্রেতা-বিক্রেতা ঃ এক্ষেত্রে ব্যবসায়ীর উচিত চার ব্যক্তির সাথে ক্রয়বিক্রয় না করা। প্রথম বালক, দ্বিতীয় উন্মাদ, তৃতীয় গোলাম এবং চতুর্থ অন্ধ। কেননা, বালক ও উন্মাদ শরীয়তে মুকাল্লাফ নয়। অর্থাৎ, তারা শরীয়তের বিধিনিষেধ থেকে মুক্ত। বালককে যদি তার ওলী ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দেয়, তবুও তার

ক্রয়-বিক্রয় ইমাম শাফেয়ীর মতে জায়েয নয়। বালক ও উন্মাদের হাতে কেউ নিজের কোন বস্তু দিলে তা যদি বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে তা দাতারই বিনষ্ট হবে। বালক ও উন্মাদ তার ক্ষতিপূরণ দেবে না। অন্ধ অদৃশ্য বস্তুর ক্রয়বিক্রয় করবে, তাই তার সাথে ক্রয়বিক্রয় জায়েয নয়। অন্ধ যদি কাউকে উকিল নিযুক্ত করে, তবে উকিলের সাথে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে। কাফেরের সাথে ক্রয়বিক্রয় জায়েয; কিন্তু তার কাছে কোরআন শরীফ বিক্রয় করা উচিত নয়। যুদ্ধাবস্থায় কাফেরের কাছে অস্ত্র বিক্রয় করা নিষিদ্ধ। বিক্রয় করলে তা অগ্রাহ্য হবে এবং বিক্রেতা আল্লাহর কাছে গোনাহগার হবে।

দ্বিতীয় রোকন- পণ্যবস্তু ঃ অর্থাৎ, সেই বস্তু, যা একজনের হাত থেকে অন্যজনের হাতে যায়, তা পণ্যবস্তু হোক অথবা তার মূল্য। এতে ছয়টি শর্ত নির্ধারিত রয়েছে। প্রথম শর্ত, পণ্যদ্রব্য সত্তার দিক দিয়ে নাপাক হতে পারবে না । নাপাক বস্তুর ক্রয়বিক্রয় জায়েয নয়। উদাহরণতঃ কুকুর, শূকর, গোবর, পায়খানা, হাতীর দাঁত ও তা দ্বারা নির্মিত পাত্র ক্রয়বিক্রয় করা জায়েয নয়। কারণ মৃত্যুর কারণে হাড় নাপাক হয়ে যায়। হাতীকে জবাই করলেও পাক হয় না। এছাড়া মদ ক্রয়বিক্রয় করা এবং যেসব জন্তু খাওয়া জায়েয নয়, সেগুলোর চর্বি ক্রয়বিক্রয় করাও জায়েয নয়, যদিও এর দ্বারা বাতি জ্বালানো ও নৌকায় মালিশ করার উপকার পাওয়া যায়। পাক তেল নাপাকী পড়ার কারণে নাপাক হয়ে গেলে তা ক্রয়বিক্রয় করা জায়েয। কেননা, খাওয়া ছাড়া এটা অন্য উপকারে আসতে পারে এবং সত্তাগতভাবে নাপাক নয়- বরং বাইরের নাপাকী দ্বারা নাপাক হয়েছে। অনুরূপভাবে রেশম পোকার ডিম ক্রয়বিক্রয় করার মধ্যে আমার মতে কোন দোষ নেই। কারণ, এটা প্রাণীর মূল, যা উপকারী। মৃগনাভি ক্রয়বিক্রয় করা জায়েয। হরিণের জীবদ্দশায় এটা নাভি থেকে আহরণ করা হলে এটাকে পাক বলাই উচিত।

দ্বিতীয় শর্ত, পণ্যদ্রব্য উপকারী হতে হবে। এ থেকে বুঝা যায়, কীটপতঙ্গ, ইঁদুর ও সর্পের ক্রয়বিক্রয় অবৈধ। সাপ দ্বারা সাপুড়েদের যে উপকার হয়, তা ধর্তব্য নয়। বিড়াল, মৌমাছি, চিতা বাঘ, সিংহ এবং শিকারী জন্তু অথবা যেগুলোর চামড়া কাজে লাগে, সেগুলোর ক্রয়বিক্রয়

জায়েয। বোঝা বহনের উদ্দেশে হাতীর ক্রয়বিক্রয়ও জায়েয। তোতা পাখী, ময়ূর ও সুশ্রী বর্ণযুক্ত জন্তুর ক্রয় বিক্রয় জায়েয। এগুলো খাওয়ার কাজে না এলেও এগুলোর সুমধুর কণ্ঠস্বর দ্বারা চিত্তবিনোদন একটি বৈধ উদ্দেশ্য। কুকুর দেখতে সুশ্রী হলেও তা ক্রয়বিক্রয় উচিত নয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) কুকুর ক্রয়বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। বাঁশী, সারঙ্গী, বীণা ও তারের বাদ্যযন্ত্র ক্রয়বিক্রয় জায়েয নয়। কেননা, এতে শরীয়তসম্মত কোন উপকারিতা নেই। এমনিভাবে মেলায় যে সমস্ত মাটির খেলনা ও পুতুল বিক্রয় হয়, সেগুলো ক্রয় করা বৈধ নয়; বরং শরীয়ত অনুযায়ী এগুলো ভেঙ্গে ফেলা ওয়াজিব। জন্তু-জানোয়ারের ছবি অংকিত কাপড় বিক্রয় করা জায়েয; কিন্তু এগুলো পেতে রাখা অবস্থায় ব্যবহার করতে হবে- ঝুলানো অবস্থায় নয়। এ ধরনের একটি পর্দার কাপড় সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আয়েশাকে বলেছিলেন ঃ এটা বিছানা বানিয়ে নাও।

তৃতীয় শর্ত, যে জিনিস বিক্রয় হবে, তা বিক্রেতার মালিকাধীন থাকতে হবে অথবা মালিকের অনুমতিক্রমে বিক্রয় হতে হবে। সুতরাং মালিক নয়- এমন ব্যক্তির কাছ থেকে মালিকের অনুমতি আশা করে কোন জিনিস কিনলে তা বৈধ হবে না। পরে যদি মালিক সম্মতও হয়ে যায়, তবুও নতুনভাবে ক্রয় করা ওয়াজিব। অনুরূপভাবে পরে জানতে পারলে সম্মত হয়ে যাবে- এই আশায় স্ত্রীর কাছ থেকে স্বামীর জিনিস ক্রয় করা অথবা স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রীর জিনিস ক্রয় করা অথবা পিতার কাছ থেকে পুত্রের জিনিস ক্রয় করা ইত্যাদি শুদ্ধ হবে না। কেননা, মালিকের সম্মতি ক্রয়ের পূর্বে থাকতে হবে। বাজারসমূহে এ ধরনের কেনাবেচা হয়। দ্বীনদারদের উচিত এ ধরনের কেনাবেচা থেকে বেঁচে থাকা।

চতুর্থ শর্ত, বিক্রয়ের জিনিসটি যেন এমন হয় যে, তা শরীয়তসম্মতভাবে ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপে সমর্পণ করা যায়। এরূপ না হলে তার ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে না। যেমন- পলাতক গোলাম, পানির ভিতরকার মাছ, গর্ভস্থ বাচ্চা এবং জন্তুর পিঠের লোম বিক্রয় করা। অনুরূপভাবে স্তনের ভিতরকার দুগ্ধ বিক্রয় করা জায়েয নয়। কেননা, এগুলো ক্রেতাকে সমর্পণ করা কঠিন। এমনিভাবে বাচ্চা ছোট হলে তাকে রেখে তার মাকে বিক্রয় করা শুদ্ধ নয়, যেমন মাকে রেখে এরূপ বাচ্চা

বিক্রয় করাও দুরস্ত নয়। কেননা, এখানে বিক্রীত বস্তু ক্রেতার কাছে সমর্পণ করলে বাচ্চা তার মা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। বাচ্চাকে তার মা থেকে বিচ্ছিন্ন করা হারাম।

পঞ্চম শর্ত, বিক্রয়ের জিনিস নির্দিষ্ট থাকতে হবে এবং পরিমাণ ও গুণ জানা থাকতে হবে। এ থেকে জানা গেল, যদি বিক্রেতা বলে, এই ছাগল অথবা সম্মুখের এই থানগুলো থেকে যে কোন একটি থান অথবা থানের যেদিক থেকে ইচ্ছা এক গজ কাপড় অথবা এই যমীন থেকে যেদিক ইচ্ছা দশ গজ যমীন বিক্রয় করলাম, তবে এই বিক্রয় বাতিল গণ্য হবে। ধর্মীয় ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শনকারীরা এ ধরনের ক্রয়বিক্রয়ে অভ্যস্ত হয়ে থাকে। পরিমাণ জানার ব্যাপারে চোখে দেখে অনুমান করা যথেষ্ট। আর জিনিস দেখে তার গুণ জানা যায়। সুতরাং অনুপস্থিত জিনিস বিক্রি করা জায়েয হবে না। হাঁ, যদি পূর্বে দেখে থাকে এবং দেখার পর এতদিন অতিবাহিত হয়েছে যাতে সাধারণতঃ পরিবর্তন হয় না, তবে বিক্রয় জায়েয হবে।

ষষ্ঠ শর্ত, বিনিময়ের দিক দিয়ে বিক্রেতা যে জিনিসের মালিক, বিক্রয়ের পূর্বে তা তার দখলে এসে যাওয়া উচিত। বিক্রেতার দখলে আসেনি, এমন জিনিস বিক্রয় করতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিষেধ করেছেন। এ ক্ষেত্রে স্থাবর অস্থাবর সকল বস্তু সমান। অস্থাবর জিনিসের দখল তুলে নেয়ার মাধ্যমে হয় এবং যমীন তথা স্থাবর জিনিসের দখল অন্যের কোন কিছু তাতে না থাকা এবং অন্যের ক্ষমতা বিলুপ্ত হওয়ার মাধ্যমে হয়।

হালাল ব্যবসা-বাণিজ্যের তৃতীয় রোকন- প্রস্তাব গ্রহণ ঃ এ ক্ষেত্রে প্রস্তাব ও তার সাথে সাথেই উদ্দেশ্যজ্ঞাপক ভাষায় তা গ্রহণ হওয়া জরুরী। এ প্রস্তাব ও গ্রহণ পরিষ্কার ভাষায় হতে হবে; যেমন বিক্রেতা বলবে– আমি এ বস্তু তোমার কাছে এত টাকায় বিক্রয় করলাম। ক্রেতা বলবে– আমি গ্রহণ করলাম। অথবা ইঙ্গিতে বলবে– যেমন বিক্রেতা বলবে, আমি তোমাকে এই জিনিস এত টাকার বদলে দিলাম এবং ক্রেতা বলবে, আমি গ্রহণ করলাম। একথা বলে উভয়ের উদ্দেশ্য ক্রয়বিক্রয়ই হবে; কিন্তু কোন মহিলার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলে বাগদানের সম্ভাবনাও হতে পারে। নিয়ত করলে সম্ভাবনা দূর হয়ে যায়। আর পরিষ্কার ভাষায় বললে কোন বিবাদই থাকে না।

কেনাবেচায় চুক্তির চাহিদার খেলাফ কোন শর্ত সংযোজন করা বৈধ নয়। উদাহরণতঃ কিছু বেশী দেয়ার শর্তে অথবা পণ্যদ্রব্য বাড়ী পৌছে দেয়ার শর্তে কেনাবেচার চুক্তি করলে তা জায়েয হবে না। হাঁ, পণ্যদ্রব্য বাড়ী পৌছানোর মজুরি পৃথকভাবে নির্ধারণ করে দিলে তা জায়েয হবে। যদি বিক্রেতা ও ক্রেতা প্রস্তাব এবং গ্রহণের বাক্য মুখে উচ্চারণ না করে কেবল আদান-প্রদান করে নেয়, তবে এ ধরনের কেনাবেচা ইমাম শাফেয়ীর মতে সিদ্ধ নয়। ইমাম আবু হানীফার মতে মামুলী পণ্যসামগ্রীর বেলায় তা জায়েয। কেননা, এরূপ কেনাবেচা সাহাবায়ে কেরামের অভ্যাসের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইবনে শুরায়হ এ বিষয়ে ইমাম আবু হানীফার উক্তি অনুযায়ী ফতোয়া দিয়েছেন। বাস্তবে এ উক্তিই সমতার অধিকতর নিকটবর্তী। কারণ, এর প্রয়োজন আছে এবং মানুষের মধ্যে এর প্রচলন বেশী। এতদসত্ত্বেও প্রস্তাব ও গ্রহণ বর্জন না করাই খোদাভীরু দ্বীনদারদের উচিত।

সুদের লেনদেন ঃ আল্লাহ তা'আলা সুদ হারাম করেছেন এবং এ ব্যাপারে কঠোর নীতি ব্যক্ত করেছেন। অতএব যারা সোনারূপার লেনদেন করে, অথবা খাদ্য শস্যের ব্যবসা করে, তাদের উপর সুদ থেকে বেঁচে থাকা ওয়াজিব। কারণ সুদ দু'জিনিসেই হয়– সোনারূপা এবং খাদ্য শস্যে। সোনারূপার ব্যবসায়ীদেরকে বাকী দেয়া ও কমবেশী দেয়া থেকে বেঁচে থাকতে হবে। বাকী দেয়া থেকে বেঁচে থাকার অর্থ, সোনারূপার যে বস্তু সোনারূপার অন্য যে বস্তুর বিনিময়ে বিক্রয় করবে, তা হাতে হাতে হওয়া দরকার; অর্থাৎ বিক্রেতা মূল্য এবং ক্রেতা পণ্য সামগ্রী একই মজলিসে হস্তগত করবে। বিক্রেতা নিজের প্রাপ্য আজ নেবে এবং ক্রেতাকে তার প্রাপ্য কাল অথবা কিছুক্ষণ পরে সমর্পণ করবে– এটা যেন না হয়। সুতরাং পোদ্দার যদি সোনা অথবা রূপা টাকশালে আজ জমা দেয় এবং তার বিনিময়ে আশরফী অথবা টাকা আগামীকাল গ্রহণ করে, তবে এই ক্রয়বিক্রয় হারাম হয়ে যাবে। এটা হারাম এ কারণেও যে, এতে পণ্য ও তার মূল্য সমান সমান হয় না। কেননা, টাকশালে সোনারূপার ওজন মুদ্রার ছাপ লাগার পর তা থাকে না, যা পূর্বে ছিল। কম বেশী থেকে বেঁচে থাকার অর্থ হচ্ছে, তিনটি বিষয় থেকে বিরত থাকবে– প্রথম, মুদ্রার খন্ড অংশ পূর্ণ মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করবে না। উভয়টি এক রকম না হওয়া পর্যন্ত বিক্রি জায়েয হবে না। দ্বিতীয়,

খাঁটিকে কৃত্রিমের বদলে বিক্রয় করবে না যদি উভয়ের ওজনে পার্থক্য হয়। যে মুদ্রার ওজন কম, কিন্তু মাল খাঁটি, সেটিকে এমন মুদ্রার সাথে বদলাবে, যার মাল কৃত্রিম, কিন্তু ওজন বেশী। এ উভয় লেনদেন তখন নাজায়েয, যখন রূপা রূপার বিনিময়ে এবং সোনা সোনার বিনিময়ে বিক্রয় করা হয়। অপরপক্ষে সোনার বিনিময়ে রূপা কিংবা রূপার বিনিময়ে সোনা বিক্রয় করা হলে কমবেশী হওয়া জায়েয। সোনা ও রূপার সংমিশ্রণে গঠিত আশরফীর মধ্যে সোনার পরিমাণ অজানা থাকলে তার লেনদেন জায়েয হবে না। হাঁ, এরূপ মুদ্রা শহরে প্রচলিত থাকলে আমরা তার লেনদেন জায়েয বলব, যদি প্রচলিত মুদ্রার বিনিময়ে লেনদেন না হয়। তাম্র মিশ্রিত টাকার অবস্থাও তদ্রূপ। কেননা, এগুলোর উদ্দেশ্য রূপা, যার পরিমাণ জানা নেই। শহরে প্রচলিত থাকলে এগুলোর লেনদেনও জায়েয। কেননা, তখন উদ্দেশ্য রূপা নয়। তবে রূপার বিনিময়ে এগুলোর লেনদেন না হওয়া উচিত। স্বর্ণ ও রৌপ্যের সংমিশ্রণে গঠিত অলংকার স্বর্ণের বা রৌপ্যের বিনিময়ে ক্রয় করা বৈধ নয়। এগুলো স্বর্ণের পরিমাণ জানা থাকলে আসবাবপত্রের বিনিময়ে ক্রয় করা উচিত। যদি অলংকারের উপর স্বর্ণের গিল্টি এমনভাবে করা হয় যে, আগুনে রেখে সম্পূর্ণ পৃথক করা যায় না, তবে এরূপ অলংকার রূপার বিনিময়ে অথবা সোনা রূপার কোন বস্তুর বিনিময়ে বিক্রয় করা জায়েয। এখন খাদ্যদ্রব্য ব্যবসায়ীদের স্মরণ রাখা উচিত, এক জাতীয় খাদ্যদ্রব্য যদি বিক্রয়ের সামগ্রীও হয় এবং মূল্যও হয় অথবা শুধু বিক্রয়ের সামগ্রী হয় কিংবা শুধু মূল্য হয়, তবে একই মজলিসে পারস্পরিক হস্তান্তর হতে হবে। উদাহরণতঃ গমের বিনিময়ে গম বিক্রয় করলে এক হাতে দেবে এবং অন্য হাতে নেবে। বিক্রয়ের সামগ্রী এবং মূল্য এক জাতীয় হলে অর্থাৎ গমের বদলে গম বিক্রয় করলে উভয়টি সমান হওয়াও জরুরী। এ ক্ষেত্রে অনেক নাজায়েয লেনদেন মানুষের মধ্যে প্রচলিত হয়েছে। উদাহরণতঃ মানুষ কসাইকে জীবিত ছাগল দেয় এবং এর বিনিময়ে গোশত নগদ অথবা বাকী নেয়। এটাও হারাম। অথবা কলুকে নারকেল, তিল, জাফরান, সরিষা ইত্যাদি দিয়ে এগুলোর বিনিময়ে নগদ অথবা বাকী তেল নেয়। এগুলো সবই হারাম। যে জিনিস দ্বারা কোন খাদ্য-বস্তু তৈরী হয়, সেই জিনিসের বিনিময়ে সেই খাদ্যবস্তু ক্রয়-বিক্রয় করা নাজায়েয— ওজনে সমান হোক কিংবা কম বেশী হোক। উদাহরণতঃ গমের বিনিময়ে রুটি ও ছাতু ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে না।

খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে বিক্রয়ের বস্তু ও মূল্য সমান সমান হলে তখন সুদ হবে না, যখন সেই খাদ্যদ্রব্য সঞ্চয়যোগ্য হয়, অর্থাৎ কাঁচামাল না হয়। আর যদি সঞ্চয়যোগ্য না হয় অর্থাৎ এক অবস্থায় না থাকে, তবে সমান সমান বিক্রয় করলেও সুদ হবে। এ কারণেই কাঁচা খোরমার বিক্রয় কাঁচা খোরমার বিনিময়ে এবং আঙ্গুরের বিক্রয় আঙ্গুরের বিনিময়ে জায়েয নয়– সমান সমান হোক কিংবা কমবেশী। (সুদ সম্পর্কিত উপরোক্ত বক্তব্য শাফেয়ী মাযহাবের ভিত্তিতে রাখা হয়েছে। হানাফী মাযহাবের বক্তব্য কিছুটা ভিন্ন ধরনের, যা হানাফী মযহাবের কিতাবসমূহে দেখা যেতে পারে।) ব্যবসায়ীদেরকে ক্রয়-বিক্রয়ের সংজ্ঞা ও অনিষ্টের স্থান সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করার ব্যাপারে উল্লেখিত কয়েকটি বিষয়ে সন্দেহ হলে অথবা কোন বিষয় বোধগম্য না হলে তাদের জিজ্ঞেস করে নেয়া উচিত। যদি এতটুকু বিষয়ও জানা না থাকে, তবে কোথায় জিজ্ঞেস করত হবে, সে সম্পর্কেও তারা অজ্ঞ থাকবে এবং অজ্ঞাতে সুদ ও হারাম লেনদেনে লিপ্ত হয়ে পড়বে।

বায়ে-সলম বা অগ্রিম ক্রয়বিক্রয়ের দশটি শর্ত ঃ (১) অগ্রিম দেয় পুঁজি নির্দিষ্ট ও জানা থাকা, যাতে অপর পক্ষ বিনিময়ে বস্তু দিতে সক্ষম না হলে পুঁজিওয়ালা তার পুঁজি ফেরত নিতে পারে। সুতরাং পুঁজিওয়ালা যদি এক থলে ভর্তি টাকা অনুমান করে এই বলে দিয়ে দেয় যে, এর বিনিময়ে এই পরিমাণ গম নেবে, তবে এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী এই বিনিময় জায়েয হবে না। (২) চুক্তির মজলিস থেকে পৃথক হওয়ার পূর্বে মজলিসের মধ্যেই পুঁজি সমর্পণ করতে হবে। অপরপক্ষ পুঁজি হস্তগত নাকরে মজলিস থেকে আলাদা হয়ে গেলে বিনিময় জায়েয হবে না। (৩) যে বস্তু অগ্রিম ক্রয় করা হয়, তা এমন হতে হবে, যার গুণ বর্ণনা করা যায়; যেমন খাদ্য শস্য, জন্তু-জানোয়ার, খনিজ দ্রব্য, তুলা, পশম, দুধ, মাংস ইত্যাদি। (৪) যেসব বস্তু গুণগত মান বর্ণনা করা যায়, সেগুলোর গুণগত মান বর্ণনা করতে হবে, এমন কি কোন গুণ যেন অবশিষ্ট থেকে না যায়, যার কারণে বস্তুর মূল্য অসহনীয় পর্যায়ে নেমে যায়। কেননা, এরূপ গুণগত মান বর্ণনা করা ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দেখে নেয়ার স্থলবর্তী হয়ে থাকে। (৫) মেয়াদের উপর অগ্রিম ক্রয় করা হলে মেয়াদ সুনির্দিষ্ট হতে হবে। এরূপ বলা চলবে না যে, ফসল কাটা পর্যন্ত অথবা ফল পাকা পর্যন্ত অগ্রিম ক্রয় করছি; বরং মাস ও দিনের হিসাবে মেয়াদ নির্দিষ্ট

করতে হবে। কারণ, ফসল কাটা এবং ফল পাকা আগে পিছে হতে পারে। (৬) ক্রীত বস্তু এমন হতে হবে, যা মানুষ প্রতিশ্রুত সময়ে দিতে পারে এবং বিলুপ্ত না হওয়ার প্রবল ধারণা থাকে। যদি কোন স্বাভাবিক আপদের কারণে জিনিসটি বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং প্রতিশ্রুত মেয়াদে সমর্পণ করা সম্ভব না হয়, তবে পুঁজিদাতা ইচ্ছা করলে প্রয়োজনীয় সময় দেবে এবং ইচ্ছা করলে লেনদেন বাতিল করে নিজের পুঁজি প্রত্যাহার করে নেবে। (৭) যদি সমর্পণ করার স্থান পরিবর্তিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে জিনিষটি সমর্পণ করার স্থান চুক্তিতে উল্লেখ করতে হবে, যাতে পরবর্তীতে কলহ সৃষ্টি না হয়। (৮) ক্রীত বস্তুকে অন্য কোন নির্দিষ্ট বস্তুর সাথে সম্পর্কযুক্ত করা যাবে না। উদাহরণতঃ এরূপ বলা যাবে না যে, এই ক্ষেতের গম অথবা এই বাগানের ফল নেব। কেননা, এরূপ শর্তের কারণে ক্রীত বস্তু যে ঋণ, তা বাতিল হয়ে যায়। তবে যদি অমুক শহরের ফল বলা হয়, তবে কোন ক্ষতি নেই এবং সেই শহরের ফলই দিতে হবে। (৯) ক্রীত বস্তু দুর্লভ না হওয়া চাই। উদাহরণতঃ মোতির এমন গুণ উল্লেখ করা, যা খুবই বিরল। (১০) মূল্য বা পুঁজি খাদ্য জাতীয় বস্তু হলে ক্রীত বস্তুটি খাদ্য জাতীয় না হওয়া উচিত। অনুরূপভাবে পুঁজি সোনা-রূপা হলে ক্রয়ের জিনিস সোনা-রূপা না হওয়া উচিত। সুদের বর্ণনায় আমরা এ বিষয়টি বর্ণনা করেছি।

ইজারা বা ভাড়ায় ক্রয় ঃ এতে প্রথম বিষয় ভাড়া এবং দ্বিতীয় বিষয় ইজারাদারের মুনাফা। এখানে ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে বর্ণিত ভাষাই ধর্তব্য হবে। ইজারার মধ্যে ভাড়া ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মূল্যের অনুরূপ। তাই যেসব শর্ত আমরা মূল্যের ক্ষেত্রে লিপিবদ্ধ করে এসেছি, ভাড়ার বেলায়ও সেসব বিষয় থেকে বেঁচে থাকা দরকার। এক্ষেত্রে মানুষ যেসব বিষয়ে অভ্যস্ত, শরীয়তে সেগুলোর কোন মূল্য নেই। উদাহরণতঃ নির্মাণের বিনিময়ে গৃহ ইজারা দেয়া হয় এবং নির্মাণের পরিমাণ জানা থাকে না। যদি ভাড়ার টাকা নির্দিষ্ট করে ভাড়াটের সাথে শর্ত করা হয় যে, এই টাকা নির্মাণে নিয়োজিত করবে, তবে তা জায়েয হবে না। কেননা, নির্মাণে নিয়োজিত করার কাজটি অজানা। যদি জন্তুর চামড়া ছিলিয়ে নেয় এবং চামড়াকে মজুরি নির্দিষ্ট করে অথবা আটা পিষিয়ে তার ভূষিকে মজুরি নির্দিষ্ট করে, তবে এই ইজারা বাতিল হবে। মোট কথা, মজুরি ও ইজারাদারের কর্ম দ্বারা যা অর্জিত হয়, তাকে মজুরি ও ভাড়া সাব্যস্ত করা

বাতিল। যদি দোকান ও গৃহের ভাড়ার ক্ষেত্রে অনেক দিনের ভাড়া একত্রিত করে বলে দেয় যে, প্রতি মাসের ভাড়া এক দীনার, এর পর কত মাস তা বর্ণনা না করে, তবে মেয়াদ অজ্ঞাত থাকার কারণে ইজারা জায়েয হবে না।

ইজারার দ্বিতীয় রোকন হল, সেই মুনাফা, যা ইজারার উদ্দেশ্য এবং তা হল কেবল কর্ম। বৈধ, নির্দিষ্ট ও শ্রমসাধ্য কর্মের জন্যে ইজারা জায়েয। ইজারার কেবল শাখা-প্রশাখা এই সামগ্রিক নীতির অধীন। ফেকাহ গ্রন্থসমূহে আমরা এসব শাখা-প্রশাখা বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। এ গ্রন্থে কেবল সেসব বিষয় বর্ণনা করব, যা প্রায়ই কাজে লাগে। সুতরাং যে কর্মের জন্যে ইজারা ও ঠিকা হয়, তাতে পাঁচটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রথম, সেই কর্ম কিছু কষ্ট ও শ্রমসাধ্য হতে হবে। এ থেকে বুঝা যায়, দোকান সাজানোর জন্যে খাদ্যবস্তু ইজারা নেয়া জায়েয নয়। দ্বিতীয়, মুনাফা ছাড়া কোন উদ্দিষ্ট বস্তু যেন ইজারাদারের মালিকানায় চলে না যায়। উদাহরণতঃ ইজারাদার এ উদ্দেশে আঙ্গুর বৃক্ষ ইজারা নিল যে, তা থেকে উৎপন্ন আঙ্গুর সে নেবে অথবা দুধ পাওয়ার আশায় গাভী ইজারা নেয়া। এ ধরনের ইজারা বৈধ নয়, কিন্তু শিশুকে বুকের দুধ পান করানোর জন্যে কোন মহিলাকে মজুরির বিনিময়ে নিযুক্ত করা জায়েয। এ অবস্থায় দুধ আলাদা করা যায় না বিধায় দুধ মহিলার অনুগামী হয়ে যাবে। এটা আলাদাভাবে উদ্দিষ্টও হয় না। তৃতীয়, কর্মটি এমন হতে হবে, যা মজুর বাহ্যতঃ ও শরীয়ত অনুযায়ী মালিককে দিতে পারে। সুতরাং যদি কোন দুর্বল ব্যক্তিকে এমন কাজের জন্যে মজুর নিযুক্ত করা হয়, যা সে করতে পারে না, তবে এই ইজারা জায়েয হবে না। শরীয়ত অনুযায়ী যেসব কর্ম হারাম সেগুলোও মজুর দিতে পারে না। যেমন- ঋতুবতী মহিলাকে মসজিদে ঝাড়ু দেয়ার জন্যে নিযুক্ত করা অথবা স্বর্ণকারকে সোনারূপার পাত্র তৈরী করার জন্যে মজুরি দেয়া। এসবই বাতিল। চতুর্থ, সে কর্মটি যেন এমন না হয়, যা করা মজুরের উপর ওয়াজিব এবং এমনও না হয়, যা মালিকের পক্ষ থেকে অন্য কেউ করে দিলে চলে না। সুতরাং জেহাদ করার জন্যে মজুরি নেয়া জায়েয হবে না। অনুরূপভাবে যে এবাদত একজনের পক্ষ থেকে অন্যজন আদায় করতে পারে না, তার জন্যেও মজুরি নেয়া বৈধ নয়। কেননা, এই এবাদত মালিকের পক্ষ থেকে হবে না; বরং মজুরের পক্ষ থেকে হবে। হাঁ, অপরের পক্ষ থেকে হজ্জ করা,

মৃতকে গোসল দেয়া, কবর খনন করা, মৃতকে দাফন করা এবং জানাযা বহন করার জন্যে মজুরি নেয়া জায়েয। পঞ্চম, সে কর্ম ও মুনাফা জ্ঞাত হওয়া দরকার। উদাহরণতঃ কাপড়ের ক্ষেত্রে দর্জির কাজ বলে দিতে হবে। শিক্ষককে সূরার শিক্ষা ও তার পরিমাণ জানিয়ে দিতে হবে। জন্তুর পিঠে বোঝা বহনের ক্ষেত্রে বোঝার পরিমাণ ও পথের দূরত্ব বলে দিতে হবে। মোট কথা, যেসব বিষয় স্বভাবতঃ বিরোধের কারণ হতে পারে, সেগুলো অস্পষ্ট না রেখে প্রথমেই পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করতে হবে।

ইজারা সম্পর্কে এতটুকু বর্ণনাই আমরা যথেষ্ট মনে করছি। এতে প্রয়োজনীয় বিধানাবলী জানা হয়ে যাবে এবং কঠিন স্থান সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া যাবে, যাতে বিজ্ঞজনের কাছে জিজ্ঞেস করে নেয়া যায়। এছাড়া যাবতীয় মাসআলা যথার্থ বিস্তারিতরূপে জানা মুফতীর কাজ– জনসাধারণের নয়।

মুযারাবা বা স্বনিয়োজিত উদ্যোক্তার মাধ্যমে ব্যবসা ঃ এই লেনদেনের রোকন তিনটি। প্রথম, পুঁজি। এতে শর্ত হল, তা নগদ ও নির্দিষ্ট হবে এবং উদ্যোক্তাকে সমর্পণ করে দিতে হবে। নগদ অর্থ, পুঁজি আসবাবপত্র ও সাজ-সরঞ্জাম হলে মুযারাবা জায়েয হবে না। কারণ, এগুলো দ্বারা ব্যবসা বাণিজ্য চলে না। নির্দিষ্ট হওয়া অর্থ, এক থলে ভর্তি টাকা দিলে মুযারাবা বৈধ হবে না। কারণ, এতে মুনাফার পরিমাণ অজ্ঞাত থাকবে। উদ্যোক্তাকে সমর্পণ করার ফায়দা হল, মালিক পুঁজি নিজের হাতে রাখার শর্ত করলে মুযারাবা শুদ্ধ হবে না। এ অবস্থায়ও ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। দ্বিতীয় রোকন মুনাফা। এর জন্যে শর্ত হচ্ছে, অংশ হিসাবে নির্ধারিত হওয়া, অর্থাৎ, এক তৃতীয়াংশ, এক চতুর্থাংশ, অর্ধেক অথবা অন্য কোন অংশ নির্ধারণ করতে হবে। এরূপ বলা যাবে না যে, একশ' টাকা দেব এবং অবশিষ্ট যা থাকবে তা আমার। কেননা, মুনাফা একশ' টাকার বেশী না-ও হতে পারে। তখন উদ্যোক্তার শ্রম পণ্ড হয়ে যাবে। তৃতীয় রোকন হচ্ছে, উদ্যোক্তার কর্ম। এতে কোন নির্দিষ্ট কর্মের শর্ত আরোপ করা যাবে না। উদাহরণতঃ যদি এই শর্ত আরোপ করা হয় যে, পুঁজি দিয়ে গৃহপালিত জন্তু ক্রয় করবে এবং তা দ্বারা বাচ্চা প্রজননের উদ্যোগ নেবে। বাচ্চাগুলো পরস্পরে ভাগ করে নেবে। অথবা গম ক্রয় করে রুটি তৈরী করবে। এতে যা মুনাফা হবে, তা

ভাগাভাগি করে নেবে। এরূপ করলে তা জায়েয হবে না। কেননা, রুটি তৈরী ও গৃহপালিত জন্তুর রাখালী করা ব্যবসা বাণিজ্যের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং এগুলো শিল্পকর্ম। যদি উদ্যোক্তার সাথে শর্ত করা হয় যে, অমুক ব্যক্তি ছাড়া অন্যের কাছ থেকে ক্রয় করা যাবে না, অথবা এ বিশেষ ব্যবসা করা যাবে না, তবে মুযারাবা বাতিল হয়ে যাবে।

দুব্যক্তির মধ্যে মুযারাবার চুক্তি সম্পাদিত হয়ে গেলে উদ্যোক্তা পুঁজির মধ্যে উকিলের ন্যায় ক্ষমতা প্রয়োগ করবে। পুঁজির মালিক যখন ইচ্ছা চুক্তি বাতিল করে দিতে পারে, কিন্তু বাতিল করার সময় যদি মুযারাবার মাল আসবাবপত্রের আকারে থাকে এবং তাতে কোন লাভ না হয়, তবে তা মালিককে ফিরিয়ে দেয়া হবে। আসবাবপত্রকে নগদে পরিণত করে দেয়ার কথা বলার এক্তিয়ার মালিকের হবে না। যদি উদ্যোক্তা বলে, আমি আসবাবপত্র বিক্রি করে দেই এবং মালিক অস্বীকার করে, তবে মালিকের কথাই ধর্তব্য হবে। তবে যদি উদ্যোক্তা এমন গ্রাহক পায়, যার কাছে বিক্রয় করলে লাভ হবে, তবে উদ্যোক্তার কথা ধর্তব্য হবে। আর যদি পুঁজির উপর লাভও হয় এবং লাভ ও পুঁজি আসবাবপত্র আকারে থাকে, তবে উদ্যোক্তা পুঁজি পরিমাণ আসবাব বিক্রয় করে নগদ করে নেবে এবং অবশিষ্ট আসবাব লাভের মধ্যে থেকে যাবে। তাতে উভয়েই অংশীদার হবে। বছরের শুরুতে মালিক ও উদ্যোক্তা যাকাতের জন্যে মালের মূল্য অনুমান করবে। কিছু লাভ হলে উদ্যোক্তাই তার মালিক হয়ে যাবে।

মালিকের অনুমতি ছাড়া উদ্যোক্তা মুযারাবার পণ্য সফরে নিয়ে যেতে পারে না। নিয়ে গেলে এবং বিনষ্ট হলে তার ক্ষতিপূরণ উদ্যোক্তা দেবে। কেননা, সফরে নিয়ে গেলে তার সীমালঙ্ঘন প্রমাণিত হবে। পক্ষান্তরে যদি মালিকের অনুমতিক্রমে উদ্যোক্তা পণ্য সফরে নিয়ে যায়, তবে পরিবহন ও পাহারার ব্যয় উদ্যোক্তার মাল থেকে দেয়া হবে, কিন্তু থান খোলা, ভাঁজ করা এবং অল্প কাজ, যা ব্যবসায়ীরা নিজেরা করে, তার জন্যে মজুরি দেয়ার এখতিয়ার উদ্যোক্তার নেই। যে শহরে মুযারাবার চুক্তি হয়, উদ্যোক্তা যতদিন সেই শহরে থাকে, ততদিন তার খাওয়া পরা ও বাসস্থানের ব্যয় বহন করবে; কিন্তু দোকানের ভাড়া তার যিম্মায় থাকবে না, কিন্তু উদ্যোক্তা যখন বিশেভভাবে মুযারাবার জন্যে সফর করবে, তখন তার ভরণপোষণ পুঁজি থেকে নির্বাহ করা হবে।

অংশীদারী লেনদেন ঃ অংশীদারী ক্রয়বিক্রয়ের চার প্রকার থেকে তিন তিন প্রকারই বাতিল। প্রথম প্রকার, দু'ব্যক্তি নিজ নিজ পুঁজি পৃথক রেখে পৃথক ক্রয়বিক্রয় করে, কিন্তু একজন অপরজনকে বলে, যত টাকা লাভ অথবা লোকসান হবে, তাতে আমরা উভয়েই অংশীদার থাকব। এ ধরনের অংশীদারীকে 'শিরকতে মুফাওয়াযা' বলা হয়, যা বাতিল। দ্বিতীয় প্রকার, দু'ব্যক্তি নিজ নিজ কাজের মজুরিতে একে অপরের অংশীদারিত্ব শর্ত করে নেয়। 'শিরকতে অবদান' নামে অভিহিত এই অংশীদারীও বাতিল। তৃতীয় প্রকার, দু'ব্যক্তির একজন থাকে ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী। ব্যবসায়ীরা তার কথা শুনে। সে অপরজনকে প্রভাব খটিয়ে পণ্যসামগ্রী নিয়ে দেয় এবং অপরজন তা বিক্রয় করে। এতে যা লাভ হয়, তাতে উভয়েই অংশীদার হয়। 'শিরকতে ওজুহ্' নামক এই অংশীদারীও বাতিল। চতুর্থ প্রকার, দু'ব্যক্তি নিজেদের টাকা পয়সা এমনভাবে মিলিয়ে দেয় যে, ভাগাভাগি না করলে তা পৃথক করা কঠিন হয়। এর পর প্রত্যেকেই একে অপরকে 'তাসাররুফ' তথা ব্যবসা-বাণিজ্য করার অনুমতি দেয়। উভয়ে যে মুনাফা অর্জন করে, তাতে উভয়েই অংশীদার হয়। একে বলা হয় 'শিরকতে এনান'। এটা জায়েয ও বৈধ। এই অংশীদারীর বিধান হচ্ছে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ পুঁজির পরিমাণ অনুযায়ী লাভ-লোকসানে অংশীদার হবে। পুঁজি ছাড়া অন্য কিছুকে লাভ-লোকসান বণ্টনের মাপকাঠি সাব্যস্ত করা যাবে না। উদাহরণতঃ একজনের পুঁজি এক-তৃতীয়াংশ হলে সে লাভ-লোকসানের এক-তৃতীয়াংশ পাবে- অর্ধেক পাবে না। তাদের একজনকে বরখাস্ত করা হলে তার ক্রয়বিক্রয় নিষিদ্ধ হবে। বণ্টনের ফলে পরস্পরের মালিকানা আলাদা হয়ে যাবে। বিশুদ্ধ উক্তি মতে, এই অংশীদারীত্ব অভিন্ন আসবাবপত্রের মাধ্যমেও জায়েয- নগদ পুঁজিরও প্রয়োজন নেই। মুযারাবা এরূপ নয়। তাতে নগদ পুঁজি থাকা জরুরী। সারকথা, ফেকাহ শাস্ত্রের এতটুকু শিক্ষা করা প্রত্যেক পেশাজীবীর জন্যে জরুরী। নতুবা অজ্ঞাতসারে হারামে লিপ্ত হয়ে যাবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

লেনদেনে সুবিচারের গুরুত্ব এবং অন্যায় থেকে বেঁচে থাকা

প্রকাশ থাকে যে, লেনদেন অনেক সময় এমনভাবে হয়, মুফতী যাকে শুদ্ধ ও জায়েয বলে। এ লেনদেন বাতিল না হলেও এতে এমন জুলুম থাকে, যে কারণে লেনদেনকারী আল্লাহ তাআলার ক্রোধানলে পতিত হয়। এখানে জুলুম বলে আমাদের উদ্দেশ্য এমন বিষয়, যা দ্বারা অপরের ক্ষতি হয়। এটা দু'প্রকার- এক, যার ক্ষতি ব্যাপক এবং দুই, যার ক্ষতি বিশেষভাবে লেনদেনকারী ভোগ করে। ব্যাপক জুলুমের অনেক ধরন রয়েছে। তন্মধ্যে দু'টি আমরা এখানে উল্লেখ করছি। প্রথম, মূল্য বৃদ্ধির নিয়তে খাদ্যশস্য গুদামজাত করে রাখা। এতে শস্য-বিক্রেতা শস্য গুদামজাত করে মূল্য বৃদ্ধির অপেক্ষায় বসে থাকে। এটা ব্যাপক জুলুমের কাজ। যে এরূপ করে, সে শরীয়তে নিন্দার যোগ্য। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

من احتكر الطعام اربعين يوما ثم تصدق به لم تكن صدقته كفارة لاحتكاره -

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি খাদ্য শস্য চল্লিশ দিন গুদামজাত করে রাখে, অতঃপর তা সদকা করে দিলেও তাতে আটকে রাখার কাফ্ফারা হবে না।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি খাদ্য শস্য চল্লিশ দিন গুদামজাত করে রাখে, সে আল্লাহ তাআলার কোপানল থেকে অব্যাহতি পাবে না এবং আল্লাহ তাআলা তার দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যান। কোন কোন রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, সে যেন একটি প্রাণ সংহার করে। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি খাদ্য শস্য চল্লিশ দিন পর্যন্ত আটকে রাখে, তার অন্তর কঠোর হয়ে যায়। বর্ণিত আছে, হযরত আলী (রাঃ) জনৈক গুদামজাতকারীর খাদ্য শস্য আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। একই হাদীসে খাদ্য শস্য গুদামজাত না করার সওয়াব সম্পর্কে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি বাইরে থেকে খাদ্য শস্য ক্রয় করে আনে এবং সেদিনের দর অনুযায়ী বিক্রয় করে দেয়, সে যেন সেই খাদ্য শস্য খয়রাত করে দেয়। এক রেওয়ায়েতে আছে-

সে যেন একটি গোলাম মুক্ত করে দেয়। জনৈক পূর্ববর্তী বুযুর্গ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি ওয়াসেত থেকে এক নৌকা গম ক্রয় করে বসরায় প্রেরণ করেন এবং নিজের উকিলকে লেখে পাঠান, যেদিন নৌকা বসরায় প্রবেশ করবে, সেদিনই গম বিক্রয় করে দেবে, দ্বিতীয় দিন পর্যন্ত বিলম্ব করবে না। ঘটনাক্রমে যেদিন পৌঁছল, সেদিন দাম কম ছিল। ব্যবসায়ীরা উকিলকে বলল ঃ এক সপ্তাহ পরে বিক্রয় করলে মুনাফা কয়েকগুণ বেশী হবে। উকিল এক সপ্তাহ অপেক্ষা করল এবং তাদের কথা অনুযায়ী বেশী লাভ হল। এর পর বুযুর্গ মালিকের কাছে এই সংবাদ লেখে পাঠালে তিনি জওয়াবে লেখলেন ঃ মিয়া, আমি অল্প লাভে সন্তুষ্ট ছিলাম, যাতে আমার দ্বীনদারী রক্ষা পায়। তুমি আমার কথার বিরুদ্ধে কাজ করেছ। আমার এটা কাম্য নয় যে, লাভ কয়েকগুণ বেশী হোক এবং এর বিনিময়ে আমার দ্বীনদারী হ্রাস পাক। তুমি বড় অন্যায় করেছ। এখন আমার পত্র পৌঁছামাত্র এর কাফ্ফারা হিসাবে সমস্ত মালপত্র বসরার ফকীরদেরকে খয়রাত করে দাও। সম্ভবত এতে আমি সওয়াব না পেলেও খাদ্য শস্য আটকে রাখার গোনাহ থেকে অব্যাহতি পাব।

প্রকাশ থাকে যে, খাদ্য শস্য আটকে রাখার নিষেধাজ্ঞা সর্বাবস্থায় থাকলেও এতে সময় ও বস্তুর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। বস্তুর দিক দিয়ে নিষেধাজ্ঞা খাদ্য জাতীয় বস্তুর ক্ষেত্রে ব্যাপক। সুতরাং কোন রকম খাদ্যই আটকে রাখা উচিত নয়। তবে যে সকল বস্তু মানুষের খাদ্য অথবা খাদ্যের সহায়ক নয়, তা খাওয়া হলেও এই নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন ওষুধ, পক্ষী ছানা, জাফরান ইত্যাদি। যে বস্তু খাদ্যের সহায়ক, যেমন গোশত, ফলমূল এবং যা মাঝে মাঝে খাদ্যের স্থলবর্তী হয়ে যায়, যদিও সব সময় খাদ্য বলা হয় না, এরূপ বস্তু আটকে রাখা নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত কিনা, সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। কোন কোন আলেম এসব বস্তুকেও নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত করে রেখেছেন। তারা ঘি, মধু, ঘন নির্যাস, পনীর, যয়তুনের তেল ইত্যাদি আটকে রাখা হারাম বলেছেন। কারও মতে এগুলো আটকে রাখার মধ্যে কোন দোষ নেই। সময়ের দিকে দিয়ে নিষেধাজ্ঞা কারও মতে সকল সময়ের জন্য ব্যাপক। বসরায় গম পৌঁছার যে কাহিনী একটু আগে বর্ণিত হয়েছে, তা থেকেও একথাই বোঝা যায়। আবার কারও মতে নিষেধাজ্ঞা সকল সময়ে প্রযোজ্য নয়; বরং যে সময় দেশে খাদ্য শস্যের অভাব থাকে এবং মানুষ দুর্ভিক্ষাবস্থায় থাকে তখন

খাদ্য শস্য আটকে রাখা নিষিদ্ধ। আর যদি দেশে পর্যাপ্ত খাদ্য শস্য থাকে এবং মানুষ অভাবগ্রস্ত না হয়, তখন খাদ্য শস্যের মালিক খাদ্য শস্য গুদামজাত করে রাখলে এবং দুর্ভিক্ষ কামনা না করলে তাতে কোন ক্ষতি হবে না। দুর্ভিক্ষের দিনে মধু, ঘি ইত্যাদি আটকে রাখলেও ক্ষতি হয়। অতএব আটকে রাখা হারাম হওয়া না হওয়া ক্ষতি হওয়া না হওয়ার উপর নির্ভরশীল হওয়া উচিত। তবে ক্ষতি না হলেও খাদ্য শস্য আটকে রাখা মাকরূহ। কেননা, খাদ্য শস্যের মালিক ক্ষতির প্রত্যাশী না হলেও তার সূচনার প্রত্যাশা করে। অর্থাৎ দর বৃদ্ধি তার লক্ষ্য থাকে। স্বয়ং ক্ষতি করা যেমন নিষিদ্ধ, তেমনি ক্ষতির ভূমিকা ও সূচনা তথা দর বৃদ্ধিও নিষিদ্ধ। তবে এর অনিষ্ট ক্ষতির অনিষ্টের তুলনায় কম। সুতরাং ক্ষতির পরিমাণ অনুযায়ী নিষেধাজ্ঞা কম বেশী হবে। সারকথা, খাদ্য শস্যের ব্যবসা পছন্দনীয় নয়। কেননা, ব্যবসা-বাণিজ্যের লক্ষ্য মুনাফা। খাদ্য শস্য মানুষের টিকে থাকার মূল বস্তু। মুনাফা যেহেতু মূল্যের অতিরিক্ত হয়ে থাকে, তাই এটা এমন সব জিনিসের মধ্যে কামনা করা উচিত, যা মানুষের মূল প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত নয়। এ কারণেই জনৈক তাবেয়ী এক ব্যক্তিকে উপদেশ দান প্রসঙ্গে বলেন ঃ তুমি তোমার পুত্রকে দুই বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়ে এবং দুই ধরনের পেশায় নিয়োজিত করো না। দু'রকম ক্রয়-বিক্রয়ের একটি হচ্ছে খাদ্য শস্যের ক্রয়-বিক্রয় এবং অপরটি হচ্ছে কাফনের ক্রয়-বিক্রয়। কেননা, খাদ্য শস্য বিক্রেতা খাদ্য শস্যের দুর্মূল্য কামনা করে এবং কাফন বিক্রেতা মানুষের মৃত্যু কামনা করে। দুই পেশার মধ্যে একটি হচ্ছে কসাইগিরি– এতে অন্তর পাষাণ হয়ে যায় এবং অপরটি হচ্ছে স্বর্ণালংকার নির্মাণ। অলংকার নির্মাতারা দুনিয়ার মানুষকে সোনারূপা দ্বারা সজ্জিত করে দিতে চায়।

ব্যাপক ক্ষতির দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে, অচল টাকা দেয়া। লেনদেনকারী না জেনে শুনে অচল টাকা রাখলে এতে তার ক্ষতি হয়। ফলে এটা জুলুম। আর যদি কেউ জেনে শুনে রাখে, তবে সে অপরকে দেবে । এভাবে যার হাতেই যাবে, সে অপরকে দেবে এবং সকলের গোনাহ প্রথম ব্যক্তির উপর বর্তাবে। কেননা, সেই এই কুপ্রথার প্রচলনকারী। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন কুকর্মের প্রচলন করে এবং তার পরে অন্যেরা তা পালন করে তার উপর এই কুকর্মের গোনাহ হবে এবং যারা তার পরে তা তা পালন করে, তাদের গোনাহও তার উপর চাপাবে

এবং তাদের গোনাহ হ্রাস করা হবে না। জনৈক বুযুর্গ বলেন : একটি অচল টাকা প্রচলিত করা একশ' টাকা চুরি করার চেয়েও গুরুতর পাপ। কেননা, চুরি একটি নাফরমানী, যা চোরের মৃত্যুর পর খতম হয়ে যায়, কিন্তু অচল টাকা প্রচলিত করা একটি বেদআত- যা প্রচলনকারী উদ্ভাবন করে। এটা শত শত বছর পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে। যে পর্যন্ত সেই টাকা চলতে থাকবে, তাতে মানুষের ধন-সম্পদে যে অনিষ্ট ও ক্ষতি হবে, তার পাপও মরে যায় এবং অত্যন্ত দুর্ভোগ সে ব্যক্তির জন্যে, যে নিজে মরে যায় কিন্তু তার গোনাহ একশ দু'শ বছর পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে এবং এ কারণে সে কবরে আযাব ভোগ করতে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ অর্থাৎ, আমি তাদের পেছনে ছেড়ে যাওয়া কীর্তিসমূহও লিপিবদ্ধ করব, যেমন তাদের সেই আমল লিপিবদ্ধ করব, যা তারা জীবদ্দশায় করে।

আরও এরশাদ হয়েছে- يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ

অর্থাৎ, মানুষকে সেদিন বলে দেয়া হবে যা সে অগ্রে প্রেরণ করেছে এবং যা পেছনে ছেড়ে এসেছে। এখানে যা পেছনে ছেড়ে এসেছে বলে সেই কুকীর্তি বুঝানো হয়েছে, যার প্রচলন মানুষ করে যায় এবং তার মৃত্যুর পর অন্যেরা তা করে। এখন জানা উচিত, অচল টাকা সম্পর্কে পাঁচটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রথম, এরূপ টাকা দ্বীনদার ব্যবসায়ীর হাতে এলে তার উচিত টাকাটি কূপে নিক্ষেপ করা, যাতে পরে কারও হাতে না পড়ে। একে ভেঙ্গে ব্যবহারের অযোগ্য করে দেয়াও জায়েয। দ্বিতীয়, ব্যবসায়ীর উচিত টাকা পয়সা পরখ করার পদ্ধতি শিখে নেয়া, যাতে সে তার হাত দিয়ে কোন মুসলমানকে অচল টাকা দিয়ে গোনাহগার সাব্যস্ত না হয়। তৃতীয়, যদি কেউ লেনদেনকারীকে এরূপ টাকা দিয়ে বলে দেয় যে, এই টাকা অচল, তবুও সে গোনাহের গন্ডির বাইরে থাকবে না। কেননা, যে এরূপ টাকা নেয়, সে অপরকে তার অজ্ঞাতে দেয়ার জন্যেই নেয়। এরূপ নিয়ত না থাকলে কখনই তা নিত না। চতুর্থ, হাদীসে বলা হয়েছে-

رحم الله سهل البيع وسهل الشراء وسهل القضاء وسهل الاقتضاء.

অর্থাৎ, আল্লাহ রহম করুন বিক্রয়ে নম্রতাকারীর প্রতি এবং ক্রয়ে নম্রতাকারীর প্রতি।

হাদীসের এই দোয়ার বরকতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার নিয়তে অচল টাকা গ্রহণ করবে এবং টাকাটি কূপে নিক্ষেপ করার অবিচল ইচ্ছা রাখবে। পঞ্চম, আমাদের মতে অচল টাকার অর্থ সেই টাকা, যাতে রূপা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত- কেবল গিল্টিই গিল্টি থাকে অথবা আশরাফী হলে তাতে স্বর্ণের নামগন্ধও থাকে না। যে টাকায় রূপা ও গিল্টি মিশ্রিত থাকে, যদি শহরে এরূপ টাকার প্রচলন থাকে, তবে তা দ্বারা লেনদেন করার ব্যাপারে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। আমাদের মতে শহরে প্রচলন থাকলে তা দ্বারা লেনদেন করা জায়েয- রূপার পরিমাণ জানা থাক বা না থাক। শহরে প্রচলন না থাকলে তা দ্বারা লেনদেন তখনই জায়েয হবে, যখন তার রূপার পরিমাণ জানা থাকবে। মোট কথা, ব্যবসা বাণিজ্যে খুঁটিনাটি বিষয়সমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখা নফল এবাদতে মশগুল হওয়ার চেয়েও অধিক সওয়াবের কারণ। এ কারণেই জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ সাধু ব্যবসায়ী আল্লাহ তা'আলার কাছে আবেদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

দ্বিতীয় প্রকার জুলুমের কারণে বিশেষভাবে লেনদেনকারী ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। বলাবাহুল্য, মুসলমান ভাইয়ের ক্ষতি না করাকে বলা হয় আদল বা সুবিচার। এ সম্পর্কে সামগ্রিক নীতি হল, অপরের জন্যে তাই পছন্দ করা যা নিজের জন্যে পছন্দ করা হয়। সুতরাং যে আচরণ তোমার সাথে কেউ করলে তোমার খারাপ লাগে, সে ব্যবহার অন্যের সাথে তোমার করা কিছুতেই সমীচীন নয়। তোমার কাছে নিজের টাকার মর্যাদা ও অপরের টাকার মর্যাদা সমান হওয়া উচিত। এই সামগ্রিক নীতির বিশদ বিবরণ চারটি বিষয়ের মধ্যে সীমিত। প্রথম, পণ্যসামগ্রীর গুণস্বরূপ এমন বিষয় বর্ণনা করবে না, যা তাতে নেই। দ্বিতীয়, পণ্যসামগ্রীর গোপন দোষ কোন অবস্থাতেই গোপন করবে না। তৃতীয়, পণ্যসামগ্রীর পরিমাণ ও ওজন সম্পর্কে কোন বিষয় অস্পষ্ট রাখবে না। চতুর্থ, পণ্যের প্রকৃত দর গোপন রাখবে না যে, প্রতিপক্ষ দর জানার পর সে জিনিস ক্রয় করতে অস্বীকার করে। এখন এই বিষয় চতুষ্টয়ের বিস্তারিত বর্ণনা শোনা দরকার।

প্রথম বিষয়, পণ্যসামগ্রীর অতিরিক্ত প্রশংসা না করা। কেননা, প্রশংসা করা দু'অবস্থা থেকে খালি নয়- প্রথমতঃ এমন বিষয় বর্ণনা

করবে, যা জিনিসের মধ্যে বাস্তবে নেই। এটা পরিষ্কার মিথ্যাচার। ক্রেতা তার কথা বিশ্বাস করলে মিথ্যা ছাড়া জুলুম এবং প্রতারণার দায়েও তাকে অভিযুক্ত করা হবে। দ্বিতীয়তঃ এমন বিষয় বর্ণনা করবে, যা জিনিসের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে এবং বর্ণনা না করলেও ক্রেতা তা জানতে পারবে। এমতাবস্থায় তার বর্ণনা বাজে ও অনর্থক কথা হবে। এই অনর্থক কথার জন্যে তাকে আল্লাহ তাআলার কাছে জবাবদিহি করতে হবে। কারণ, আল্লাহ বলেন ঃ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

অর্থাৎ মানুষ যা-ই উচ্চারণ করে, তা লিপিবদ্ধ করার জন্যে তৎপর প্রহরী তার কাছেই রয়েছে।

হাঁ, যদি এমন অভ্যন্তরীণ বিষয় বর্ণনা করে, যা বর্ণনা না করলে ক্রেতা জানতে পারে না, তবে তাতে কোন দোষ হবে না যদি অতিরঞ্জিত না হয়, কিন্তু এসব বিষয় বর্ণনা করতে গিয়ে কসম খাবে না। হাদীসে আছে– দুর্ভোগ সেই ব্যবসায়ীর জন্যে, যে বলে, হাঁ আল্লাহর কসম, না, আল্লাহর কসম এবং দুর্ভোগ সেই কারিগরের জন্যে, যে কাল ও পরশুর ওয়াদা করে। অন্য এক হাদীসে আছে– মিথ্যা কসম পণ্যদ্রব্যকে প্রসার দেয়, কিন্তু উপার্জন মিটিয়ে দেয়। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না– অহংকারী, দান করে অনুগ্রহ প্রকাশকারী এবং কসমের মাধ্যমে আপন পণ্যসামগ্রীকে প্রসারদাতা।

দ্বিতীয়, পণ্যের বাহ্যিক ও গোপন সকল দোষ প্রকাশ করবে। কিছুই চেপে যাবে না। কোন দোষ গোপন করলে বিক্রেতা জালেম ও প্রতারক হবে। প্রতারণা হারাম। কাপড়ের ভাল পিঠ প্রকাশ করলে এবং অপর পিঠ গোপন রাখলে প্রতারণা হবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার এক শস্য বিক্রেতার কাছে গেলেন। তার শস্য খুব ভাল দেখাচ্ছিল। তিনি শস্যস্তূপের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে কিছু আর্দ্রতা অনুভব করে বললেন ঃ একি! দোকানদার বললঃ এটা বৃষ্টিতে ভিজে গেছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তা হলে তুমি ভিজা খাদ্য শস্য উপরে রাখলে না কেন? শুন, যে প্রতারণা করে, সে আমার দলভুক্ত নয়। দোষ বলে দিয়ে মুসলমানদের শুভ কামনা করা যে ওয়াজিব, তা এই হাদীস দ্বারা জানা যায়– হযরত জারীর (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাতে ইসলামের বয়াত করার পর প্রস্থানোদ্যত হলে

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তার কাপড় ধরে টান দেন এবং তাকে বসতে বলেন। অতঃপর তিনি প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে শুভ কামনা করা তার ইসলামের জন্যে শর্ত সাব্যস্ত করে দেন। এর পর থেকে হ্যরত জারীরের নিয়ম ছিল, তিনি যখনই কোন পণ্যসামগ্রী বিক্রয় করতেন, তখন তার দোষ ক্রেতাকে ভাল করে দেখিয়ে দিয়ে বলতেন ঃ এখন তুমি ইচ্ছা করলে ক্রয় কর, ইচ্ছা না হয় ক্রয় না কর। লোকেরা তাকে বলল ঃ এরূপ করলে তোমার বিক্রয় কোনটিই পূর্ণ হবে না। তিনি বললেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর হাতে অঙ্গীকার করেছি, প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে শুভ কামনা করব। অর্থাৎ, এভাবে বিক্রয় না করলে অঙ্গীকারের বিরুদ্ধাচরণ হবে। একবার ওয়াসেলা ইবনে আসকা (রাঃ) বাজারে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তার কাছেই এক ব্যক্তি তার উষ্ট্রী বিক্রয় করছিল। ক্রেতা উষ্ট্রীর দাম তিনশ' দেরহাম বিক্রেতাকে দিয়ে চলে যেতে লাগল। হযরত ওয়াসেলা তখন অন্যমনস্ক ছিলেন। তিনি যখন ক্রেতাকে উষ্ট্রি নিয়ে চলে যেতে দেখলেন, তখন তার পেছনে দৌড় দিলেন এবং ডেকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি এই উষ্ট্রী গোশতের জন্যে ক্রয় করেছ, না সওয়ারীর জন্যে? ক্রেতা বলল ঃ সওয়ারীর জন্যে। ওয়াসেলা বললেন ঃ আমি এর পায়ে একটি ফাটল দেখেছি। এটি মনযিলের পর মনযিল অতিক্রম করে চলতে সক্ষম হবে না। অতঃপর ক্রেতা ফিরে এসে উষ্ট্রী বিক্রেতার হাতে ফিরিয়ে দিল। বিক্রেতা তার দাম আরও একশ' দেরহাম হ্রাস করে ওয়াসেলাকে বলল ঃ আল্লাহ্ তোমার প্রতি রহম করুন, তুমি আমার বিক্রয় নস্যাৎ করে দিয়েছ। ওয়াসেলা বললেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে অঙ্গীকার করেছি, প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে শুভ কামনা করব। তিনি আরও বললেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি

لا يحل لاحد يبيع بيعا الا ان يبين ما فيه ولا يحل لمن يعلم ذلك الا تبينه ـ

অর্থাৎ পণ্যের দোষ বর্ণনা না করে পণ্য বিক্রয় করা কারও জন্যে হালাল নয়। আর যে ব্যক্তি সেই দোষ জানে, তার জন্যে বর্ণনা না করে থাকা জায়েয নয়। মোট কথা, পূর্ববর্তীরা মুসলমানের শুভ কামনাকে একটি অতিরিক্ত ফযীলতের বিষয় মনে করতেন না; বরং তারা বিশ্বাস করতেন, এটা ইসলামের অন্যতম শর্ত এবং বয়াতের অন্তর্ভুক্ত। এটা

অধিকাংশ মানুষের জন্যে কঠিন। তাই সৎ ও সাবধানী ব্যক্তিরা এসব ঝগড়ায় পড়ে না। তারা নির্জনবাস অবলম্বন করে খাঁটি এবাদত করে। কেননা, মানুষের সাথে মিলেমিশে আল্লাহ তা'আলার হক আদায় করা এমন দুরূহ প্রচেষ্টা, যা সিদ্দীকগণ ছাড়া কেউ করতে পারে না। দু'টি বিষয় বিশ্বাস করা ব্যতীত এ কাজ মানুষের জন্যে সহজ হয় না। প্রথমতঃ বিশ্বাস করতে হবে যে, দোষ গোপন করে বিক্রয় করলে রুযী বৃদ্ধি পায় না, বরং বরকত দূর হয়ে যায় এবং এই বিচ্ছিন্ন পাপ একত্রিত হয়ে একদিন হঠাৎ সমস্ত সম্পদ বিলীন করে দেয়। সেমতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তির একটি গাভী ছিল। সে তার দুধে পানি মিশিয়ে বিক্রয় করত। একবার এমন এক বন্যা এল যা তার গাভীটিকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। লোকটির ছেলে বলল ঃ এই সে বিচ্ছিন্ন পানি, যা আমরা দুধের সাথে মিশ্রিত করেছিলাম, হঠাৎ একত্রিত হয়ে আমাদের গাভী ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

البيعان اذا صدقا فى بيعهما وانصحا بورك لهما فى بيعهما واذا كتما وكذبا نزعت بركة بيعهما -

অর্থাৎ, যখন ক্রেতা-বিক্রেতা সত্য কথা বলে এবং একে অপরের শুভ কামনা করে, তখন তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত দেয়া হয়। আর যখন তারা দোষ গোপন করে এবং মিথ্যা বলে, তখন তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত ছিনিয়ে নেয়া হয়। এক হাদীসে আছে-

يد الله على الشريكين مالم يتخاونا واذا تخاونا رفع يده عنهما -

আল্লাহ তা'আলার সাহায্য দুই শরীকের উপর ততক্ষণই থাকে যতক্ষণ তারা খেয়ানত না করে। আর যখন খেয়ানত করে, তখন তাঁর সাহায্যের হাত তাদের উপর থেকে সরিয়ে নেয়া হয়।

মোট কথা, খেয়ানতের মাধ্যমে অর্থসম্পদ বৃদ্ধি পায় না, যেমন খয়রাত করলে তা হ্রাস পায় না। যে ব্যক্তি মাপ ব্যতীত অন্য কোনভাবে হ্রাসবৃদ্ধি হতে পারে বলে স্বীকার করে না, সে আমাদের এই বক্তব্য বিশ্বাস করবে না, কিন্তু যে জানে, মাঝে মাঝে এক টাকার বরকত দ্বারা দীন দুনিয়ার সৌভাগ্য অর্জিত হয়ে যায় এবং কখনও আল্লাহ তা'আলা

হাজার হাজার টাকা থেকে বরকত এমনভাবে তুলে নেন যে, সেই টাকা মালিকের ধ্বংসের কারণ হয়ে যায়, ফলে সে বলতে বাধ্য হয়, হায়, আমার কাছে যদি এত টাকা না থাকত। সে একথার সত্যতা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে, খেয়ানত দ্বারা ধন বৃদ্ধি পায় না এবং খয়রাত দ্বারা হ্রাস পায় না। দ্বিতীয়তঃ বিশ্বাস করতে হবে, পরকালের কল্যাণ দুনিয়ার কল্যাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ধনসম্পদের উপকারিতা বয়ঃক্রম শেষ হওয়ার সাথে সাথে শেষ হয়ে যায় এবং বান্দার হক ঘাড়ে থেকে যায়। এমতাবস্থায় বুদ্ধিমান ব্যক্তি কিরূপে নিকৃষ্ট বস্তু গ্রহণ করার বিনিময়ে উৎকৃষ্ট বস্তু হাতছাড়া করা পছন্দ করবে? বলাবাহুল্য, ধর্মের নিরাপত্তা সবকিছুর ঊর্ধ্বে ও উৎকৃষ্ট। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ মানুষ যে পর্যন্ত পার্থিব ব্যাপারাদিকে পরকালের উপর অগ্রাধিকার না দেয়, সেই পর্যন্ত কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' মানুষের উপর থেকে আল্লাহর গজব দূর করতে থাকে। মোট কথা, ক্রয়-বিক্রয় হোক কিংবা কারিগরি, সকল ক্ষেত্রেই প্রতারণা হারাম। কারিগরেরও উচিত তার কাজে এমন শৈথিল্য না করা, যা তার নিজের দেয়া কাজে অন্য কারিগর করলে সে তা পছন্দ করবে না। কারিগর সুন্দর ও মজবুত কাজ করবে এবং তাতে কোন দোষ থাকলে তা বলে দেবে । এভাবে সে শাস্তি থেকে বাঁচতে পারবে। কেউ বলতে পারে, পণ্যের দোষ বর্ণনা করা ব্যবসায়ীর উপর ওয়াজিব হলে তার ব্যবসা শিকায় উঠতে বাধ্য। এর জওয়াব হচ্ছে, ব্যবসায়ী প্রথমেই নির্দোষ পণ্য ক্রয় করবে, যা বিক্রয় না হলে সে নিজের জন্যে রেখে দিতে পারে। এছাড়া অল্প লাভে বিক্রয় করবে। এতে আল্লাহ তা'আলা তার সম্পদে বরকতও দেবেন এবং ধোঁকা দেয়ারও প্রয়োজন হবে না, কিন্তু মুশকিল হল, মানুষ অল্প লাভে সন্তুষ্ট হয় না এবং অনেক লাভ প্রতারণা ছাড়া পাওয়া যায় না। সুতরাং সুষ্ঠুরূপে ব্যবসা করলে এমন দোষী পণ্য ক্রয় করবে না, যা বর্ণনা করার প্রয়োজন দেখা দেয়। যদি ঘটনাক্রমে এমন কোন বস্তু এসে যায়, তবে তার দোষ বলে দেবে এবং দোষসহ তার যা দাম হয়, তাতেই সন্তুষ্ট থাকবে।

হযরত ইবনে সিরীন (রহঃ) একটি ছাগল বিক্রয় করে ক্রেতাকে বললেন ঃ এর একটি দোষ আছে, সেটাও শুন। সে ঘাস পায়ে মাড়িয়ে দেয়। হাসান ইবনে সালেহ এক বাঁদী বিক্রয় করে ক্রেতাকে বললেন ঃ আমার এখানে থাকা অবস্থায় একবার তার নাক দিয়ে রক্ত বের হয়েছিল।

মোট কথা, বুযুর্গগণ লেনদেনে সামান্য বিষয়ও বলে দিতেন।

তৃতীয়, পণ্যের পরিমাণ ও ওজন গোপন করবে না। সমান মাপ এবং সাবধানতা সহকারে মাপার মাধ্যমে তা অর্জিত হয়। সুতরাং অন্যের কাছ থেকে যে মাপ নেবে অন্যকেও সেভাবে মেপে দেবে । আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন–

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ الَّذِيْنَ إِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ وَإِذَا كَالُوْهُمْ أَوْوَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ـ

অর্থাৎ, মাপে প্রবঞ্চনাকারীদের জন্যে দুর্ভোগ, যারা মানুষের কাছ থেকে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে এবং যখন মানুষকে মেপে দেয় অথবা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়।

এ থেকে মুক্তির উপায় এটাই যে, অপরকে মেপে দেয়ার সময় পাল্লা কিছু ঝুঁকিয়ে দেবে এবং নিজে নেয়ার সময় সমানের চেয়ে কিছু কম নেবে। কেননা, ঠিক সমান খুব কমই হতে পারে। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আমি এক রতির বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে দুর্ভোগ ক্রয় করব কেন? তাই তিনি নিজের হক নেয়ার সময় আধা রতি কম নিতেন এবং অপরকে দেয়ার সময় এক রতি বেশী দিতেন। তিনি আরও বলতেন ঃ সে ব্যক্তির জন্যে দুর্ভোগ, যে এক রতির বিনিময়ে জান্নাত বেচে দেয়, যে জান্নাতের বিনিময় আকাশ ও পৃথিবীর সমান। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ এ ধরনের বিষয়াদি থেকে আত্মরক্ষার জন্যে জোর তাকিদ করেছেন। কেননা, এগুলো বান্দার হক, যা থেকে তওবা হতে পারে না। কেননা, এখানে কার কার হক রয়ে গেছে, তা জানা থাকে না। জানা থাকলে অবশ্য তাদেরকে জড়ো করে হক শোধ করা যেত। রসূলে করীম (সাঃ) কোন বস্তু ক্রয় করার পর যে মূল্য ওজন করত, তাকে বলতেন ঃ زن وارجح অর্থাৎ, মূল্য ওজন কর এবং ঝুঁকিয়ে দাও। ফোযায়ল (রহঃ) একবার তাঁর পুত্রকে একটি আশরাফী ধৌত করতে দেখলেন। আশরফীটি ভাঙ্গানো উদ্দেশ্য ছিল। তাই তা থেকে ময়লা পরিষ্কার করা হচ্ছিল, যাতে ময়লার কারণে তার ওজন বেশী না হয়ে যায়। ফোযায়ল বললেন ঃ বৎস, তোমার এ কাজ দু'টি হজ্জ ও দশটি ওমরা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আমি একথা ভেবে অবাক হই যে, সেই ব্যবসায়ী ও বিক্রেতার নাজাত কিরূপে হবে, যারা দিনের বেলায় মাপজোখ করে এবং রাতে ঘুমিয়ে

থাকে।। হযরত সোলায়মান (আঃ) তাঁর পুত্রকে বললেন ঃ হে কলিজার টুকরা, সর্প যেমন দুই পাথরের মাঝখানে ঢুকে পড়ে, তেমনি পাপ দুই লেনদেনকারীর মাঝখানে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে যায়।

সারকথা, দাঁড়িপাল্লার ব্যাপারটি খুবই গুরুতর। এক আধ রতি দিয়ে এ থেকে নাজাত পাওয়া সম্ভব। যে ব্যক্তি নিজের হক অন্যের কাছ থেকে আদায় করে এবং যেভাবে আদায় করে সেভাবে অন্যের হক শোধ করে না, সে-ও মাপে প্রবঞ্চনাকারীদের সম্পর্কিত আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, আয়াতে মাপের জিনিসসমূহে সমান সমান না করা হারাম করার উদ্দেশ্য এটাই যে, ন্যায় ও ইনসাফ বর্জন করা হারাম। এটা প্রত্যেক কাজেই হতে পারে। যে ব্যক্তি খাদ্য শস্যে মাটি মিশ্রিত করে বিক্রয় করবে, সে মাপে প্রবঞ্চনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। অনুরূপভাবে যে কসাই গোশতের সাথে এমন হাড্ডি মেপে দেবে, যা সাধারণভাবে মাপা হয় না, তার অবস্থাও তেমনি হবে। বস্ত্র বিক্রেতা যখন গজ দিয়ে বস্ত্র মেপে ক্রয় করে, তখন বস্ত্রকে ঢিলা রাখে; কিন্তু বিক্রয় করার সময় খুব টেনে মাপে, যাতে কিছু বেড়ে যায়। এ ধরনের সব কাজকর্ম মানুষকে আয়াতে বর্ণিত দুর্ভোগের উপযুক্ত করে দেয়।

চতুর্থ, পণ্যের দর সত্য সত্য বলবে– কিছুই গোপন করবে না। কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) শহরের বাইরে গিয়ে শহরে আগমনকারী কাফেলার কাছ থেকে মিথ্যা দর শুনিয়ে পণ্য ক্রয় করতে বারণ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ لاتلقوا الركبان ومن تلقها نصاحب السلعة بالخيار بعد ان يقدم السوق অর্থাৎ, বাইরের সওদাগরদের কাছ থেকে এগিয়ে গিয়ে ক্রয় করো না। কেউ এরূপ ক্রয় করলে বাজারে আসার পর পণ্যের মালিকের এখতিয়ার থাকবে– ইচ্ছা করলে বিক্রয় বহাল রাখবে এবং ইচ্ছা করলে ক্রেতার কাছ থেকে পণ্য ফেরত নেবে। অর্থাৎ, বিক্রেতা যদি জানতে পারে, ক্রেতা মিথ্যা দর বলেছিল, তবে তার এই এখতিয়ার থাকবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

লেনদেনে অনুগ্রহ প্রদর্শন করা

প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহ তা'আলা আদল (ন্যায়বিচার) এবং 'এহসান' (অনুগ্রহ প্রদর্শন) উভয়টিরই নির্দেশ দিয়েছেন। এরশাদ হয়েছে ঃ

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ـ

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়বিচার ও অনুগ্রহ প্রদর্শনের নির্দেশ দেন। ন্যায়বিচার মুক্তির কারণ। এটা ব্যবসা-বাণিজ্যের পুঁজি বেঁচে থাকার মত। অনুগ্রহ প্রদর্শন পারলৌকিক সৌভাগ্য অর্জনের কারণ। এটা ব্যবসায়ে মুনাফা হওয়ার অনুরূপ। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মূল্য পাওয়াকেই যথেষ্ট মনে করে এবং আসল মুনাফা অন্বেষণ করে না, তাকে বুদ্ধিমান গণ্য করা হয় না। তেমনি পারলৌকিক লেনদেনেও যে ব্যক্তি কেবল ন্যায়বিচার ও জুলুম বর্জন করেই ক্ষান্ত থাকে, অনুগ্রহ প্রদর্শন করে না, তাকে ধর্মপরায়ণ বলা যায় না। কারণ, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللّٰهُ إِلَيْكَ ـ

অর্থাৎ, অনুগ্রহ প্রদর্শন কর, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন। আর বলা হয়েছে-

إِنَّ رَحْمَةَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ـ

অর্থাৎ, আল্লাহর রহমত অনুগ্রহ প্রদর্শনকারীদের নিকটবর্তী। অনুগ্রহ প্রদর্শন দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য এমন কাজ করা, যদ্দ্বারা লেনদেনকারীদের উপকার হয়; কিন্তু তা করা ওয়াজিব নয়; বরং নিজের পক্ষ থেকে সদাচরণস্বরূপ করা হয়। কেননা, যেসব কাজ করা ওয়াজিব, সেগুলো ন্যায়বিচার ও জুলুম বর্জনের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

ছয়টি বিষয়ের মধ্য থেকে কোন একটি পালন করার মাধ্যমে অনুগ্রহ প্রদর্শনের স্তর অর্জিত হয়। প্রথমতঃ অন্যের এমন লোকসান না করা, যা সাধারণতভাবে করা হয় না। কিছু না কিছু লোকসান করার অনুমতি রয়েছে। কেননা, ক্রয়বিক্রয় মুনাফার জন্যে করা হয়। আর কিছু বেশী নেয়া ছাড়া মুনাফা হতে পারে না। এই বেশী নেয়ার ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে সাধারণ নিয়মের বেশী না হয়। কেননা, যে ক্রেতা সাধারণ

নিয়মের বেশী মুনাফা দেবে, সে হয় এই পণ্যের প্রতি অধিক আগ্রহী হবে, না হয় আপাততঃ এর প্রয়োজন তার অধিক হবে। এমতাবস্থায় যদি বিক্রেতা অধিক মুনাফা না নেয়, তবে এটা তার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ হবে। অন্যথায় প্রতারণা না হলে সম্ভবতঃ বেশী মুনাফা নেয়া জুলুম নয়। কোন কোন আলেমের মতে মূল্যের এক-তৃতীয়াংশের বেশী মুনাফা নিলে ক্রেতা জানার পর পণ্য ফেরত দেয়ার অধিকারী হবে, কিন্তু আমাদের অভিমত তা নয়, বরং আমরা বলি, কম মুনাফা নেয়া অনুগ্রহের শামিল।

কথিত আছে, ইউনুস ইবনে ওবায়দের দোকানে বিভিন্ন দামের বস্ত্রজোড়া ছিল, কোনটি চারশ' দেরহামের এবং কোনটি দু'শ দেরহামের। একদিন তিনি যখন তাঁর ভাতিজাকে দোকানে রেখে নামায পড়তে গেলেন, তখন এক বেদুঈন এসে একটি চারশ' দেরহামের বস্ত্রজোড়া চাইল। ভাতিজা দু'শ দেরহামের বস্ত্রজোড়া থেকে একটি বের করে দেখাল। বেদুঈন পছন্দ করে সানন্দে চারশ' দেরহাম দিয়ে দিল এবং বস্ত্রজোড়াটি হাতে নিয়ে চলে যেতে লাগল। পথিমধ্যে ইউনুস ইবনে ওবায়দ নিজের দোকানের বস্ত্রজোড়া চিনতে পেরে বেদুঈনকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ কত দিয়ে কিনলে? বেদুঈন বলল ঃ চারশ' দেরহাম দিয়ে। ইউনুস বললেন ঃ এর দাম দু'শ দেরহামের বেশী নয়। এটা ফেরত দাও। বেদুঈন বলল ঃ আমাদের শহরে এটা পাঁচশ' দেরহামের মাল। আমি সানন্দে এটা পছন্দ করেছি এবং চারশ' দেরহাম দিয়েছি। অতঃপর ইউনুস তাকে অনেকটা জোর করেই দোকানে নিয়ে গেলেন এবং দু'শ' দেরহাম ফেরত দিলেন। এর পর তিনি ভাতিজাকে শাসিয়ে বললেন ঃ এত মুনাফা লুটতে এবং মুসলমানদের শুভ কামনা বর্জন করতে তোর লজ্জা হল না? ভাতিজা বললেন ঃ সে তো নিজেই এত দেরহাম দিতে রাজি ছিল। তিনি বললেন ঃ তা হলে নিজের জন্যে যা পছন্দ করতে, তার জন্যে তা পছন্দ করলে না কেন? এ কাজটিই যদি দাম গোপন করে প্রতারণার মাধ্যমে হত, তবে তা হত এক প্রকার জুলুম, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসে আছে–

غبن المرسل حرام -

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি নিজের উপর আস্থা রাখে, তাকে ধোঁকা দেয়া হারাম। যোবায়র ইবনে আদী বলতেন ঃ আমি আঠার জন সাহাবীকে এমন দেখেছি যে তাঁরা ভাল করে এক দেরহামের গোশতও কিনতে

জানতেন না। অতএব এমন আত্মভোলাদের ক্ষতি করা এবং তাঁদেরকে ধোঁকা দেয়া জুলুম। অধিক লাভ নেয়ার ক্ষেত্রে কোন না কোন প্রকার ধোঁকা কিংবা সমকালীন দর গোপন করা প্রায়ই হয়ে থাকে। অনুগ্রহ প্রদর্শনের এক পন্থা হযরত সিররী সকতী (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি ষাট দীনার মূল্য দিয়ে এক বস্তা বাদাম ক্রয় করেন এবং আপন ডায়রীতে তার মুনাফা তিন দীনার লেখে রাখেন। অর্থাৎ, তিনি প্রতি দশ দীনারে আধা দীনার মুনাফা ঠিক করলেন। এর পর বাদামের দর বেড়ে গেল এবং নব্বই দীনার প্রতি বস্তা বিক্রি হতে লাগল। জনৈক খরিদ্দার তাঁর কাছে এসে বাদামের বস্তা ক্রয় করতে চাইল। তিনি বললেন ঃ নিয়ে যাও। খরিদ্দার দাম জিজ্ঞেস করলে তিনি তেষট্টি দীনার বললেন। খরিদ্দারও সৎ ও সাধু ব্যবসায়ী ছিল। সে বলল ঃ বর্তমান দর প্রতি বস্তা নব্বই দীনার। সিররী সকতী বললেন ঃ আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, এর বেশী নেব না। তেষট্টি দীনারেই বিক্রয় করব। খরিদ্দার বলল ঃ আমিও আল্লাহ তাআলার সাথে অঙ্গীকার করেছি, কোন মুসলমানের ক্ষতি করব না। অতএব নব্বই দীনার দিয়েই নেব। ঘটনা বর্ণনাকারী বলেন ঃ এর পর না সিররী নব্বই দীনার দিয়েই বিক্রয় করলেন এবং না খরিদ্দার তেষট্টি দীনারে ক্রয় করল। এটা ছিল তাঁদের উভয়ের তরফ থেকে অনুগ্রহ প্রদর্শন।

বর্ণিত আছে, মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদেরের বস্ত্রালয়ে কিছু চোগা (পোশাক বিশেষ) ছিল। কিছু পাঁচ টাকা দামের এবং কিছু দশ টাকা দামের। গোলাম তাঁর অনুপস্থিতিতে পাঁচ টাকার চোগা দশ টাকায় বিক্রয় করেছে। ক্রেতা বলল ঃ কোন দোষ নেই। আমি রাজি আছি। তিনি বললেন ঃ আপনি রাজি বটে; কিন্তু আমি আপনার জন্যে তাই পছন্দ করি, যা নিজের জন্যে পছন্দ করি। আপনি তিনটি কাজের একটি করুন– হয় দশ টাকা মূল্যের চোগা নিয়ে নিন, না হয় পাঁচ টাকা ফেরত নিন, না হয় আমার বস্ত্র আমাকে ফেরত দিন এবং আপনার মূল্য নিয়ে যান। ক্রেতা বলল ঃ আমাকে পাঁচ টাকা ফেরত দিন। তিনি পাঁচ টাকা দিয়ে দিলেন। ক্রেতা পাঁচ টাকা নিয়ে চলে গেল এবং মানুষের কাছে জিজ্ঞেস করল ঃ এই দোকানদার কে? এক ব্যক্তি বলল ঃ ইনি মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদের। ক্রেতা বলল ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, তাঁরই বদৌলত দুর্ভিক্ষে আমাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষিত হয়। মোট কথা, অনুগ্রহ প্রদর্শন হল, যে

জায়গায় যে বস্তুতে যে পরিমাণ মুনাফা নেয়ার সাধারণ রীতি থাকে, তার চেয়ে বেশী না নেয়া। যে ব্যক্তি অল্প লাভে সন্তুষ্ট থাকে, তার দোকানে লেনদেন বেশী হয় এবং বেশী লেনদেনের কারণে তাঁর ফায়দাও বেশী হয়। ফলে বরকত দেখা যায়। হযরত আলী (রাঃ) কুফার বাজারে দোররা নিয়ে ঘুরাফেরা করতেন এবং বলতেন ঃ ব্যবসায়ীরা, নিজেদের হক নাও এবং অন্যের হক দাও। এতে তোমরা বেঁচে থাকবে। অল্প লাভ ফিরিয়ে দিয়ো না। তা হলে বেশী লাভ থেকে বঞ্চিত থাকবে। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ)-কে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ আপনার ধন-দৌলত বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ কি? তিনি বললেন ঃ তিনটি— প্রথমতঃ আমি অল্প মুনাফা হলেও পণ্য বিক্রি করে দেই। দ্বিতীয়তঃ কেউ আমার কাছে জন্তু চাইলে আমি তা বিক্রি করতে দ্বিধা করি না। তৃতীয়তঃ আমি কখনও বাকী বিক্রি করি না।

কথিত আছে, একবার তিনি এক হাজার উষ্ট্রী বিক্রি করেন। লাভের মধ্যে কেবল এগুলোর রশি তাঁর কাছে রইল। এর পর প্রত্যেকটি রশি এক দেরহামে বিক্রয় করে তিনি এক হাজার দেরহাম মুনাফা অর্জন করেন। আর এক হাজার সেদিনের খোরাক থেকে বেঁচে গেল।

দ্বিতীয়, কোন দুর্বল অথবা নিঃস্ব ব্যক্তির কাছ থেকে কোন জিনিস ক্রয় করলে নিজে কিছু লোকসান স্বীকার করে নিলে দুর্বল ও নিঃস্ব ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হবে। এভাবে ক্রেতা এই হাদীসে বর্ণিত দোয়ার হকদার হয়ে যাবে—

رحم الله سهل البيع سهل الشراء ـ

অর্থাৎ, যে ক্রয় ও বিক্রয় সহজ করে, আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন। তবে যে ধনী ব্যক্তি প্রয়োজনের অতিরিক্ত মুনাফা নেয়, তার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করা ভাল নয়; বরং বিনা সওয়াবে অর্থ বিনষ্ট করার শামিল। এক হাদীসে আছে— الغبون فى الشراء لامحمود ولا ماجور যে ব্যক্তি ক্রয়ে ঠকে যায়, সে প্রশংসার পাত্রও নয় এবং তাকে সওয়াবও দেয়া হয় না। বসরার কাযী ও তাবেয়ী আয়ায ইবনে মুয়াবিয়া অত্যন্ত চতুর লোক ছিলেন। তিনি বলতেন ঃ না আমি ধূর্ত এবং না কোন ধূর্ত আমাকে ঠকাতে পারে। অপরকে না ঠকানো এবং নিজে না ঠকাই বাহাদুরী। হযরত ওমর (রাঃ)-এর প্রশংসায় কেউ কেউ লেখেছেন, তাঁর

চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি কাউকে ধোঁকা দিতেন না এবং কেউ তাঁকে ধোঁকা দিতে পারত না। হযরত ইমাম হাসান ও হুসাইন (রাঃ) ক্রয় বিক্রয় করার সময় খুব যাচাই করে নিতেন এবং সামান্য বিষয়ের জন্যে অনেক কথা বলতেন; কিন্তু কাউকে দেয়ার সময় অনেক বেশী দিয়ে দিতেন। এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তাঁরা বলেন ঃ যে দেয়, সে নিজের ফযীলত ও শ্রেষ্ঠত্ব দেয়। কাজেই যত দেবে তত বেশী তার ফযীলত জানা যাবে। পক্ষান্তরে ক্রয়বিক্রয়ে যে ঠকে যায় সে তার বুদ্ধি হ্রাস করে; অর্থাৎ, ঠকা হল বুদ্ধির ত্রুটি।

তৃতীয়, মূল্য ও ঋণ শোধ নেয়ার সময় ত্রিবিধ উপায়ে অনুগ্রহ প্রদর্শন হতে পারে। এক, কিছু মাফ করে দিয়ে, দুই, আর কিছু সময় দিয়ে এবং তিন, দাম নেয়ার ব্যাপারে নম্রতা করে। এগুলো মোস্তাহাব। হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি দরিদ্রকে সময় দেয় অথবা তার ঋণ ছেড়ে দেয়, আল্লাহ্ তাআলা তার কাছ থেকে অল্প ও সহজ হিসাব নেবেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন– যে ব্যক্তি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত ধার দেয়, সেই মেয়াদ পর্যন্ত প্রত্যহ খয়রাতের সওয়াব পাবে। মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার পর যদি আরও সময় দেয়, তবে প্রত্যহ কর্জের সমান খয়রাত করার সওয়াব পাবে। এই হাদীসের বিষয়বস্তু অনুয়ায়ী কোন কোন বুযুর্গ ভাল মনে করতেন না যে, ঋণী তাদের ঋণ পরিশোধ করে দিক। কেননা, কর্জ যতদিন অপরিশোধিত থাকবে, ততদিন কর্জদাতা প্রত্যহ সেই পরিমাণ টাকা খয়রাত করার সমান সওয়াব পেতে থাকবে। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে, হুযুর (সাঃ) বলেছেন, আমি জান্নাতের দরজায় লিখিত দেখেছি– সদকার সওয়াব দশ গুণ এবং কর্জের সওয়াব আঠার গুণ। কেউ কেউ এর কারণ এই বর্ণনা করেছেন, সদকা অভাবগ্রস্ত এবং অভাবহীন সবার হাতেই পড়ে, কিন্তু কর্জ চাওয়ার জিল্লতী অভাবী ছাড়া অন্য কেউ বরদাশত করে না। যে ব্যক্তি কোন বস্তু বিক্রয় করে ক্রেতার কাছ থেকে তার মূল্য তখনই নেয় না এবং তাগাদাও করে না, সে-ও কর্জদাতার অনুরূপ। কথিত আছে, হযরত হাসান বসরী একটি খচ্চর চারশ' দেরহামে বিক্রি করলেন। মূল্য দেয়ার সময় ক্রেতা বলল ঃ আবু সায়ীদ, কিছু রেয়াত করুন। তিনি বললেন, যাও, আমি তোমাকে একশ' দেরহাম ছেড়ে দিলাম। সে বলল ঃ এখন আপনি কিছু অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন। তিনি বললেন ঃ আরও একশ' দেরহাম মাফ করলাম। অতঃপর তিনি ক্রেতার

কাছ থেকে অবশিষ্ট মাত্র দু'শ দেরহাম নিলেন। কেউ আরজ করল ঃ এতে তো অর্ধেক মূল্য রয়ে গেল। তিনি বললেন ঃ অনুগ্রহ হলে এরূপই হওয়া উচিত।

চতুর্থ, কর্জ শোধ করার ব্যাপারে অনুগ্রহ প্রদর্শনের উপায় হল, কর্জের টাকা এমনভাবে কর্জদাতার কাছে পৌঁছে দেয়া যাতে তার তাগাদা করার কষ্ট স্বীকার করতে না হয়। সেমতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ خيركم احسنكم قضاء অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে উত্তম সে ব্যক্তি যে উত্তমরূপে শোধ দেয়। কর্জ শোধ করার সামর্থ্য হয়ে গেলে দ্রুত নির্ধারিত সময়ের পূর্বে এবং যেভাবে দেয়া শর্ত, তার চেয়ে উত্তম উপায়ে শোধ করে দেয়া উচিত। কর্জ শোধ করতে অক্ষম হলে এ নিয়তই রাখবে, যখন হাতে টাকা আসবে তখনই শোধ করে দেবে । রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি এই নিয়তে কর্জ গ্রহণ করে যে, হাতে আসামাত্রই দিয়ে দেবে, আল্লাহ তাআলা তার উপর ফেরেশতা নিযুক্ত করে দেন যাতে তার হেফাযত করে এবং কর্জ শোধ করা পর্যন্ত তার জন্যে দোয়া করে। এই হাদীসের বিষয়বস্তু অবগত হয়ে পূর্ববর্তী কয়েকজন বুযুর্গ প্রয়োজন ছাড়াও কর্জ গ্রহণ করতেন। কোন কর্জদাতা কঠোর ভাষায় কথা বললে তা বরদাশত করা এবং তার সাথে নরম ব্যবহার করা উচিত। এতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অনুসরণ হবে। বর্ণিত আছে, একবার জনৈক কর্জদাতা মেয়াদ অতিবাহিত হওয়ার পর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এল এবং কর্জ শোধ না করা পর্যন্ত সে তাঁর সাথে অত্যন্ত রূঢ় ভাষায় কথা বলল। সাহাবায়ে কেরাম তাকে সাবধান করতে চাইলে তিনি বললেন ঃ যেতে দাও, হকদার বলেই সে এমন করেছে। কর্জদাতা ও কর্জ গ্রহীতার মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হলে তৃতীয় ব্যক্তির উচিত কর্জদাতার পক্ষপাতিত্ব না করা। কারণ, কর্জদাতা তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা থেকে কর্জ দেয়, আর কর্জ গ্রহীতা নিজের অভাবের তাড়নায় কর্জ গ্রহণ করে, তাই অভাবগ্রস্তের রেয়াত করাই সমীচীন। হাঁ, যখন কর্জগ্রহীতা সীমালঙ্ঘন করে তখন তার সাহায্য এভাবে করা উচিত, যাতে সে সীমালঙ্ঘন থেকে বিরত হয়ে যায়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ নিজের ভাইয়ের সাহায্য কর, সে জালেম হোক অথবা মজলুম। কেউ আরজ করল ঃ জালেম হলে তার সাহায্য কিভাবে করব? তিনি বললেন ঃ জুলুম থেকে বিরত রাখাই তার সাহায্য।

পঞ্চম, কোন ক্রেতা পণ্যদ্রব্য ফেরত দিতে চাইলে তা অনুমোদন করবে। কেননা, ফেরত সে-ই দেবে, যে ক্রয়-বিক্রয়ে অনুতপ্ত হবে এবং নিজের জন্যে তাকে ক্ষতিকর মনে করবে। সুতরাং নিজের জন্যে এমন বিষয় পছন্দ করা উচিত নয়, যা তার ভাইয়ের জন্যে ক্ষতির কারণ হয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যে অনুতপ্ত ব্যক্তির লেনদেন ফেরত দেবে, আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন তার ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা করবেন।

ষষ্ঠ, বাকী দিলে ফকীর ও নিঃস্বদেরকে দেবে এবং লেনদেনের সময় নিয়ত করবে যে, সামর্থ্য না হলে তাদের কাছে দাবী করব না। সেমতে পূর্ববর্তী সাধু ব্যবসায়ীদের কাছে দুটি হিসাব বহি থাকত। একটির শিরোনাম কিছুই হত না। তাতে অজ্ঞাত, দুর্বল ও নিঃস্বদের নাম লেখা থাকত। কোন ফকীর তাদের দোকানে এসে যদি বলত, আমার অমুক খাদ্য শস্য ও ফলের প্রয়োজন; কিন্তু আমার হাতে দাম নেই, তবে বুযুর্গ ব্যবসায়ী বলতেন ঃ নিয়ে যাও। যখন তোমার হাতে দাম হয় তখন দিয়ে যেয়ো। এর পর তিনি তার নাম সেই হিসাব বহিতে লেখে রাখতেন। পূর্ববর্তী বুযুর্গণ এরূপ ব্যবসায়ীকেও সাধু মনে করতেন না; বরং তাকেই সাধু গণ্য করতেন, যে ফকীরের নামই খাতায় লেখত না এবং তার যিম্মায় কোন কর্জ রাখত না; বরং ফকীরকে বলে দিত, যতটুকু প্রয়োজন নিয়ে যাও। তোমার কাছে দাম হলে দিয়ে যাবে। নতুবা এটা তোমার জন্যে হালাল করে দেয়া হল।

মোট কথা, এগুলো ছিল পূর্ববর্তী ভাল মানুষদের ব্যবসা-বাণিজ্যের নিয়মনীতি। এগুলো সব বর্তমানে মিটে গেছে। এখন কেউ এ সব নিয়মনীতির উপর কায়েম থাকলে সে যেন এই পন্থাকে পুনরুজ্জীবিত করবে। প্রকাশ থাকে যে, ব্যবসা-বাণিজ্য মানুষের জন্যে একটি কষ্টিপাথর, যদ্দ্বারা তাদের দ্বীনদারী ও তাকওয়া পরীক্ষা করা হয়। এজন্যেই বলা হয়, যখন কোন ব্যক্তির প্রতিবেশী তার গুণ-কীর্তন করে, সফরে গেলে সফরসঙ্গী তার প্রশংসা করে এবং বাজারে লেনদেনকারীরা তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে এবং তাকে ভাল বলে, তখন সে ব্যক্তির সাধুতায় কোন সন্দেহ করা উচিত নয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ব্যবসায়ীদের জন্যে জরুরী দিকনির্দেশনা

ব্যবসায়ীর উচিত ধর্মের ভয় রাখা অর্থাৎ, প্রত্যেক কাজে ধর্মের প্রতি লক্ষ্য রাখা; জীবিকার ধান্ধায় পড়ে পরকাল থেকে গাফেল হয়ে জীবন বরবাদ করা উচিত নয়। পরকালের লোকসান জাগতিক মুনাফা দ্বারা পূরণ হতে পারে না। বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত পুঁজি বাঁচিয়ে রাখা। মানুষের পুঁজি হচ্ছে তার ধর্ম। হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ) তাঁর ওসিয়তে বলেন, দুনিয়াতে তোমার কোন অংশ জরুরী, কিন্তু তোমার আখেরাতের অংশের প্রয়োজন অধিক। অতএব এখান থেকেই শুরু কর এবং প্রথমে আখেরাতের অংশ গ্রহণ কর। দুনিয়ার অংশ এমনিতেই আদায় হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন وَلَاتَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا অর্থাৎ, দুনিয়া থেকে তুমি তোমার আখেরাতের অংশ ভুলে যেয়ো না। দুনিয়া আখেরাতের শস্যক্ষেত্র। পুণ্য এখান থেকেই অর্জিত হয়।

জানা উচিত, ধর্মের প্রতি ব্যবসায়ীর খেয়াল সাতটি বিষয় দ্বারা পূর্ণতা লাভ করে। প্রথম, ব্যবসায়ের শুরুতে নিয়ত ও বিশ্বাস সঠিক রাখতে হবে। এই নিয়তে ব্যবসা করবে যে, জীবিকার জন্যে সওয়াল করতে না হয় এবং অপরের মুখাপেক্ষী না হতে হয়; বরং হালাল উপার্জনলব্ধ ধনসম্পদ দ্বারা ধর্মকর্মে সাহায্য নেয়া এবং পরিবার-পরিজনের হক আদায় করা লক্ষ্য হতে হবে। এভাবে ব্যবসায়ী ব্যক্তি অর্থ দ্বারা জেহাদকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। সকল মুসলমানের হিতাকাঙ্ক্ষার নিয়ত করবে এবং অপরের জন্যে তাই পছন্দ করবে যা নিজের জন্যে পছন্দ করা হয়। লেনদেনে ন্যায়বিচার ও অনুগ্রহ প্রদর্শনের পন্থা অনুসরণের নিয়ত করবে, যেভাবে আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। আরও নিয়ত করবে যে, বাজারে ভালমন্দ যা দেখবে, তাতে সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ সম্পর্কিত নীতি পালনে কোনরূপ ত্রুটি করবে না। অন্তরে এসব নিয়ত ও আকীদা পোষণ করলে ব্যবসায়ী আখেরাতের একজন পথিক হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় কিছু ধনসম্পদ পাওয়া গেলে তা হবে মুনাফা। আর যদি দুনিয়ার কিছু লোকসান হয়, তবে আখেরাতে ফায়দা লাভ করবে।

দ্বিতীয়, ফরযে কেফায়া পালন করার উদ্দেশে ব্যবসায়ে অথবা শিল্পকর্মে আত্মনিয়োগ করবে। কেননা, শিল্পকর্ম অথবা ব্যবসা সম্পূর্ণ বর্জিত হলে জীবিকার কারখানা অচল হয়ে পড়বে এবং অধিকাংশ মানুষ ধ্বংস হয়ে যাবে। কারণ, সকলের ব্যবস্থাপনাই সকলের পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতায় সম্পন্ন হচ্ছে। এক এক দল মানুষ এক এক কাজের যিম্মাদার। যদি সকল মানুষ একই শিল্পকর্ম করতে শুরু করে এবং অন্য সকল শিল্প বর্জিত হয়, তবে সকলেই ধ্বংস হয়ে যাবে। "আমার উম্মতের মতবিরোধ রহমত"– কেউ কেউ এই হাদীসকে এই অর্থে নিয়েছেন যে, মতবিরোধের উদ্দেশ্য এখানে আলাদা আলাদা শিল্পকর্ম ও পেশা। শিল্পকর্মসমূহের মধ্যে কিছু অত্যন্ত উপকারী এবং কিছু অনাবশ্যক। কারণ, এগুলো দ্বারা পরিণামে আরামপ্রিয়তা, বিলাসিতা ও জাগতিক সাজসজ্জা হয়ে থাকে। অতএব এমন শিল্পকর্ম অবলম্বন করা উচিত, যা দ্বারা মুসলমানদের উপকার হয় এবং যা ধর্ম-কর্মে আবশ্যক। পক্ষান্তরে বাহ্যিক সাজ-সজ্জায় শিল্প থেকে দূরে থাকতে হবে; যেমন কারুকার্য করা, স্বর্ণের কাজ করা, চুনার আস্তর করা ইত্যাদি। এ ধরনের কাজকে ধর্মপরায়ণতা মাকরূহ মনে করে। ক্রীড়া-কৌতুকের সাজসরঞ্জাম ব্যবহার করা হারাম। এগুলো নির্মাণ থেকে বেঁচে থাকা জুলুম পরিহারের মধ্যে শামিল। এমনিভাবে পুরুষের জন্যে রেশমী জামা সেলাই করা এবং পুরুষের সোনার আংটি গড়া পাপ, এ মজুরি হারাম।

তৃতীয়, ব্যবসা-বাণিজ্যে দুনিয়ার বাজার যেন ব্যবসায়ীকে আখেরাতের বাজার থেকে বিমুখ না করে। আল্লাহর মসজিদসমূহ হচ্ছে আখেরাতের বাজার। আল্লাহ তাআলা স্বয়ং বলেন ঃ

فِىْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ رِجَالٌ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ ـ

অর্থাৎ, আল্লাহ কোন কোন গৃহকে উঁচু করার এবং তাতে তাঁর নাম উচ্চারণ করার নির্দেশ করেছেন। সেখানে এমন লোকেরা সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয় বিক্রয় আল্লাহর যিকির, নামায প্রতিষ্ঠা ও যাকাত প্রদান থেকে গাফেল করে না।

অতএব বাজারের সময় হওয়া পর্যন্ত দিনের প্রথম অংশকে আখেরাতের জন্যে নির্দিষ্ট করবে; অর্থাৎ, তখন মসজিদে বসে ওযিফা ইত্যাদি পাঠ করবে। হযরত ওমর (রাঃ) ব্যবসায়ীদেরকে বলতেন ঃ দিনের শুরুকে আখেরাতের জন্যে নির্ধারিত কর এবং এর পরবর্তী সময়কে দুনিয়ার জন্যে রেখে দাও। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ তাই করতেন। এক হাদীসে আছে, রাত ও দিনের ফেরেশতারা ফজর ও আসরের সময় আল্লাহ তাআলার দরবারে সমবেত হয়। তখন সবকিছু জানা সত্ত্বেও আল্লাহ তাদেরকে প্রশ্ন করেন, তোমরা আমার বান্দাদেরকে কি অবস্থায় ছেড়ে এসেছ? ফেরেশতারা বলে ঃ আমরা তাদেরকে নামায পড়ার অবস্থায় ছেড়ে এসেছি। আর যখন তাদের কাছে গিয়েছিলাম, তখনও নামায পড়া অবস্থায় পেয়েছিলাম। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ আমি তোমাদেরকে সাক্ষী করছি– আমি তাদেরকে ক্ষমা করলাম। এর পর ব্যবসায়ী যখন দিনের মধ্যভাগে যোহর কিংবা আসরের আযান শুনবে, তখন অন্য কোন কাজের আগ্রহ না করে সোজা মসজিদের দিকে রওয়ানা হবে। তখন কোন কাজ থাকলে তা পরিত্যাগ করবে। কেননা, জামাতে ইমামের সাথে প্রথম তকবীর না পাওয়া এতবড় ক্ষতি, যা পৃথিবী ও পৃথিবীস্থিত সবকিছু দিয়ে পূরণ করা যাবে না। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের নিয়ম ছিল, তাঁরা আযান হওয়ার সাথে সাথে দোকানে বালক ও যিম্মীদেরকে রেখে মসজিদে চলে যেতেন। তাঁরা নামাযের সময় দোকানের হেফাযত করার জন্যে এই বালক ও যিম্মীদেরকে কিছু মজুরি দিতেন। এভাবেই তাদের জীবিকা নির্বাহ হত।

চতুর্থ, এতটুকুতেই ক্ষান্ত হবে না; বরং বাজারে থাকার সময় সর্বদা আল্লাহ পাককে স্মরণ করবে এবং তসবীহে মশগুল থাকবে। কেননা, বাজারে গাফেলদের মধ্য আল্লাহর স্মরণে অনেক ফযীলত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ গাফেলদের ভেতরে থেকে আল্লাহর যিকিরকারী এমন, যেমন পলাতকদের মধ্যে জেহাদকারী অথবা মৃতদের মধ্যে জীবিত ব্যক্তি। এক রেওয়ায়েতে আছে, শুষ্ক ঘাসের মধ্যে সবুজ সতেজ বৃক্ষ। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেন ঃ যে ব্যক্তি বাজারে এসে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করে, তার জন্যে লক্ষ পুণ্যের সওয়াব লেখা হবে।

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ

وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ

অর্থাৎ, এক আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। তাঁর শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই। তিনি জীবিত করেন ও মৃত্যু দেন। তিনি চিরজীবী– অমর। কল্যাণ তাঁরই হাতে, তিনি সর্ববিষয়োপরি ক্ষমতাবান।

হযরত ইবনে ওমর, সালেম ইবনে আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসে ও অন্য কয়েকজন মনীষী কেবল এই দোয়ার ফযীলত হাসিল করার জন্যে বাজারে যেতেন।

পঞ্চম, বাজার ও ব্যবসায়ের প্রতি এত মোহ পোষণ না করবে যাতে সবার আগে বাজারে যেতে হয় এবং সময় শেষে ফিরতে হয়। অথবা ব্যবসায়ের খাতিরে সমুদ্রে সফর করবে না, এটা মাকরূহ। বলা হয়, যে ব্যক্তি সমুদ্রের সফর করে সে রিযিক অন্বেষণে সীমা ছাড়িয়ে যায়। এক হাদীসে আছে, তিন কাজ– হজ্জ, ওমরা ও জেহাদ ছাড়া অন্য কাজের জন্যে সামুদ্রিক সফর করবে না। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আছ বলতেন ঃ বাজারে প্রথমে প্রবেশ করো না এবং শেষে বের হয়ো না। কারণ, এরূপ করলে শয়তান ডিম-বাচ্চা দেয়। এক হাদীসে আছে– সর্বনিকৃষ্ট স্থান হচ্ছে বাজার এবং বাজারীদের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট সে ব্যক্তি, যে সবার আগে বাজারে প্রবেশ করে এবং সবার শেষে বাজার থেকে বের হয়। এই নিবৃত্তি তখন পূর্ণাঙ্গ হবে, যখন মানুষ জীবিকার একটি পরিমাণ নির্দিষ্ট করে নেয়। যে পরিমাণ অর্জিত হয়ে গেলে সে বাজার থেকে চলে আসবে এবং আখেরাতের ব্যবসায়ে মশগুল হবে। পূর্ববর্তী মনীষীদের নিয়ম এমনি ছিল। তাঁদের কেউ কেউ তিন পয়সা পেয়ে গেলেই বাজার থেকে চলে আসতেন এবং এতেই সন্তুষ্ট থাকতেন। হাম্মাদ ইবনে সালমা রেশমী বস্ত্রের ঝোলা বিক্রয়ের জন্যে সামনে রেখে দিতেন। প্রায় ছয় আনা অর্জিত হয়ে গেলে তিনি ঝোলা তুলে নিয়ে বাড়ী চলে আসতেন।

ষষ্ঠ, কেবল হারাম থেকে আত্মরক্ষা করেই ক্ষান্ত থাকবে না; বরং সন্দেহের স্থান, সন্দেহজনক বিষয়াদি থেকেও বেঁচে থাকবে। এ ব্যাপারে ফতোয়া কি বলে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করবে না। নিজের মনের কাছে ফতোয়া চাইবে। মনে কোন রকম খট্‌কা অনুভব করলে তা থেকে বেঁচে থাকবে। কোন সন্দেহযুক্ত বস্তু সামনে এলে তার অবস্থা লোকের কাছে

জিজ্ঞেস করে জেনে নেবে। অন্যথায় সন্দেহযুক্ত মাল খাওয়া হবে। একবার এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে দুধ উপস্থিত করলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এই দুধ কোথায় পেলে? লোকটি আরজ করল ঃ ছাগলের স্তন থেকে লাভ করেছি। তিনি বললেন ঃ ছাগল কোত্থেকে এল? লোকটি বলল ঃ অমুক জায়গা থেকে। এর পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) দুধ পান করলেন এবং বললেন ঃ আমাদের পয়গম্বর সম্প্রদায়ের প্রতি নির্দেশ রয়েছে, উৎকৃষ্ট মাল ছাড়া খেতে পারব না এবং সৎকাজ ছাড়া কিছু করতে পারব না। তিনি আরও বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকেও তাই নির্দেশ করেছেন, যা পয়গম্বরগণকে করেছেন। সেমতে বলেছেন—

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ۔

অর্থাৎ, মুমিনগণ, তোমরা আমার দেয়া পবিত্র বস্তুসমূহ খাবে।

আর রসূলগণকে বলেছেন—

يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ۔

অর্থাৎ, হে রসূলগণ, পবিত্র বস্তু থেকে খান এবং সৎকর্ম সম্পাদন করুন।

মোট কথা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) সেই দুধের মূল এবং মূলের মূল পর্যন্ত জিজ্ঞেস করেছেন। এর বেশী জিজ্ঞেস করেননি। কেননা, এর বেশীতে জটিলতা রয়েছে। আমরা সত্বরই হালাল ও হারাম অধ্যায়ে লেখব যে, এই প্রশ্ন করা কোথায় ওয়াজিব হয়। কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর খেদমতে পেশকৃত প্রত্যেক বস্তু সম্পর্কে এই প্রশ্ন করতেন না। এতে বুঝা যায়, সর্বত্র এই প্রশ্ন করা জরুরী নয়। যার সাথে লেনদেন করবে সে জালেম, চোর, খেয়ানতকারী অথবা সুদখোর কিনা দেখে লেনদেন করবে। এরূপ হলে তার সাথে লেনদেন করবে না। কেননা, এরূপ ব্যক্তির সাথে লেনদেন করলে তার কুকর্মে সাহায্য করা হবে।

সারকথা, এখন যমানা খুব নাজুক। তাই ব্যবসায়ীর উচিত মানুষকে দু'ভাগে ভাগ করে নেয়া। এক ভাগের সাথে লেনদেন করবে এবং এক ভাগের সাথে করবে না। যাদের সাথে লেনদেন করবে, তারা তুলনামূলকভাবে কম হওয়া হওয়া উচিত। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ এক ছিল সত্য যুগ। তখন মানুষ যদি বাজারে গিয়ে জিজ্ঞেস করত, কার সাথে লেনদেন করব? তখন উত্তর পেত, যার সাথে ইচ্ছা লেনদেন কর। এর পর এমন যুগ এল যখন উত্তরে বলা হত, যার সাথে ইচ্ছা লেনদেন কর; কিন্তু

অমুক অমুকের সাথে করো না। এর পর আর এক যুগ এল, যখন বলা হত, কারও সাথে লেনদেন করো না, কিন্তু অমুক অমুকের সাথে কর। এখন আমার ভয় হচ্ছে, ভবিষ্যতে এমনও থাকবে না। বলাবাহুল্য, এই বুযুর্গ যা আশংকা করতেন, এখন তা বিদ্যমান রয়েছে।

সপ্তম, প্রত্যেক লেনদেনকারীর সাথে নিজের যাবতীয় অবস্থার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। কেননা, কেয়ামতের দিন যাবতীয় কথা ও কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। বলা হয়, কেয়ামতে ব্যবসায়ীকে এমন সবার সাথে দাঁড় করানো হবে, যাদের সাথে সে লেনদেন করেছে। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আমি এক ব্যবসায়ীকে তার মৃত্যুর পর স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলাম ঃ আল্লাহ্ তাআলা তোমার সাথে কি ব্যবহার করেছেন? সে বলল ঃ আমার সামনে পঞ্চাশ হাজার আমলনামা খুলে দিয়েছেন। আমি আরজ করলাম, এই সবগুলো গুনাহ্? এরশাদ হল- এগুলো তোমার লেনদেন। যাদের সাথে লেনদেন করেছ তাদের প্রত্যেকের আমলনামা আলাদা আলাদা এবং এতে আদ্যোপান্ত তোমার ও তাদের লেনদেন লিখিত রয়েছে। এ পর্যন্ত ন্যায়বিচার ও অনুগ্রহ প্রদর্শনের বিষয় বর্ণিত হল। সুতরাং যে ব্যবসায়ী কেবল ন্যায়বিচার করে ক্ষান্ত থাকবে, সে সৎলোকদের মধ্যে গণ্য হবে। আর যে ন্যায়বিচারের সাথে অনুগ্রহও প্রদর্শন করবে, সে নৈকট্যশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। যদি কেউ এই উভয়টির সাথে ধর্মীয় ওযিফাসমূহ- যা পাঁচটি পরিচ্ছেদে লিখিত হয়েছে, পালন করে যায়, তবে সে সিদ্দীকগণের মধ্যে গণ্য হবে।

দ্বাদশ অধ্যায়

হালাল ও হারাম

রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেনঃ

طلب الحلال فريضة على كل مسلم অর্থাৎ, হালাল উপার্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয, কিন্তু এ ফরযটি বুঝা অন্যান্য ফরযের তুলনায় বিবেকের জন্যে যেমন কঠিন, তেমনি এটা পালন করা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর অত্যন্ত কঠিন। ফলে এ ফরযের জ্ঞান ও আমল উভয়টিই অধিকাংশ লোক প্রায় ভুলতে বসেছে। এ জ্ঞান সূক্ষ্ম হওয়ার কারণে আমল আরও বিলীন হয়ে যাচ্ছে। কারণ, মূর্খেরা মনে করে নিয়েছে, হালাল দুনিয়া থেকে পুরাপুরি বিদায় নিয়েছে এবং হালাল পর্যন্ত পৌঁছার পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয়ে গেছে। এখন পবিত্র বলতে নদীর পানি এবং কারও মালিকানাধীন নয় এমন যমীনের উদ্ভিদ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। এ দু'টি ছাড়া আর যত মাল আছে, তাতে লেনদেনের অনিয়মের কারণে কলুষতা এসে গেছে। যেহেতু পানি ও ঘাস নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা কঠিন, তাই হারামের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়া ছাড়া আর কি করা যেতে পারে? এ ধারণার বশবর্তী হয়ে মূর্খেরা দ্বীনের এ ফরযটি পেছনে নিক্ষেপ করেছে এবং মাল ও ধন-সম্পদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের কাজটি বর্জন করে বসেছে। অথচ বাস্তব অবস্থা এরূপ নয়। যা হালাল তা সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট, হারামও প্রকাশ্য এবং আলাদা। এতদুভয়ের মাঝখানে রয়েছে সন্দিগ্ধ বস্তুসমূহ। তবে অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে এ তিনটি বিষয় একে অপরের সাথে মিলিত থাকে। যেহেতু এই সর্বশেষ বেদআতের ক্ষতি ধর্মীয় ক্ষেত্রে ব্যাপক হয়ে পড়েছে এবং এটা দাবানলের মত মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে, তাই এটা দূর করার প্রচেষ্টা চালানো নেহায়েত জরুরী এবং হালাল হারাম ও সন্দিগ্ধ বস্তুসমূহের পারস্পরিক পার্থক্য ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। নিম্নে আমরা সাতটি পরিচ্ছেদে এ বিষয়বস্তু বর্ণনা করব।

প্রথম পরিচ্ছেদ

হালালের ফযীলত ও হারামের নিন্দা

এ সম্পর্কে কোরআন পাকের কয়েকটি আয়াত নিম্নরূপ ঃ

كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا অর্থাৎ, তোমরা খাও পবিত্র বস্তু এবং সৎকর্ম সম্পাদন কর। এ আয়াতে আমল করার পূর্বে পবিত্র বস্তু খাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে, এখানে পবিত্র বস্তু বলে হালাল সামগ্রী বুঝানো হয়েছে।

لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ অর্থাৎ, তোমরা একে অপরের ধনসম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না। এখানে অন্যায়ভাবে খাওয়া অর্থে হারাম ভক্ষণ বোঝানো হয়েছে।

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ـ

অর্থাৎ, যারা এতীমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করে তাদের পেটে আগুন ছাড়া আর কিছু ভরে না।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ ـ

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং যে সুদ অবশিষ্ট রয়েছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা ঈমানদার হও।

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ـ

অর্থাৎ, যদি তোমরা তা না কর, তবে আল্লাহ ও রসূলের সাথে যুদ্ধ করতে তৈরী হয়ে যাও।

وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوْسُ اَمْوَالِكُمْ অর্থাৎ, যদি তোমরা তওবা কর, তবে তোমরা পাবে তোমাদের মূলধন।

مَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ অর্থাৎ, যে আবার সুদ নেবে সেই হবে দোযখী।

প্রথমে সুদ খাওয়া আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করার শামিল এবং পরিণামে জাহান্নামে প্রবেশের কারণ বলা হয়েছে। হালাল ও হারাম সম্পর্কে এছাড়া আরও অনেক আয়াত রয়েছে। এখন এ সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করা হচ্ছে। হযরত ইবনে মসঊদের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ হালাল অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। কোন কোন আলেমের মতে এখানে জ্ঞানের অর্থ হালাল ও হারামের জ্ঞান এবং উভয় হাদীসের উদ্দেশ্যই এক। রসূলে করীম (সাঃ) আরও বলেন ঃ যে ব্যক্তি তার পরিবার-পরিজনকে হালাল সামগ্রী উপার্জন করে খাওয়ায়, সে যেন আল্লাহ তাআলার পথে জেহাদ করে। আর যে সাধুতা সহকারে হালাল অর্জন করে, সে শহীদগণের স্তরে থাকবে। আরও বলা হয়েছে ঃ

من اكل الحلال اربعين يوما نور الله قلبه واجرى ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه -

যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন হালাল খাদ্য আহার করে, আল্লাহ তার অন্তর আলোকিত করেন এবং তার অন্তর থেকে প্রজ্ঞার ঝরণা তার মুখে প্রবাহিত করেন।

বর্ণিত আছে, হযরত সা'দ (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আবেদন করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার জন্যে দোয়া করুন, যাতে আল্লাহ তাআলা আমার দোয়া কবুল করেন। তিনি বললেন ঃ اطيب طعمتك تستجب دعوتك অর্থাৎ, তোমার খাদ্য পবিত্র ও হালাল কর, তা হলেই তোমার দোয়া কবুল হবে। রসূলে আকরাম (সাঃ) একবার দুনিয়ালোভীদের আলোচনা করার পর বললেন ঃ অনেক বিক্ষিপ্ত মলিন মুখ ও ধূলি ধূসরিত ব্যক্তি রয়েছে, যাদের পানাহার হারাম, উপার্জন হারাম এবং হারাম দ্বারা লালিত পালিত, তারা হাত তুলে বলে ঃ হে পালনকর্তা, হে পালনকর্তা! তাদের দোয়া কিরূপে কবুল হতে পারে? হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলার এক ফেরেশতা প্রত্যেক রাতে বায়তুল মোকাদ্দাসে ঘোষণা করে– যে ব্যক্তি হারাম খায়, তার ফরয, নফল কিছুই কবুল হবে না। তিনি আরও বলেন ঃ যে ব্যক্তি একটি কাপড় দশ দেরহাম দিয়ে ক্রয় করে এবং তার ভেতরে এক দেরহাম হারাম থাকে, তার দেহে যে পর্যন্ত সে কাপড় থাকবে আল্লাহ তাআলা তার নামায কবুল করবেন না। আরও বলেন ঃ হারাম

থেকে উৎপন্ন মাংসের জন্যে দোযখই অধিক উপযুক্ত। আরও বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোথা থেকে সম্পদ উপার্জন করে, তার পরওয়া করে না, আল্লাহ তাআলা তাকে কোন্ পথ দিয়ে জাহান্নামে ঢোকাবেন, তারও পরওয়া করবেন না। আরও বলা হয়েছে–

যে ব্যক্তি হালাল উপার্জন করতে করতে সন্ধ্যায় ক্লান্ত হয়ে যায়, তার রাত এমনভাবে অতিবাহিত হবে যে, তার গোনাহ মাফ করে দেয়া হবে এবং ভোরে যখন সে উঠবে, তখন আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন। আরও বলা হয়েছে– যে ব্যক্তি গোনাহের মাধ্যমে সম্পদ সৃষ্টি করে তা খয়রাত করবে অথবা আল্লাহর পথে ব্যয় করবে, আল্লাহ তাআলা তার যাবতীয় ব্যয়কে একত্রিত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। এক হাদীসে আছে– সুদের এক দেরহাম আল্লাহ তাআলার কাছে মুসলমান অবস্থায় ত্রিশটি যিনার চেয়ে গুরুতর। আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত এক হাদীসে বলা হয়েছে– পাকস্থলী দেহের চৌবাচ্চা। শিরা-উপশিরা তৃষ্ণার্ত হলে এই চৌবাচ্চার দিকে যায়। পাকস্থলী সুস্থ হলে শিরাগুলোও সুস্থতা সহকারে পানি পান করে ফিরে আসে। আর পাকস্থলী অসুস্থ হলে শিরাসমূহ অসুস্থ হয়ে ফিরে। দ্বীনদারীর জন্যে খাদ্য যেমন, ইমারতের জন্যে ভিত্তি তেমনি। ভিত্তি মজবুত ও সোজা স্থাপিত হলে ইমারত সোজা ও উঁচু হবে। পক্ষান্তরে ভিত্তি বাঁকা এবং দুর্বল হলে ইমারত ভূমিসাৎ হয়ে যাবে।

এ সম্পর্কে বিজ্ঞজনদের উক্তি রয়েছে। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) একবার নিজের গোলামের উপার্জিত দুধ পান করেছিলেন। এর পর গোলামকে জিজ্ঞেস করলে সে বলল ঃ আমি এক সম্প্রদায়ের জন্যে ভবিষ্যত গণনা করেছিলাম, তারা আমাকে এই দুধ দিয়েছিল। একথা শুনে হযরত আবু বকর (রাঃ) গলায় অঙ্গুলি ঢুকিয়ে বমি করতে শুরু করলেন। এমন কি গোলামের ধারণা হল তাঁর দম বের হয়ে যাবে। অতঃপর তিনি বললেন ঃ ইলাহী, আমি সেই দুধের জন্যে ক্ষমাপ্রার্থী, যা আমার শিরা উপশিরায় মিশে গেছে। অনুরূপভাবে হযরত ওমর (রাঃ) একবার যাকাতের উটের দুধ পান করে ফেলেন। পরে জানতে পেরে গলায় অঙ্গুলি ঢুকিয়ে বমি করে দেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ তোমরা শ্রেষ্ঠ এবাদত থেকে গাফেল, যার নাম হারাম থেকে বেঁচে থাকা। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন ঃ যদি তোমরা নামায পড়তে পড়তে ধনুকের মত বাঁকা এবং রোযা রাখতে রাখতে লাকড়ির মত কৃশ

হয়ে যাও, তবুও আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের এসব আমল কবুল করবেন না, যে পর্যন্ত হারাম থেকে বেঁচে না থাক। হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম বলেন ঃ যে যা পেয়েছে তা এভাবেই পেয়েছে যে, পেটে যা ফেলেছে ভেবে চিন্তে ফেলেছে। হযরত ফোযায়ল বলেন ঃ যে ব্যক্তি তার আহার্য বুঝে নেয়, আল্লাহ্ তা'আলা তার নাম সিদ্দীকগণের মধ্যে লিপিবদ্ধ করে দেন। অতএব হে মিসকীন, যখন তুমি রোযার ইফতার কর, তখন দেখে নাও কার কাছে ইফতার করছ। হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহামকে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি যমযমের পানি পান করেন না কেন? তিনি বললেন ঃ আমার নিজের বালতি থাকলে পান করতাম। হযরত সুফিয়ান সওরী বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যে হারাম মাল ব্যয় করে, সে সেই ব্যক্তির মত, যে নিজের বস্ত্র পেশাব দ্বারা পবিত্র করে। অথচ পাক পানি ছাড়া বস্ত্র পাক হয় না। তেমনি হালাল মাল ছাড়া অন্য কিছু গোনাহ্ দূর করে না। হযরত সহল তস্তরী (রহঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন সন্দিগ্ধ বস্তু ভক্ষণ করে, তার অন্তর কাল হয়ে যায়। কোরআনের আয়াত– كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ এর অর্থও তাই। একবার ফোযায়ল ইবনে আয়ায, ইবনে ওয়ায়না ও ইবনে মোবারক (রহঃ) মক্কা মোয়াযযমায় ওহায়ব ইবনে ওবায়েদ (রহঃ)-এর কাছে সমবেত হন এবং খোরমার কথা আলোচনা করেন। ওহায়ব বললেন ঃ খোরমা আমার খুব প্রিয়, কিন্তু আমি তা খাই না। কেননা, মক্কার খেজুর বাগানগুলি যুবায়দা প্রমুখের বাগানের সাথে মিশে গেছে। একথা শুনে ইবনে মোবারক বললেন ঃ যদি আপনি এত চুলচেরা দেখেন, তবে রুটি খাওয়াও কঠিন হয়ে পড়বে। ওহায়ব কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ গম উৎপাদনের ভূখন্ড আশেপাশের ভূখন্ডের সাথে মিশে গেছে। একথা শুনতেই ওহায়ব বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন। সুফিয়ান সওরী ইবনে মোবারককে বললেন ঃ তুমি এ লোকটিকে মেরে ফেলেছ। তিনি বললেন ঃ আমার উদ্দেশ্য ছিল তিনি যেন এই চুলচেরা বিশ্লেষণ ছেড়ে দেন। ওহায়বের জ্ঞান ফিরে এলে তিনি সারাজীবন রুটি খাবেন না বলে কসম খেলেন। এর পর তিনি ক্ষুধা লাগলে দুধ পান করে নিতেন। একবার তাঁর জননী দুধ আনলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এই দুধ কোথাকার? মা বললেন ঃ অমুক ব্যক্তির ছাগলের দুধ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ ছাগলটি তার কাছে কোত্থেকে এল এবং মূল্য কোথা থেকে

দিল? মা এসব কথা বলে দেয়ার পর তিনি দুধের পাত্রটি মুখের কাছে নিলেন, কিন্তু বললেন ঃ আরেকটি কথা রয়ে গেছে। এই বকরী কোথায় ঘাস খেত? মা চুপ হয়ে গেলেন। তিনিও দুধ পান করলেন না। কারণ ছাগলটি এমন জায়গায় ঘাস খেত, যেখানে মুসলমানদের কিছু হক ছিল। স্নেহময়ী জননী বললেন ঃ পান করে নাও। আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করবেন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহর নাফরমানী করে আল্লাহর কাছে মাগফেরাত চাইব– এটা আমার কাছে ভাল মনে হয় না। অর্থাৎ, পান করলে তাঁর নাফরমানী যেখানে নিশ্চিত, সেখানে ইচ্ছা করে নাফরমানী করার পর ক্ষমা চাওয়া ঠিক নয়। মোট কথা, পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ সন্দিগ্ধ বস্তু থেকে এভাবেই গা বাঁচিয়ে চলতেন।

হালাল ও হারামের প্রকারভেদ ঃ প্রকাশ থাকে যে, হালাল ও হারামের বিস্তারিত বিবরণ ফেকাহর কিতাবসমূহে বর্ণিত রয়েছে। সত্যান্বেষী ব্যক্তি যদি তার খাদ্য তালিকা ফতোয়ার দৃষ্টিতে হালাল বস্তু দ্বারা তৈরী করে এবং এ ছাড়া অন্য কিছু না খায়, তবে তার জন্যে এই দীর্ঘ আলোচনার কোন প্রয়োজন নেই, কিন্তু যে ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকার ও বিভিন্ন পন্থায় খাদ্য সংগ্রহ করে, তার হালাল-হারাম বিশদভাবে জানা প্রয়োজন। এই বিশদ বিবরণ আমি ফেকাহ গ্রন্থের সাহায্যেই লিপিবদ্ধ করেছি। এখানে সংক্ষেপে হালাল সম্পদ অর্জনের উপায়সমূহ বর্ণনা করব।

সম্পদ দু'প্রকার– সত্তাগত হারাম অথবা অর্জনে ত্রুটির কারণে হারাম। প্রথম প্রকার যেমন মদ, শূকর ইত্যাদি। এর বিবরণ হচ্ছে, পৃথিবীতে খাদ্য জাতীয় বস্তু তিন প্রকার ঃ (১) খনিজ পদার্থ, যেমন, লবণ, মাটি ইত্যাদি, (২) উদ্ভিদ জাতীয় এবং (৩) প্রাণী জাতীয়। খনি থেকে নির্গত বস্তুসমূহ ক্ষতিকর বিধায় হারাম। কোন কোন বস্তু বিষতুল্য। রুটি খাওয়া ক্ষতিকর হলে তা-ও হারাম হত। মাটি খাওয়াও ক্ষতির কারণেই হারাম। এ থেকে বুঝা গেল, খনিজ পদার্থের কোন অংশ শুরবা অথবা কোন তরল খাদ্যে পড়ে গেলে খাদ্য হারাম হবে না। উদ্ভিদের মধ্যে যেসব বস্তু বুদ্ধি নাশ করে; যেমন– ভাং, গাঁজা ইত্যাদি, অথবা জীবননাশ করে; যেমন– বিষবৃক্ষ অথবা স্বাস্থ্য বিনাশ করে, সেগুলো হারাম। মোট কথা, শরাব ও মাদক দ্রব্য ছাড়া অন্যগুলো কোন না কোন কারণে হারাম হয়, কিন্তু মাদক দ্রব্যের ক্ষেত্রে তা নয়। মাদক দ্রব্যের অল্প খেলেও হারাম, তাতে নেশা হোক বা না হোক। এর এক কারণ সত্তাগত

নাপাকী এবং অন্য কারণ গুণগত অর্থাৎ মাদকতা সৃষ্টিকারী উগ্রতা। বিষাক্ত বস্তু থেকে যদি ক্ষতির গুণ দূর হয়ে যায়– পরিমাণ হ্রাস করার কারণে অথবা অন্য বস্তু মিশ্রিত করার কারণে, তবে তা হারাম হবে না।

প্রাণী দু'প্রকার– খাদ্য ও অখাদ্য। এর বিস্তারিত বিবরণ ফেকাহর খাদ্য অধ্যায়ে উদ্ধৃত রয়েছে। যেসব প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল, সেগুলোও শরীয়তসম্মতভাবে যবেহ করা শর্ত। শিকার ও যবেহ অধ্যায়ে এসব বিষয় বর্ণিত হয়েছে। যেসব প্রাণী শরীয়তসম্মতভাবে যবেহ করা হয় না অথবা মরে যায়, সেগুলো হারাম। তবে টিড্ডি ও মাছ হালাল। স্বভাবগত অপছন্দের কারণে মাছি, বিচ্ছু ইত্যাদি রক্তহীন প্রাণী মাকরূহ। মরার কারণে এগুলো নাপাক হয় না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আদেশ করেছেন, মাছি খাদ্যে পড়ে গেলে তা পুরোপুরি ডুবিয়ে ফেলে দাও। খাদ্য কোন সময় গরম থাকে, ফলে মাছি পড়ার সাথে সাথে মরে যায়। যদি কোন পিঁপড়া অথবা মাছি ব্যঞ্জনের পাত্রে রান্না হয়ে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে সে পাত্রের সমস্ত ব্যঞ্জন ফেলে দেয়া জরুরী নয়।

যেসব প্রাণী খাওয়া হয়, শরীয়ত মত যবেহ করলেও সেগুলোর সকল অঙ্গ খাওয়া হালাল হয় না; বরং রক্ত, মল এবং যা যা নাপাক সব হারাম। দ্বিতীয়তঃ যে সম্পদ অর্জনে ত্রুটির কারণে হারাম হয় তার বর্ণনা সুবিস্তৃত। এ ধরনের সম্পদকে ছয় ভাগে ভাগ করা যায়।

প্রথম, মালিকবিহীন মাল। যেমন– খনি থেকে কিছু বের করা, পতিত জমি আবাদ করা, অন্যের মালিকানায় শিকার করা, জঙ্গল থেকে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করা, নদীর পানি নেয়া। এসব সামগ্রীতে কারও মালিকানার সম্পর্ক না থাকলে এগুলো হালাল এবং যে এগুলো সংগ্রহ করবে, সে মালিক হয়ে যাবে।

দ্বিতীয়, যে বস্তু এমন লোকদের কাছ থেকে জবরদস্তি নেয়া হয়, যাদের কাছ থেকে নেয়াতে বাধা নেই। যেমন, যুদ্ধ থেকে প্রাপ্ত গনীমত সামগ্রী, অথবা যুদ্ধ ছাড়াই কাফেরদের কাছ থেকে প্রাপ্ত মালে ফায়। এই মাল তখনও হালাল হয়, যখন এ থেকে এক পঞ্চমাংশ বের করে হকদারদের মধ্যে ন্যায়ভাবে বণ্টন করা হয়।

তৃতীয়, যে বস্তু এমন লোকদের কাছ থেকে জবরদস্তি নেয়া হয়, যারা ওয়াজিব প্রাপ্য আদায় করে না এবং সম্মতি ছাড়াই নেয়ার যোগ্য হয়ে

যায়। এই সব বস্তুও কয়েকটি শর্তে হালাল; যখন হকদার হওয়ার কারণ পূর্ণ হয়, যখন ওয়াজিব পরিমাণেই নেয়া হয়, যখন বিচারক, বাদশাহ অথবা হকদার নেয়। এসব শর্ত পূর্ণ হলে যেসব বস্তু নেয়া হবে, তা হালাল।

চতুর্থ, যে মাল বিনিময়ের আকারে মালিকের সম্মতিক্রমে নেয়া হয়। এটা তখন হালাল হয়, যখন উভয় বিনিময়ের শর্তাবলী, ক্রেতা বিক্রেতা এবং প্রস্তাব ও গ্রহণের শর্তাবলী ঠিকভাবে পালন করা হয় এবং অন্যায় শর্তসমূহ থেকে আত্মরক্ষা করা হয়। এসব শর্ত ফেকাহর কিতাবুল বুয়ুতে সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে।

পঞ্চম, যে মাল মালিকের সম্মতিক্রমে বিনিময় ছাড়াই নেয়া হয়। এটা তখন হালাল হয়, যখন মাল, দাতা গ্রহীতা ও দানের শর্ত পূর্ণ করা হয় এবং কোন ওয়ারিসের ক্ষতি না হয়। হেবা, ওসিয়ত ও সদকা অধ্যায়ে এর বিস্তারিত বিবরণ বিদ্যমান রয়েছে।

ষষ্ঠ, যে মাল ইচ্ছা ছাড়াই মানুষ প্রাপ্ত হয়; যেমন, মৃতের ত্যাজ্য সম্পত্তি। এটা তখন হালাল হয়, যখন মৃত ব্যক্তি হালাল উপায়ে সেই সম্পত্তি অর্জন করে। এছাড়া ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে প্রথমে তার কর্জ ও ওসিয়ত আদায় হয়ে যায়, ওয়ারিসদের অংশ ন্যায়ভাবে বণ্টন হয় এবং যাকাত, হজ্জ, কাফফারা ইত্যাদি ওয়াজিব হক আদায় হয়। ফেকাহর কিতাবুল ওসায়া ও কিতাবুল ফরায়েযে এর বিবরণ দেয়া হয়েছে।

মোট কথা, আমরা আমদানীর সবগুলো উপায়ের দিকে সংক্ষেপে ইশারা করলাম যাতে সত্যান্বেষী ব্যক্তি বুঝে নেয় যে, তার আমদানী বিভিন্ন উপায়ে হলে এসব বিষয় তাকে জেনে নিতে হবে। সে প্রয়োজনীয় বিধানসমূহ আলেমদেরকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নেবে। জিজ্ঞাসা না করে কিছু করবে না। কেননা, কেয়ামতের দিন যেমন আলেমকে প্রশ্ন করা হবে, তুমি তোমার এলমের খেলাফ কেন করলে, তেমনি মূর্খকেও বলা হবে, তুমি তোমার মূর্খতা আঁকড়ে রইলে কেন, শিখে নিলে না কেন? তুমি কি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এই এরশাদ জানতে না যে, জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয!

হালাল ও হারামের স্তরভেদ ঃ প্রকাশ থাকে যে, যা হারাম তাই ভ্রষ্ট, কিন্তু কতক হারামের মধ্যে ভ্রষ্টতা বেশী এবং কতক হারামের মধ্যে

অল্প। অনুরূপভাবে যা হালাল তাই পাক সাফ, কিন্তু কোন কোন হালাল অধিক পাক এবং কতক অল্প। উদাহরণতঃ ডাক্তার বলে ঃ সকল মিষ্টি গরম, কিন্তু কতক মিষ্টি অধিক গরম যেমন, চিনি এবং কতক কম গরম, যেমন গুড়। আমরা এখানে হারাম থেকে বাঁচার চারটি স্তর উল্লেখ করেছি।

প্রথম, আদেল ব্যক্তির ওয়ারা তথা পরহেযগারী। এটা সেই হারাম থেকে বেঁচে থাকার নাম, যাতে লিপ্ত হলে মানুষ ফাসেক হয়ে যায় এবং আদেল থাকে না। এটা জাহান্নামে দাখিল হওয়ার কারণ। এই পরহেযগারী তখন অর্জিত হয়, যখন ফেকাহবিদরা যাকে হারাম বলেন তা থেকে আত্মরক্ষা করা হয়।

দ্বিতীয়, সালেহীন তথা সৎকর্মপরায়ণদের পরহেযগারী। এটা সন্দেহযুক্ত হারাম থেকে আত্মরক্ষার নাম।

তৃতীয়, মুত্তাকী তথা খোদাভীরুদের পরহেযগারী। এটা এমন বিষয় থেকে বেঁচে থাকার নাম, যা ফতোয়াদৃষ্টে হারাম নয় এবং হালাল হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ নেই, কিন্তু হারামের দিকে পৌঁছে দেয়ার আশংকা রয়েছে। অর্থাৎ,, যেসব বিষয়ে কোন ভয় নেই, সেগুলো ভয়ের বিষয়সমূহের কারণে বর্জন করা। হাদীসে বিষয়টি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে–

لايبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لاباس به مخافة مما به باس -

অর্থাৎ, বান্দা মুত্তাকীর স্তরে পৌঁছতে পারে না, যে পর্যন্ত সে দোষমুক্ত বিষয়ের ভয়ে দোষহীন বিষয় বর্জন না করে।

চতুর্থ, সিদ্দীকগণের পরহেযগারী। এটা এমন বিষয় থেকে বেঁচে থাকার নাম, যা দোষমুক্ত নয় এবং তদ্দ্বারা দোষমুক্ত বিষয় পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ারও আশংকা নেই, কিন্তু একান্তভাবে আল্লাহর জন্যে করা হয় না অথবা যাতে তাঁর এবাদতে শক্তি অর্জনের নিয়ত থাকে না। সিদ্দীকগণ এরূপ বিষয় থেকে বেঁচে থাকতেন।

বর্ণিত প্রথম স্তরের হারামেরও কয়েকটি স্তর আছে। উদাহরণতঃ ফাসেদ ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে কারও মাল নেয়া তেমন হারাম নয়; যেমন

হারাম কারও কাছ থেকে মাল ছিনিয়ে নেয়া। বরং ছিনিয়ে নেয়া মাল অধিক হারাম। এই পার্থক্য এভাবে জানা যায়, শরীয়ত যে সমস্ত নিষিদ্ধ বিষয়ে কঠোরতা, শাস্তিবাণী উচ্চারণ ও তাকিদ বেশী করেছে, সেগুলো অবলম্বন করা অধিক গোনাহ এবং যেখানে কঠোরতা কম, সেখানে গোনাহ কম। তওবা অধ্যায়ে সগীরা ও কবীরা গোনাহের পার্থক্য প্রসঙ্গে বিষয়টি আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। অনুরূপভাবে যদি কোন বস্তু কোন ফকীর, সাধু অথবা এতীমের কাছ থেকে জবরদস্তি ছিনিয়ে নেয়া হয়, তা কোন সবল, ধনী অথবা ফাসেকের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়ার তুলনায় অধিক ভ্রষ্টতাপূর্ণ। সুতরাং বিষয় থেকে গাফেল হওয়া উচিত নয়। এ প্রসঙ্গে এ তত্ত্বটিও স্মর্তব্য, যদি গোনাহগারদের বিভিন্ন স্তর না থাকত তবে দোযখের স্তরও ভিন্ন ভিন্ন হত না।

দ্বিতীয় স্তরের হারামের উদাহরণ হচ্ছে সন্দিগ্ধ বিষয়সমূহ, যা থেকে বেঁচে থাকা ওয়াজিব নয়; বরং মোস্তাহাব। তবে কোন কোন সন্দিগ্ধ বিষয় থেকে বেঁচে থাকাও ওয়াজিব। এগুলো হারামের অন্তর্ভুক্ত। কোন কোন সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকা মাকরূহ। এ থেকে বেঁচে থাকা ওয়াসওয়াসা তথা শংকাশীলদের পরহেযগারী। যেমন– কোন ব্যক্তি এই আশংকায় শিকার করে না যে, সম্ভবতঃ শিকারটি কোন মানুষের হাত থেকে ছুটে চলে এসেছে। কাজেই শিকার করলে অন্যের মালিকানায় হস্তক্ষেপ করা হবে। এ ধরনের সাবধানতার নাম ওয়াসওয়াসা। সন্দিগ্ধ বিষয়ের অধ্যায়ে এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত বর্ণনা করা হবে।

তৃতীয় স্তরের পরহেযগারীর প্রমাণ হচ্ছে রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর এই উক্তি–

لايبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لاباس به مخافة مما به باس ـ

অর্থাৎ, বান্দা মুত্তাকীর স্তরে পৌঁছবে না যে পর্যন্ত দোষযুক্ত বিষয়ে লিপ্ত হওয়ার আশংকায় দোষমুক্ত বিষয় বর্জন না করে।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ আমরা হালালের নবম দশম অংশ বর্জন করতাম এই আশংকায় যে, কোথাও হারামে লিপ্ত না হয়ে পড়ি। হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন ঃ পূর্ণ হওয়ার উপায় হল বিন্দু পরিমাণ বিষয়েও তাকওয়া অবলম্বন করা । এমন কি, হালাল মনে করা হয়– এমন কোন

কোন বিষয়কেও হারাম হওয়ার ভয়ে বর্জন করা। এই বর্জন তাকওয়াকারী ও দোযখের আগুনের মাঝে আড়াল হয়ে যাবে। এ কারণেই জনৈক বুযুর্গ এক ব্যক্তির কাছে একশ' দেরহাম পাওনা ছিলেন। লোকটি তা নিয়ে এলে তিনি নিরানব্বই দেরহাম গ্রহণ করলেন। কোথাও বেশী হয়ে যায়– এই আশংকায় তিনি সম্পূর্ণ দেরহাম নিলেন না। জনৈক ব্যবসায়ী বুযুর্গ যখন অন্যের কাছ থেকে নিজের প্রাপ্য নিতেন, তখন একরতি কম নিতেন এবং যখন অপরকে দিতেন, তখন বেশী দিতেন। যেসব বিষয়কে মানুষ সাধারণতঃ কিছু মনে করে না এবং চোখ বন্ধ করে রাখে, সেগুলো থেকে বেঁচে থাকাও এ পর্যায়ের পরহেযগারী। যদিও ফতোয়ার দৃষ্টিতে এগুলো হালাল, কিন্তু একবার দরজা খুলে গেলে মানুষ অন্য গুরুতর কাজও নির্দ্বিধায় করে নিতে পারে। এমনি এক ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে আলী ইবনে মা'বাদ (রহঃ) বলেন ঃ আমি একটি ভাড়ার ঘরে বসবাস করতাম। একবার একটি চিঠি লেখে দেয়ালের মাটি দিয়ে চিঠিটি শুকাতে চাইলাম, কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলাম, দেয়াল আমার মালিকানাধীন নয়, কিন্তু আমার মন (নফস) বলে উঠল ঃ এটুকু মাটির অস্তিত্বই কি! সেমতে আমি মাটি নিয়ে কাজ সেরে নিলাম। এর পর ঘুমালে স্বপ্ন দেখলাম, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলছে ঃ মিয়া সাহেব, যে বলে এতটুকু মাটির হাকিকত কি? তার অবস্থা আগামীকল্য জানতে পারবে। এর অর্থ সম্ভবতঃ কেয়ামতে এরূপ ব্যক্তি মুত্তাকীদের মর্তবা পাবে না। এই অর্থ নয় যে, এ কাজের জন্যে কোন আযাব ভোগ করতে হবে। এ ধরনের আর একটি বর্ণনা– খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) এর কাছে বাহরাইন থেকে মেশক এলে তিনি বললেন ঃ আমার মনে হয়, কোন মহিলা এই মেশ্‌ক মেপে এর পর তা মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করলে ভাল হত। তাঁর স্ত্রী আতেকা বললেন ঃ আমি মাপতে পারি। হযরত ওমর কোন জওয়াব না দিয়ে আবার কথাটির পুনরাবৃত্তি করলেন। আতেকা আবার বললেন ঃ আমি মাপতে পারি। হযরত ওমর বললেন ঃ আমি চাই না, তুমি মাপার পর নিক্তির ধূলিকণা নিজের ঘাড়ে মেখে নাও । যার ফলে অন্য মুসলমানদের তুলনায় এই মেশ্‌ক দ্বারা আমি অধিক লাভবান হই। খলীফা হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (রহঃ)-এর সামনে মুসলমানদের জন্যে মেশ্‌ক মাপা হচ্ছিল। তিনি নিজের নাক বন্ধ করে নিলেন, যাতে সুগন্ধি প্রবেশ না করে। লোকেরা এই অবান্তর কাজের কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন

ঃ মেশ্‌কের উপকারিতা তো সুগন্ধিই। আমি অন্যের চেয়ে বেশী উপকার লাভ করব কেন? শৈশবে হযরত ইমাম হুসাইন (আঃ) যাকাতের খোরমা থেকে একটি খোরমা হাতে তুলে নিলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ ছিঃ ছিঃ অর্থাৎ, রেখে দাও।

চতুর্থ স্তরের পরহেযগারী হচ্ছে সিদ্দীকগণের পরহেযগারী । তাঁদের মতে যে বস্তু আল্লাহ্‌র জন্যে নয় তাই হারাম। তাঁরা এই আয়াত অনুযায়ী আমল করেন–

قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِىْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ

অর্থাৎ, আপনি বলুন আল্লাহ। এর পর তাদেরকে তাদের বাজে কথা নিয়ে খেলা করতে দিন।

সিদ্দীক তারা, যারা আল্লাহ্‌কে এক বলে এবং কামনা বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে একান্ত ভাবে তাঁরই জন্য নিবেদিত থাকে। তাঁরা গোনাহের কাজ করেন না; পরন্তু এমন কাজও করেন না, যার মূলে কোন গোনাহ মিলিত থাকে । সেমতে হযরত বিশরে হাফী (রহঃ) শাসকবর্গের খনন করা খালের পানি পান করতেন না। কেননা, খাল পানি প্রবাহিত হওয়ার এবং তাঁর কাছে পৌছার কারণ ছিল। যদিও পানি স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে বৈধ, কিন্তু এতে এমন খাল দ্বারা উপকার লাভ করা হত, যা হারাম অর্থে খনন করা হয়েছিল।

মোট কথা, পরহেযগারীর একটি হচ্ছে সূচনা । তা হল, ফতোয়া যাকে হারাম বলে তা থেকে বেঁচে থাকবে। একে বলা হয় আবেদদের পরহেযগারী । আর একটি হচ্ছে পরহেযগারীর শেষ প্রান্ত । অর্থাৎ, সিদ্দীকগণের পরহেযগারী তা এই যে, যেসব বস্তু আল্লাহ্‌র জন্যে নয়; বরং খাহেশের তাড়নায় লাভ করা হয়েছে অথবা অপছন্দনীয় পন্থায় পাওয়া গেছে, অথবা যেসব মাকরূহ, সেসবগুলো থেকে বেঁচে থাকবে। এই দু'প্রান্তের মাঝখানে সাবধানতার অনেক স্তর রয়েছে। মানুষ প্রবৃত্তির ব্যাপারে যত বেশী সাবধানতা অবলম্বন করবে এবং পাপের পাল্লা ভারী হওয়া থেকে দূরে থাকবে, আখেরাতের স্তর তেমনি বিভিন্ন হবে, যেমন দুনিয়াতে পরহেযগারীর স্তর বিভিন্ন হবে। হারাম মালের পার্থক্য অনুযায়ী জালেমদের জন্যে দোযখের স্তর ভিন্ন ভিন্ন হবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সন্দিগ্ধ বস্তুসমূহের স্তর ও স্থানভেদ

রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لايعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ بعرضه ودينه ومن وقع فى الشبهات وقع الحرام كالراعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه ـ

অর্থাৎ, হালাল সুস্পষ্ট ও হারাম সুস্পষ্ট। এতদুভয়ের মাঝখানে রয়েছে সন্দিগ্ধ বিষয়সমূহ। অনেকেই এগুলো জানে না। অতএব যে ব্যক্তি সন্দিগ্ধ বিষয় থকে বেঁচে থাকে, সে নিজের ইযযত ও ধর্ম পরিচ্ছন্ন করে নেয়। আর যে ব্যক্তি সন্দিগ্ধ বিষয়ে পতিত হয়, সে হারামে লিপ্ত হয়; যেমন রাজকীয় শিকার ক্ষেত্রের আশেপাশে যে পশু চরানো হয় সেগুলো প্রায়ই তাতে ঢুকে পড়ে। এই হাদীসে তিন প্রকারেরই স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। তন্মধ্যে মধ্যবর্তী প্রকারটি কঠিন, যা অনেকেই জানে না। অর্থাৎ, সন্দিগ্ধ বিষয়। তাই এর বর্ণনা ও এর স্বরূপ ফুটিয়ে তোলা আবশ্যক। কেননা, অধিকাংশ মানুষ যা জানে না, কম সংখ্যক মানুষ তা জানে। অতএব আমরা বলি, স্পষ্ট হালাল সেই বস্তু, যার সত্তা থেকে হারাম হওয়ার কারণাদি আলাদা থাকে এবং যাতে হারাম অথবা মাকরূহ হওয়ার কারণাদির কোন দখল থাকে না। এর দৃষ্টান্ত বৃষ্টির সেই পানির মত, যা বর্ষিত হওয়ার সময় মানুষ নিজের জমি অথবা বৈধ জমিতে দাঁড়িয়ে সংগ্রহ করে নেয়। পক্ষান্তরে নির্ভেজাল হারাম সেই বস্তু, যাতে হারামকারী কোন গুণ সন্দেহাতীতরূপে বিদ্যমান থাকে; যেমন শরাবের তীব্র মাদকতা গুণ এবং প্রস্রাবে নাপাকী গুণ অথবা যে বস্তু কোন অকাট্যরূপে নিষিদ্ধ উপায়ে অর্জিত হয়; যেমন জুলুম, সুদ ইত্যাদির মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ। এই দুই প্রান্ত সুস্পষ্ট। এগুলোতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এই উভয় প্রান্তে সেই বস্তুও অন্তর্ভুক্ত যা হালাল বলে জানা রয়েছে, কিন্তু অপরের হওয়ারও সম্ভাবনা বিদ্যমান। তবে এই সম্ভাবনার পক্ষে ধরে নেয়া

ও কল্পনা ছাড়া কোন কারণ নেই। যেমন, স্থল অথবা জলের শিকার হালাল, কিন্তু কেউ হরিণ শিকার করলে তাতে এই সম্ভাবনাও থাকে যে, এটি কেউ পূর্বে শিকার করেছিল এবং তার হাত থেকে ছুটে গেছে। অনুরূপভাবে কেউ মাছ ধরলে তাতে সম্ভাবনা থাকে যে, পূর্বে কেউ ধরেছিল এবং তার হাত থেকে পিছলে পানিতে পড়ে গেছে। যেহেতু এই সম্ভাবনার কোন কারণ নেই; তাই এ শিকারও স্পষ্ট হালালের অন্তর্ভুক্ত। এই সম্ভাবনাকে ওয়াসওয়াসা তথা অমূলক সংশয় মনে করা উচিত। এ থেকে বেঁচে থাকাকে আমরা সংশয়বাদী তথা কল্পনাকারীদের পরহেযগারী বলব। এটা সন্দিগ্ধ বিষয়ের মধ্যে গণ্য। বরং সন্দিগ্ধ বিষয় তাই, যার হালাল হওয়া ও হারাম হওয়ার অবস্থা আমাদের উপর সন্দেহযুক্ত হয়ে যায়; অর্থাৎ, দু'রকম বিশ্বাস দু'রকম কারণ থেকে উৎপন্ন হওয়া এবং একটিও অগ্রগণ্য না হওয়া। এখন জানা উচিত, সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার ক্ষেত্র চারটি।

প্রথম ক্ষেত্র, উভয় সম্ভাবনা সমান থাকবে অথবা একটি প্রবল হবে। যদি উভয় সম্ভাবনা সমান থাকে, তবে যে বিধান পূর্বে জানা থাকবে, তাই বহাল থাকবে। সন্দেহের কারণে অন্য বিধান দেয়া হবে না। পূর্বের বিধান দেখে বর্তমানের উপর সেই বিধান বহাল রাখার এই প্রকারকে বলা হয় 'এস্তেসহাব।' পক্ষান্তরে যদি ধর্তব্য অর্থ জ্ঞাপনের মাধ্যমে এই সম্ভাবনা প্রবল থাকে তবে প্রবল সম্ভাবনা অনুযায়ী বিধান হবে। এ বিষয়টি উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত ছাড়া স্পষ্ট হবে না। তাই আমরা একে চার ভাগে বিভক্ত করেছি। প্রথমতঃ হালাল হওয়ার ব্যাপারে পূর্ব থেকে জানা না থাকা। এর পর হালাল হওয়ার কারণে সন্দেহ সৃষ্টি হওয়া। এরূপ সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকা ওয়াজিব। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি শিকার লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করল। শিকার আহত হয়ে পানিতে পড়ে গেল। এর পর শিকারটি মৃত পাওয়া গেল। এখানে জানা নেই যে, পানিতে ডুবে মরেছে, না তীরের আঘাতে মরেছে? অতএব এ শিকার খাওয়া হারাম। কেননা, এক বিশেষ পন্থায় মরা ছাড়া শিকারটি হারাম ছিল। এখন এই বিশেষ পন্থার মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে গেছে। সুতরাং মিশ্রিত বিধানটি সন্দেহের কারণে পরিত্যক্ত হবে না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই পরিস্থিতিতেই আদী ইবনে হাতেমকে বলেছিলেন ঃ এই শিকার খেয়ো না। সম্ভবতঃ তোমার কুকুর ছাড়া অন্য কিছু একে হত্যা করেছে। এ কারণেই রসূলে করীম (সাঃ)-এর

কাছে যখন কোন বস্তু আসত এবং সেটি সদকা, না হাদিয়া সে বিষয়ে সন্দেহ থাকত, তখন তিনি জিজ্ঞেস করে জেনে নিতেন।

বর্ণিত আছে, তিনি এক রাত্রি অনিদ্রায় অতিবাহিত করলে জনৈক পত্নী কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন ঃ আমি একটি খোরমা পেয়ে খেয়ে নিয়েছি। এখন এটি সদকা ছিল কিনা, সেই আশংকায় ঘুম হয়নি। দ্বিতীয় প্রকার হল, হালাল হওয়া পূর্ব থেকে জানা। এখন হারাম হওয়ার কারণে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। এখানে হালালের বিধানই বহাল থাকবে। উদাহারণতঃ দু'জন পুরুষ দু'জন মহিলাকে বিবাহ করল। আকাশে একটি উড়ন্ত পাখী দেখে একজন বলল ঃ এটা কাক হলে তার স্ত্রী তালাক। দ্বিতীয় জন বলল ঃ এটা কাক না হলে তার স্ত্রী তালাক। এরপর অবস্থা পরিষ্কার হওয়ার পূর্বেই পাখীটি অদৃশ্য হয়ে গেল। এখানে কোন স্ত্রীই তালাক হবে না। তৃতীয় প্রকার, আসলেই হারাম হওয়া, কিন্তু তাতে এমন বিষয় প্রকাশ পায়, যা প্রবল ধারণা অনুযায়ী হালাল হওয়া ওয়াজিব করে। এরূপ বস্তু সন্দিগ্ধ হয়ে থাকে। এর বিধান হচ্ছে, প্রবল ধারণাটি শরীয়তসম্মত ও ধর্তব্য কি-না তা দেখা উচিত। শরীয়তসম্মত হলে বস্তুটি হালাল হবে এবং তা থেকে বেঁচে থাকা পরহেযগারীর অন্তর্ভুক্ত হবে। উদাহরণতঃ শিকারের গায়ে তীর নিক্ষেপ করার পর তা দৃষ্টি থেকে উধাও হয়ে গেল। এর পর কোথাও মৃত পাওয়া গেল। তীর ছাড়া অন্য কোন জখম সেটির গায়ে নেই। এখানে পড়ে যাওয়ার কারণে অথবা অন্য কোন কারণে মরে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। ইমাম শাফেয়ীর উক্তি অনুযায়ী এই শিকারটি হালাল। এমনি মাসআলায় রসূলুল্লাহ (সাঃ) আদী ইবনে হাতেমকে শিকার খেতে নিষেধ করেছেন। এটা পরহেযগারী ও তানযিহীস্বরূপ নিষেধ। কেননা, কোন কোন রেওয়ায়েতে এরূপ শিকার খাওয়ার অনুমতিও বর্ণিত আছে। চতুর্থ প্রকার, আসলে হালাল হওয়া, কিন্তু তার মধ্যে এমন শরীয়তসম্মত ও ধর্তব্য বিষয় প্রকাশ পায়, যা প্রবল ধারণা অনুযায়ী হারাম হওয়া ওয়াজিব করে। এখানে বস্তুটি হারাম বলেই বিধান দেয়া হবে। উদাহরণতঃ পানির দু'টি পাত্রের মধ্যে থেকে একটি সম্পর্কে যদি প্রবল ধারণা হয় যে, এটি নাপাক, তবে সে পাত্রের পানি পান করা অথবা তা দিয়ে ওযু করা হারাম হবে। তবে এই প্রবল ধারণা তখনই ধর্তব্য হবে, যখন বস্তুর মধ্যে বিদ্যমান কোন আলামতের সাথে এর সম্পর্ক থাকবে।

সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার দ্বিতীয় পর্যায় হল, হারাম ও হালাল বস্তু পরস্পরে এমনভাবে মিশ্রিত হয়ে পড়া যাতে পার্থক্য করা যায় না। এর কয়েকটি প্রকার আছে।

প্রথম প্রকার, কোন সীমিত বস্তু সীমিত বস্তুর সাথে মিশ্রিত হয়ে যায়; যেমন একটি মৃত ছাগল যবেহ্ করা একটি অথবা দশটি ছাগলের সাথে মিশে যাওয়া, অথবা দু'ভগিনীর একজন বিবাহ করার পর সন্দেহ হওয়া যে, কোন্ ভগিনীকে বিবাহ করেছিল। এ ধরনের সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকা সর্বসম্মতভাবে ওয়াজিব। কেননা, এতে আলামত ও ইজতিহাদের কোন দখল নেই। এছাড়া সীমিত বস্তুর মধ্যে মিশ্রণ হওয়ার কারণে সবগুলো মিলে যেন এক বস্তু হয়ে যায়।

দ্বিতীয় প্রকার, সীমিত হারাম বস্তু সীমাহীন হালাল বস্তুর সাথে মিশ্রিত হয়ে যাওয়া; যেমন একজন অথবা দশ জন দুধ শরীক মহিলা কোন বড় শহরের মহিলাদের সাথে মিশ্রিত হয়ে যাওয়া। এমতাবস্থায় সমগ্র শহরের মহিলাদের বিবাহ করা থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য নয়। বরং যাকে ইচ্ছা বিবাহ করা যায়। এর প্রমাণ, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যমানায় একটি ঢাল চুরি হয়ে গিয়েছিল, এ কারণে দুনিয়াতে কেউ ঢাল ক্রয় করা থেকে বিরত থাকেনি। মোট কথা, দুনিয়া হারাম থেকে তখনই বাঁচতে পারে, যখন দুনিয়ার সকল মানুষ গোনাহ্ পরিত্যাগ করবে। সুতরাং দুনিয়াতে যখন এ ধরনের বেঁচে থাকা শর্ত নয়, তখন শহরেও শর্ত হবে না। এখন প্রশ্ন হয়, আল্লাহ্ তাআলার জ্ঞানে তো সকল বস্তুই সীমিত। এমতাবস্থায় এখানে সীমিত ও সীমাহীন বস্তুর সংজ্ঞা কি? মানুষ ইচ্ছা করলে কোন শহরের বাসিন্দাদের গণনা করতে পারে। সুতরাং এটা সীমাহীনের দৃষ্টান্ত হবে কিরূপে? এর জওয়াব, এ ধরনের বিষয়সমূহের সংজ্ঞা নির্ণয় করা অসম্ভব। তবে কাছাকাছি সংজ্ঞা নির্ণয় করা হয়। সেমতে আমরা বলি, সীমাহীন বস্তুর সংজ্ঞা এই যে, যদি এক মাঠে সকলেই সমবেত হয়, তবে দর্শক দেখা মাত্রই তাদেরকে গণনা করা কঠিন মনে করে; যেমন হাজার দু'হাজার, তবে তা সীমাহীন। আর যদি সহজেই গণনা করা যায়; যেমন দশ বিশ জন, তবে সীমিত। এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সংখ্যাসমূহকে প্রবল ধারণার মাধ্যমে যে কোন একদিকে মিলিয়ে দেয়া হয়। যে সংখ্যায় সন্দেহ দেখা দেয়, তাতে মন থেকে ফতোয়া নেয়া উচিত। কারণ, যা গোনাহ, তা মনে বাজে। এরূপ ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ (সাঃ)

হযরত ওয়াবেসাকে বলেছিলেন ঃ

استفت قلبك وان افتوك وامروك

অর্থাৎ, নিজের মনের কাছে ফতোয়া চাও, যদিও লোকেরা তোমাকে ফতোয়া দেয় এবং আদেশ করে।

বলাবাহুল্য, মুফতী বাহ্যিক অবস্থাদৃষ্টে ফতোয়া দেয় এবং আল্লাহ তা'আলা আভ্যন্তরীণ অবস্থার মালিক। মুফতীর ফতোয়া মানুষকে আখেরাতে গোনাহ থেকে মুক্তি দেবে না।

তৃতীয় প্রকার হল সীমাহীন হালাল সীমাহীন হারামের সাথে মিশ্রিত হয়ে যাওয়া। যেমন, আজকালকার ধন দৌলত। এধরনের মিশ্রণের ফলে কোন নির্দিষ্ট বস্তু হারাম হয় না, যাতে হালাল ও হারাম হওয়ার উভয় সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে। হাঁ, যদি তাতে হারাম হওয়ার কোন লক্ষণ বিদ্যমান থাকে, তবে তা হারাম হবে, কিন্তু লক্ষণ না থাকলে সেই বস্তু বর্জন করা পরহেযগারী এবং গ্রহণ করা হালাল। সেটি খেলে মানুষ ফাসেক হবে না। হারাম হওয়ার লক্ষণসমূহ পরে বর্ণিত হবে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, সেই বস্তুটি জালেম শাসনকর্তার কাছ থেকে পাওয়া। বর্ণিত এই বিধানের প্রমাণ হচ্ছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তাঁর পরবর্তী খোলাফায়ে রাশেদীনের যমানায় সুদের টাকা এবং শরাবের মূল্য যিম্মীদের কাছ থেকে আদায় হয়ে সরকারী ধন-সম্পদের সাথে মিশে যেত। সুদ নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন বলেছিলেন– আমি সর্বপ্রথম আব্বাসের সুদ ছেড়ে দিচ্ছি, তখন সকলেই সুদের লেনদেন বর্জন করেনি, যেমন শরাব বিক্রি করা কেউ বর্জন করেনি। সেমতে বর্ণিত আছে– জনৈক সাহাবী শরা বিক্রি করলে হযরত ওমর (রাঃ) বললেন ঃ অমুকের প্রতি আল্লাহ তাআলার অভিসম্পাত হোক। সে সর্বপ্রথম শরাব বিক্রি করার প্রথা চালু করেছে। এ বিক্রয়ের কারণ ছিল, কেউ কেউ শরাব হারাম হওয়ার ফলে শরাব বিক্রয় এবং শরাবের মূল্যও হারাম হয়ে গেছে একথা বুঝতে পারেনি।

এযীদের সৈন্যরা তিন দিন পর্যন্ত মদীনা তাইয়েবা লুট করেছিল। কয়েকজন সাহাবী জালেম শাসকদের লুটতরাজের এই যুগ পেয়েছিলেন, কিন্তু মদীনার লুটের মাল হতে পারে -এই আশংকায় কোন সাহাবীই বাজারে ক্রয়বিক্রয় বন্ধ করে দেননি। সুতরাং তাঁরা এই মিশ্রণকে বাধা

মনে করেননি। পূর্ববর্তীগণ যে বিষয় অপরিহার্য করেননি, এখন যদি কেউ সেটাকে অপরিহার্য করে নেয় এবং ধারণা করে, সে শরীয়তের এমন বিষয় বুঝে নিয়েছে, যা পূর্ববর্তীরা বুঝতে পারেনি, তবে সে পাগল। পূর্ববর্তীরা শরীয়তের জ্ঞান আমাদের তুলনায় অনেক বেশী রাখতেন। তাঁদের চেয়ে বেশী শরীয়ত বুঝা আমাদের যে কোন ব্যক্তির জন্যে অসম্ভব। এখানে প্রশ্ন হতে পারে, রসূলে করীম (সাঃ)-এর যমানায় সুদ, চুরি, লুটতরাজ, গনীমত সামগ্রীর খেয়ানত ইত্যাদি হালাল ধনসম্পদের তুলনায় অনেক কম ছিল, কিন্তু আমাদের যুগে লেনদেনের ভ্রষ্টতা ও শর্তসমূহের প্রতি লক্ষ্য না রাখার কারণে, সুদের প্রাচুর্য এবং জালেম শাসকদের বাড়াবাড়ির কারণে মানুষের অধিকাংশ ধনসম্পদ দূষিত ও হারাম হয়ে যাচ্ছে। অতএব এসব ধনসম্পদ কেউ পেলে এবং তাতে কোন বিশেষ লক্ষণ না থাকলে হালাল বলা হবে, না হারাম? জওয়াব হচ্ছে, এই মাল হারাম নয়। তবে এটা গ্রহণ না করাই পরহেযগারীর মধ্যে দাখিল।

সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার তৃতীয় স্থান হল, যে কারণে বস্তু হালাল হয়, তাতে কোন গোনাহ্ সংযুক্ত হয়ে যাওয়া। এই গোনাহ হয় কারণের ইঙ্গিত অর্থাৎ, সঙ্গের বস্তুর মধ্যে; অথবা পরিণতির মধ্যে, অথবা ভূমিকার মধ্যে, অথবা বিনিময়ের মধ্যে সংযুক্ত হবে। সর্বাবস্থায় গোনাহটি এমন না হওয়া শর্ত, যা দ্বারা আক্দ বা চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। এখন এই চার প্রকার গোনাহের উদাহরণ বর্ণিত হচ্ছে।

ইঙ্গিতের মধ্যে গোনাহ্ হওয়ার উদাহরণ জুমুআর দিনে আযানের সময় ক্রয়-বিক্রয় করা। এক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত আছে, কিন্তু এ থেকে ক্রয়-বিক্রয়ের আকদ তথা চুক্তি বাতিল হওয়া বুঝা যায় না। অতএব এ থেকে বিরত থাকা অবশ্য পরহেযগারীর অন্তর্ভুক্ত। এক্ষেত্রে হারামের বিধান প্রযোজ্য হবে না এবং এর নাম সন্দেহ রাখাও ভুল। কেননা, সন্দেহের ব্যবহার অধিকাংশ দ্বিধা ও অনিশ্চয়তার ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। এখানে কোন দ্বিধা নেই।

পরিণতির মধ্যে গোনাহ্ সংযুক্ত হওয়ার উদাহরণ শরাব প্রস্তুতকারীর কাছে আঙ্গুর বিক্রি করা অথবা দস্যুদের কাছে তরবারি বিক্রি করা। এধরনের বিক্রি শুদ্ধ কি-না, এ ব্যাপারে আলেমগণের মতভেদ রয়েছে। কিয়াস অনুযায়ী এই ক্রয় বিক্রয় শুদ্ধ এবং মূল্য হালাল, তবে বিক্রয়কারী

গোনাহগার হবে; যেমন ছিনতাই করা ছুরি দিয়ে যবেহ্ করলে গোনাহগার হয় এবং যবেহ করা জন্তু হালাল হয়। বিক্রেতার গোনাহ্ এ কারণে হয় যে, সে গোনাহের কাজে অপরকে সাহায্য করে। মূল্য মাকরূহ এবং তা গ্রহণ না করা পরহেযগারী– হারাম নয়।

ভূমিকায় গোনাহ সংযুক্ত হওয়ার তিন স্তর। সর্ববৃহৎ স্তরের উদাহরণ সেই ছাগলের গোশত খাওয়া; যে নিষিদ্ধ চারণ ভূমিতে ঘাস খেয়েছে। এটা কঠিন মাকরূহ। এই গোশত খাওয়া থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব না হলেও জরুরী পরহেযগারী। পূর্ববর্তী অনেক বুযুর্গ থেকে এই পরহেযগারী বর্ণিত রয়েছে। সেমতে আবু আবদুল্লাহ্ তূসী (রহঃ)-এর একটি ছাগল ছিল, সেটির দুধ তিনি পান করতেন। তিনি প্রত্যহ ছাগলটিকে কাঁধে তুলে জঙ্গলে ছেড়ে আসতেন। ছাগল ঘাস খেত এবং তিনি নামায পড়তেন। একদিন এক অসাবধান মুহূর্তে ছাগলটি এক ব্যক্তির বাগানের ধারে আঙ্গুরের পাতা খেতে লাগল। এর পর তিনি ছাগলটি বাগানেই ছেড়ে এলেন; বাড়ি আনা হালাল মনে করলেন না। দ্বিতীয় স্তরের উদাহরণ বিশর ইবনে হারেস থেকে বর্ণিত আছে, তিনি সেই পানি পান থেকে বিরত থাকেন, যা জালেম শাসকদের খনন করা খালে প্রবাহিত হত। অপর একজন বুযুর্গ সেই বাগানের আঙ্গুর খাননি, যাতে জালেমদের খনন করা খাল থেকে পানি দেয়া হয়েছিল। তৃতীয় স্তরের উদাহরণ এমন হালাল খাদ্য খাওয়া থেকে বিরত থাকা, যা কোন গোনাহগারের হাতে পরিবেশিত হয়; যেমন কোন ব্যভিচারী কোন হালাল খাদ্য পরিবেশন করলে তা না খাওয়া, কিন্তু এরূপ বিরত থাকা ওয়াসওয়াসার নিকটবর্তী এবং বাড়াবাড়ি। কেননা, ব্যভিচার দ্বারা কোন বস্তু পরিবেশন করার শক্তি অর্জিত হয় না। এধরনের সাবধানতা অবলম্বন করা হলে পরিণামে এরূপ ব্যক্তির হাত থেকেও কোন বস্তু নেয়া যাবে না, যে গীবত, মিথ্যাচার অথবা এধরনের কোন কোন গোনাহ্ করে। এটা খুবই বাড়াবাড়ি।

উপরোক্ত তিনটি স্তরের মধ্যে কেবল প্রথম স্তরটি মুফতীর ফতোয়ার আওতায় পড়ে। পরবর্তী দু'টি স্তর ফতোয়ার বাইরে। এগুলো সম্পর্কে ফতোয়া তাই, যা রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত ওয়াবেসা (রাঃ)-কে বলেছিলেন– মানুষ তোমাকে ফতোয়া দিলেও তুমি মনের কাছে ফতোয়া চাও। এটা মুত্তাকী ও সালেহ ব্যক্তিবর্গের পরহেযগারী। বাস্তবে তাঁরা মন থেকে ফতোয়া জেনে নেন। গোনাহ্ তাঁদের অন্তরে বাজে।

চতুর্থ স্থান প্রমাণাদির পরস্পর বিরোধিতার কারণে সন্দেহ সৃষ্টি হওয়া। এটা তিন প্রকারে বিভক্ত– (১) শরীয়তের প্রমাণাদির বৈপরীত্য, (২) লক্ষণ বৈপরীত্য এবং (৩) সামঞ্জস্যশীল বিষয়াদির বৈপরীত্য।

প্রথম প্রকার, শরীয়তের দলীলসমূহের বৈপরীত্য; যেমন কোরআন পাকের দুই আয়াত অথবা দুই হাদীস অথবা দুই কিয়াসের পরস্পর বিরোধী হওয়া। বৈপরীত্যের এ সবগুলো প্রকারই সন্দেহের কারণ হয়ে থাকে। এতে যদি হারাম হওয়ার দিকটি অগ্রগণ্য হয়, তবে এটাই অবলম্বন করা ওয়াজিব। আর যদি হালাল হওয়ার দিক অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য হয়, তবে তা অবলম্বন করা জায়েয, কিন্তু তা থেকে বেঁচে থাকা ভাল। পরহেযগারীর ক্ষেত্রে বিরোধের স্থান থেকে বেঁচে থাকা মুফতী ও মুকাল্লেদ উভয়ের জন্যে জরুরী। তবে মুকাল্লেদ শহরের যে মুফতীকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করবে, তার ফতোয়া অনুযায়ী আমল করা তার জন্যে জায়েয। মুফতীর সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়া জনশ্রুতি দ্বারা জানা যায়। যেমন, চিকিৎসকদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, তা মানুষের কাছে শুনে নির্ণয় করা যায়। ফতোয়া প্রার্থীর জন্যে সুবিধামত মাযহাব বেছে নেয়া জায়েয নয়; বরং যে মাযহাব তার কাছে শ্রেষ্ঠ মনে হয়, সেই মাযহাবের অনুসরণ এমনভাবে করবে, যেন কখনও তার বিরুদ্ধাচরণ না হয়। হাঁ, যদি তার মাযহাবের ইমাম কোন বিষয়ে ফতোয়া দেয় এবং এতে অন্য মাযহাবের ইমামের বিরোধ পাওয়া যায়, তবে এমনভাবে আমল করবে যাতে উভয় মাযহাবের উপর আমল হয়ে যায়। এখানে বিরোধ থেকে বেঁচে থাকা জরুরী– পরহেযগারীর অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে যদি মুজতাহিদের মতে প্রমাণসমূহ পরস্পর বিরোধী হয় এবং ধারণা ও অনুমান দ্বারা হালাল হওয়ার দিক অগ্রাধিকারযোগ্য মনে হয়, তবে মুজতাহিদের জন্যে পরহেযগারী হচ্ছে, সে বিষয় থেকে নিজে বেঁচে থাকবে এবং ফতোয়া হালাল বলে মেনে নেবে। সেমতে পূর্ববর্তী মুফতীগণ অনেক ব্যাপারে হালাল হওয়ার ফতোয়া দিতেন, কিন্তু পরহেযগারীবশতঃ নিজেরা তা করতেন না, যাতে সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকা যায়।

দ্বিতীয় প্রকার, এমন লক্ষণসমূহের বৈপরীত্য, যেগুলো হালাল ও হারাম হওয়া জ্ঞাপন করে। উদাহরণতঃ কোন এক সময়ে লুণ্ঠিত এক প্রকার সামগ্রী বর্তমানে বাজারে দুর্লভ। এমন সামগ্রী যদি কোন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তির কাছে পাওয়া যায়, তবে এখানে উভয় প্রকার লক্ষণ

বিদ্যমান। যার কাছে আছে, তার সততা ও ধর্মপরায়ণতা এটা হালাল হওয়ার প্রমাণ। পক্ষান্তরে এ সামগ্রীর দুর্লভ্যতা এবং লুটের মাল ছাড়া কম পওয়া যাওয়া এ বিষয়ের দলীল যে, এটা হারাম। সুতরাং এখানে পরস্পর বিরোধী দু'প্রকার লক্ষণের কারণে সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে। এখানে যদি কোন এক দিক অগ্রাধিকারযোগ্য হয়, তবে তদনুযায়ী বিধান হবে, কিন্তু এ সামগ্রী থেকে বেঁচে থাকা হবে পরহেযগারী। অগ্রাধিকার প্রকাশ না পেলে 'তাওয়াক্কুফ' তথা বিধান মওকুফ রাখা ওয়াজিব হবে।

তৃতীয় প্রকার, সামঞ্জস্যশীল বস্তুসমূহের বৈপরীত্য; যেমন কোন ব্যক্তি ফকীহগণকে কোন মাল দান করার ওসিয়ত করল। এতে বুঝা যায়, যে ব্যক্তি ফেকাহ শাস্ত্রে পন্ডিত, সে এই ওসিয়তের অন্তর্ভুক্ত এবং যে ব্যক্তি একদিন অথবা এক মাস আগে ফেকাহ শুরু করেছে সে এর অন্তর্ভুক্ত নয়। এতদুভয়ের মধ্যবর্তী অসংখ্য স্তর রয়েছে, যেগুলোতে সন্দেহ দেখা দেয়। এ ক্ষেত্রে মুফতী তার ধারণা অনুযায়ী ফতোয়া দেন। সন্দেহের যত স্থান রয়েছে, তন্মধ্যে এ প্রকারটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম। কেননা, এর কোন কোন ক্ষেত্রে মুফতীকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যেতে হয়। সে কোন কৌশল খুঁজে পায় না। দরিদ্রদের মধ্যে যে সদকা-খয়রাত বন্টন করা হয়, তার অবস্থাও তদ্রূপ। কেননা, যার কাছে কিছুই নেই, সে নিশ্চিতই দরিদ্র। আর যার কাছে অনেক ধন-সম্পদ আছে, সে নিশ্চিতই ধনী, কিন্তু এতদুভয়ের মাঝখানে অনেক সূক্ষ্ম স্তর রয়েছে। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তির কাছে একটি গৃহ, গৃহের আসবাবপত্র, বস্ত্র ও বই পুস্তক রয়েছে। এখন যদি এগুলো প্রয়োজন পরিমাণে থাকে, তবে তার সদকা গ্রহণের পথে কোন বাধা নেই। আর যদি প্রয়োজনের চেয়ে বেশী থাকে, তবে বাধা আছে, কিন্তু প্রয়োজনের কোন সীমা নির্ধারিত নেই। এটা অনুমান দ্বারা জানা যায় এবং অত্যধিক আলোচনা সাপেক্ষ ব্যাপার। এ ক্ষেত্রে এ হাদীসটিই একমাত্র উপকারী– دع ما يريبك الى ما لا يريبك অর্থাৎ, সন্দেহের বিষয় পরিত্যাগ করে সন্দেহমুক্ত বিষয় অবলম্বন কর।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রাপ্ত ধনসম্পদ যাচাই করা জরুরী

প্রকাশ থাকে যে, কেউ তোমার সামনে কোন খাদ্য অথবা হাদিয়া পেশ করলে অথবা তুমি তা থেকে ক্রয় করতে কিংবা দান গ্রহণ করতে চাইলে তা যাচাই করা জরুরী নয়। বরং কোন কোন অবস্থায় জিজ্ঞেস করা ও অবস্থা যাচাই করা ওয়াজিব এবং কোন কোন অবস্থায় হারাম। আবার কোন কোন অবস্থায় মোস্তাহাব ও কোন অবস্থায় মাকরূহ। তাই এ বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যা প্রয়োজন। এ সম্পর্কে চূড়ান্ত কথা হল, যেসব জায়গায় সন্দেহ হয়, সেখানেই জিজ্ঞেস ও যাচাই করা। সন্দেহের জায়গা সম্পদের মালিকের সাথে অথবা স্বয়ং সম্পদের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে থাকে। তাই বিষয়টি দু'টি শিরোনামে বর্ণনা করা হচ্ছে।

মালিকের অবস্থা যাচাই করা ঃ মালিকের অবস্থা তিন প্রকার হতে পারে– অজ্ঞাত, সন্দিগ্ধ অথবা কোন প্রকারে জ্ঞাত। অজ্ঞাত হওয়ার অর্থ, মালিকের সাথে এমন কোন ইঙ্গিত নেই, যদ্দ্বারা তার ভ্রষ্টতা ও জুলুম জানা যায়; যেমন সিপাহীর পোশাক অথবা পদক এবং সাধুতারও কোন আলামত নেই; যেমন সুফী, ব্যবসায়ী ও আলেমের পোশাক পরিচ্ছদ। উদাহরণতঃ তুমি কোন অখ্যাত গ্রামে পৌঁছে এমন এক ব্যক্তিকে পেলে, যার অবস্থা তোমার কিছুই জানা নেই এবং তার মধ্যে এমন কোন আলামতও নেই, যদ্দ্বারা তাকে সাধু কিংবা দুষ্ট বলা যায়। এরূপ ব্যক্তিকে বলা হবে অজ্ঞাত অবস্থাধারী। তাকে সন্দিগ্ধ বলা যাবে না। কেননা, কোন বিষয়ে পরস্পর বিরোধী দু'কারণ থেকে উদ্ভূত পরস্পর বিরোধী দু'বিশ্বাস থাকাকে বলা হয় সন্দেহ। এখানে কোন বিশ্বাসও নেই, কারণও নেই। অধিকাংশ ফেকাহবিদ অজ্ঞাত ও সন্দিগ্ধের পার্থক্য জানে না বিধায় বিষয়টি বর্ণিত হল।

এই প্রকার মালিকের ক্ষেত্রে বাহ্যিক বিধান হচ্ছে যাচাই না করা। অর্থাৎ, কোন অজ্ঞাত মালিক যদি তোমার সামনে খাদ্য পেশ করে অথবা হাদিয়া পাঠায় অথবা তুমি তার দোকান থেকে কিছু ক্রয় করতে চাও, তবে তার অবস্থা জিজ্ঞেস করা জরুরী নয়। বরং তার মুসলমান হওয়া এবং বস্তুটি তার কব্জায় থাকাই তোমার গ্রহণের জন্যে যথেষ্ট। এ ক্ষেত্রে

এরূপ বলা অপরিহার্য নয় যে, জুলুম ও ভ্রষ্টতা মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে বিধায় এ মালও তদ্রূপই হবে। এরূপ বললে এটা হবে ওয়াসওয়াসা এবং এতে বিশেষ মুসলমানের প্রতি কুধারণা হয়। অথচ কোন কোন কুধারণা গোনাহ। আমরা জানি, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) জেহাদে ও সফরে বিভিন্ন গ্রামে গমন করতেন এবং খানার দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করতেন না। শহরসমূহে গেলে বাজার থেকে বেঁচে থাকতেন না। অথচ হারাম মাল তাঁদের যমানায়ও বিদ্যমান ছিল। তাঁরা সন্দেহ ছাড়া কখনও যাচাই করেছেন বলে শুনা যায়নি। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-ও সামনে যা আসত তার অবস্থা যাচাই করতেন না। বরং শুরুতে মদীনায় অবস্থানকালে কেউ কিছু প্রেরণ করলে তিনি সদকা না হাদিয়া তাও জিজ্ঞেস করে নিতেন। কেননা, তখন অবস্থার চাহিদা এমনিই ছিল। মদীনায় নিঃস্ব মুহাজিরগণ তাঁর কাছে থাকতেন। তাই প্রেরিত বস্তু সদকা হওয়ার ধারণাই প্রবল ছিল। এছাড়া দাতার মালিকানা এবং তার মুসলমান হওয়া একথা জ্ঞাপন করে না যে, বস্তুটি সদকা নয়। কেউ দাওয়াত করলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তা কবুল করে নিতেন এবং সদকা থেকে খাওয়ানো হবে কিনা, তা জিজ্ঞেস করতেন না। কারণ, সদকার খাদ্য দ্বারা দাওয়াত করার অভ্যাস সাধারণতঃ নেই। উম্মে সুলায়ম রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে দাওয়াত করেছিলেন এবং এমন খাদ্য পেশ করেছিলেন, যাতে লাউ ছিল। এসব দাওয়াতে তিনি জিজ্ঞেস করেছেন বলে কোথাও বর্ণিত নেই। মোট কথা, যার অবস্থা অজ্ঞাত, তার প্রতি সুধারণা রাখা এবং জিজ্ঞেস না করা উচিত। তবে কেউ যদি না জানা পর্যন্ত পেটে কিছু দিতে না চায়, তবে সেটা নিঃসন্দেহে ভাল কথা। তার উচিত তা না খাওয়া। জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন কি? খেতে হলে জিজ্ঞেস করা ছাড়াই খেয়ে নেবে। কেননা, জিজ্ঞেস করার অর্থ কষ্ট দেয়া, গোপনীয়তা ফাঁস করা এবং আতংকে ফেলে দেয়া। এটা নিঃসন্দেহে হারাম। মুসলমানকে কষ্ট দেয়ার গোনাহ হারাম ও সন্দেহযুক্ত বস্তু খাওয়ার গোনাহের চেয়ে কম নয়। যদি তার অবস্থা অন্যের কাছে এমনভাবে জিজ্ঞেস করা হয় যে, সে জেনে নেয়, তবে তাতে কষ্ট আরও বেশী হয়। আর যদি সে জানতে না পারে, তবে এটা কুধারণা, গোপনীয়তা ফাঁস করা, গুপ্তচরবৃত্তি এবং গীবতের ভূমিকা। এই সবগুলো বিষয় একই আয়াতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ـ

অর্থাৎ, মুমিনগণ, তোমরা অধিকাংশ ধারণা থেকে দূরে থাক; কারণ, কোন কোন ধারণা পাপ, তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করো না।

অনেক মূর্খ দরবেশ জিজ্ঞাসাবাদ করে মানুষকে আতংকগ্রস্ত করে এবং কর্কশ ও পীড়াদায়ক কথা বলে ফেলে। এটা শয়তান তাদের মনের মধ্যে সজ্জিত করে দেয়, যাতে তারা মানুষের মধ্যে হালালখোর বলে খ্যাত হয়ে যায়। ধর্মপরায়ণতাই এর কারণ হলে মুসলমানের মনে কষ্ট দেয়ার ভয় তারা বেশী করত। এটাই ছিল সাহাবায়ে কেরামের পছন্দনীয় তরীকা। যে ব্যক্তি তাঁদের চেয়ে বেশী পরহেযগার হতে চায়, সে গোমরাহ ও বেদআতী। কেননা, সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে– যদি কেউ ওহুদ পর্বতের সমপরিমাণ স্বর্ণ দান করে, তবে তা সাহাবায়ে কেরামের এক রতি পরিমাণ স্বর্ণ দান করার সমান হবে না।এছাড়া রসূলে করীম (সাঃ) হযরত বরীরা (রাঃ)-এর প্রেরিত খাদ্য খেলে লোকেরা আরজ করল ঃ এই খাদ্য বরীরা সদকায় পেয়েছিল। তিনি বললেন ঃ এটা তার জন্যে সদকা ছিল, আমার জন্যে হাদিয়া। তিনি জিজ্ঞেস করলেন না, এই সদকা বরীরাকে কে দিয়েছিল? কেননা, সদকাদাতা তাঁর কাছে অজ্ঞাত ছিল।

মালিকের সন্দিগ্ধ হওয়ার অর্থ মালিকের সাথে সন্দেহ সৃষ্টিকারী কোন লক্ষণ পাওয়া যাওয়া। প্রথমে আমরা সন্দেহের আকার বর্ণনা করব, এর পর তার বিধান লেখব। সন্দেহের আকার এই যে, যে বস্তু মালিকের কব্জায় আছে, তার হারাম হওয়ার কোন প্রমাণ মালিকের দৈহিক গড়নে, পোশাকে অথবা কর্ম ও কথায় পাওয়া যায়। তার দৈহিক গড়ন উদাহরণতঃ জংলী দস্যু অথবা জালেমের মত; মোটা গোঁফ, মাথার চুল দক্ষতকারীদের অনুরূপ। তার পোশাক উদাহরণতঃ জালেম সিপাহীদের মত। তার কর্ম ও কথার মধ্যে হালাল নয়, এমন বিষয়াদির প্রতি সাহসিক উদ্যম পাওয়া যায়। এসব লক্ষণ দ্বারা বুঝা যাবে, এ লোকটি সম্পদের ব্যাপারেও অসাবধানতার পক্ষপাতী হবে। যে মাল হালাল নয়, তাও গ্রহণ করে থাকবে। মোট কথা, এগুলো হচ্ছে সন্দেহের আকার আকৃতি। এরূপ ব্যক্তির কাছ থেকে কেউ কিছু কিনতে অথবা হাদিয়া

গ্রহণ করতে অথবা দাওয়াত কবুল করতে চাইলে দেখতে হবে, এখানে কব্জা একটি দুর্বল দলীল এবং তার বিপরীতে এমন সব লক্ষণ বিদ্যমান, যদ্দ্বারা সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে গেছে। কাজেই এগুলো করা জায়েয না হওয়া উচিত। এ বিধানকেই আমরা পছন্দ করি এবং ফতোয়াও তাই দেই। কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) সন্দেহযুক্ত বিষয় বর্জন করতে এবং সন্দেহের ঊর্ধ্বে থাকতে বলেছেন। হাদীসে এটা করা বাহ্যতঃ ওয়াজিব বুঝা গেলেও মোস্তাহাব হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। এছাড়া এরূপ সন্দেহের স্থলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) সদকা, না হাদিয়া জিজ্ঞেস করেছেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁর গোলামের উপার্জনের অবস্থা জানতে চেয়েছেন এবং হযরত ওমর (রাঃ) দুধের অবস্থা যাচাই করেছিলেন। এগুলো সব সন্দেহের ক্ষেত্রে হয়েছিল। এগুলোকে পরহেযগারী মনে করা সম্ভব নয়। কেননা, এসব লক্ষণ অধিকার ও মুসলমানিত্বের পরিপন্থী।

তৃতীয় অবস্থা হচ্ছে মালিকের অবস্থা সম্পর্কে কোন প্রকার অভিজ্ঞতা ইত্যাদি দ্বারা জ্ঞাত হওয়া, যদ্দ্বারা সম্পদের হালাল হওয়ার প্রবল ধারণা জন্মে। উদাহরণতঃ কোন ব্যক্তির বাহ্যিক সাধুতা ও ধর্মপরায়ণতা জানা থাকা, কিন্তু আভ্যন্তরীণ অবস্থা বাহ্যিক অবস্থার বিপরীত হতে পারে বিধায় সন্দেহ সৃষ্টি হয়। এরূপ ক্ষেত্রে সম্পদ সম্পর্কে প্রশ্ন করা এবং যাচাই করা জরুরী নয়; বরং এখানে আরও উত্তমরূপে নাজায়েয হওয়া উচিত। কেননা, বাহ্যিক সাধু ব্যক্তির হারাম মাল নিতে উদ্যত হওয়া অজ্ঞাত ব্যক্তির উদ্যত হওয়ার তুলনায় সন্দেহ থেকে অনেক দূরে। এ ছাড়া ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের খাদ্য আহার করা নবী ও ওলীগণের অভ্যাস। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

لا تاكل الا طعام الاتقى ولا ياكل طعامك الا الاتقى -

অর্থাৎ, তুমি পরহেযগারদের খাদ্য ছাড়া খেয়ো না এবং তোমার খাদ্য যেন পরহেযগার ছাড়া কেউ না খায়, কিন্তু যদি অভিজ্ঞতার দ্বারা জানা যায়, লোকটি জালেম, গায়ক অথবা সুদখোর, তবে অভিজ্ঞতার সামনে বাহ্যিক পোশাক ও পরহেযগারীর কোন মূল্য নেই। এরূপ ক্ষেত্রে যাচাই করা অবশ্যই ওয়াজিব।

সম্পদ সম্পর্কিত যাচাই ঃ হারাম ও হালাল সম্পদ মিশ্রিত হয়ে গেলে যাচাই করতে হয়। যেমন প্রচুর পরিমাণ চোরাই মাল বাজারীরা

ক্রয় করে নিল। এরূপ ক্ষেত্রে যদি প্রকাশ পায় যে, বাজারীদের অধিকাংশ মাল চোরাই তথা হারাম মাল, তবে যে ব্যক্তি এ বাজার থেকে ক্রয় করবে, তার উপর যাচাই করে নেয়া ওয়াজিব। আর যদি প্রকাশ পায়, বাজারীদের অধিকাংশ মাল হারাম নয়, তবে যাচাই করা ওয়াজিব নয়; বরং তা পরহেযগারীর অন্তর্ভুক্ত। এর দলীল হচ্ছে, সাহাবায়ে কেরাম বাজারে ক্রয় থেকে বিরত থাকতেন না; অথচ এসব বাজারে সুদের দেরহাম এবং গনীমতে খেয়ানতের মালও থাকত। হযরত ওমর (রাঃ) আযারবাইজানে প্রেরিত পত্রে লেখেছিলেন ঃ তোমরা এমন শহরে রয়েছ, যেখানে মৃত জন্তুর চামড়া শুকানো হয়। অতএব যবেহ করা ও মৃত জন্তুর ব্যাপারটি যাচাই করে নিয়ো। এতে যাচাই করার নির্দেশ পাওয়া যায়, কিন্তু এর সাথে তিনি এই নির্দেশ দেননি যে, নগদ টাকা-পয়সাও যাচাই করে নাও, সেটা মৃত জন্তুর চামড়ার মূল্য, না যবেহ করা জন্তুর চামড়ার মূল্য? কেননা, চামড়া বিক্রি হলেও অধিকাংশ নগদ টাকা-পয়সা চামড়ার দাম ছিল না, কিন্তু চামড়া অধিকাংশ মৃত জন্তুরই হত। তাই এগুলো যাচাই করার নির্দেশ দিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আর্থিক দায়দায়িত্ব থেকে তওবাকারীর মুক্তির উপায়

প্রকাশ থাকে যে, তওবাকারীর কাছে হালাল হারাম উভয় প্রকার মাল মিশ্রিত থাকলে তার জন্যে দু'টি কাজ করা অপরিহার্য। প্রথম নিজের মাল থেকে হারাম মালকে পৃথক করা এবং দ্বিতীয়তঃ হারাম মাল ব্যয় করা। সেমতে এই পরিচ্ছেদটি দু'টি শিরোনামে বর্ণিত হচ্ছে।

হারাম মাল পৃথক করা ঃ জানা উচিত, যে ব্যক্তি তওবা করে, তার নিকট হারাম মাল থাকলে তা আলাদা করতে হবে। তার মিশ্রিত মাল হয় ওজন করা যায়– এমন হবে, যথা খাদ্য শস্য, তৈল, মুদ্রা ইত্যাদি; না হয় এমন হবে, যা ওজন করা যায় না; যথা গোলাম, গৃহ প্রভৃতি। এখন যদি কোন ব্যক্তি ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে কিছু মাল অর্জন করে এবং জানে যে, সে কোন কোন সামগ্রী বেশী মুনাফায় বিক্রি করতে যেয়ে মিথ্যা বলেছে এবং কিছু মালে সত্য বলেছে, অথবা কোন ব্যক্তি তেল চুরি করে নিজের তেলে মিশ্রিত করে নেয় কিংবা খাদ্য শস্য ও অর্থের বেলায়ও এরূপ হয়, তবে হারাম মাল পৃথক করতে হলে দেখতে হবে, সে হারাম মালের পরিমাণ জানে কি না? যদি পরিমাণ জানা থাকে; যেমন, অর্ধেক অথবা এক তৃতীয়াংশ, তবে অর্ধেক কিংবা এক তৃতীয়াংশ আলাদা করে নেবে। আর যদি পরিমাণ জানা না থাকে, তবে সন্দেহ ও একীনের মধ্যে একীনের দিকটি অবলম্বন করে সে পরিমাণ মাল আলাদা করবে অথবা প্রবল ধারণা অনুযায়ী কাজ করবে। এর উপায় হল, তার অধিকারে মালের মধ্যে উদাহরণতঃ অর্ধেক হালাল এবং এক তৃতীয়াংশ হারাম। অবশিষ্ট এক ষষ্ঠমাংশের মধ্যে তা হালাল না হারাম সন্দেহ রয়েছে। এখানে প্রবল ধারণা অনুযায়ী আমল করবে। যদি হালাল বলে প্রবল ধারণা হয়, তবে হালালের মধ্যে রাখবে এবং হারাম বলে প্রবল ধারণা হলে হারামের মধ্যে রাখবে। যদি কোন দিকেই প্রবল ধারণা না হয়; বরং সন্দেহই থেকে যায়, তবে হালালের সাথে রেখে দেয়া জায়েয এবং হারামের সাথে রাখা পরহেযগারী।

নিম্নে উপরোক্ত বর্ণনার পরিপূরক কয়েকটি মাসআলা বর্ণিত হচ্ছে।

(১) এক ব্যক্তি অন্য আরও কয়েক ব্যক্তির সাথে জনৈক মৃত ব্যক্তির

ওয়ারিস। সরকার এই মৃত ব্যক্তির একটি ভূখন্ড বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছিল, এখন সেই ভূখন্ড ফেরত দিচ্ছে। এটা সকল ওয়ারিসের প্রাপ্য হবে। যদি সরকার এই ভূখণ্ডের অর্ধেক ফেরত দেয় এবং এই ব্যক্তির অংশও অর্ধেক হয়, তবু অন্যান্য ওয়ারিস এই অর্ধেকের মধ্যে তার সাথে শরীক হবে। কেননা, তার অর্ধেক পৃথক নয়। কাজেই বলা যাবে না যে, তার অর্ধেক ফেরত দিয়েছে এবং অন্যদের অংশ বাজেয়াপ্ত রয়ে গেছে। সরকার আলাদার নিয়ত করলেও তা আলাদা হবে না।

(২) এক ব্যক্তির কাছে কোন জালেম শাসনকর্তার দেয়া একটি ভূখণ্ড ছিল। সে তা থেকে কিছু ফসল পেত। এখন সে তওবা করতে চায়। তার উচিত যতদিন এই ভূখণ্ডের ফসল খেয়েছে, আশেপাশের দর অনুযায়ী ততদিনের ভাড়া প্রকৃত মালিককে দিয়ে দেয়া। অন্যায়ভাবে প্রাপ্ত প্রত্যেক মাল থেকে এরূপ মুনাফা অর্জিত হলে তার বিধানও তদ্রূপ। এরূপ না করলে তওবা হবে না। গোলাম, বস্ত্র, তৈজসপত্র ইত্যাদি সাধারণতঃ যে সকল বস্তুর ভাড়া হয় না, সেগুলোর ক্ষেত্রে সাবধানতা হচ্ছে অধিকতর মজুরি ধার্য করে তা মালিককে দিয়ে দেয়া।

(৩) যে ব্যক্তি ওয়ারিসী সম্পত্তি লাভ করে, কিন্তু জানে না মৃত ব্যক্তি হালাল উপায়ে এ সম্পত্তি অর্জন করেছিল না হারাম উপায়ে। হালাল হারাম জানার কোন লক্ষণও নেই। এমতাবস্থায় সকল আলেম একমত যে, এই সম্পত্তি ওয়ারিসের জন্যে হালাল। আর যদি ওয়ারিস নিশ্চিতরূপে জানে যে, এ সম্পত্তিতে হারাম আছে, কিন্তু কি পরিমাণ হারাম, তা সন্দিগ্ধ, তবে অনুমান করে হারাম আলাদা করে দেবে। আর যদি হারাম হওয়ার জ্ঞান না থাকে, কিন্তু মৃত ব্যক্তি জালেম শাসনকর্তার কর্মচারী ছিল বিধায় হারামের সম্ভাবনা আছে, তবে এ সম্পত্তি থেকে বেঁচে থাকা পরহেযগারী– ওয়াজিব নয়। যদি ওয়ারিস জানে যে, মৃত ব্যক্তির কিছু মাল জুলুমের পথে অর্জিত ছিল, তবে সেই পরিমাণ মাল পৃথক করে দেয়া ওয়ারিসের জন্যে অপরিহার্য হবে। কোন কোন আলেম বলেন, বের করা ওয়াজিব হবে না এবং গোনাহ মৃত ব্যক্তির যিম্মায় থাকবে। এর প্রমাণস্বরূপ একটি রেওয়ায়েতপেশ করা হয়। তা হল, বাদশাহের জনৈক কর্মচারী মারা গেলে জনৈক সাহাবী বললেন ঃ এখন তার মাল তার ওয়ারিসদের জন্যে পবিত্র হয়ে গেছে। অবশ্য এ রেওয়ায়েতটি দুর্বল। কারণ, এতে সাহাবীর নাম উল্লেখ করা হয়নি। সম্ভবতঃ কোন অসাবধান

সাহাবী বলে থাকবেন। সাহাবীগণের মধ্যে কেউ কেউ কিছুটা অসাবধানও ছিলেন। সম্ভ্রমের খাতিরে আমরা তাঁদের নাম উল্লেখ করছি না। চিন্তার বিষয় হল, যে মালে নিশ্চিতরূপেই হারাম মিশ্রিত থাকে তা অর্জনকারীর মৃত্যুর কারণে বৈধ কিরূপে হয়ে যাবে? হাঁ, ওয়ারিসের জানা না থাকলে বলা যায়, যা সে জানে না, তার শাস্তি তাকে ভোগ করতে হবে না। সুতরাং যে ক্ষেত্রে ওয়ারিস জানে না, এই মালে নিশ্চিতরূপেই হারাম আছে, সেই মাল তার জন্যে পবিত্র বিবেচিত হবে।

হারাম মাল ব্যয় করা ঃ হারাম মাল পৃথক করার পর যদি তার মালিক নির্দিষ্ট থাকে, তবে সেই মাল মালিকের কাছে অথবা তার ওয়ারিসের কাছে অর্পণ করবে। মালিক সেই স্থানে না থাকলে তার জন্যে অপেক্ষা করবে অথবা যেখানে থাকে, সেখানে পৌঁছে দেবে। এই মালে কিছু বৃদ্ধি ও মুনাফা হলে মালিকের আসা পর্যন্ত তাও জমা রাখবে। আর যদি মালিক নির্দিষ্ট ব্যক্তি না হয় এবং নির্দিষ্ট করারও কোন আশা না থাকে, তবে পরিস্থিতি খুব স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত সেই মাল জমা রাখবে। কোন সময় মালিক অনেক হওয়ার কারণে মাল ফেরত দেয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। যেমন, গনীমতের মাল খেয়ানত করার পর যোদ্ধারা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ল। এখন তাদেরকে একত্রিতও করা যায় না। একত্রিত করা গেলেও এক দীনার উদাহরণতঃ দু'হাজার যোদ্ধার মধ্যে কিরূপে বণ্টন করা যাবে? সুতরাং এরূপ মাল সদকা করে দিতে হবে। আর যদি সেই মাল বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত মাল অথবা সরকারী ধনাগারের মাল হয়, যা জনহিতকর কাজের জন্যে হয়ে থাকে, তবে সে মাল পুল, মসজিদ, সরাইখানা এবং মক্কা মোয়াযযমার পথে ঝরণা নির্মাণের কজে ব্যয় করতে হবে, যাতে সে পথে চলাচলকারী মুসলমানরা উপকৃত হয়। এখানে সদকা ও জনহিতকর কাজ করা- এ দুটির দায়িত্ব কাযী তথা বিচারককে দেয়া উচিত। সুতরাং উপরোক্ত হারাম মাল কোন ধার্মিক কাযী পেলে তার হাতে সমর্পণ করবে। যে কাযী হারাম মাল নিজের জন্যে হালাল মনে করে, তার হাতে সমর্পণ করলে মালের ক্ষতিপূরণ সমর্পণকারীর যিম্মায় থাকবে। এমতাবস্থায় কোন ধর্মভীরু আলেমের হাতে সমর্পণ করবে অথবা তাকে কাযীর সাথে সহকর্মী করে দেবে। এসব ব্যবস্থা সম্ভবপর না হলে নিজেই সমস্ত কার্যনির্বাহ করবে। কেননা, উদ্দেশ্য হল ব্যয় করা। তবে অনেকেই জনহিতকর কাজ প্রকৃতপক্ষে

কোন্‌টি তা জানে না বিধায় সাহায্যকারীর প্রয়োজন। সুতরাং উপযুক্ত সাহায্যকারী পাওয়া না গেলে আসল ব্যয় পরিত্যাগ করা যাবে না। এখন প্রশ্ন হতে পারে, হারাম বস্তু সদকা করা যে বৈধ তার প্রমাণ কি? মানুষ যে বস্তুর মালিক নয়, তা সদকা করবে কিরূপে? এছাড়া কোন কোন ইমামের মাযহাব অনুযায়ী হারাম মাল সদকা করা জায়েযই নয়। সেমতে ফোযায়ল (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তাঁর হাতে হারাম দু'দেরহাম এসে গেলে তিনি তা পাথরে নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন ঃ আমি পবিত্র মাল ছাড়া অন্য কিছু সদকা করব না। এর জওয়াব হচ্ছে, হারাম মাল সদকা করা যে জায়েয, তার পক্ষে হাদীস, মনীষী বাক্য এবং কিয়াস রয়েছে। হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে একটি ভাজা করা আস্ত ছাগল খাওয়ার জন্যে পেশ করা হলে ছাগলটি অলৌকিকভাবে তাঁকে বলল ঃ আমি হারাম। অতঃপর তিনি সেটি বন্দীদেরকে খাইয়ে দিতে আদেশ করলেন, অর্থাৎ, সদকা করে দিতে বললেন। এছাড়া রোম ও পারস্যের যুদ্ধ সম্পর্কে কোরআন শরীফে এই আয়াত নাযিল হয় ঃ

الٓمٓ غُلِبَتِ الرُّومُ فِىٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ -

অর্থাৎ, নিকটবর্তী অঞ্চলে রোমকরা পরাজিত হয়েছে। এই পরাজয়ের পর কয়েক বছরের মধ্যে তারা জয়লাভ করবে।

কাফেররা এর সত্যতা চ্যালেঞ্জ করলে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রসূলে করীম (সাঃ)-এর অনুমতিক্রমে কাফেরদের সাথে বাজি ধরলেন। এর পর আল্লাহ তা'আলা যখন কাফেরদের মাথা হেঁট করালেন, তখন হযরত আবু বকর বাজিতে জিতে মাল রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির করলেন। তিনি বললেন ঃ এই মাল হারাম। একে খয়রাত করে দাও। মনীষী উক্তি হচ্ছে, হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) একটি বাঁদী ক্রয় করার পর মূল্য পরিশোধ করার সময় বিক্রেতাকে খুঁজে পেলেন না। অনেক খোঁজাখুঁজি করা হল, কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না। এর পর তিনি বাঁদীর মূল্য খয়রাত করে দিলেন এবং বললেন ঃ ইলাহী, আমি এটা বাঁদীর মালিকের পক্ষ থেকে দিচ্ছি। সে রাযী হলে ভাল, নতুবা এর সওয়াব আমাকে দিয়ো। হযরত হাসান বসরীকে প্রশ্ন করা হল– এক ব্যক্তি গনীমতের মালে খেয়ানত করল। যোদ্ধারা যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল,

সে তওবা করল। সে এই গনীমতের মাল কি করবে? তিনি জওয়াব দিলেন ঃ খয়রাত করে দেবে। এ সম্পর্কে কিয়াস হচ্ছে, হারাম মাল হয় ধ্বংস করে দিতে হবে, না হয় কোন জনহিতকর কাজে ব্যয় করতে হবে। কারণ, তার মালিক পাওয়ার আশা নেই। বলাবাহুল্য, সমুদ্রে নিক্ষেপ করার তুলনায় কোন জনহিতকর কাজে ব্যয় করাই উত্তম। কেননা সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হলে নিজের পক্ষ থেকেও বিনষ্ট হবে এবং মালিকের পক্ষ থেকেও বিনষ্ট হবে। কারই কোন ফায়েদা হবে না, কিন্তু গরীবকে দিয়ে দিলে সে মালিকের জন্যে দোয়া করবে। মালিকের ইচ্ছা ব্যতিরেকে সদকা করলে সওয়াব হবে না– একথা ঠিক নয়। কেননা, হাদীসে বলা হয়েছে– ক্ষেতের ফসল এবং ফলের বৃক্ষ থেকে যে পরিমাণ মানুষ ও পশুপাখী খায়, সে পরিমাণ সওয়াব চাষী ও বৃক্ষরোপণকারী পায়। বলাবাহুল্য, এটা তাদের ইচ্ছা ছাড়াই পাওয়া যায়। এখন এ প্রসঙ্গে কয়েকটি মাসআলা উল্লেখ করা হচ্ছে।

(১) মুহাসেবী (রহঃ) বলেন ঃ কারও হাতে শাসনকর্তার কাছ থেকে কোন মাল পৌঁছলে এই মাল শাসনকর্তাকেই ফিরিয়ে দেবে। কেননা, সে ভাল করেই জানে এটা কাকে দেয়া উচিত। এই ফিরিয়ে দেয়া খয়রাত করার চেয়ে উত্তম। শাসনকর্তার জ্ঞানে হয় তো এই মালের কোন নির্দিষ্ট মালিক আছে। এমতাবস্থায় এটা খয়রাত করা জায়েয হলে কারও কাছ থেকে মাল চুরি করে তা খয়রাত করাও জায়েয হওয়া উচিত। কেউ কেউ বলেন ঃ যদি জানা যায় যে, শাসনকর্তা এই মাল মালিককে ফেরত দেবে না, তবে তা খয়রাত করে দেবে। কেননা, এমতাবস্থায় শাসনকর্তাকে দিলে জুলুমে সাহায্য করা এবং জুলুমের কারণ বৃদ্ধি করা হবে। এছাড়া মালিকের হকও বরবাদ হবে। কাজেই মালিকের পক্ষ থেকে খয়রাত করে দেয়াই উত্তম।

(২) যখন কোন ব্যক্তির মালিকানায় হালাল, হারাম ও সন্দিগ্ধ মাল থাকে এবং সমগ্র মাল তার প্রয়োজনের বেশী না হয়, তখন সে পরিবার-পরিজন বিশিষ্ট হলে বিশেষভাবে নিজের জন্যে হালাল মাল আর সন্দিগ্ধ মাল পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করবে। কেননা, মানুষ বিশেষভাবে নিজের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে বেশী। এখানে নিজে হারাম

খেলে তা জেনে শুনে খাওয়া হবে, কিন্তু পরিবার পরিজনরা না জেনে খাবে। কাজেই, তাদের ওযর আছে তার ওযর নেই।

(৩) যদি কোন ব্যক্তি হারাম মাল ফকীরকে খয়রাত করে, তবে অকাতরে দেয়া জায়েয। আর যদি নিজের উপর ব্যয় করে, তবে যথাসম্ভব কম ব্যয় করবে। পরিবার-পরিজনের উপর ব্যয় করলে মাঝামাঝি পরিমাণে ব্যয় করবে।

(৪) হারাম মাল পিতামাতার কাছে থাকলে তাদের সাথে খাওয়া ত্যাগ করবে। তারা অসন্তুষ্ট হলেও তাদের কথা মানবে না। কেননা, আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী করে কোন মানুষের আদেশ পালন করা জায়েয নয়। আর সন্দিগ্ধ মাল হলে তাদের সাথে না খাওয়া পরহেযগারী। এর বিপরীতে পিতামাতার সন্তুষ্টিও পরহেযগারী; বরং ওয়াজিব। কাজেই বিরত থাকলে এমনভাবে বিরত থাকবে যেন তাদের কাছে অসহনীয় না হয়।

(৫) যে ব্যক্তির কাছে হারাম মাল আছে, তার উপর হজ্জ ও যাকাত ফরয হয় না। কেননা, সে নিঃস্ব। আর যদি সন্দিগ্ধ মাল থাকে, যা হালাল হওয়ারও সম্ভাবনা আছে, তবে হালাল হওয়ার সম্ভাবনার কারণে তার উপর হজ্জ ও যাকাত ফরয হবে।

(৬) যে ব্যক্তির কাছে হারাম মাল আছে এবং সে তা নিজের প্রয়োজনের জন্যে আটকে রেখেছে, সে যদি নফল হজ্জ করতে চায়, তবে পদব্রজে গেলে এই মাল খেতে পারবে। কেননা, হজ্জ ছাড়াও সে এই মাল খেত। সুতরাং হজ্জে খাওয়া আরও ভাল। আর যদি পদব্রজে যেতে সক্ষম না হয় এবং সওয়ারীর মুখাপেক্ষী হয়, তবে এরূপ প্রয়োজনের জন্যে এই মাল ব্যয় করা জায়েয নয়।

(৭) যে ব্যক্তি ফরয হজ্জের জন্য সন্দিগ্ধ মাল নিয়ে রওয়ানা হয়, সে পবিত্র মাল থেকে খাদ্য খাওয়ার চেষ্টা করবে। সারা পথে সম্ভব না হলে এহরাম বাঁধার পর থেকে এহরাম খোলা পর্যন্ত সময়ে পবিত্র খাদ্য খাওয়ার চেষ্টা করবে। যদি তাও সম্ভব না হয়, তবে কমপক্ষে আরাফার দিনে আল্লাহ তাআলার সামনে দাঁড়িয়ে দোয়া যেন এমতাবস্থায় না হয় যে, খাদ্যও হারাম এবং পরনের পোশাকও হারাম; বরং সেদিন পেটে হারাম

খাদ্য এবং দেহে হারাম পোশাক না রাখার চেষ্টা করবে। কেননা, সন্দিগ্ধ মাল প্রয়োজনের জন্যে জায়েয বলা হলেও এর অর্থ এই নয় যে, তা হালাল হয়ে গেছে। যদি আরাফার দিনেও হালাল খাদ্য ও হালাল পোশাক সম্ভবপর না হয়, তবে মনে মনে ভয় ও দুঃখ করবে যে, যে মাল পাক নয়, তা আমি অপারগ ও অক্ষম অবস্থার কারণেই খাচ্ছি। এতে আশা করা যায়, এই ভয় ও দুঃখের কারণে আল্লাহ্ তাআলা তার প্রতি কৃপা দৃষ্টি দেবেন এবং ত্রুটি মার্জনা করবেন।

(৮) হযরত ইমাম আহমদ (রহঃ)-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল ঃ আমার পিতা ধন সম্পদ রেখে মারা গেছেন, কিন্তু তিনি এমন লোকদের সাথে লেনদেন করতেন, যাদের সাথে লেনদেন করা মাকরূহ। এখন আমি কি করব? তিনি বললেন ঃ তোমার পিতা যে পরিমাণ মুনাফা লাভ করেছেন, সেই পরিমাণ মাল বাদ দাও এবং অবশিষ্ট মাল নিজে রেখে দাও। লোকটি আরজ করল ঃ তাঁর কিছু ঋণ অন্যের কাছে এবং অন্য লোকের কিছু ঋণ তাঁর কাছে প্রাপ্য আছে। তিনি বললেন ঃ তাঁর কাছে যার প্রাপ্য আছে তা শোধ কর এবং যা প্রাপ্য আছে, তা আদায় কর। ইমাম আহমদের এই জওয়াব সঠিক। এ থেকে বুঝা যায়, আন্দাজ করে হারাম পরিমাণ বের করে দেয়া তাঁর মতে জায়েয। ধনের ব্যাপারে তিনি এ বিষয়ের উপর ভরসা করেছেন যে, ঋণ নিশ্চিত। সন্দেহের কারণে একে বর্জন করা উচিত নয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রাজকীয় পুরস্কার ও ভাতার বিবরণ

প্রকাশ থাকে যে, যে ব্যক্তি বাদশাহের কাছ থেকে কোন পুরস্কার কিংবা ভাতা গ্রহণ করে, তার দু'টি বিষয় অবশ্যই দেখা উচিত। এক, সেই অর্থ বাদশাহের কাছে আমদানীর কোন্ খাত থেকে এসেছে? দুই, অর্থ গ্রহণকারীর নিজের যোগ্যতা এবং সেই যোগ্যতা অনুযায়ী কি পরিমাণ পাওয়ার যোগ্য?

রাজকীয় আমদানীর খাত ঃ চাষাবাদযোগ্য খাস ভূমি ছাড়া যে অর্থ বাদশাহের জন্যে হালাল এবং যাতে প্রজারা অংশীদার, তা দু'প্রকার। প্রথম প্রকার যা কাফেরদের কাছ থেকে হস্তগত হয়; যেমন যুদ্ধলব্ধ মালে গনীমত, যুদ্ধ ছাড়াই প্রাপ্ত মালে ফায় এবং জিযিয়া ও সন্ধির অর্থ, যা শর্তসাপেক্ষ গ্রহণ করা হয়। দ্বিতীয় প্রকার যা মুসলমানদের কাছ থেকে হস্তগত হয়, এর মধ্যে কেবল দু'শ্রেণীর মাল বাদশাহের জন্য হালাল– (১) ওয়ারেসীর মাল অথবা সেই মাল, যার কোন ওয়ারিস সাব্যস্ত না হয় এবং (২) ওয়াকফের মাল, যার কোন মুতাওয়াল্লী নেই। এসব খাত ছাড়া যত খরচ ও জরিমানা মুসলমানদের কাছ থেকে নেয়া হয় এবং উৎকোচের অর্থ, সবগুলো হারাম। অতএব যদি বাদশাহ কোন ফেকাহ্‌বিদ প্রমুখের জন্যে কোন জায়গীর কিংবা পুরস্কার কিংবা উপহার দেয়, তবে তা আট অবস্থার বাইরে নয়– হয় জিযিয়ার আমদানী থেকে প্রদান করবে না হয় বেওয়ারিস ওয়ারিসী সম্পত্তি থেকে, ওয়াকফ সম্পত্তি থেকে, নিজের খাস মালিকানা থেকে, নিজের ক্রয় করা মালিকানা থেকে, মুসলমানদের কাছ থেকে, রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারী থেকে, কোন ব্যবসায়ী থেকে অথবা খাস ধনভান্ডার থেকে বরাদ্দ করবে। এখন প্রত্যেকটির অবস্থা শুনা দরকার।

প্রথমঃ জিযিয়া, যার পাঁচ ভাগের চার ভাগ জনহিতকর কাজে ব্যয় করা হয় এবং একভাগ নির্দিষ্ট খরচের জন্যে রাখা হয়। যদি বাবদশাহ এই এক ভাগ থেকে কিংবা চার ভাগ থেকে দেয় এবং পরিমাণও সাবধানতা সহকারে নির্ধারণ করে, তবে এই অর্থ ফেকাহ্‌বিদ প্রমুখের জন্যে হালাল এই শর্তে যে, মাথাপিছু এক দীনার অথবা চার দীনার

বার্ষিকের চেয়ে বেশী হবে না। কেননা, এর পরিমাণের ক্ষেত্রে মতভেদ রয়েছে। অবশ্য বাদশাহ যে কোন এক উক্তি অনুযায়ী আমল করতে পারে এই শর্তে যে, যে যিম্মীর কাছ থেকে জিযিয়া আদায় করা হয়, সে যেন কোন নিশ্চিত হারাম পেশায় নিয়োজিত না থাকে।

দ্বিতীয় ঃ ওয়ারিসী মাল ও বেওয়ারিস মাল। এগুলোও জনহিতকর কাজে ব্যয় করার জন্যে। এ ক্ষেত্রে দেখা উচিত, যে ব্যক্তি এই মাল ছেড়ে গেছে, তার সব মাল না কম মাল হারাম ছিল। এর বিধান পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। মাল হারাম না হলে দেখতে হবে যাকে দেয়া হচ্ছে, তাকে দেয়া মঙ্গলজনক কিনা। মঙ্গলজনক হলে কতটুকু মঙ্গলজনক?

তৃতীয় ঃ ওয়াকফের মাল। ওয়ারিসী মালে যে সব বিষয় বিবেচ্য, এখানেও তাই বিবেচ্য। অতিরিক্ত বিষয়, ওয়াকফকারীর শর্তও দেখতে হবে যে, তা লঙ্ঘিত হচ্ছে কি না।

চতুর্থ ঃ বাদশাহের আবাদ করা ভূমি। এখানে বিবেচ্য বিষয় হল, ভূমি আবাদ করার সময় বাদশাহ মজুরদেরকে মজুরি দিয়েছে কিনা এবং হালাল মাল থেকে দিয়েছে কিনা। বলপূর্বক আবাদ করিয়ে থাকলে বাদশাহ সে ভূমির মালিক হয়নি এবং সেটা হারাম। আর হারাম মাল থেকে মজুরি দিয়ে থাকলে সে ভূমি সন্দিগ্ধ, যার বিধান পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

পঞ্চম ঃ বাদশাহের ক্রয় করা সম্পত্তি। এর মূল্য হারাম মাল দ্বারা পরিশোধ করে থাকলে হারাম এবং সন্দিগ্ধ মাল দ্বারা পরিশোধ করলে সন্দিগ্ধ হবে।

ষষ্ঠ ঃ মুসলমানদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারী অথবা যে মালে গনীমত ও জরিমানা একত্রিত করে, তার কাছ থেকে নেয়া। এই মাল নিঃসন্দেহে হারাম। এরূপ মাল থেকে পুরস্কার, ভাতা কিংবা উপহার গ্রহণ করবে না। এ যুগে অধিকাংশ জায়গীর এমনি ধরনের, কিন্তু ইরাকের যমীন এরূপ নয়।

সপ্তম ঃ এরূপ ব্যবসায়ীর কাছ থেকে নেয়া, যে স্বয়ং বাদশাহের সাথে লেনদেন করে, অন্য কারও সাথে করে না। তার মাল রাজকীয় ধনভাণ্ডারের মালের মতই। আর যদি অন্যের সাথে বেশী লেনদেন করে, তবে বাদশাহের লেখা অনুযায়ী যা দেবে, তা বাদশাহের কাছে পাওনা

হবে। এর বিনিময় হারাম দ্বারা শোধ করলে হারাম হবে এবং এর বিধান পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

অষ্টম ঃ খাস ধনভাণ্ডার থেকে নেয়া কিংবা এমন কর্মচারীর কাছ থেকে নেয়া, যার কাছে হালাল ও হারাম উভয়ই সঞ্চিত হয়। বাদশাহের আমদানী হারাম ছাড়া কিছু না থাকলে নিশ্চিত হারাম হবে। যদি নিশ্চিতরূপে জানা থাকে যে, শাহী ধনভাণ্ডারে হারাম হালাল উভয়ই আছে এবং যা দেয়া হচ্ছে তা হালাল কিংবা হারাম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তবে কেউ কেউ বলেন, যে বস্তু নিশ্চিতরূপে হারাম নয়, তা গ্রহণ করা যায়। আবার কেউ কেউ বলেন, হালাল বলে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত গ্রহণ করা উচিত নয়। কেননা, সন্দেহ কখনও হালাল হয় না। এই উভয় মতই বাড়াবাড়ি। মাঝামাঝি মত তাই, যা আমরা লেখেছি। অর্থাৎ, শাহী মাল অধিকাংশ হারাম হলে গ্রহণ করা হারাম।

শাহী ভাণ্ডারে হালাল হারাম উভয় প্রকার মাল থাকলে এবং যা দেয়া হয়, তার হারাম হওয়া প্রমাণিত না হলে যারা তা গ্রহণ করা জায়েয বলেন, তারা প্রমাণস্বরূপ বলেন, অনেক সাহাবী জালেম বাদশাহদের যমানা দেখেছেন এবং তাদের কাছ থেকে মাল গ্রহণ করেছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন হযরত আবু হোরায়রা, আবু সায়ীদ খুদরী, হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত, হযরত আবু আইউব আনসারী, জরীর ইবনে আবদুল্লাহ, আনাস ইবনে মালেক, মেসওয়ার ইবনে মাখরামা, ইবনে ওমর, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুম। সেমতে হযরত আবু হোরায়রা এবং আবু সায়ীদ (রাঃ) মারওয়ান ইবনে হাকাম ও ইয়াযীদ ইবনে আবদুল মালেকের কাছ থেকে মাল গ্রহণ করেছেন। হযরত ইবনে ওমর ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের কাছ থেকে মাল গ্রহণ করেছেন এবং অনেক তাবেয়ীও গ্রহণ করেছেন; যেমন শা'বী, ইবরাহীম, হাসান বসরী ও ইবনে আবী লায়লা। হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) হারূন রশীদের কাছ থেকে এক দফায় হাজার দীনার গ্রহণ করেছিলেন এবং ইমাম মালেক (রহঃ) খলীফাগণের কাছ থেকে অনেক ধন-সম্পদ নেন। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ বাদশাহ্ তোমাকে যা দেয়, তা কবুল কর। সে তোমাকে হালাল থেকেই দেয়। পক্ষান্তরে যাঁরা রাজকীয় দান গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন, তাঁরা পরহেযগারীর ভিত্তিতেই অস্বীকার করেছেন। তাঁরা আশংকা করেছেন, কোথাও এমন মাল না এসে যায় যা

হালাল নয় এবং দ্বীনদারী বরবাদ করার কারণ হয়ে যায়। হযরত আবু যুর গিফারী (রাঃ) আহনাফ ইবনে কায়সকে একবার বললেন ঃ মনের খুশীতে দিলে দান গ্রহণ কর। দান যদি তোমার দ্বীনদারীর বিনিময় হয়ে যায়, তবে তা বর্জন কর। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ কেউ আমাদেরকে কোন দান দিলে আমরা কবুল করে নেই আর না দিলে সওয়াল করি না। সায়ীদ ইবনে মুসাইয়িব (রঃ) আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ আমীর মোয়াবিয়া (রাঃ) তাঁকে কিছু দিলে তিনি চুপ করে থাকতেন, আর না দিলে কিছুই বলতেন না। হযরত মসরূক (রহঃ) বলেন ঃ সদাসর্বদা দান গ্রহণকারীরা ক্রমান্বয়ে হারাম দান গ্রহণ করতে শুরু করবে। নাফে' হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, মুখতার তাঁর কাছে ধন-দৌলত প্রেরণ করলে তিনি তা কবুল করে নিতেন এবং বলতেন ঃ আমি কারও কাছে সওয়াল করি না এবং আল্লাহ আমাকে যা দেন, তা প্রত্যাখ্যান করি না। নাফে আরও বর্ণনা করেন, ইবনে মুয়াম্মার হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)-এর কাছে ষাট হাজার দেরহাম প্রেরণ করলে তিনি তৎক্ষণাৎ তা বিলিয়ে দেন। এর পর জনৈক সওয়ালকারী আগমন করলে তিনি যাদেরকে দিয়েছিলেন, তাদের কাছ থেকে কর্জ করে সওয়ালকারীকে দেন। হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) আমীর মোয়াবিয়ার কাছে গমন করলে আমীর মোয়াবিয়া (রাঃ) বললেন ঃ আমি আপনাকে এমন দান দেব, যা ইতিপূর্বে কোন আরবকে দেইনি এবং ভবিষ্যতেও দেব না। এর পর তিনি চার লক্ষ দেরহাম পেশ করলেন। হযরত ইমাম হাসান তা কবুল করে নিলেন। হাবীব ইবনে আবু সাবেত বর্ণনা করেন, আমি হযরত ইবনে ওমর ও ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে প্রদত্ত মুখতারের উপঢৌকন দেখেছি। তাঁরা উভয়েই সেই উপঢৌকন কবুল করে নেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ সে উপঢৌকন কি ছিল? তিনি বললেন ঃ নগদ অর্থ ও বস্ত্র। হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ) এরশাদ করেন, তোমার কোন বন্ধু যদি রাজকর্মচারী কিংবা ব্যবসায়ী হয়– যে সুদ থেকে বেঁচে থাকে না, সে যদি তোমাকে ভোজের দাওয়াত করে অথবা কোন বস্তু দেয়, তবে তা কবুল করে নাও। এটা জায়েয। গোনাহ্ ও শাস্তি তার যিম্মায় থাকবে। সুদ গ্রহীতার ক্ষেত্রে যখন কবুল করা প্রমাণিত হল, তখন জালেমের ক্ষেত্রেও তাই হবে। কেননা, উভয়ের অবস্থা একই রূপ। হযরত ইমাম জাফর সাদেক নিজের পিতার কাছ থেকে বর্ণনা করেন, হযরত ইমাম হাসান ও

ইমাম হোসাইন (রাঃ) হযরত আমীর মোয়াবিয়ার উপঢৌকন কবুল করতেন। হাকীম ইবনে জোবায়র (রাঃ) বলেন ঃ আমি হযরত সায়ীদ ইবনে জোবায়র (রাঃ)-এর কাছে গেলাম। তিনি তখন ফোরাতের নিম্নাঞ্চলের ওশর আদায়ের প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি আদায়কারীদের কাছে এই বলে লোক পাঠালেন, তোমাদের কাছে যা আছে তা থেকে আমাদেরকে কিছু দাও, খাওয়াও। তারা খাদ্য পাঠিয়ে দিল। তিনি তা খেলেন এবং আমাকেও খাওয়ালেন। হযরত ইবরাহীম নখয়ী বলেন ঃ কাজকর্মচারীদের উপঢৌকন কবুল করায় কোন দোষ নেই। কেননা, তারা শ্রমজীবী। তাদের ধনাগারে ভাল-মন্দ সকল প্রকার মাল থাকে। তারা তোমাকে ভাল মাল থেকেই উপঢৌকন দেবে। দেখ, উপরোল্লিখিত সকলেই জালেম বাদশাহর উপঢৌকন কবুল করেছেন। পূর্ববর্তীদের মধ্যে যারা এই উপঢৌকন কবুল করেননি তাদের কাজ হারাম হওয়ার দলীল নয়; বরং তারা পরহেযগারীর কারণে কবুল করেননি। যেমন, খোলাফায়ে রাশেদীন, হযরত আবু যর গেফারী প্রমুখ পরহেযগারীর কারণে অনেক হালালও গ্রহণ করতেন না। সুতরাং উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গের কবুল করা থেকে বুঝা যায়, রাজকীয় ধন-সম্পদ কবুল করা জায়েয। তবে বাস্তব ক্ষেত্রে কবুল করার তুলনায় কবুল না করা অতি উত্তম। জালেম বাদশাহদের মাল গ্রহণ করা যাদের মতে জায়েয, এ পর্যন্ত তাদের বক্তব্য পেশ করা হল।

এই বক্তব্যের জওয়াব, যাদের কবুল করার কথা বর্ণিত হয়েছে, তাদেরই কবুল করতে অস্বীকার করা ও ফেরত দেয়ার কথাও বর্ণিত আছে এবং কবুল করার রেওয়ায়েত অপেক্ষা কবুল না করার রেওয়ায়েত অধিক।

জানা উচিত, রাজকীয় ধনসম্পদ পরহেযগারগণের পক্ষে কবুল করা না করার চারটি স্তর আছে। তন্মধ্যে প্রথম স্তর হচ্ছে বাদশাহদের ধনসম্পদ কিছুই কবুল না করা; যেমন পূর্ববর্তী যমানার পরহেযগারগণ করেছেন এবং খোলাফায়ে রাশেদীন করতেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) বায়তুল মাল থেকে যা কিছু নিয়েছিলেন, সবগুলো হিসাব করে ইন্তেকালের পূর্বে বায়তুল মালে জমা করিয়ে দেন। একবার হযরত ওমর (রাঃ) বায়তুল মালের ধনরাশি বণ্টন করছিলেন, এমন সময় তাঁর এক কন্যা এসে একটি দেরহাম তুলে নেয়। তিনি তৎক্ষণাৎ তাকে ধরার জন্যে

এমনভাবে ছুটলেন যে, চাদর এক কাঁধ থেকে পড়ে গেল। কন্যা কাঁদতে কাঁদতে গৃহে চলে গেল এবং দেরহামটি মুখের মধ্যে পুরে নিল। হযরত ওমর (রাঃ) তার মুখে অঙ্গুলি ঢুকিয়ে দেরহামটি বের করে নিয়ে এলেন এবং যথাস্থানে রেখে বললেন ঃ লোক সকল! এই মাল থেকে ওমর ও তার সন্তানদের ততটুকুই প্রাপ্য, যতটুকু দূরবর্তী ও নিকটবর্তী মুসলমানদের প্রাপ্য। হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) একবার বায়তুল মাল ঝাড়ু দিয়ে একটি দেরহাম পান। তিনি সেই দেরহামটি হযরত ওমরের ছোট শিশু পুত্রকে দিয়ে দিলেন। সে সেখানে ঘুরাফেরা করছিল। হযরত ওমর তার হাতে দেরহাম দেখে জিজ্ঞেস করলেন ঃ কোথায় পেলে? পুত্র বলল ঃ আবু মূসা আমাকে দিয়েছেন। তিনি আবু মূসাকে ডেকে এনে বললেন ঃ তোমার জানা মতে মদীনাবাসীদের কোন গৃহ ওমরের গৃহ অপেক্ষা অধিক হেয় ছিল নাকি? তোমার ইচ্ছা, উম্মতে মোহাম্মদীর (সাঃ) এমন কেউ না থাক, যে তার হক আমার কাছে তলব করবে না। এ কথা বলে তিনি দেরহামটি বায়তুল মালে রেখে দিলেন, অথচ সেটা হালাল বৈ ছিল না, কিন্তু তাঁর আশংকা ছিল, হয় তো এতটুকু প্রাপ্য তাঁর হবে না। তিনি দ্বীনদারী ও ইযযত রক্ষার্থে নিজের প্রাপ্যের অপেক্ষা কম নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতেন। কেননা, তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মুখে রাজকীয় ধনসম্পদ সম্পর্কে অনেক কঠোর বক্তব্য শুনেছিলেন। সেমতে রসূলে করীম (সাঃ) যখন ওবাদা ইবনে সামেতকে যাকাত আদায় করার জন্যে প্রেরণ করেন, তখন বললেন ঃ হে আবুল ওলীদ! আল্লাহ তাআলাকে ভয় করবে। এমন যেন না হয় যে, তুমি কেয়ামতের দিন একটি উষ্ট্রীকে কাঁধে বহন করে আনবে, আর উষ্ট্রী উচ্চৈস্বরে চীৎকার করতে থাকবে অথবা একটি গাভীকে আনবে, যেটি প্রচণ্ড শব্দে হাম্বা রব করতে থাকবে, অথবা একটি ছাগলকে আনবে, সেটি চেঁচাতে থাকবে। ওবাদা আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, এরূপই কি হবে? তিনি বললেন ঃ হাঁ, সেই আল্লাহর কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ— এরূপই হবে। তবে যার প্রতি আল্লাহ রহম করেন, তার অবস্থা ভিন্ন। ওবাদা আরজ করলেন ঃ যে আল্লাহ আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, তাঁর কসম, আমি কখনও কোন বস্তুর অসহায় বাহক হব না। রসূলে করীম (সাঃ) আরও বলেন ঃ তোমরা আমার পরে মুশরিক হয়ে যাবে এ ভয় আমি করি না, কিন্তু আমার আশংকা, তোমরা ধনসম্পদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বে। এক

হাদীসে বায়তুল মালের অর্থ সম্পর্কে হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ এই সম্পদের ব্যাপারে আমি নিজেকে এমন উপলব্ধি করি, যেমন এতীমের সম্পত্তির ওলী হয়ে থাকে। প্রয়োজন না হলে আমি এ সম্পদ থেকে দূরে থাকি, আর প্রয়োজন হলে নিতান্ত প্রয়োজন পরিমাণে এ থেকে খাই। বর্ণিত আছে, হযরত তাউসের পুত্র তাঁর পক্ষ থেকে একটি জাল পত্র লেখে খলীফা হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজের কাছে দিলে খলীফা তাকে তিনশ' আশরাফী দিয়ে দিলেন। এই ঘটনা অবগত হয়ে হযরত তাউস নিজের একখণ্ড ভূমি বিক্রয় করে খলীফার কাছে তিনশ' আশরাফী পাঠিয়ে দিলেন। অথচ তিনি ছিলেন খ্যাতনামা ন্যায়পরায়ণ শাসনকর্তা হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ। এ স্তরটি পরহেযগারীর শ্রেষ্ঠতম স্তর।

দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে বাদশাহদের ধনসম্পদ গ্রহণ করা, কিন্তু তখন, যখন জানা যায় যে, যা গ্রহণ করা হচ্ছে তা হালাল পন্থায় অর্জিত। এখানে বাদশাহদের মালিকানায় অন্য হারাম মাল থাকলেও তা ক্ষতিকর হবে না। অধিকাংশ পরহেযগার সাহাবীগণের গ্রহণ করা এই নীতির ভিত্তিতেই ছিল। উদাহরণতঃ হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) অত্যধিক পরহেযগারী করতেন। তিনি না জেনে না শুনে কিরূপে শাহী ধনসম্পদ কবুল করতে পারতেন? তিনি তো বাদশাহদেরকে সর্বাধিক অপছন্দ এবং তাদের ধনসম্পদের সর্বাধিক সমালোচনা করতেন। সেমতে একবার রাজকর্মচারী ইবনে আমেরের কাছে লোকজন সমবেত ছিল। হযরত ইবনে ওমরও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ইবনে আমের রাজকর্মচারী হওয়ার কারণে আল্লাহর কাছে দণ্ডিত হওয়ার ভয় ব্যক্ত করছিলেন। লোকেরা বলল ঃ আশা করা যায়, আপনি আল্লাহর কাছে দণ্ডিত না হয়ে পুরস্কৃত হবেন। কেননা, আপনি কূপ খনন করিয়েছেন, হাজীদের কাফেলাকে পানি পান করিয়েছেন এবং এই কাজ করেছেন, সেই কাজ করেছেন। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) চুপচাপ শুনলেন। ইবনে আমের জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি কি বলেন? তিনি বললেন ঃ এসব কথা তখন সত্য হবে, যখন উপার্জন ভাল হয় এবং ব্যয়ও সুষ্ঠুভাবে করা হয়। তোমাকে তো ভুগতেই হবে। অন্য এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী তিনি জওয়াবে বললেন ঃ দূষিত বিষয় গোনাহের বিনিময় হতে পারে না। তুমি বসরার শাসনকর্তা ছিলে। আমার ধারণায় তুমি তাতে পাপই অর্জন করেছ। ইবনে আমের আরজ করলেন ঃ

আপনি আমার জন্যে দোয়া করুন। তিনি বললেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি–

لايقبل الله صلوة بغير طهور ولا صدقة من غلول ـ

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা ওযু ছাড়া নামায কবুল করেন না এবং খেয়ানতের মাল থেকে সদকা কবুল করেন না।

হযরত ইবনে ওমরের এ উক্তি সেই মালের ব্যাপারে ছিল, যা ইবনে আমের খয়রাতে ব্যয় করেছিলেন। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে আরও বর্ণিত আছে, হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের আমলে একবার তিনি বললেন ঃ যেদিন থেকে রাজধানী লুণ্ঠিত হয়েছে, আমি পেট ভরে আহার করিনি। একবার ইবনে আমের হযরত ইবনে ওমরের গোলাম নাফে'কে ত্রিশ হাজার দেরহামের বিনিময়ে ক্রয় করতে চাইলে তিনি বললেন ঃ আমার আশংকা, ইবনে আমেরের দেরহাম আমাকে ফেতনায় না ফেলে দেয়। এই বলে তিনি নাফে'কে মুক্ত করে দিলেন। হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বলেন ঃ আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যাকে দুনিয়া আকৃষ্ট করেনি– হযরত ইবনে ওমর ছাড়া। তাঁকে দুনিয়া আকৃষ্ট করতে পারেনি। এ থেকে বুঝা যায়, হযরত ইবনে ওমরের মত ব্যক্তি সম্পর্কে এরূপ ধারণা হতে পারে না যে, তিনি হালাল না জেনেই কোন মাল কবুল করে থাকবেন।

তৃতীয় স্তর হচ্ছে বাদশাহের কাছ থেকে যা গ্রহণ করা হয়, তা ফকীর ও হকদারদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া। যে মালের কোন নির্দিষ্ট মালিক নেই, শরীয়তে তার বিধান এরূপই। বাদশাহ যদি এমন হয় যে, তার কাছ থেকে না নেয়া হলে সে নিজে বণ্টন করবে না; বরং তা জুলুমের সহায়তায় ব্যয় করবে, তবে তার কাছে মাল রেখে দেয়ার চেয়ে গ্রহণ করে বণ্টন করে দেয়া উত্তম। কোন কোন আলেমের অভিমত তাই। অধিকাংশ পূর্ববর্তীগণ এই প্রকারেই বাদশাহদের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করতেন। এই জন্যেই হযরত ইবনে মোবারক বলেন ঃ আজ যারা শাহী দান গ্রহণ করে এবং হযরত ইবনে ওমর ও হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করে, তারা তাঁদের অনুসরণ করে না। কেননা, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) যা কিছু গ্রহণ করেছেন তা সবই বণ্টন করে দিয়েছেন। এমন কি ষাট হাজার দেরহাম বণ্টন করার পরও অন্য একজন

সওয়ালকারীর জন্যে মজলিস থেকেই কর্জ করেছেন। হযরত আয়েশা (রাঃ)-ও তাই করেছেন। জাবের ইবনে যায়েদও গ্রহণ করে তা খয়রাত করে দিয়েছেন এবং বলেছেন ঃ বাদশাহদের কাছ থেকে গ্রহণ করে বণ্টন করে দেয়া তাদের কাছে থাকতে দেয়ার তুলনায় আমার কাছে ভাল মনে হয়। ইমাম শাফেয়ী হারুন রশীদের কাছ থেকে যা গ্রহণ করেছিলেন, তাও কয়েক দিনের মধ্যেই খয়রাত করে দিয়েছিলেন, নিজের জন্যে একটি দানাও রাখেননি।

চতুর্থ স্তর হচ্ছে, মাল হালাল হওয়ার প্রমাণ নেই, তা বণ্টনের উদ্দেশে নয়; বরং নিজের ভোগ করার জন্যে গ্রহণ করা, কিন্তু এমন বাদশাহ্র কাছে থেকে গ্রহণ করা, যার অধিকাংশ মাল হালাল। চার জন খোলাফায়ে রাশেদীনের পরও সাহাবী ও তাবে তাবেয়ীগণের যুগের খলীফাগণ এরূপই ছিলেন। তাদের অধিকাংশ মাল হারাম ছিল না। এর দলীল হযরত আলী (রাঃ)-এর এরশাদ– বাদশাহ হালাল পন্থায় যে মাল প্রাপ্ত হয় তাই বেশী। এই চতুর্থ স্তরকে একদল আলেম জায়েয বলেছেন। আমরা নিষেধ তখন করি, যখন হারামের অংশ বেশী বলে অনুমিত হয়।

উপরোক্ত স্তরসূহ হৃদয়ঙ্গম করার পর একথা বুঝা সহজ যে, এ যুগের জালেম বাদশাহদের জায়গীর ও ভাতা তেমন নয়, যেমন পূর্বে ছিল। কেননা, এ যুগের বাদশাহদের মাল সম্পূর্ণ অথবা অধিকাংশ হারাম। হালাল ছিল কেবল যাকাত, ফায় ও গনীমতের খাত। এ যুগে এগুলোর অস্তিত্ব নেই। এখন বাকী রয়েছে জিযিয়া, যা জুলুমের মাধ্যমে আদায় করা হয়। ফলে তা গ্রহণ করা হালাল নয়। এছাড়া পূর্বেকার জালেম বাদশাহরা সাহাবী ও তাবেয়ীদের যমানার নিকটবর্তী ছিল বিধায় জুলুম সম্পর্কে অধিক সচেতন ছিল। তারা সাহাবী ও তাবেয়ীগণের সন্তুষ্টিতে আগ্রহী ছিল। তারা চাওয়া ছাড়াই উপঢৌকন ইত্যাদি তাঁদের খেদমতে পাঠিয়ে দিত এবং কবুল করলে নিজেদেরকে ধন্য মনে করত। তাঁরা বাদশাহদের কাছ থেকে নিয়ে ফকীরদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন। ফলে তাঁদের ধর্মীয় ক্ষতির আশংকা ছিল না, কিন্তু বর্তমানে অবস্থা হচ্ছে, শাসকদের মন তাকেই কিছু দিতে চায়, যে তাদের খেদমত করতে পারে, দল বৃদ্ধি করতে পারে, সাহায্য করতে পারে, দরবারে শরীক হয়ে সৌন্দর্য বর্ধন করতে পারে, দোয়া করতে পারে, সদাসর্বদা স্তূতি বাক্য পাঠ করতে

পারে এবং সম্মুখে ও পশ্চাতে বাড়িয়ে বাড়িয়ে প্রশংসা করতে পারে। আর যারা এসব খিদমতী সম্পাদন করতে সম্মত নয় তাদের সম্পর্কে নিশ্চিতরূপেই বলা যায় যে, শাসকরা তাদেরকে একটি পয়সাও দেবে না, যদিও সমসাময়িক ইমাম উদাহরণতঃ ইমাম শাফেয়ীই হয়। এসব কারণে বর্তমান যুগের শাসকদের কাছ থেকে হালাল মাল হলেও নেয়া জায়েয নয়। আর হারাম অথবা সন্দিগ্ধ মাল হলে তো নিঃসন্দেহেই নেয়া জায়েয নয়। এখন যে কেউ শাসকদের মাল গ্রহণ করে এবং নিজেকে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের সাথে তুলনা করে, সে কর্মকারকে ফেরেশতাদের সাথে তুলনা করে। পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, বাদশাহদের আমদানীর খাতসমূহের মধ্যে কোন্‌টি হালাল ও কোন্‌টি হারাম। এখন যদি কোন ব্যক্তি হালাল খাত থেকে তার হক পরিমাণে ঘরে বসে পায়, কারও তোষামোদ ও খেদমত করার প্রয়োজন না হয়, বাদশাহদের প্রশংসা করতে না হয় এবং তাদের মতলবে একমত হতে না হয় তবে সেই মাল গ্রহণ করা হারাম হবে না, কিন্তু কয়েক কারণে মাকরূহ হবে, যা ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হবে।

পরিমাণ ও গুণ ঃ কতক মালের প্রাপক নির্দিষ্ট থাকে। যেমন, ওয়াকফের মাল, যাকাতের মাল, ফায়-এর এক পঞ্চমাংশ ও গনীমতের এক পঞ্চমাংশ। কতক মালের মালিক স্বয়ং বাদশাহ, যেমন তার চাষযোগ্য ভূমি অথবা তার ক্রীত সম্পত্তি। বাদশাহের মালিকানাধীন এসব সম্পদ থেকে যাকে ইচ্ছা, যে পরিমাণ ইচ্ছা দিতে পারে। তাই আমরা সে সব সম্পদ সম্পর্কে আলোচনা করব, যেগুলো জনহিতকর কাজের জন্যে নির্দিষ্ট। যেমন ফায়-এর চার-পঞ্চমাংশ এবং বেওয়ারিস ত্যাজ্য সম্পত্তি। এসব সম্পদ তাদেরকেই দেয়া উচিত, যাদেরকে দিলে জনগণের কল্যাণ হয় অথবা যে ব্যক্তি উপার্জন করতে অক্ষম। যে ব্যক্তি ধনী এবং যাকে দিলে জনগণের কোন কল্যাণ হয় না, বায়তুল মালের অর্থ তাকে না দেয়া উচিত। এতে আলেমগণের মতভেদ থাকলেও না দেয়াটাই বিশুদ্ধ। হযরত ওমর (রাঃ)-এর উক্তি থেকে বুঝা যায়, বায়তুল মালের অর্থে প্রত্যক মুসলমানের অধিকার রয়েছে মুসলমান হওয়ার কারণে। এতদসত্ত্বেও তিনি সকল মুসলমানের মধ্যে অর্থ বন্টন করতেন না; বরং তাদেরকেই দিতেন, যার উপকার মুসলমানরা পায় এবং যে এই কাজ না

করে উপার্জনে মশগুল হলে সে কাজ হতে পারে না, এরূপ ব্যক্তির হক প্রয়োজন পরিমাণে বায়তুল মালে প্রতিষ্ঠিত হবে। এ নীতি অনুযায়ী প্রয়োজন পরিমাণে বায়তুল মালে হক রয়েছে। এখানে আমাদের উদ্দেশ্য এমন আলেম, যাদের দ্বারা দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণ সাধিত হয়। যেমন, ফেকাহ্, হাদীস ও তফসীরের আলেম এবং এগুলোর শিক্ষক ও তালেবে এলেম। কেননা, তারা প্রয়োজন পরিমাণে না পেলে এলেম অর্জন করতে পারবে না। সে সব কর্মচারীও এর অন্তর্ভুক্ত, যাদের কর্ম দুনিয়ার উপকারের সাথে জড়িত। যেমন, সেনাবাহিনীর লোকজন, যারা দেশের সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী। দেশের চিকিৎসকগণও এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তাদের এবং এ ধরনের অন্যান্য আলেমগণের ভাতা বায়তুল মাল থেকে দেয়া উচিত, যাতে কেউ পারিশ্রমিক ছাড়া চিকিৎসা করাতে চাইলে তাদের দ্বারা করাতে পারে। তাঁদের মধ্যে প্রয়োজন থাকা শর্ত নয়; বরং ধনী হলেও তাঁদেরকে ভাতা দিতেন, অথচ তাঁদের সকলের প্রয়োজন ছিল না। ভাতার পরিমাণও নির্দিষ্ট নয়; বরং শাসনকর্তার অভিমতের উপর নির্ভরশীল। তিনি যাকে ইচ্ছা ততটুকু দিতে পারবেন, যদ্দ্বারা ধনী হয়ে যায় এবং যাকে ইচ্ছা প্রয়োজন পরিমাণে দিতে পারবেন। সাময়িক উপযোগিতা ও আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী এরূপ করার ক্ষমতা তাঁর রয়েছে। সেমতে হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) আমীর মোয়াবিয়ার কাছ থেকে এক দফায় চার লাখ দেরহাম গ্রহণ করেছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) কিছুসংখ্যক লোককে বার্ষিক বার হাজার দেরহাম দিতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নাম এই তালিকারই অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি কিছু লোককে দশ হাজার এবং কিছু লোককে ছয় হাজার দেরহাম করেও দিতেন।

সারকথা, বায়তুল মাল উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গের হক এবং তাদের মধ্যে বিনাদ্বিধায় বণ্টন করা উচিত। অনুরূপভাবে এই মাল থেকে বিশেষ ব্যক্তিবর্গকে উপঢৌকন ও পুরস্কার দ্বারা ভূষিত করার ক্ষমতাও বাদশাহের আছে, কিন্তু এতে উপযোগিতার প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। যখন কোন বিজ্ঞ ও বীর পুরুষকে পুরস্কৃত করা হবে, তখন অন্যরাও অনুপ্রাণিত হবে এবং অনুরূপ কাজ করতে আগ্রহী হবে। এসব বিষয় বাদশাহের ইজতিহাদের সাথে জড়িত।

জালেম বাদশাহদের ব্যাপারে দুটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রথমতঃ জালেম শাসক শাসন ক্ষমতা থেকে পদচ্যুত হওয়ার যোগ্য। সে হয় পদত্যাগ করবে না হয় তাকে পদচ্যুত করা ওয়াজিব। এমতাবস্থায় সে যখন প্রকৃতপক্ষে শাসকই নয়, তখন তার কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করা কিরূপে দুরস্ত হবে? দ্বিতীয়ত জালেম শাসক তার অর্থ সকল হকদারকে দেয় না। এমতাবস্থায় তার কাছ থেকে দু'একজন কিরূপে নিতে পারে? এর পর কথা হল, দু'একজন তাদের অংশ পরিমাণে নিলে দুরস্ত হবে কিনা? না মোটেই না নেয়া অথবা যা-ই পাওয়া যায় তা-ই নেয়া জায়েয। প্রথম অবস্থায় আমাদের অভিমত হচ্ছে, কেউ আপন অংশ পরিমাণে নিলে তাকে নিষেধ করা যাবে না। কেননা, জালেম শাসক শক্তিমান হলে তাকে বরখাস্ত করা কঠিন হয়ে থাকে এবং অন্যকে তার স্থলাভিষিক্ত করলে অসহনীয় ফাসাদ দেখা দেয়। ফলে জালেম শাসককেই থাকতে দেয়া এবং তার আনুগত্য করা জরুরী হয়ে যায়। আজকাল তো 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতিই কার্যকর। জোরওয়ালারা যার বয়াত করে নেয় সেই খলীফা। অতএব যা পাওয়া যায় তাই নেয়া কেয়াসসম্মত। অবশিষ্ট যারা না পায় তাদের প্রতি জুলুম থেকে যাবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

জালেম শাসকের সাথে মে'লামেশার স্তর

প্রকাশ থাকে যে, জালেম শাসকদের সাথে তিন প্রকার অবস্থা হতে পারে। এক, তাদের কাছে যাওয়া। এটা কম মন্দ অবস্থা। দুই, জালেম শাসকদের তোমার কাছে আসা। এটা অপেক্ষাকৃত কম মন্দ অবস্থা। তিন, তাদের থেকে সম্পূর্ণ সরে থাকা। যেমন, তুমিও তাদেরকে দেখবে না এবং তারাও তোমাকে দেখবে না। এটা সম্পূর্ণ দোষমুক্ত অবস্থা। এখন প্রত্যেক অবস্থার গুণাগুণ আলাদা আলাদা বর্ণনা করা হচ্ছে।

জালেম শাসকদের কাছে যাওয়া ঃ এ সম্পর্কে হাদীসে অনেক কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। শরীয়তের দৃষ্টিতে বিষয়টি যে কত নিন্দনীয়, নিম্নোদ্ধৃত বাণীসমূহ থেকে তা সহজেই বুঝা যাবে। রসূলে করীম (সাঃ) জালেম শাসকদের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ

فمن نابدهم نجا ومن اعتزلهم سلم او كاد ان يسلم ومن وقع معهم فى دنياهم فهم منهم -

অর্থাৎ, যে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে সে মুক্তি পাবে। যে তাদের থেকে পৃথক থাকবে সে নিরাপদ থাকবে অথবা নিরাপত্তার নিকটবর্তী বলে গণ্য হবে। আর যে তাদের সাথে তাদের দুনিয়াতে লিপ্ত হবে, সে তাদেরই একজন বলে গণ্য হবে।

উদ্দেশ্য, যে তাদের থেকে সরে থাকবে, সে তাদের গোনাহ থেকে নিরাপদ থাকবে, কিন্তু তাদের উপর আযাব নাযিল হলে সে আযাব থেকে অব্যাহতি পাবে না। কারণ, সে প্রতিবাদ করেনি এবং সৎকাজের আদেশ বর্জন করেছে। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে– আমার পরে এমন শাসক হবে, যারা মিথ্যা বলবে এবং জুলুম করবে। অতএব যে ব্যক্তি তাদের মিথ্যাকে সত্য বলবে এবং তাদের জুলুমে সহায়তা করবে, সে আমা থেকে মুক্ত এবং আমি তার থেকে মুক্ত। সে আমার হাউজে অবতীর্ণ হবে না। হযরত আবু হোরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

ابغض القراء الى الله تعالى يزورون الامراء -

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার কাছে সর্বাধিক ঘৃণিত সে সকল ক্বারী, যারা শাসকদের দরবারে গিয়ে উপনীত হয়।

এক হাদীসে আছে– শাসকদের মধ্যে উত্তম তারা, যারা আলেমগণের নিকট যায়। আর আলেমগণের মধ্যে নিকৃষ্টতম তারা যারা শাসকদের কাছে যায়। হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ

العلماء امناء الرسل على عباد الله ما ليخالطوا السلطان فاذا فعلوا ذلك فقد خانوا الرسل فاحذروهم واعتزلوهم -

অর্থাৎ, আলেমগণ আল্লাহর বান্দাদের উপর রসূলগণের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি, যে পর্যন্ত তারা শাসকবর্গের সাথে মেলামেশা না করে। যদি তারা এরূপ করে, তবে রসূলগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। তোমরা এ ধরনের আলেম থেকে হুঁশিয়ার থাক এবং দূরে সরে থাক।

এ সম্পর্কে বিশিষ্ট জ্ঞানীগণের উক্তি নিম্নরূপ ঃ

হযরত হোযায়ফা (রাঃ) বলেন ঃ ফেতনার জায়গা থেকে দূরে থাক। প্রশ্ন করা হল ঃ ফেতনার জায়গা কি? তিনি বললেন ঃ শাসকবর্গের দরজা। তোমাদের কেউ শাসকবর্গের কাছে গেলে মিথ্যা কথায় তাদেরকে সত্যবাদী বলে এবং যে গুণ তাদের মধ্যে নেই তা বর্ণনা করে।

হযরত আবু যর (রাঃ) সালামাকে উপদেশ প্রদান প্রসঙ্গে বললেন ঃ হে সালামা! বাদশাহদের দরজায় যেয়ো না, গেলে তুমি তাদের দুনিয়া থেকে যা পাবে, তার চেয়ে উত্তম বস্তু তারা তোমার দ্বীন থেকে নিয়ে নেবে। হযরত সুফিয়ান সওরী (রহঃ) বলেন ঃ দোযখে একটি উপত্যকা আছে, যাতে কেবল সেই কারীদের স্থান হবে, যারা বাদশাহদের কাছে যাতায়াত করে। আওযায়ী (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলার কাছে সেই আলেমের চেয়ে মন্দ কেউ নয়, যে কোন রাজকর্মচারীর নিকট স্বার্থোদ্ধারের লক্ষ্যে যাতায়াত করে। সমনূন (রহঃ) বলেন ঃ আলেমের জন্যে এটা খুব মন্দ ব্যাপার যে, তার মজলিসে এসে তাকে না পেয়ে যখন কেউ জিজ্ঞেস করে– তিনি কোথায় আছেন? তখন জওয়াবে বলা হয়– তিনি শাসকের কাছে আছেন। যদি কোন আলেমকে দুনিয়ার সাথে

মহব্বত রাখতে দেখ, তবে তাকে দ্বীনদারীতে দোষী মনে করবে। আমি এই নীতিবাক্য আগে শুনতাম, কিন্তু এখন নিজে তা পরীক্ষা করে নিয়েছি। অর্থাৎ, আমি যখন বাদশাহের কাছে গেছি, তখন তাদের দরবার থেকে বের হওয়ার পর আত্মজিজ্ঞাসার মাধ্যমে দুনিয়ার প্রতি মোহ অনুভব করেছি। অথচ আমি বাদশাহের সাথে কঠোর ভাষায় কথা বলি এবং তার খেয়াল-খুশীর সমর্থন করি না।

হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রাঃ) বলেন ঃ কারী আবেদ যদি শাসকদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে, তবে তা হয় মোনাফেকী, আর যদি ধনীদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে, তবে তা হয় রিয়া। হযরত আবু যর (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ে ভিড় বৃদ্ধি করে, তাকে তাদের মধ্যেই গণ্য করা হয়। এর অর্থ জালেমদের দল বৃদ্ধি করলে তাকে জালেমই বলা হবে। হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ কোন ব্যক্তি যখন বাদশাহের কাছে যায়, তখন তার দ্বীন তার কাছেই থাকে, কিন্তু যখন সেখান থেকে ফিরে আসে, তখন দ্বীন বিদায় হয়ে যায়। এর কারণ জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি বললেন ঃ সে বাদশাহকে এমন কথা বলে সন্তুষ্ট করে, যে কথার কারণে আল্লাহ্ তা'আলা অসন্তুষ্ট হন। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (রহঃ) এক ব্যক্তিকে কর্মচারী নিযুক্ত করার পর জানতে পারলেন, সে এক সময় হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের কর্মচারী ছিল। তিনি কালবিলম্ব না করে তাকে বরখাস্ত করলেন। লোকটি আরজ করল ঃ আমি তো তার আমলে অল্প কয়েক দিন কাজ করেছিলাম। তিনি বললেন ঃ তার সংসর্গে একদিন অথবা কয়েক মুহূর্ত থাকাই অকল্যাণ ও অনর্থ সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট ছিল। হযরত ফোযায়ল (রহঃ) বলেন ঃ মানুষ যতই শাসকদের নৈকট্যশীল হয়, ততই আল্লাহ থেকে দূরে সরে পড়ে। হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়িব তেলের ব্যবসা করতেন এবং বলতেন ঃ এই ব্যবসার কারণে শাসকদের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। ওহায়ব (রহঃ) বলেন ঃ যেসব মানুষ বাদশাহদের কাছে যায় তারা উম্মতের জন্যে জুয়াড়ীদের চেয়েও অধিক ক্ষতিকর। যুবায়রী (রহঃ) যখন বাদশাহের সাথে মেলামেশা শুরু করলেন, তখন তাঁর জনৈক ধর্মীয় ভাই তাঁর কাছে এই মর্মে পত্র লেখলেন ঃ হে আবু বকর! আল্লাহ তা'আলা আমাকে ও তোমাকে ফেতনা থেকে বাঁচিয়ে রাখুন। তোমার অবস্থা এই পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তোমার জন্যে আল্লাহ তা'আলার কাছে রহমতের দোয়া করা

তোমার পরিচিত জনের কর্তব্য হয়ে পড়েছে। তুমি বড় প্রবীণ। আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত তোমার ওজনও বৃদ্ধি করে দিয়েছে। তিনি তাঁর কিতাবের জ্ঞান তোমাকে দান করেছেন এবং তাঁর রসূলের সুন্নত শিক্ষা দিয়েছেন, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আলেমগণের কাছ থেকে এই অঙ্গীকার নিয়েছেন ঃ

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَلَاتَكْتُمُوْنَهٗ ـ

অর্থাৎ, স্মরণ কর সে সময়ের কথা, যখন আল্লাহ কিতাবপ্রাপ্তদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলেন যে, তোমরা লোকদের কাছে অবশ্যই এই কিতাব বর্ণনা করবে এবং একে গোপন করবে না।

মনে রেখো, যে কাজ তুমি করছ, তার সামান্যতম অনিষ্ট এই যে, তুমি জালেমের ভীতি দূর করে দিয়েছ। আপন সান্নিধ্য দ্বারা সে ব্যক্তির সামনে ভ্রষ্টতার পথ সহজ করে দিয়েছ, যে কোন হক আদায় করেনি এবং কোন কুকর্ম বর্জন করেনি। জালেমরা তোমাকে নৈকট্যশীল করে আপন জুলুমের কেন্দ্র সাব্যস্ত করেছে, যাতে তাদের জুলুমের যাঁতাকল তোমার চারপাশে ঘুরে। তুমি তাদের জন্যে সেতু হয়ে গেছ, যাতে বিপদে তোমার উপর দিয়ে পার হওয়া যায়। তুমি তাদের ভ্রষ্টতার স্তর অতিক্রম করার জন্যে সিঁড়ির মত ব্যবহৃত হচ্ছ। তোমার কারণে তারা আলেমদের প্রতি সন্দেহ সৃষ্টি করবে এবং মূর্খদের মন নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করবে। অতএব তারা যতটুকু তোমার নষ্ট করেছে, তার মোকাবিলায় তোমার ফায়দা নগণ্য। তুমি কি এই আয়াতের প্রতীক হতে ভয় কর না যে, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ الخ অতঃপর তাদের স্থলাভিষিক্ত হল অযোগ্যরা, যারা নামায বিনষ্ট করল! মনে রেখো, তোমার লেনদেন এমন এক সত্তার সাথে, যিনি তোমার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত নন এবং তোমার ক্রিয়াকর্ম থেকে গাফেলও নন। এখন তুমি তোমার রুগ্ন দ্বীনদারীর চিকিৎসা কর এবং পাথেয় প্রস্তুত কর। কারণ, সফর দূরদূরান্তের এবং আল্লাহ তাআলার কাছে কোন বিষয় পৃথিবীতে ও আকাশে গোপন নয়। ওয়াস সালাম।

এসব হাদীস ও জ্ঞানীগণের উক্তি থেকে জানা যায়, বাদশাহদের সাথে মেলামেশায় কি ধরনের ফেতনা ফাসাদ বিদ্যমান রয়েছে, কিন্তু

নিম্নে আমরা ফেকাহর দৃষ্টিকোণ থেকে এসবের বিবরণ পেশ করব, যদ্দ্বারা বুঝা যাবে যে, এই মেলামেশার মধ্যে কোন্‌টি হারাম, কোনটি মাকরূহ ও কোন্‌টি বৈধ?

যে ব্যক্তি বাদশাহের কাছে যায়, সে নিজের কর্মের দ্বারা, মৌন সম্মতির দ্বারা, কথাবার্তার দ্বারা অথবা বিশ্বাস দ্বারা আল্লাহ তাআলার নাফরমানীর সম্মুখীন হয়। কর্ম দ্বারা নাফরমানী এভাবে যে, বাদশাহের কাছে যাওয়া অধিকাংশ অবস্থায় জবরদখলকৃত ঘরে প্রবেশের মত হয়ে থাকে। কেননা, অধিকাংশ ক্ষমতার মসনদই তো জোরপূর্বক দখলকৃত। জবরদখল করা কোন ঘরে প্রবেশ করা তো নিঃসন্দেহে হারাম। এখানে যদি বলা হয়, এটা হালকা বিষয়, যা মানুষ সাধারণতঃ মার্জনা করে থাকে; যেমন খোরমা অথবা একখণ্ড রুটি তুলে নিলে কেউ আপত্তি করে না, তবে তাতে ধোঁকা খাওয়া উচিত নয়– এমন বস্তুর মধ্যে মার্জনা হয়ে থাকে। জবরদখলকৃত বস্তুতে সাধারণতঃ মার্জনা হয় না। আর যদি জালেম নিজের মালিকানাধীন জায়গায় থাকে, তবুও তার কাছে যাওয়া হারাম। কেননা, তার জায়গা হারাম উপায়ে অর্জিত। যদি ধরে নেয়া যায়, তার জায়গা তাঁবু ইত্যাদি হালাল মাল দ্বারা অর্জিত, তবে এমতাবস্থায় কেবল সম্মুখে যাওয়া এবং আসসালামু আলাইকুম বলা পর্যন্ত গোনাহগার হবে না, কিন্তু যদি জালেমকে তোয়াজ করা হয় অথবা তার সামনে নত হয়, তবে তাতে নিঃসন্দেহে গোনাহ্ হবে।

মৌন সম্মতি দ্বারা নাফরমানী এভাবে হয় যে, যে জালেম বাদশাহের দরবারে যাবে, সে রেশমী ফরশ, সোনার পাত্র, বাদশাহ এবং বাদশাহের গোলামদের রেশমী বস্ত্র ইত্যাদি হারাম বস্তু সামগ্রী দেখবে। গোনাহের বস্তু সামগ্রী দেখে যে চুপ থাকে, সে সেই গোনাহে শরীক হয়ে যায়। এছাড়া তাদের অশ্লীল কথাবার্তা, মিথ্যা ভাষণ, গালি-গালাজ, পীড়াদায়ক উক্তি, গীবত ইত্যাদি হারাম বিষয়াদি শুনে চুপ থাকা হারাম। সে সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করার ওয়াজিব কর্তব্য পালন করতে অক্ষম হয়ে চুপ করে থাকে। এটা গোনাহ। যদি বলা হয়, সে ভয়ে কিছু বলে না, তাই এটা ওযর, তবে জওয়াব, তার সেখানে যাওয়ারই কি প্রয়োজন ছিল? অবৈধ কাজ করার প্রয়োজন কেবল শরীয়তসম্মত ওযর দ্বারা হতে পারে। অতএব সে সেখানে না গেলে এবং সেগুলো না দেখলে অসৎ কাজে নিষেধ করাও তার কর্তব্য হত না। সুতরাং উপরোক্ত ওযর

গ্রহণযোগ্য নয়। এ কারণেই আমরা বলি, যে ব্যক্তি জানে যে, অমুক জায়গায় অনাচার হচ্ছে যা দূর করা সম্ভবপর নয়, সেখানে তার যাওয়া জায়েয নয়। কারণ, সেখানে গেলে অনাচার দেখেও চুপ করে থাকতে হবে। কাজেই দেখা থেকেই বিরত থাকা উচিত।

জালেম বাদশাহের জন্যে এরূপ দোয়া করা জায়েয ঃ আল্লাহ আপনাকে পুণ্য দান করুন, অথবা আল্লাহ আপনাকে সৎ কাজের তওফীক দান করুন অথবা আল্লাহ পাক তাঁর আনুগত্যে আপনার হায়াত দরাজ করুন। অথবা এমনি ধরনের দোয়া করবে, কিন্তু প্রভু বলে দীর্ঘায়ু ও সমস্ত নেয়ামত পূর্ণ করার দোয়া করা জায়েয নয়। অনুরূপভাবে তার মুখ থেকে কোন ভ্রান্ত কথা বের হলেও এরূপ বলা জায়েয নয় যে, হুযর (সাঃ) যথার্থই এরশাদ করেছেন। রসূলে করীম (সাঃ) বললেন ঃ

من دعا لظالم بالبقاء احب ان يعص الله فى ارضه -

অর্থাৎ, যেব্যক্তি জালেমের জন্যে দীর্ঘায়ুর দোয়া করে, সে চায়, আল্লাহর দুনিয়াতে আল্লাহর নাফরমানী অব্যাহত থাকুক।

এমনিভাবে অতিরঞ্জিত দোয়া করা ও তার প্রশংসা বর্ণনা করা জায়েয নয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ পাপাচারীর প্রশংসা করা হলে আল্লাহ তাআলা ক্রুদ্ধ হন। এক হাদীসে আছে–

من اكرم فاسقا فقد اعان على هدم الاسلام -

অর্থাৎ, যে ফাসেকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, সে ইসলামকে বিধ্বস্ত করতে সহায়তা করে।

হযরত সুফিয়ান সওরী (রহঃ)-কে কেউ প্রশ্ন করল ঃ এক জালেম জনশূন্য জঙ্গলে মরতে থাকলে তাকে পানি পান করানো উচিত কিনা? তিনি বললেন ঃ না; তাকে মরতে দেয়া উচিত। পান পানি করানো তাকে জুলুমে সাহায্য করার নামান্তর। অন্যেরা এ বিষয়ে বলেন, তাকে পানি এতটুকু পান করানো উচিত, যাতে তার দেহে প্রাণ ফিরে আসে।

যেব্যক্তি জালেমকে ভালবাসে, সে যদি জুলুমের কারণে ভালবাসে তবে গোনাহগার হবে। আর যদি অন্য কোন কারণে ভালবাসে, তবে ওয়াজিব তরক করার কারণে পাপী হবে। ওয়াজিব ছিল জালেমের সাথে শত্রুতা পোষণ করা। সে উল্টা ভালবাসলো। এক ব্যক্তির মধ্যে দু'টি

অথবা তিনটি কল্যাণ ও অনিষ্টের বিষয় একত্রিত অবস্থায় পাওয়া গেলে কল্যাণকর বিষয়ের কারণে তাকে ভালবাসা এবং অনিষ্টকর বিষয়ের কারণে তার সাথে শত্রুতা রাখা উচিত। শত্রুতা ও ভালবাসা কিরূপে একত্রিত হতে পারে, তা পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত হবে।

মোট কথা, দু'টি ওযর ছাড়া বাদশাহদের কাছে যাওয়া জায়েয নয়– এক তাদের কাছ থেকে হাযির হওয়ার পরওয়ানা জারি হলে যাবে এবং দুই, কোন মুসলমান ভাইয়ের উপর থেকে জুলুম দূর করার জন্যে অথবা নিজের উপর জুলুম না হওয়ার নিয়তে যাবে। এসব ওযরের কারণে যাওয়ার অনুমতি আছে, কিন্তু শর্ত, মিথ্যা বলবে না এবং প্রশংসা করবে না।

বাদশাহের স্বয়ং কারও কাছে আসা ঃ যদি স্বয়ং জালেম বাদশাহ তোমার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসে, তবে সালামের জওয়াব দেয়া জরুরী এবং তার সম্মানে দাঁড়ানোও হারাম নয়। কেননা, এলেম ও দ্বীনের সম্মান করার কারণে সে সম্মান পাওয়ার যোগ্য হয়ে যায়। সুতরাং সম্মানের বদলে সম্মান করা এবং সালামের বদলে জওয়াব দেয়া উচিত, কিন্তু একান্তে আগমন করলে তার সম্মানে না দাঁড়ানোই উত্তম, যাতে দ্বীনের ইযযত তার কাছে জাহির হয়, জুলুম তার দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন হয় এবং সে জানতে পারে যে, আল্লাহ যার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন তাঁর বিশিষ্ট বান্দারাও সেব্যক্তি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। যদি জনসমাবেশে মিলিত হবার জন্য আসে, তবে প্রজাদের সন্মুখে বাদশাহর প্রতি সম্মান দেখানো জরুরী। সুতরাং এই নিয়তে দণ্ডায়মান হলে কোন দোষ নেই। এর পর সাক্ষাতের সুযোগে বাদশাহকে উপদেশ দেয়া ওয়াজিব। যদি সে এমন হারাম কাজ করে, যা হারাম বলে সে জানে না এবং জানিয়ে দিলে সে কোজটি বর্জন করবে বলে আশা করা যায়, তবে সে কাজটি যে হারাম, তা বলে দেয়া ওয়াজিব। আর যেসব বিষয় হারাম বলে সে নিজে জানে; যেমন মদ্যপান, জুলুম করা, সেগুলো উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন নেই। মোট কথা, যদি তোমার বিশ্বাস থাকে যে, তোমার উপদেশ বাদশাহের মধ্যে কার্যকর হবে, তবে তিনটি বিষয় তোমার উপর ওয়াজিব। এক, যে বিষয় বাদশাহ জানে না তা তাকে বলে দেবে। দুই, সে জেনেশুনে যেসব কাজ করে, তার জন্যে তাকে সতর্ক করবে। তিন, যে বিষয়ে সে গাফেল সেদিকে তাকে পথ প্রদর্শন করবে।

মুহাম্মদ ইবনে সালেহ বলেন ঃ আমি হাম্মাদ ইবনে সালমার কাছে

উপস্থিত ছিলাম। দেখলাম, তাঁর গৃহে চারটি বস্তু ছাড়া কিছুই নেই। (১) তাঁর বসার চাটাই, (২) তেলাওয়াতের জন্যে একখানি কোরআন শরীফ, (৩) কিতাবের একটি বস্তা এবং (৪) ওযুর লোটা। একদিন যখন আমি তাঁর কাছে ছিলাম, হঠাৎ দরজায় কেউ কড়া নাড়ল। জানা গেল, শাসক মুহাম্মদ ইবনে সোলায়মান আগমন করেছে। তিনি অনুমতি দিয়ে সে ভিতরে এসে সম্মুখে বসে গেল। সে আরজ করল ঃ ব্যাপার কি, আমি যখনই আপনাকে দেখি ভীত হয়ে পড়ি? হাম্মাদ বললেন ঃ এর কারণ, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন– আলেম যখন তার এলেম দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে, তখন প্রত্যেক বস্তু তাকে ভয় করে। আর যখন এলেম দ্বারা ধনভাণ্ডার গড়ে তুলতে চায়, তখন সে স্বয়ং প্রত্যেক বস্তুকে ভয় করে। এর পর মুহাম্মদ ইবনে সোলায়মান চল্লিশ হাজার দেরহাম তাঁর খেদমতে উপহার পেশ করে আরজ করল ঃ এগুলো আপনি আপনার প্রয়োজনে ব্যয় করুন। তিনি বললেন ঃ যাদের উপর জুলুম চালিয়ে তুমি এগুলো অর্জন করেছ, তাদেরকে ফেরত দাও। মুহাম্মদ ইবনে সোলায়মান আরজ করল ঃ আল্লাহর কসম, যে মাল আমি আপনার খেদমতে পেশ করছি, তা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছি– জুলুম করে কারও কাছ থেকে অর্জন করিনি। হাম্মাদ বললেন ঃ আমার এই মালের কোন প্রয়োজন নেই। মুহাম্মদ বলল ঃ আপনি এ মাল গ্রহণ করে দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করে দিন। তিনি বললেন ঃ আমি বণ্টনে ইনসাফ করতে পারব বলে ভরসা পাই না। যে ব্যক্তি এ মাল থেকে কিছু পাবে না, সে হয় তো বলবে, আমি বণ্টনে ইনসাফ করিনি। ফলে আমার কারণে তার গোনাহ হবে। অতএব এ মাল আমার কাছ থেকে দূরেই রাখ।

বাদশাহদের কাছ থেকে সরে থাকা ঃ বাদশাহদের কাছ থেকে এমনভাবে সরে থাকা ওয়াজিব যাতে সে নিজেও তাদেরকে না দেখে এবং তারাও যেন তাকে না দেখে। কেননা, এক্ষেত্রে এভাবেই নিরাপত্তা বিদ্যমান। সুতরাং বাদশাহদের জুলুমের কারণে অন্তরে তাদের প্রতি শত্রুতা রাখা, তাদের দীর্ঘায়ু কামনা না করা, তাদের প্রশংসা না করা, যারা তাদের তল্পীবাহক, তাদের কাছে না যাওয়া, তাদের কাছ থেকে সরে থাকার কারণে কোন বস্তু না পেলে তজ্জন্যে পরিতাপ না করা ওয়াজিব। আর বাদশাহদের তরফ থেকে সম্পূর্ণ নির্বিকার থাকলে তা আরও ভাল। যদি অন্তরে এই ধারণা জন্মে যে, বাদশাহদের কাছে অনেক সম্পদ এবং

বিলাস সামগ্রী আছে, তবে আসাম্মের উক্তি স্মরণ করবে। তিনি বলতেন ঃ আমার ও বাদশাহদের মধ্যে মাত্র এক দিনের তফাৎ। কেননা, গতকালকের আনন্দ তো আর আজ তাদের কাছে বসে নেই। আর আগামীকাল কি হবে, সে ব্যাপারে আমি ও তারা উভয়েই শংকিত। সুতরাং কেবল আজকের দিনই বাকী রইল। এক দিনে কি হতে পারে? অথবা হযরত আবু দারদা (রাঃ)-এর উক্তি স্মরণ করবে। তিনি বলতেন ঃ ধনী ব্যক্তিরা পানাহার ও পোশাকে আমাদের শরীক। তারাও পানাহার করে এবং পোশাক পরিধান করে, আমরাও তাই করি। তাদের কাছে অতিরিক্ত ধন-সম্পদ থাকে, যা তারা দেখে এবং আমরাও তাদের সাথে দেখতে পাই। পার্থক্য হচ্ছে, এই ধন-সম্পদের হিসাব তাদেরকে দিতে হবে আর আমরা তা থেকে মুক্ত। যে ব্যক্তি কোন জালেমের জুলুম অথবা পাপীর পাপ সম্পর্কে অবগত হয়, এই অবগতি যেন তার মন থেকে সেই জুলুম ও পাপের গুরুত্ব হ্রাস করে দেয়, এটা জরুরী। কেননা যে ব্যক্তি কুকর্ম করে, সে অবশ্যই মন থেকে পতিত হয়ে যায়। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহর হকে ত্রুটি করে, তাকে এমন খারাপ মনে কর, যেমন তোমার হকে ত্রুটি করলে মনে করতে।

যদি বল, পূর্ববর্তী আলেমগণ তো বাদশাহদের কাছে যেতেন, তবে এর জওয়াব হচ্ছে, প্রথমে তাঁদের কাছ থেকে বাদশাহদের কাছে যাওয়ার রীতি-নীতি শিখে নাও। এর পর গেলে কোন দোষ নেই। বর্ণিত আছে, বাদশাহ হেশাম ইবনে আবদুল মালেক হজ্জের উদ্দেশে মক্কা মোয়াযযমায় উপনীত হয়ে বলল ঃ সাহাবীগণের কেউ থেকে থাকলে তাঁকে আমার সামনে নিয়ে আস। লোকেরা বলল ঃ তাঁরা তো সকলেই ইন্তেকাল করে গেছেন। সে বলল ঃ কোন তাবেয়ীকে আন। সেমতে লোকেরা হযরত তাউস ইয়ামনীকে (রাহঃ) ডেকে আনল। তিনি হেশামের সামনে গিয়ে জুতা জোড়া ফরাশের কিনারে খুললেন এবং আমীরুল মুমিনীন বলে সালাম না করে বললেন ঃ হে হেশাম, সালামুন আলাইকা। তিনি তার কুনিয়তও উল্লেখ করলেন না। সালামের পর হেশামের ঠিক সামনে আসন গ্রহণ করে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে হেশাম, কেমন আছেন? তাঁর কান্ড দেখে হেশাম ক্রুদ্ধ হল। এমন কি, তাঁকে হত্যা করার ইচ্ছা করল, কিন্তু লোকেরা তাকে স্মরণ করিয়ে দিল যে, সে এখন আল্লাহ ও রসূলের হেরেমে আছে। এখানে এটা হতে পারে না। হেশাম হযরত তাউসকে

বলল ঃ তুমি এহেন কর্ম করলে কেন? তিনি বললেন ঃ আমি কি করেছি? এতে হেশামের ক্রোধ আরও বেড়ে গেল। সে বলল ঃ তুমি আমার সামনে জুতাজোড়া খুলেছ। আমার হস্ত চুম্বন করনি। আমাকে 'আমিরুল মুমিনীন' বলে সালাম করনি। আমার কুনিয়ত উল্লেখ করনি। আমার মুখের সামনে আমার অনুমতি ছাড়াই আসন গ্রহণ করেছ এবং জিজ্ঞেস করেছ– হেশাম, কেমন আছেন? হযরত তাউস জওয়াবে বললেন ঃ জুতা খোলার ব্যাপারটা হচ্ছে, আমি প্রত্যহ পাঁচবার রব্বুল ইযযত আল্লাহ পাকের সামনে জুতা খুলি। তিনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধও হন না এবং আমাকে শাস্তিও দেন না। হস্ত চুম্বন না করার কারণ, আমি হযরত আলী (রাঃ)-এর মুখ থেকে শুনেছি– পুরুষের জন্যে কারও হস্ত চুম্বন করা জায়েয নয়। তবে স্বামী কামবশতঃ স্ত্রীর হস্ত আর পিতা স্নেহবশতঃ সন্তানের হস্ত চুম্বন করতে পারে। আমি আমিরুল মুমিনীন বলে আপনাকে সালাম করিনি। এর কারণ, সকল মানুষ আপনার শাসনক্ষমতা লাভে সন্তুষ্ট নয়; তাই আমি মিথ্যা বলা পছন্দ করিনি। কুনিয়ত উল্লেখ না করার হেতু হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা তাঁর পয়গম্বরগণকে নাম ধরেই ডেকেছেন, কুনিয়ত সহকারে নয়। তিনি বলেছেন– ইয়া দাউদ, ইয়া ইয়াহইয়া, ইয়া ঈসা। এর বিপরীতে তিনি তাঁর দুশমনদের কুনিয়ত উল্লেখ করেছেন ঃ تَبَّتْ يَدَا أَبِىْ لَهَبٍ (আবু লাহাবের হস্তদ্বয় নিপাত যাক।) সামনে বসার কথা যে বলেছেন, এর কারণ, আমি হযরত আলী (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, জাহান্নামে পর্বতশৃঙ্গের মত সর্প আর খচ্চরের অনুরূপ বিচ্ছু রয়েছে । এরা সেই সব শাসককে দংশন করবে, যারা তাদের প্রজাদের প্রতি ইনসাফ করে না। এর পর হযরত তাউস সেখান থেকে দ্রুত প্রস্থান করলেন।

হযরত সুফিয়ান সওরী থেকে বর্ণিত আছে, তিনি মিনায় আবু জাফর মনসুরের নিকট তশরীফ নিলে সে আরজ করল ঃ আপনি আপনার প্রয়োজন ব্যক্ত করুন। হযরত সুফিয়ান বললেন ঃ আল্লাহ্ তাআলাকে ভয় কর। কারণ, তুমি জুলুম ও সীমালঙ্ঘন দ্বারা পৃথিবীকে পূর্ণ করে দিয়েছ। মনসুর মাথা নত করল। এর পর মাথা তুলে বলল ঃ আপনার অভাব অনটন পেশ করুন। তিনি বললেন ঃ তুমি কেবল মুহাজির ও আনসার-সন্তানগণের তরবারির জোরে এই মর্যাদায় পৌঁছেছ। এখন তাঁদের সন্তানরা ক্ষুধায় মৃত্যুবরণ করছে। আল্লাহকে ভয় কর এবং তাদের হক তাদের হাতে সমর্পণ কর। মনসুর আবার মাথা নত করল। অবশেষে

মাথা তুলে বলল ঃ নিজের প্রয়োজন বলুন। তিনি বললেন ঃ হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) হজ্জ করার পর তাঁর কোষাধ্যক্ষকে জিজ্ঞেস করেছিলেন– আমি কি পরিমাণ ব্যয় করলাম? কোষাধ্যক্ষ আরজ করেছিলেন ঃ দশ দেরহামের কিছু বেশী। আর এখন তোমার সাথে এত মাল দেখছি, যা উটও বহন করতে পারে না। একথা বলে তিনি চলে গেলেন। এই ছিল আগেকার যুগের মনীষীগণের বাদশাহদের কাছে যাওয়ার রীতিনীতি। তাঁরা বাদশাহদের জুলুমের বিরুদ্ধে আল্লাহর ওয়াস্তে প্রতিরোধ করার জন্যে জীবনপন করে দিতেন।

ইবনে আবী নমলা (রহঃ) আবদুল মালেকের কাছে তশরীফ নিয়ে গেলে সে আরজ করল ঃ কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ কেয়ামতের ক্রোধ, তিক্ততা ও ধ্বংসকারিতা দেখে তারাই কেবল স্থির থাকতে পারবে, যারা আপন প্রবৃত্তিকে নারাজ করে আল্লাহ তাআলাকে রাজি করে থাকবে। আবদুল মালেক কেঁদে ফেলে বলল ঃ আমি যতদিন বেঁচে থাকব, এ বাক্যটি চোখের সামনে রাখব। হযরত ওসমান গনী (রাঃ) খলীফা হলে সকল সাহাবী তাঁর খেদমতে হাযির হলেন, কিন্তু তাঁর বন্ধু হযরত আবু যর গেফারী (রাঃ) অনেক বিলম্বে উপস্থিত হলেন। হযরত ওসমান (রাঃ) এজন্যে তাঁর প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করলে তিনি বললেন ঃ আমি রসূলে খোদা (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি– মানুষ যখন কোন রাষ্ট্রের কর্ণধার নিযুক্ত হয়, তখন আল্লাহ তা'আলা তার কাছ থেকে দূরে সরে পড়েন। হযরত মালেক ইবনে দীনার (রহঃ) বসরার শাসনকর্তার দরবারে গেলেন এবং বললেন ঃ আমি কোন এক কিতাবে দেখেছি, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন– "বাদশাহের চেয়ে বেশী বেওকুফ কেউ নয়। যে আমার নাফরমানী করে, তার চেয়ে অধিক প্রতারক কেউ নয়। হে মন্দ রাখাল, আমি তোমাকে মোটা তাজা ও সুস্থ ভেড়া-ছাগল দিয়েছি। তুমি তাদের গোশত খেয়ে এবং পশম পরিধান করে সেগুলিকে কংকালসার করে দিয়েছ। বসরার শাসনকর্তা বলল ঃ আপনি কি জানেন, কেন আপনি আমাদের বিরুদ্ধে এত নির্ভীক? তিনি বললেন ঃ না। সে বলল ঃ এর কারণ, আপনি আমাদের কাছে কম আশা করেন এবং ধন-সম্পদ সঞ্চয় করেন না। একবার হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (রহঃ) খলীফা সোলায়মান ইবনে আবদুল মালেকের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হঠাৎ বজ্রপাতের আওয়াজ শুনে সোলায়মান ভীত কম্পিত হয়ে গেল। হযরত

ওমর ইবনে আবদুল আজীজ বললেন ঃ এটা ছিল আল্লাহ্ তা'আলার রহমতের আওয়াজ। যখন তাঁর আযাবের আওয়াজ শুনবে, তখন তোমার অবস্থা কি হবে? কথিত আছে, সোলায়মান ইবনে আবদুল মালেক মক্কার উদ্দেশে মদীনা মুনাওয়ারায় উপস্থিত হয়ে আবু হাযেমকে (রহঃ) ডাকলেন এবং বললেন ঃ আমরা মৃত্যুকে খারাপ মনে করি কেন? তিনি বললেন ঃ কারণ, তুমি তোমার আখেরাতকে বরবাদ করেছ এবং দুনিয়াকে আবাদ করেছ। তাই আবাদ ভূমি থেকে পতিত ভূমিতে যাওয়া খারাপ মনে কর। সোলায়মান প্রশ্ন করলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে যাওয়ার অবস্থাটা কেমন হবে? তিনি বললেন ঃ নেক বান্দারা এমনভাবে যাবে, যেমন কোন মুসাফির ব্যক্তি গৃহে ফিরে আসে। আর গোনাহগাররা এমনভাবে যাবে যেমন কোন পলাতক গোলামকে তার প্রভুর সামনে ধরে আনা হয়। সোলায়মান কেঁদে কেঁদে বললেন ঃ হায়, আমি যদি জানতাম আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আমার অবস্থা কিরূপ হবে! আবু হাযেম (রহঃ) বললেন ঃ নিজের অবস্থা কোরআন মজীদের অনুরূপ করে নাও। আল্লাহ্ বলেন ঃ

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ অর্থাৎ, নিশ্চয় সৎকর্মপরায়ণরা নেয়ামতের মধ্যে এবং পাপাচারীরা জাহান্নামের মধ্যে থাকবে। সোলায়মান বললেন ঃ তাহলে আল্লাহ্ তা'আলার রহমত কোথায়? তিনি বললেন ঃ

إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহর রহমত সৎকর্ম সম্পাদনকারীদের নিকটবর্তী। সোলায়মান জিজ্ঞেস করলেন ঃ আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কে বেশী সম্মানিত? তিনি বললেন ঃ যারা মুত্তাকী বা খোদাভীরু। প্রশ্ন হল ঃ সর্বোত্তম আমল কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ হারাম থেকে বেঁচে থাকার সাথে ফরযসমূহ আদায় করা। প্রশ্ন হল ঃ কথার মধ্যে অধিক শ্রবণযোগ্য কথা কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ সত্য বাক্য তার সামনে বলা, যার কাছে আশাও করা হয় এবং যাকে ভয়ও করা হয়। প্রশ্ন হল ঃ মুমিনদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী কে? উত্তর হল ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে আমল করে এবং মানুষকে এজন্যে উদ্বুদ্ধ করে। প্রশ্ন হল ঃ মুমিনদের মধ্যে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত কে? তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের জালেম ভাইয়ের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে এবং নিজের আখেরাতকে অন্যের দুনিয়ার বিনিময়ে বিক্রয় করে। এর পর

সোলায়মান প্রশ্ন করলেন ঃ আমরা বর্তমানে যে অবস্থায় আছি, সে সম্পর্কে আপনি কি বলেন? আবু হাযেম বললেন ঃ আগে বল, তুমি আমাকে শাস্তি দেবে কি না? বললেন ঃ না, বরং উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ হে আমীরুল মুমিনীন! তোমাদের পিতৃপুরুষরা জনগণের উপর তরবারির ধার প্রয়োগ করে এই দেশ জবরদখল করেছে। মুসলমানদের সাথে পরামর্শও করেনি এবং তাদের সম্মতিক্রমেও দখল করেনি। অবশেষে তারা অনেক খুনখারাবি করে দুনিয়া থেকে চলে গেছে। হায়, এখন যদি তুমি জানতে, তারা কি করেছে এবং জনগণ তাদেরকে কি বলেছে! সোলায়মানের সহচরদের থেকে এক ব্যক্তি বলল ঃ হে আবু হাযেম! আপনি একথাটি ভাল বলেননি। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তাআলা আলেমগণের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন, তারা জনগণের কাছে সত্য কথা বর্ণনা করবেন এবং সত্য গোপন করবেন না। সোলায়মান আরজ করলেন ঃ আমরা পূর্বপুরুষদের এই কলংক মোচন করব কিরূপে? তিনি বললেন ঃ হালাল পথে ধন উপার্জন কর এবং যথাস্থানে ব্যয় কর। তিনি বললেন ঃ এটা কার দ্বারা সম্ভবপর? আপনি আমার জন্যে দোয়া করুন। আবু হাযেম বললেন ঃ ইলাহী, সোলায়মান আপনার দোস্ত হলে তার জন্যে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ সহজ করে দিন। আর শত্রু হলে তাকে জোর করে হলেও আপনার প্রিয় কাজে নিয়োজিত করুন। অতঃপর সোলায়মান বললেন ঃ আপনি আমাকে ওসিয়ত করুন। তিনি বললেন ঃ আমি সংক্ষেপে ওসিয়ত করছি– আপন পালনকর্তার মাহাত্ম্য ও পবিত্রতা এতদূর ধ্যান কর যে, তিনি যে কাজ করতে নিষেধ করেছেন তা করতে যেন তোমাকে না দেখেন এবং যে কাজ করতে আদেশ করেছেন, তা করতে যেন তোমাকে দুর্বল না পান। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (রহঃ) আবু হাযেমকে বললেন ঃ আমার জন্যে দোয়া করুন। তিনি বললেন ঃ শয়ন করে ধ্যান করবে যে, মৃত্যু তোমার মাথার উপরে বিদ্যমান এবং এটা ইন্তেকালের সময়। এর পর ধ্যান করবে– এই মুহূর্তে কোন্ গুণটি তুমি নিজের মধ্যে থাকা পছন্দ কর এবং কোন্ গুণটি থাকা পছন্দ কর না। যে গুণটি থাকা পছন্দ কর, সেটি তখন থেকেই অবলম্বন কর এবং যে গুণটি পছন্দ কর না, সেটি তখনই বর্জন কর। কেননা, সম্ভবতঃ আখেরাতের সময় নিকটবর্তী।

জনৈক বেদুঈন সোলায়মান ইবনে আবদুল মালেকের কাছে এলে

তিনি তাকে বললেন ঃ কি চাও? সে বলল ঃ আমীরুল মুমিনীন, আমি আপনাকে কিছু বলব। সহ্য করে নেবেন। সহ্য না করলে পরে আফসোস করবেন। সোলায়মান বললেন ঃ আমার সহনশীলতা এত বিস্তৃত যে, যার কাছ থেকে উপদেশ আশা করি না এবং দোয়ার সম্ভাবনা দেখি, তার সাথেও সহনশীল আচরণ করি। আর যে ব্যক্তি আমাকে উপদেশ দেবে এবং প্রতারণা করবে না, তার সাথে সহনশীল হব না কেন? বেদুঈন বলল ঃ হে আমিরুল মুমিনীন! আপনার চারপাশে এমন লোক রয়েছে, যারা নিজেদের স্বার্থে মন্দ পথ অবলম্বন করছে এবং দ্বীনের বিনিময়ে দুনিয়া ক্রয় করছে। তারা আল্লাহ্ তাআলার অসন্তুষ্টির বিনিময়ে আপনার সন্তুষ্টি অর্জন করছে। আল্লাহ্ তাআলার ক্ষেত্রে তো তারা আপনাকে ভয় করেছে, কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তাআলাকে ভয় করেনি। তারা আখেরাতের সাথে যুদ্ধ এবং দুনিয়ার সাথে সন্ধি পছন্দ করেছে। অতএব আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে যে বিষয়ে বিশ্বস্ত প্রতিনিধি করেছেন, আপনি সে বিষয়ে তাদেরকে প্রতিনিধি করবেন না। কারণ, তারা আমানত বিনষ্ট করতে এবং মুসলমানদেরকে হেয় ও লাঞ্ছিত করতে কোন ত্রুটি করেনি। তাদের কাজকর্মের জবাবদিহি আপনাকে করতে হবে, কিন্তু আপনার কাজ-কর্ম সম্পর্কে তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে না। আপনি নিজের পরকাল নষ্ট করে তাদের দুনিয়া সুখকর করবেন না। কেননা, সে ব্যক্তিই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত, যে অন্যের দুনিয়ার বিনিময়ে নিজের পরকাল বিনষ্ট করে। সোলায়মান বললেন ঃ হে বেদুঈন! তুমি তোমার মুখের তরবারি দিয়ে পাষাণ বিদীর্ণ করতে চাইলে, কিন্তু এত ধার কি তোমার তরবারিতে আছে? বেদুঈন বলল ঃ ঠিক বলেছেন, কিন্তু এসব কথা আপনার উপকারের জন্যে, ক্ষতির জন্যে নয়।

বর্ণিত আছে, সাধক আবু বকর হযরত মোআবিয়ার কাছে গিয়ে বললেন ঃ হে মোআবিয়া, আল্লাহকে ভয় কর। জেনে রাখ, যতই দিন অতিবাহিত হয়ে রাত্রি আগমন করে, ততই তুমি দুনিয়া থেকে দূরবর্তী এবং পরকালের নিকটবর্তী হচ্ছ। তোমার পেছনে এমন অন্বেষণকারী আছে, যার কবল থেকে তুমি বাঁচতে পারবে না। তোমার জন্যে একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে, যার আগে তুমি যেতে পারবে না। তুমি সত্বরই সেই সীমায় পৌঁছে যাবে এবং অনতিবিলম্বে সেই অন্বেষণকারী তোমাকে এসে ধরবে। আমরা এবং আমাদের সাজ-সরঞ্জাম সমস্তই ধ্বংসশীল। যেখানে

আমরা যাব, সেটা অক্ষয়। আমাদের ক্রিয়াকর্ম ভাল হলে প্রতিদানও ভাল হবে, আর মন্দ হলে প্রতিদানও মন্দ হবে।

মোট কথা, যারা আখেরাতের আলেম, তারা বাদশাহদের কাছে এভাবে যেতেন, যা উপরে বর্ণিত হল, কিন্তু দুনিয়াদার আলেমরা তাদের কাছে যায় নৈকট্য হাসিল করার উদ্দেশে। তারা শাসকবর্গকে নানা ধরণের অন্যায়ে সম্মতি দেয় এবং সূক্ষ্ম কৌশল ও নিজেদের মতলব অনুযায়ী পরিত্রাণের উপায় বলে দেয়। যদি ওয়ায প্রসঙ্গে তাদেরকে উপরে বর্ণিত বিষয়সমূহ বর্ণনাও করে, তবুও তাতে উদ্দেশ্য শাসকবর্গের সংশোধন থাকে না; বরং স্বীয় মাহাত্ম্য, জাঁকজমক ও শাসকবর্গের দৃষ্টিতে প্রিয় হওয়া উদ্দেশ্য থাকে। এক্ষেত্রে বোকামিবশতঃ দু'টি ভুল করা হয়। এক, জনগণকে একথা বোঝানোর চেষ্টা করা হয় যে, আমাদের শাসকদের কাছে যাওয়ার উদ্দেশ্য উপদেশের মাধ্যমে তাদেরকে সংশোধন করা। অথচ অন্তরে প্রায়শঃ একথা থাকে না। উদ্দেশ্য যা থাকে, তা হচ্ছে সুখ্যাতি অর্জন করা এবং শাসকদের কাছে পরিচিত হওয়া। সংশোধন উদ্দেশ্য সত্য হওয়ার লক্ষণ হচ্ছে, যদি অন্য কোন আলেম এই সংশোধনের দায়িত্ব নেয় এবং তার ওয়ায প্রভাবশালী হতে দেখা যায়, তবে এতে তার সন্তুষ্ট হওয়া উচিত এবং আল্লাহ্ তা'আলার শোকর করা উচিত যে, যে গুরুদায়িত্ব আমি নিয়েছিলাম, তা অন্যের হাতে সম্পন্ন হয়ে গেছে। ফলে আমি কষ্ট থেকে বেঁচে গেছি। উদাহরণতঃ কোন দুরারোগ্য রোগীর শুশ্রূষা করা একজনের উপর জরুরী হলে যদি অন্য কেউ এসে এই দায়িত্ব গ্রহণ করে, তবে স্বভাবতই প্রথম ব্যক্তি সন্তুষ্ট হবে। সুতরাং যদি কেউ নিজের ওয়াযকে অন্যের ওয়াযের উপর অগ্রাধিকার দেয়, তবেই বুঝা যাবে উদ্দেশ্য শাসকদের সংশোধন নয়; বরং অন্য কিছু।

দ্বিতীয়তঃ বলা হয়, আমি কোন মুসলমানের উপর থেকে জুলুম অপসারিত করার জন্যে শাসকদের কাছে যাই। এটাও আত্মপ্রবঞ্চনা এবং যাচাই করার কষ্টিপাথরও তাই, যা উপরে বর্ণিত হয়েছে।

বাদশাহদের কাছে যাওয়ার নিয়মনীতি সুস্পষ্ট হওয়ার পর আমরা এখানে কয়েকটি বিষয় বর্ণনা করছি, যদ্দ্বারা বাদশাহদের সাথে মেলামেশা করা ও তাদের বস্তু সামগ্রী নেয়ার কিছু অবস্থা জানা যাবে।

(১) বাদশাহ্ কিছু বস্তু সামগ্রী ফকীরদের মধ্যে বণ্টন করার জন্যে

তোমার কাছে প্রেরণ করলে যদি সে সামগ্রীর কোন নির্দিষ্ট মালিক থাকে, তবে তা নেয়া তোমার পক্ষে হালাল নয়। আর যদি নির্দিষ্ট মালিক না থাকে তবে তা গ্রহণ করে মিসকীনদের মধ্যে বণ্টন করে দেবে। বণ্টন না করে নিজে নিয়ে নিলে গোনাহগার হবে। কোন কোন আলেম গ্রহণ করতেই অস্বীকার করেন। এখন এতে উত্তম কোন্‌টি তাই দেখা উচিত।

আমরা বলি, যদি তিনটি আশংকা থেকে মুক্ত হও, তবে গ্রহণ করা তোমার পক্ষে উত্তম। প্রথম আশংকা– তোমার গ্রহণ করার কারণে বাদশাহের বুঝে নেয়া যে, তার সম্পদ পবিত্র। পবিত্র না হলে তুমি তার জন্যে হাত বাড়াতে না। সুতরাং পরিস্থিতি এরূপ হলে সে সম্পদ গ্রহণ করবে না। কারণ, তা গ্রহণ করা বিপজ্জনক। কেননা, তোমার হাতে এই সম্পদ বণ্টন করলে যে কল্যাণ হবে, তা সে অনিষ্টের তুলনায় কম হবে, যা বাদশাহের হারাম সম্পদ উপার্জনে সাহসী হওয়ার কারণে হবে।

দ্বিতীয় আশংকা হল তোমার দেখাদেখি অন্য আলেম অথবা জাহেলের সে সম্পদ গ্রহণ জায়েয মনে করা এবং তা মিসকীনদের মধ্যে বণ্টন না করা। এ অনিষ্টটি প্রথম অনিষ্টের তুলনায় বড়। সেমতে কিছু লোক গ্রহণ করার বৈধতার সপক্ষে ইমাম শাফেয়ীকে পেশ করে, কিন্তু তিনি যে ফকীরদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছেন, তা দেখে না। অতএব, অনুসৃত ব্যক্তির এ থেকে বেঁচে থাকা উচিত। কেননা, তার কাজ অনেক মানুষের পথভ্রষ্টতার কারণ হয়ে যায়। ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ (রহঃ) বলেন ঃ এক বাদশাহের সামনে এক ব্যক্তিকে ধরে আনা হল। বাদশাহ জনসমক্ষে তাকে জবরদস্তিমূলকভাবে শূকরের মাংস খাওয়াতে চাইল। সে খেল না। এর পর তার সামনে ছাগলের গোশত রেখে তরবারি উচিয়ে হুমকি দেয়া হল, সে তাও খেল না। লোকেরা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলল ঃ লোকেরা জেনেছে, আমাকে শূকরের মাংস খাওয়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এখন যদি আমি জীবিত অবস্থায় তাদের সামনে যেতাম এবং কিছু খেয়ে নিতাম, তবে তারা জানত না, আমি কি খেয়েছি। ফলে তারা গোমরাহ হয়ে যেত।

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ ও তাউস (রহঃ) একবার হাজ্জাজের ভাই মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফের কাছে গেলেন। লোকটি ছিল খামখেয়ালী প্রকৃতির। শীতের দিনে সে একটি খোলা মজলিসে বসে ছিল। তাঁরা উভয়েই নির্ধারিত আসনে বসে গেলেন। মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ তার

গোলামকে একটি চাদর এনে তাউসের গায়ে পরিয়ে দিতে বলল। সে আদেশ পালন করল। তাউস নিজের কাঁধ হেলাতে লাগলেন। অবশেষে চাদর কাঁধ থেকে পড়ে গেল। মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ক্রুদ্ধ হয়ে বলল ঃ স্বীকার করলাম, আপনার চাদরের প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু এটি গ্রহণ করে সদকা করে দিলে কি ক্ষতি হত? তিনি বললেন ঃ তাহলে লোকেরা কেবল এটাই বলত, তাউস চাদর গ্রহণ করেছেন। আমার সদকা করা তারা দেখত না। তাই আমি এটা গ্রহণ করিনি।

তৃতীয় আশংকা হল, বাদশাহ কেবল তোমার কাছেই বিশেষভাবে প্রেরণ করেছে– অন্য কারও কাছে প্রেরণ করেনি– দেখে তোমার অন্তরে তার প্রতি মহব্বত উথলে উঠা। এরূপ আশংকা থাকলে কখনও গ্রহণ করবে না। কেননা, জালেমদের প্রতি মহব্বত বিষতুল্য। এটা এমন ব্যাধি, যার কোন প্রতিকার নেই। কেননা মানুষ যাকে মহব্বত করে তার দোষত্রুটির ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করে থাকে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ দাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা পোষণ করাই মানুষের মজ্জাগত স্বভাব। রসূল (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ اللهم لاتجعل الفاجر عندى هدا فيحبه قلبى ইলাহী, আমাকে কোন পাপাচারীর কাছে ঋণী করবেন না। করলে আমার অন্তর তাকে ভালবাসতে থাকবে। এতে বর্ণিত হয়েছে যে, মানুষের অন্তর মহব্বত থেকে সাধারণতঃ মুক্ত থাকে না। কথিত আছে, জনৈক শাসক হযরত মালেক ইবনে দীনার (রহঃ)-এর কাছে দশ হাজার দেরহাম প্রেরণ করলেন ঃ তিনি নিঃশেষে তা ফকীরদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন। এর পর তাঁর কাছে মুহম্মদ ইবনে ওয়াসে' (রঃ) আগমন করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন ঃ সেই শাসক তোমার কাছে যে দেরহাম পাঠিয়েছিল, তা কি করেছ? তিনি বললেন ঃ আমার খাদেমদেরকে জিজ্ঞেস কর। খাদেমরা বলল ঃ তিনি সম্পূর্ণ অর্থ বিলিয়ে দিয়েছেন। মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসে' বললেন ঃ আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি– তোমার অন্তরে সেই শাসকের প্রতি মহব্বত এখন বেশী, না অর্থ পাঠানোর পূর্বে বেশী ছিল? তিনি বললেন ঃ এখন বেশী। মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসে' বললেন, আমি তাই আশংকা করছিলাম।

মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসে' সত্যই বলেছেন। কেননা, যখন শাসককে মহব্বত করবে, তখন তার দীর্ঘায়ু কামনা করবে এবং তার পদচ্যুতি

অপছন্দ করবে; বরং তার শাসন বিস্তৃত হওয়া এবং সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়া পছন্দ করবে। এসব বিষয় জুলুমের সহায়ক কারণ।

হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ) ও ইবনে মসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন কাজে সন্তুষ্ট থাকে, সে অনুপস্থিত থাকলেও এমন হবে যেন সে কাজে শরীক ছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَا تَرْكَنُوْٓا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ـ

অর্থাৎ, যারা জালেম, তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ো না।

কোন কোন তফসীরকারের মতে এর অর্থ হচ্ছে, জালেমদের কাজ-কর্মে সম্মত হয়ো না। সুতরাং তোমার যদি অতটুকু সামর্থ্য থাকে যে, সম্পদ গ্রহণ করলে বাদশাহদের প্রতি মহব্বত বৃদ্ধি পাবে না, তবে গ্রহণ করা মোটেও দূষণীয় হবে না। সে মতে বসরার জনৈক আবেদের ঘটনা বর্ণিত রয়েছে। তিনি বাদশাহদের কাছ থেকে সম্পদ গ্রহণ করে হকদারদের মাঝে বণ্টন করে দিতেন। লোকেরা তাঁকে প্রশ্ন করল ঃ আপনি কি বাদশাহদেরকে ভালবাসার আশংকা করেন না? তিনি বললেন ঃ যদি কেউ আমাকে হাতে ধরে জান্নাতে দাখিল করিয়ে দেয়, এর পর সে আল্লাহ তাআলার নাফরমানী করে, তবে এতটুকু সদ্ব্যবহার সত্ত্বেও আমার অন্তর তাকে মহব্বত করবে না। কেননা, যে সত্তা তাকে আমার হাত ধরতে বাধ্য করেছে, তাঁর খাতিরেই আমি এ ব্যক্তিকে শত্রু মনে করি। উপরোক্ত বক্তব্য থেকে জানা গেল, বাদশাহদের কাছ থেকে সম্পদ গ্রহণ করা কোন কোন কারণে জায়েয হলেও বর্তমান যুগে তা নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয়। কেননা, বর্তমান যুগে বাদশাহের ধন সম্পদ গ্রহণ করা উপরোক্ত অনিষ্ট থেকে মুক্ত নয়।

(২) যদি কেউ প্রশ্ন করে, বাদশাহের দেয়া সম্পদ গ্রহণ করা এবং ফকীরদের মধ্যে বন্টন করা যখন জায়েয, তখন বাদশাহের সম্পদ চুরি করে তা ফকীরদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়া জায়েয হবে না কেন? এর জওয়াব হচ্ছে, তা জায়েয নয়। কেননা, বাদশাহের সম্পদ এমনও হতে পারে যার কোন নির্দিষ্ট মালিক রয়েছে এবং বাদশাহ তার কাছে তা ফিরিয়ে দেয়ার নিয়ত রাখে। সুতরাং চুরি করা সম্পদ সেই সম্পদের মত নয়, যা বাদশাহ নিজে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেয়। কেননা, বাদশাহ সম্পর্কে সাধারণত এরূপ ধারণা করা যায় না যে, কোন সম্পদের

মালিক জানা সত্ত্বেও সে তা খয়রাত করে দেবে। সুতরাং বাদশাহের দেয়া এ বিষয়ের প্রমাণ যে, সে সেই সম্পদের মালিক কে তা জানে না। যদি কোন বাদশাহ এসব ব্যাপারে অসাবধান হয়, তবে তার সম্পদ সম্পর্কে পরিপূর্ণ খোঁজ-খবর না নেয়া পর্যন্ত গ্রহণ করা উচিত নয়।

(৩) জালেমদের নির্মিত পুল, সরাইখানা, মসজিদ ইত্যাদির ব্যাপারেও সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। অর্থাৎ, পুলের উপর দিয়ে যাওয়া প্রয়োজনের সময় জায়েয এবং যথাসম্ভব তা থেকে বিরত থাকা পরহেযগারী। নৌকা পাওয়া গেলে পরহেযগারীর দাবী জোরদার হয়ে যাবে। নৌকা পাওয়া গেলেও পুলের উপর দিয়ে যাওয়া আমরা জায়েয বলেছি। এর কারণ, পুলের সামগ্রীসমূহের যখন কোন নির্দিষ্ট মালিক জানা নেই, তখন তার বিধান হচ্ছে খয়রাতে ব্যয় করা। পুলের উপর দিয়ে যাওয়াও একটি খয়রাত, কিন্তু যদি জানা যায়, পুলের ইট ও পাথর অমুক বাড়ী, কবরস্থান অথবা মসজিদ থেকে উঠিয়ে এনে লাগানো হয়েছে, তবে সে পুল দিয়ে যাওয়া জায়েয নয়।

যদি মসজিদ জবর দখল করা যমীনে নির্মিত হয়, তবে তার ভেতরে জমাত কিংবা জুমআর জন্যে যাওয়া কস্মিনকালেও জায়েয নয়। এমনকি, যদি ইমাম মসজিদের ভেতরে দাঁড়ায়, তবে তুমি তার পিছনে মসজিদের বাইরে দাঁড়াবে। কেননা, জবরদখলকৃত যমীনে নামায পড়লে যদিও ফরয থেকে মুক্তি পাওয়া যায় এবং এক্তেদাও জায়েয হয়ে যায়, কিন্তু তার ভেতরে দাঁড়ানো গোনাহ। যদি জালেমরা এমন সামগ্রী দ্বারা মসজিদ নির্মাণ করে, যার মালিক জানা নেই, তবে অন্য মসজিদ পাওয়া গেলে সেখানে চলে যাওয়াই পরহেযগারী। অন্য মসজিদ না থাকলে জুমআ ও জামাত তরক করবে না। কেননা, এরূপ সম্ভাবনাও আছে যে, জালেম নির্মাতা নিজের মালিকানার অর্থেই নির্মাণ করেছে। জবরদখলকৃত যমীনে নির্মিত মসজিদে নামায পড়তে কোন দোষ নেই, যদি সে যমীনের নির্দিষ্ট কোন মালিক না থাকে। মসজিদে জালেমদের বিছানো চাটাই ও মাদুরের মালিক নির্দিষ্ট থাকলে তার উপর বসা হারাম। মালিক নির্দিষ্ট না থাকলে এগুলো বিছানো জায়েয, কিন্তু যথাসম্ভব এগুলো বর্জন করা এবং যে মসজিদে জালেমদের বিছানো চাটাই নেই, সেখানে চলে যাওয়া পরহেযগারী।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

উপস্থিত জরুরী মাসআলা

(১) প্রশ্ন করা হয়েছে, সুফীগণের খাদেম বাজার থেকে তাদের জন্যে যে খাদ্য সংগ্রহ করে আনে অথবা নগদ মূল্য দিয়ে কিনে আনে, তা থেকে অন্য কারও পক্ষে কিছু খাওয়া হালাল কি না? আমি এর জওয়াব এই দিয়েছি যে, অন্য সুফী ব্যক্তির এ থেকে খাওয়া যে হালাল তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু যে সুফী নয়, সে খাদেমের সম্মতিক্রমে খেলে তা-ও হালাল। তবে সন্দেহ থেকে মুক্ত নয়। হালাল হওয়ার কারণ, সুফীগণের খাদেমকে যারা কোন বস্তু দেয়, তারা সুফীগণের কারণে দেয়, কিন্তু গ্রহণকারী খাদেম নিজে সুফীগণের অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন, সন্তান-সন্ততিওয়ালা ব্যক্তি সন্তান-সন্ততির কারণে মানুষের কাছ থেকে কিছু পেলে সে তার মালিক হয়ে যায়– সন্তান-সন্ততি মালিক হয় না। সে সন্তান-সন্ততি ছাড়া অন্যকেও এ থেকে খাওয়াতে পারে।

(২) প্রশ্ন করা হওয়ছে যে, কিছু বস্তু সামগ্রী সুফীদের জন্যে ওসিয়ত করা হল। এখন এই সম্পদ কিরূপ লোকের মধ্যে ব্যয় করতে হবে? আমি জওয়াবে বললাম, তাসাওউফ একটি অন্তরের বিষয়, যা বাইরে থেকে জানা যায় না। তাসাওউফের স্বরূপও নিশ্চিতরূপে বিধিবদ্ধ করা সম্ভবপর নয়; বরং কয়েকটি বাহ্যিক বিষয় বর্ণনা করা যায়, যার উপর ভরসা করে পরিভাষায় মানুষকে সুফী বলা হয়। এ ব্যাপারে পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। (১) নেক হওয়া, (২) ফকীর হওয়া, (৩) সুফীদের পোশাক পরা, (৪) কোন পেশায় নিয়োজিত না থাকা এবং (৫) সুফীদের খানকায় তাঁদের সাথে মিলেমিশে থাকা। এসব গুণের মধ্যে কোন কোনটি এমন যে, তা মানুষের মধ্যে না থাকলে সুফী শব্দও তার জন্যে প্রয়োগ করা হবে না। উদাহরণত যে ব্যক্তি নেক নয়, বরং ফাসেক, সে সুফী কথিত হওয়ার যোগ্য হবে না। কেননা, সুফী সাধারণতঃ নেক লোককে বলা হয়। সুতরাং যে ব্যক্তির ফাসেকী প্রকাশ পাবে সে সুফীদের পোশাক পরিধান করলেও তাদের জন্যে ওসিয়ত করা সম্পদের হকদার হবে না। এ ক্ষেত্রে সগীরা গোনাহ ধর্তব্য নয়। ফাসেকীর অর্থ কবীরা গোনাহ করা। পেশা অবলম্বন করা এবং উপার্জনে

আত্মনিয়োগ করাও হকদার হওয়ার পরিপন্থী। সুতরাং কৃষক, চাকুরীজীবী, ব্যবসায়ী, দোকানে কিংবা গৃহে পেশায় লিপ্ত ও মজুর সে সম্পদের হকদার নয়, যা সুফীদের জন্যে ওসিয়ত করা হয়। হাঁ, লেখা ও সেলাই করা, যা সুফীদের দ্বারা হতে পারে, তা যদি গৃহে হয় এবং দোকানে না হয়, তবে তা হকদার হওয়ার পরিপন্থী নয়। এই ক্ষতি সুফীদের সাথে থাকা ও অন্যান্য গুণ দ্বারা পূরণ হয়ে যাবে। ওয়ায করা এবং দরস দেয়া সুফী শব্দের পরিপন্থী নয়; যদি পোশাক, সুফীদের সাথে থাকা এবং ফকীরী পাওয়া যায়। কেননা, সুফীর সাথে কারী, ওয়ায়েয, আলেম ও মুদাররেস হওয়ার মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। ফকীরী হচ্ছে, যদি কারও কাছে এই পরিমাণ মাল হয়ে যায়, যদ্দরুন মানুষ বাহ্যতঃ তাকে সচ্ছল বলতে থাকে, তবে সুফীদের জন্যে ওসিয়তকৃত মাল গ্রহণ করা তার জন্যে জায়েয নয়, কিন্তু যদি মাল থাকে এবং তা দ্বারা ব্যয় নির্বাহ না হয়, তবে তার হক বাতিল হবে না। এক্ষেত্রে সুফীদের সাথে থাকারও প্রভাব আছে। তবে কেউ যদি সুফীদের সাথে না থাকে; বরং নিজের বাড়ী অথবা মসজিদে থাকে, কিন্তু পোশাক ও চরিত্র তাদেরই মত হয়, তবে সে-ও সে মালে শরীক হবে। যদি পোশাকও তাদের মত না হয় এবং অন্যান্য গুণ পাওয়া যায়, তবে শরীক হবে না। যে ফকীর সুফীদের মত পোশাক পরে না এবং খানকায়ও থাকে না, সে সুফী বলে গণ্য হবে না। যে সুফীর স্ত্রী আছে, ফলে সে কখনও গৃহে এবং কখনও খানকায় থাকে, সে সুফীদের দল থেকে খারিজ হবে না।

(৩) প্রশ্ন করা হয়েছে, ঘুষ ও উপঢৌকনের মধ্যে পার্থক্য কি? উভয়টিই সম্মতিক্রমে দেয়া হয় এবং উদ্দেশ্যও উভয়ের মধ্যে এক থাকে। এমতাবস্থায় ঘুষ হারাম এবং উপঢৌকন হালাল হল কেন?

আমি জওয়াব দিলাম, উদ্দেশ্য ছাড়া কেউ কখনও অর্থ ব্যয় করে না, কিন্তু অর্থ দেয়ার উদ্দেশ্য পাঁচ প্রকার হতে পারে। (১) আখেরাতের সওয়াবের উদ্দেশে অর্থ দেয়া। কেননা, যাকে দেয়া হবে সে নিঃস্ব, সম্ভ্রান্ত, আলেম অথবা ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি হবে। যদি কাউকে নিঃস্ব মনে করে দেয়া হয়; কিন্তু বাস্তবে সে নিঃস্ব না হয়, তবে গ্রহণকারীর জন্যে তা গ্রহণ করা হালাল নয়। যদি আলেম হওয়ার কারণে অর্থ দেয়া হয়, তা গ্রহণ করা তখন হালাল হবে, যখন সে দাতার বিশ্বাসের অনুরূপ আলেম হবে। যদি দাতা তাকে কামেল মনে করে দেয়, যাতে সওয়াব বেশী হয়, কিন্তু সে

কামেল নয়, তবে গ্রহণ করা তার জন্যে হালাল হবে না। আর যদি ধর্মপরায়ণতার কারণে অর্থ দেয়া হয় আর অন্তরে সে এমন ফাসেক যে দাতা জানতে পারলে তাকে দিত না, তবে তার জন্যেও গ্রহণ করা হালাল হবে না। এমন নেক লোক কমই হয়, যাদের অন্তরের অবস্থা প্রকাশ হয়ে গেলে মানুষের মন তাদের দিকে আকৃষ্ট থাকে। আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক গোপন রাখাই এক মানুষকে অন্য মানুষের প্রিয় করে রাখে। অতএব ধর্মপরায়ণতার কারণে যা পাওয়া যায়, তা গ্রহণ করা থেকে যথাসম্ভব বিরত থাকা উচিত।

(২) কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সামনে রেখে দেয়া; যেমন ফকীর ব্যক্তি উপঢৌকন পাওয়ার আশায় কোন ধনীকে কিছু দেয়। এটা বিনিময়ের শর্তে উপঢৌকন। এটা গ্রহণ করা তখনই হালাল হবে, যখন যে বিনিময়ের আশায় দেয়া হয়, তা পাওয়া যায় এবং লেনদেনের সকল শর্তও তাতে বিদ্যমান থাকে।

(৩) কোন নির্দিষ্ট কাজ দ্বারা সাহায্যের উদ্দেশে দেয়া। উদাহরণতঃ বাদশাহের কাছে এক ব্যক্তির কোন প্রয়োজন রয়েছে। সে বাদশাহের উকিল কিংবা অন্য কোন মর্যাদাবান ব্যক্তিকে কিছু হাদিয়া দেয়। বলাবাহুল্য, এটাও বিনিময়ের শর্তে উপঢৌকন। এখানে হাদিয়ার বিনিময়ে যে কাজটি সে হাসিল করতে চায়, সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সেটি হারাম কাজ হলে এই হাদিয়া গ্রহণ করা হারাম, যেমন হারাম ভাতা জারি হওয়া কিংবা কোন ব্যক্তিকে উৎপীড়ন করা। আর যদি সে কাজটি করা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্যে ওয়াজিব থাকে, তবে এর জন্যে উপঢৌকন নেয়া হারাম। যেমন– জুলুম প্রতিরোধ করা কিংবা সাক্ষ্য দেয়া। কেননা, যার জুলুম প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আছে, তার উপর জুলুম প্রতিরোধ করা ওয়াজিব। এমনিভাবে ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ব্যক্তির উপর সাক্ষ্য দেয়া ওয়াজিব। এ ধরনের কাজের বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করাই ঘুষ, যা নিঃসন্দেহে হারাম। আর যদি সে কাজটি হারাম না হয় এবং করাও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপর ওয়াজিব না হয়; বরং বৈধ হয়; এছাড়া কাজটি সম্পাদনও এমন শ্রমসাধ্য হয়, যার কারণে সাধারণ লোক মজুরি নিয়ে থাকে, তবে এ ধরনের কাজের বিনিময়ে হাদিয়া নেয়া এই শর্তে হালাল যে, গ্রহীতা দাতার উদ্দেশ্য পূর্ণ করে দেবে। এ হাদিয়াটি মজুরির

স্থলবর্তী। উদাহরণতঃ কাউকে এরূপ বলা, আমার এ আর্জিটি বাদশাহের কাছে পৌঁছে দিলে তোমাকে এক দীনার দেব। বিচারকের সামনে উকিলের বিতর্ক এবং সেজন্যে মজুরি নেয়াও এই পর্যায়ে পড়ে, যদি সে বিতর্ক হারাম ব্যাপারে না হয়। যদি কারও উদ্দেশ্য সামান্য কথায় হাসিল হয়ে যায়, যার জন্যে কোন শ্রম স্বীকার করতে হয় না, কিন্তু কথাটি কোন সম্মানী কিংবা প্রতিপত্তিশালীর মুখ দিয়ে উপকারী হয়; যেমন রাজকর্মচারী কিংবা উজির মুখ দিয়ে দারোয়ানকে বলে দেয়া যে, এই ব্যক্তি এলে তাকে বাধা দিয়ো না, তবে এর বিনিময়ে কিছু নেয়া হারাম। কেননা, প্রতিপত্তির বিনিময়ে কিছু নেয়ার বৈধতা শরীয়তে প্রমাণিত নেই; বরং এ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত আছে।

যে ব্যক্তি কোন ওষুধ জানে, যা অন্যে জানে না, তা বলে দেয়ার বিনিময় নেয়াও এ পর্যায়ে হারাম। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি এমন এক ওষুধীর কথা জানে, যা অর্শ্বরোগে ফলপ্রদ, কিন্তু মজুরি ছাড়া কাউকে তা বলে না, এরূপ মজুরি নেয়া জায়েয নয়। কেননা, সামান্য মুখ নেড়ে দেয়ার কোন মূল্য হতে পারে না। হাঁ, এই ওষুধীর জ্ঞান অর্জন করতে যদি তার অর্থ ব্যয় হয়ে থাকে, তবে সেক্ষেত্রে পরিমিত মজুরি নেয়া জায়েয।

(৪) অন্যের মহব্বত লাভ করার উদ্দেশে দেয়া। অর্থাৎ, যাকে দেয়া হয় তার অন্তরের মহব্বত লাভ করা এবং এই মহব্বতের মাধ্যমে কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হাসিল না করা। এরূপ দেয়া শরীয়তে মোস্তাহাব ও কাম্য। সেমতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ تهادوا وتحابوا (পারস্পরিক উপঢৌকন আদান-প্রদান কর এবং পরস্পরের বন্ধু হও।) সারকথা, যদিও মানুষ মহব্বতের জন্যেই মহব্বত করে না; বরং উপকারের লক্ষ্যেই মহব্বত করে থাকে, কিন্তু যখন উপকার নির্দিষ্ট না থাকে এবং বর্তমানে অথবা ভবিষ্যতে উপকার লাভের কোন নির্দিষ্ট প্রেরণা অন্তরে প্রতিষ্ঠিত না থাকে, তখন যা দেয়া হয় তাকেই হাদিয়া বলে। এই হাদিয়া গ্রহণ করা হালাল।

(৫) প্রতিপত্তি ও জাঁকজমকের কারণে কাউকে হাদিয়া দেয়া, যাতে তার আন্তরিক নৈকট্য ও মহব্বত লাভ করা যায়, ফলে নিজের সীমিত অনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ সাধিত হয়। যদি এই প্রতিপত্তি জ্ঞানগত অথবা

বংশগত হয়, তবে এর বিনিময়ে হাদিয়া গ্রহণ করা মাকরূহ। কেননা, এটা বাহ্যতঃ হাদিয়া হলেও ঘুষসদৃশ। আর যদি এই প্রতিপত্তি শাসন ক্ষমতার প্রতিপত্তি হয়; যেমন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বিচারক, সরকারী পদাধিকারী, যাকাত আদায়কারী অথবা রাজস্ব আদায়কারী হয়– এরূপ না হলে কেউ তাকে হাদিয়া দিত না, তবে এটা ঘুষ, যা হাদিয়ার আকারে পেশ করা হয়। কেননা, দাতার উদ্দেশ্য আপাততঃ নৈকট্য ও মহব্বত অর্জন হলেও একটা বিশেষ স্বার্থবুদ্ধি সামনে রেখেই তা জালেমের জন্যে দেয়া হয়। বলাবাহুল্য, শাসকদের কাছ থেকে অনেক স্বার্থ হাসিল করা যায়। এটা যে নিছক মহব্বত নয়, তার লক্ষণ হচ্ছে, তখন যদি অন্য কোন ব্যক্তি শাসক হয়ে যায়, তবে সেই হাদিয়া পূর্বের শাসককে দেবে না; বরং নতুন শাসককে দেবে। এ ধরনের হাদিয়া কঠোর মাকরূহ, কিন্তু হারাম হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। এখানে কারণ পরস্পর বিরোধী। অর্থাৎ, একে খাঁটি হাদিয়া বলা হবে, না এমন ঘুষ বলা হবে যা কেবল প্রতিপত্তিবশতঃ কোন নির্দিষ্ট স্বার্থ হাসিলের জন্যে দেয়া হয়– এটা নিশ্চিত নয়। যখন অনুমানগত মিল একটি অপরটির পরিপন্থী হয় তখন হাদীস কোন একটিকে শক্তিশালী মনে করলে তাই নির্দিষ্ট হয়ে যায়। এক্ষেত্রে হাদীসে অত্যন্ত কঠোর ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ এক যমানা আসবে, যখন হাদিয়ার নামে হারামকে হালাল মনে করা হবে এবং জনসাধারণকে ভীত সন্ত্রস্ত করার জন্য নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে।

হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ)-কে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ কোরআনে বর্ণিত সুহত কি? জবাবে তিনি বললেন, কেউ কারও কাজ করে দেয়ার পর তার কাছে হাদিয়া আসা। সম্ভবতঃ তাঁর মতে কাজ করার অর্থ এখানে কিছু বলে দেয়া, যাতে কোন কষ্ট হয় না। অথবা মজুরির নিয়ত ছাড়াই দান স্বরূপ কাজ করে দেয়া। এর পর যদি বিনিময় স্বরূপ পরে কিছু আসে, তবে তা নেয়া জায়েয হবে না।

হযরত মসরূক এক ব্যক্তির জন্যে সুপারিশ করলেন। পরে সে তাঁর খেদমতে এক বাঁদী হাদিয়া স্বরূপ প্রেরণ করল। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে বাঁদী ফেরত দিলেন এবং বললেন ঃ যদি আগে জানতাম তোমার মনে এই

অভিপ্রায়, তবে কখনও তোমার জন্যে সুপারিশ করতাম না। এখন তোমার যতটুকু প্রয়োজন রয়ে গেছে, তাতে একটি কথাও বলব না। হযরত তাউসের কাছে বাদশাহ প্রদত্ত হাদিয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন ঃ হারাম। হযরত ওমর ফারূক (রাঃ)-এর দু'পুত্র একবার বায়তুল মাল থেকে সম্পদ নিয়ে মুযারাবা স্বরূপ ব্যবসায়ে খাটিয়ে মুনাফা অর্জন করেছিলেন। তিনি সেই মুনাফা পুত্রদ্বয়ের কাছ থেকে নিয়ে বায়তুল মালে জমা করে দেন এবং বলেন ঃ লোকেরা তোমাদেরকে আমার স্বজন মনে করে এটা দিয়েছে। অর্থাৎ, শাসনগত প্রতিপত্তির কারণে এই মুনাফা অর্জিত হয়েছে। হযরত আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ (রাঃ)-এর পত্নী একবার রোম সম্রাজ্ঞীর কাছে সুগন্ধি হাদিয়া প্রেরণ করেন। জওয়াবে সম্রাজ্ঞী তার কাছে কিছু মণিমুক্তা পাঠিয়ে দেন। হযরত ওমর (রাঃ) সেই মুক্তা তার কাছ থেকে নিয়ে বিক্রি করে দেন। অতঃপর সুগন্ধির মূল্য তাকে দিয়ে বায়তুল মালে জমা করে দেন। হযরত জাবের ও হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-কে বাদশাহদের হাদিয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তাঁরা একে খেয়ানতের মাল আখ্যা দেন। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (রহঃ) হাদিয়া ফেরত দিলে লোকেরা আরজ করল ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) হাদিয়া কবুল করতেন। তিনি বললেন ঃ তাঁর জন্যে সেটা হাদিয়া ছিল এবং আমাদের জন্যে ঘুষ। অর্থাৎ, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে লোকেরা দিত নবুওয়তের কারণে, শাসনক্ষমতার কারণে নয়। আর আমাদেরকে শাসন ক্ষমতার কারণেই দেয়। এসব হাদীস ও রেওয়ায়েতের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ সেই হাদীসটি, যা আবু হুমায়দ সায়েদী বর্ণনা করেছেন। তিনি রেওয়ায়েত করেন– রসূলুল্লাহ (সাঃ) ইযদ গোত্রের যাকাতের জন্যে একজন কর্মকর্তা প্রেরণ করেন। সে ফিরে এসে কিছু মাল নিজের কাছে রেখে দেয় এবং বলে ঃ এগুলো আমি হাদিয়া হিসাবে পেয়েছি। এর পর অবশিষ্ট মাল রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে অর্পণ করে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তুমি সত্যবাদী হলে তোমার মায়ের গৃহে বসে রইলে না কেন, যাতে এখানে হাদিয়া আসত। এর পর তিনি মুসলমানদের সামনে এই ভাষণ দিলেন ঃ

مالى استعمل الرجل منكم فيقول هذه لكم وهذه لكم

وهذا لى هدية ـ الا حبس فى بيت امه يهدى له والذى نفسى

بيده لاياخذ منكم احد شيئا بغير حقه الا اتى الله يحمله فلا يأتين احدكم يوم القيامة ببعير له رخاء او بقرة له خوار او شاة تيعر -

অর্থাৎ, ব্যাপার কি, আমি তোমাদের কাউকে কর্মকর্তা নিযুক্ত করি। সে বলে ঃ এটা মুসলমানদের জন্যে, আর এটা আমার জন্যে হাদিয়া। সে তার মায়ের গৃহে বসে থাকলে কি কেউ তাকে হাদিয়া দিত? কসম সেই সত্তার, যাঁর কব্জায় আমার প্রাণ– তোমাদের যে কেউ অন্যায়ভাবে কিছু নেবে, সে তা বয়ে নিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে উপস্থিত হবে। অতএব তোমাদের কেউ যেন কেয়ামতের দিন চীৎকাররত উট নিয়ে অথবা হাম্বারবরত গরু নিয়ে অথবা ক্রন্দনরত ছাগল নিয়ে উপস্থিত না হয়। এর পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) উভয় হাত আকাশের দিকে উত্তোলন করলেন, এমনকি, তাঁর বগলের শুভ্রতা আমার দৃষ্টিগোচর হল। তিনি এরশাদ করলেন ঃ ইলাহী, আমি পৌঁছালাম কি না? মোট কথা, হাদীস ও রেওয়ায়েত দ্বারা যখন এহেন কঠোরতা প্রমাণিত হয়, তখন বিচারক ও কর্মকর্তাদের উচিত, তারা যেন নিজেদেরকে গৃহে উপবিষ্ট মনে করে নেয়। এর পর পদচ্যুত ও গৃহে বসা অবস্থায় যে বস্তু তারা হাদিয়া পায়, চাকুরীরত অবস্থায় তা নেয়া দুরস্ত। আর যে বস্তু সম্পর্কে জানে যে, এটা কেবল শাসনক্ষমতায় থাকা অবস্থায় পাওয়া যায়, সেটা নেয়া হারাম। যদি কোন বন্ধুর হাদিয়ার ব্যাপারে এই মীমাংসা কঠিন হয়, তবে সেটা সন্দিগ্ধ বিধায় পরিহার করা উচিত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সঙ্গ, সম্প্রীতি ও বন্ধুত্ব

প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশে মুসলমানদের পারস্পরিক মহব্বত ও ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ব একটি উৎকৃষ্টতম বিষয়। মানবিক অভ্যাস ও আচরণ থেকে যেসকল শক্তি উদ্ভূত হয়, সেগুলোর মধ্যে এটি অধিক পবিত্র ও নমনীয়, কিন্তু এর কিছু শর্ত আছে, যেগুলো পাওয়া গেলে মানুষকে আল্লাহর জন্যে বন্ধুর কাতারে গণ্য করা হয় এবং কতিপয় হক আছে, যেগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখলে এই বন্ধুত্ব মালিন্যের সংমিশ্রণ ও শয়তানী প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে যায়। এছাড়া বন্ধুত্বের এসব হক আদায় করলে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য এবং শর্তসমূহ পূরণ করলে উচ্চ মর্যাদা অর্জিত হয়। তাই আমরা এ অধ্যায়টি তিনটি পরিচ্ছেদে বর্ণনা করছি।

প্রথম পরিচ্ছেদ

সম্প্রীতি ও বন্ধুত্বের ফযীলত এবং শর্ত

জানা উচিত যে, সম্প্রীতি সচ্চরিত্রতার এবং বিদ্বেষ অসচ্চরিত্রতার ফল। সচ্চরিত্রতা পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও আনুকূল্যের কারণ হয় এবং অসচ্চরিত্রতা ঘৃণা, শত্রুতা ও বিচ্ছিন্নতার ফল। বলাবাহুল্য, বৃক্ষ ভাল হলে ফলও ভাল হয়। ধর্মে সচ্চরিত্রতার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। সচ্চরিত্রতার কারণেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী (সাঃ)-এর প্রশংসা করেছেন এবং বলেছেন ঃ إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ (নিঃসন্দেহে আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।)

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ اكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق যে বস্তু অধিকতর মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করায়, তা হচ্ছে আল্লাহর ভয় ও সচ্চরিত্র।

হযরত উসামা ইবনে শরীক বলেন ঃ আমরা আরজ করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ, মানুষ যা যা পেয়েছে, তার মধ্যে সর্বোত্তম কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ সচ্চরিত্র।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ بعثت لاتمم محاسن الاخلاق (আমি

সচ্চরিত্রতাকে পূর্ণতা দান করার জন্যে প্রেরিত হয়েছি।) তিনি আরও বলেন ঃ اثقل ما يوضع فى الميزان خلق حسن। (দাঁড়িপাল্লায় যা ওজন করা হবে, তার মধ্যে অধিক ভারী হবে সচ্চরিত্র।) তিনি আরও বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যার আকার-আকৃতি ও চরিত্র সুন্দর করেছেন, সে দোযখের যোগ্য নয়। একবার তিনি হযরত আবু হোরায়রাকে বললেন ঃ হে আবু হোরায়রা, সচ্চরিত্র নিজের জন্যে অপরিহার্য করে নাও। তিনি আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, সচ্চরিত্র কি? জওয়াব হল ঃ যে তোমার কাছ থেকে আলাদা থাকে, তুমি তার সাথে মিলিত থাক। যে তোমার উপর জুলুম করে, তুমি তাকে মাফ কর। যে তোমাকে বঞ্চিত করে, তুমি তাকে দান কর। শুধু সম্প্রীতির প্রশংসায় এত আয়াত, হাদীস ও রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে, যা তার শ্রেষ্ঠত্বের জন্যে যথেষ্ট। বিশেষত ঃ যখন সম্প্রীতির সূত্র খোদাভীতি, ধর্মপরায়ণতা ও আল্লাহর মহব্বত হয়, তখন তো এর শ্রেষ্ঠত্ব সোনায় সোহাগা হয়ে যায়। সম্প্রীতি মানুষের প্রতি একটি নেয়ামত। আল্লাহ তাআলা এই মহা অনুগ্রহ প্রকাশ করে বলেন ঃ

لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّا اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ -

অর্থাৎ, আপনি পৃথিবীস্থ সবকিছু ব্যয় করেও মানুষের অন্তরে সম্প্রীতি স্থাপন করতে পারতেন না, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন করেছেন।

বিভেদের নিন্দা ও তা থেকে ভয় প্রদর্শনের উদ্দেশে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاۤءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖۤ اِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ -

অর্থাৎ, তোমরা সকলেই আল্লাহর রজ্জু শক্তভাবে আঁকড়ে ধর এবং বিভক্ত হয়ে পড়ো না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামত স্মরণ কর, যখন তোমরা একে অপরের শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের অন্তরে সম্প্রীতি সৃষ্টি করেছেন। ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভাই ভাই হয়ে গেছ।

আর তোমরা জাহান্নামের গর্তের কিনারে দাঁড়িয়েছিলে; তিনি তা থেকে তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন। এমনিভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্যে তাঁর আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা হেদায়েতপ্রাপ্ত হও। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

ان اقربكم منى مجلسا احاسنكم اخلاقا الموطؤون اكنانا الذين يالفون ويولفون -

অর্থাৎ, তোমাদের মজলিসে আমার অধিক নিকটবর্তী সেই ব্যক্তি, যার চরিত্র ভাল, যার অন্তর অন্যের জন্যে কোমল এবং যে অন্যের সাথে সম্প্রীতি রক্ষা করে ও অন্যেরা যার সাথে সম্প্রীতি বজায় রাখে।

তিনি আরও বলেন ঃ ঈমানদার সম্প্রীতির আচরণ করে এবং তার সাথে সম্প্রীতির আচরণ করা হয়। যে সম্প্রীতি রক্ষা করে না এবং যার সাথে সম্প্রীতি রক্ষা করা হয় না, তার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। ধর্মীয় ভ্রাতৃত্বের প্রশংসায় বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ তাআলা যার কল্যাণ করতে চান তাকে সৎ বন্ধু দান করেন। সে ভুলে গেলে বন্ধু তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। সে স্মরণ করলে তবে বন্ধু তাকে সাহায্য করে। আরও এরশাদ হয়েছে ঃ যখন ধর্মীয় দু'ভাই মিলিত হয়, তখন তারা দু'হাত সদৃশ, যারা একে অপরকে ধৌত করে। আর দুই ঈমানদার যখন মিলিত হয়, তখন আল্লাহ তাআলা একেকে অপরের দ্বারা কিছু উপকৃত করেন। আল্লাহ্র ওয়াস্তে ভ্রাতৃত্বের প্রতি উৎসাহ দান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশে অপরের সাথে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে, আল্লাহ তাকে জান্নাতের এমন স্তরে পৌছাবেন, যা অন্য কোন আমল দ্বারা লাভ করা যায় না। আবু ইদরীস খওলানী বলেন ঃ আমি হযরত মুয়ায (রাঃ)-কে বললাম, আমি আপনাকে আল্লাহর উদ্দেশে মহব্বত করি। তিনি বললেন ঃ তোমাকে সুসংবাদ, পুনঃ সুসংবাদ– আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, কেয়ামতের দিন কিছু লোকের জন্যে আরশের চারপাশে চেয়ার বিছানো হবে। তাদের মুখমন্ডল পূর্ণিমার চাঁদের মত ঝলমল করবে। সব মানুষ ভীতবিহ্বল হবে, কিন্তু তারা ভীতবিহ্বল হবে না। তারা আল্লাহ তা'আলার ওলী। তারা ভয় ও দুঃখ করবে না। লোকেরা আরজ করল ঃ তারা কারা ইয়া রসূলাল্লাহ? তিনি বললেন ঃ তারা আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বতকারী। হযরত আবু হোরায়রা বর্ণিত এই রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে– আরশের

চারপাশে নূরের মিম্বর থাকবে। এই মিম্বরের উপর একদল লোক থাকবে, যাদের পোশাকও মুখমণ্ডল হবে নূরের। তারা নবীও নয়, শহীদও নয়, কিন্তু নবী ও শহীদগণ তাদের ঈর্ষা করবে। লোকেরা আরজ করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, তাদের গুণাবলী বর্ণনা করুন। তিনি বললেন ঃ তারা হল আল্লাহর ওয়াস্তে পারস্পরিক মহব্বতকারী। তারা আল্লাহর ওয়াস্তে পরস্পর বৈঠকে বসে এবং আল্লাহর ওয়াস্তে আলাদা হয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেন ঃ যে দু'ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বত করে, তাদের মধ্যে সেই আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়, যে অপরজন থেকে অধিক মহব্বত রাখে। বলা হয়, যে দু'ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে, তাদের মধ্যে একজনের মর্তবা উচ্চ হলে অপরজনের মর্তবাও তার সাথে উচ্চ করা হবে এবং তাকে প্রথম জনের সাথে সংযুক্ত করা হবে; যেমন সন্তানদেরকে পিতামাতার সাথে এবং এক আত্মীয়কে অন্য আত্মীয়ের সাথে সংযুক্ত করা হবে। কেননা, আল্লাহর ওয়াস্তে ভ্রাতৃত্ব হলে তা আত্মীয়তার চেয়ে কম হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ -

অর্থাৎ, আমি তাদের সাথে সন্তানদেরকে সংযুক্ত করে দেব এবং তাদের কোন আমল হ্রাস করব না।

নবী করীম (সাঃ)-এর বর্ণনায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আমার মহব্বত তাদের জন্যে অবধারিত, যারা আমার খাতিরে একে অপরের কাছে আসা-যাওয়া করে। আমার মহব্বত তাদের জন্যে ওয়াজিব, যারা আমার জন্যে পরস্পরে মহব্বত করে। তাদের জন্যেও আমার মহব্বত জরুরী, যারা আমার খাতিরে একে অপরকে সাহায্য করে। অন্য এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে—

ان الله تعالى يقول يوم القيامة اين المتحابون بجلالى اليوم اظلهم فى ظلى يوم لاظل الا ظلى -

আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিন বলবেন ঃ কোথায় আমার প্রতাপের খাতিরে মহব্বতকারীরা, আমি আজ তাদেরকে আমার ছায়ায় স্থান দেব; যেদিন আমার ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া নেই। আরেক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه متعلق بالمسجد اذا خرج منه حتى يعود اليه ورجلان تحابا في الله اجتماعا على ذلك وتفرقا عليه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت له عيناه ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال اني اخاف الله تعالى ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لاتعلم شماله ما تنفق يمينه -

অর্থাৎ, সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ছায়ায় স্থান দেবেন যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া কোন ছায়া থাকবে না– এক, ন্যায়পরায়ণ শাসক। দুই, যে যুবক আল্লাহর এবাদতে যৌবন অতিবাহিত করে। তিন, যার মন মসজিদ থেকে বাইরে আসার পর থেকে মসজিদে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত মসজিদের সাথেই সম্পৃক্ত থাকে। চার, যে দু'ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে পরস্পরকে মহব্বত করে, আল্লাহর ওয়াস্তেই মিলিত হয় এবং তাঁর জন্যেই আলাদা হয়। পাঁচ, যে একান্তে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং অশ্রু বহায়। ছয়, যাকে কোন অভিজাত সুন্দরী রমণী প্ররোচিত করলে সে বলে – আমি আল্লাহকে ভয় করি, সাত, যে ব্যক্তি দান করে এবং এত গোপনে করে যে, ডান হাত কি দিল তা বাম হাত জানতে পারে না।

অন্য এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে– কোন ব্যক্তি তাঁর (আল্লাহর) জন্যে ভ্রাতার সাথে সাক্ষাত করতে রওয়ানা হলে আল্লাহ্ তা'আলা তার পথে একজন ফেরেশতা বসিয়ে দিলেন। ফেরেশতা জিজ্ঞেস করল ঃ তুমি কোথায় যাচ্ছ? সে বলল ঃ অমুক ভ্রাতার সাথে সাক্ষাত করতে। ফেরেশতা বলল ঃ তার সাথে তোমার কোন কাজ নেই? লোকটি বলল ঃ না। ফেরেশতা জিজ্ঞেস করল ঃ তোমরা কি একে অপরের আত্মীয়? সে বলল না। ফেরেশতা শুধাল ঃ সে তোমার প্রতি কোন অনুগ্রহ করেছে কি? সে বলল না। ফেরেশতা বলল ঃ তা হলে কেন যাও? সে জওয়াব দিল ঃ আমি আল্লাহর ওয়াস্তে তাকে মহব্বত করি। ফেরেশতা বলল ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে মহব্বত করেন এবং তোমার জন্যে তিনি জান্নাত ওয়াজিব করে দিয়েছেন। হাদীসে আরও বলা হয়েছে– ঈমানের

রজ্জুসমূহের মধ্যে অধিক মজবুত রজ্জু হচ্ছে আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বত করা। এ হাদীসের কারণেই মানুষের কিছু শত্রু থাকা জরুরী, যাদের সাথে আল্লাহর ওয়াস্তে শত্রুতা হবে এবং কিছু বন্ধু থাকা জরুরী, যাদের সাথে আল্লাহর ওয়াস্তে বন্ধুত্ব হবে। বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা কোন নবীর কাছে ওহী পাঠালেন, তুমি দুনিয়াতে বৈরাগ্য করেছ। এতে তুমি সুখ পেয়েছ। তুমি সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমার দিকে মনোযোগী হয়েছ। ফলে তোমার ইযযত বৃদ্ধি পেয়েছে। বল, আমার জন্যে কোন শত্রুর সাথে শত্রুতা অথবা কোন বন্ধুকে মহব্বত করেছ কিনা? রসূলে করীম (সাঃ) এই দোয়া করেছেন- ইলাহী, আমার উপর কোন পাপাচারীর অনুগ্রহ রাখবেন না, যে কারণে সে আমার মহব্বত পায়। আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি ওহী পাঠান- যদি তুমি সমগ্র আকাশ ও পৃথিবীর বাসিন্দাদের সমপরিমাণ আমার এবাদত কর আর আল্লাহর জন্যে মহব্বত ও আল্লাহর জন্যে শত্রুতা তোমার মধ্যে না থাকে, তবে সে এবাদত আমার কোন উপকারে আসবে না। হযরত ঈসা (আঃ) বলেন ঃ গোনাহগারদের সাথে শত্রুতা করে আল্লাহ তা'আলার মহব্বত সৃষ্টি কর, তাদের কাছ থেকে দূরে আসার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জন কর এবং তাদেরকে নারাজ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ কর। লোকেরা আরজ করল ঃ ইয়া রুহাল্লাহ, তাহলে আমরা কার কাছে বসব? তিনি বললেন ঃ তাদের কাছে বস, যাদেরকে দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়, যাদের বক্তৃতা তোমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করে এবং যাদের আমল তোমাদেরকে আখেরাতের প্রতি আগ্রহান্বিত করে।

বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি ওহী প্রেরণ করলেন- হে এমরান তনয়, সাবধান থাক এবং নিজের জন্যে সহচর অন্বেষণ কর। যে বন্ধু আমার সন্তুষ্টিতে তোমাদের সাথে একমত হয় না, সে তোমার দুশমন। আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ (আঃ)-কে ওহী পাঠালেন- হে দাউদ, তুমি নির্জন প্রকোষ্ঠে একা থাক কেন? জওয়াব হল- ইলাহী, আমি তোমার খাতিরে সৃষ্টিকে মন্দ জ্ঞান করেছি। এরশাদ হল, হে দাউদ, হুশিয়ার হও এবং নিজের জন্যে বন্ধু অন্বেষণ কর। যে বন্ধু আমার আনন্দে তোমার সাথে একমত নয়, তার সাথে থেকো না। সে তোমার দুশমন। সে তোমার অন্তর কঠোর করে দেবে এবং তোমাকে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নেবে। হযরত দাউদ (আঃ)-এর জীবন

বৃত্তান্তে বর্ণিত আছে, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে আরজ করলেন ঃ ইলাহী, এর কি পদ্ধতি যে, সকল মানুষ আমাকে মহব্বতও করবে এবং আমার ও আপনার মধ্যবর্তী সম্পর্কও বজায় থাকবে? আদেশ হল– দাউদ, মানুষের সাথে তাদের চরিত্র অনুযায়ী ব্যবহার কর এবং আমার ও তোমার সম্পর্কের ব্যাপারে এহসান কর। এক রেওয়ায়েতে আছে– দুনিয়াদারদের সাথে তাদের চরিত্র অনুযায়ী এবং আখেরাতওয়ালাদের সাথে তাদের চরিত্র অনুযায়ী মেলামেশা কর। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে পছন্দনীয় সে ব্যক্তি, যে অধিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করে এবং যার সাথে অধিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করা হয়। আর অধিক ঘৃণিত সে ব্যক্তি, যে কানকথা বলে এবং ভাইয়ে ভাইয়ে বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। আরও বলা হয়েছে– আল্লাহ্ তা'আলার এক ফেরেশতার অর্ধেক দেহ আগুনের এবং অর্ধেক বরফের। সে বলে– ইলাহী, তুমি যেমন বরফ ও আগুনের মধ্যে সম্প্রীতি সৃষ্টি করেছ, তেমনি তোমার নেক বান্দাদের অন্তরে সম্প্রীতি সৃষ্টি কর। এক হাদীসে আছে– যখন কোন বান্দা আল্লাহর ওয়াস্তে নতুন বন্ধু সৃষ্টি করে, তখনই আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে তার জন্যে নতুন মর্তবা নির্ধারণ করেন।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, বন্ধু অবশ্যই বানাও। কারণ, বন্ধু দুনিয়াতেও উপকারে আসে এবং আখেরাতেও। দোযখীরা সেদিন বলবে–

فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ وَلَا صَدِيْقٍ حَمِيْمٍ অর্থাৎ, আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই এবং কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু নেই।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহর কসম, যদি আমি অবিরাম রোযা রাখি, সারারাত বিনিদ্র এবাদত করি এবং নিজের উৎকৃষ্ট মাল দৌলত আল্লাহর পথে দিয়ে দেই, তবুও মৃত্যুর সময় আমার অন্তরে আল্লাহর অনুগতদের মহব্বত এবং তাঁর নাফরমানদের প্রতি ঘৃণা না থাকলে এসব এবাদত আমার কোন উপকারে আসবে না। ইবনে সাম্মাক (রহঃ) জীবন সায়াহ্নে আরজ করলেন ঃ ইলাহী, আপনি জানেন, আমি আপনার নাফরমানী করলেও আপনার অনুগত বান্দাদেরকে মহব্বত করতাম। ইলাহী, আমার এ অভ্যাসকে আমার জন্যে আপনার নৈকট্যের কারণ করুন। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) এই বিষয়বস্তুর বিপরীতে বলেন ঃ হে আদম সন্তান! মানুষ যাকে মহব্বত করবে, তার সাথে

থাকবে– এই উক্তি দ্বারা প্রতারিত হয়ো না। কেননা, তুমি সজ্জনদের মর্তবা তাদের মত আমল না করে পাবে না। ইহুদী এবং খৃষ্টানরাও তো তাদের পয়গম্বরগণকে মহব্বত করে, অথচ তারা তাঁদের মর্তবায় নয়। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কিছু আমল অথবা সম্পূর্ণ আমল সজ্জনদের অনুরূপ না হলে কেবল মহব্বত উপকারী নয়। হযরত ফোযায়ল (রহঃ) তাঁর কোন এক ওয়াযে বলেন ঃ তুমি জান্নাতুল ফেরদৌসে থাকতে চাও এবং আল্লাহ তাআলার পড়শী হয়ে পয়গম্বর, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহগণের সাথে বাসস্থান কামনা কর, কিন্তু কোন্ মুখে? কোন্ কামনা তুমি ত্যাগ করেছ? কোন্ ক্রোধটি তুমি সংবরণ করেছ? কোন্ সম্পর্কচ্ছেদকারীর সাথে তুমি সম্পর্ক স্থাপন করেছ। কোন্ নিকট বন্ধুর কাছ থেকে তুমি আল্লাহর জন্য দূরে সরে পড়েছ? কোন দূরবর্তী ব্যক্তিকে তুমি আল্লাহর ওয়াস্তে নিকট বন্ধ করেছ? বর্ণিত আছে, আল্লাহ তাআলা নিকট হযরত মূসা (আঃ) আরজ করলেন ঃ ইলাহী, আমি তোমার জন্যে নামায পড়েছি, রোযা রেখেছি, সদকা দিয়েছি এবং যাকাত দিয়েছি। বলা হল ঃ নামায তোমার জন্যে দলীল, রোযা তোমার ঢাল, সদকা ছায়া এবং যাকাত নূর। আমার জন্যে কি করেছ? হযরত মূসা (আঃ) আরজ করলেন ঃ ইলাহী, বলে দাও তোমার জন্যে আমল কোন্‌টি? এরশাদ হল ঃ তুমি কখনও আমার জন্যে কোন বন্ধুকে বন্ধু এবং শত্রুকে শত্রু বানিয়েছ কি? তখন মূসা (আঃ) জানতে পারলেন, আল্লাহর জন্যে কারও শত্রু হওয়া এবং আল্লাহর খাতিরে কারও বন্ধু হওয়া উৎকৃষ্ট আমল। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি রোকন এবং মকামে ইবরাহীমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সত্তর বছর এবাদত করে, তবুও আল্লাহ তা'আলা তার হাশর সেই ব্যক্তির সাথে করবেন যাকে সে মহব্বত করবে। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ ফাসেকের সাথে আল্লাহর ওয়াস্তে শত্রুতা রাখা আল্লাহর নৈকট্য লাভের কারণ। এক ব্যক্তি মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসে'কে বলল ঃ আমি আপনাকে আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বত করি? তিনি বললেন ঃ যার খাতিরে তুমি আমাকে মহব্বত কর, তিনি তোমাকে মহব্বত করুন। এর পর তিনি মুখ ফিরিয়ে বললেন ঃ ইলাহী, আমি তোমার কাছে এ বিষয় থেকে আশ্রয় চাই যে, লোকে আমাকে তোমার খাতিরে মহব্বত করবে, আর তুমি আমাকে শত্রু মনে করবে। এক ব্যক্তি দাউদ তায়ীর কাছে গেলে তিনি বললেন ঃ তোমার উদ্দেশ্য কি? সে বলল

ঃ কেবল আপনার সাক্ষাৎ। তিনি বললেন ঃ তুমি সাক্ষাৎ করে ভাল কাজই করেছ, কিন্তু আমি আমার নিজের অবস্থা চিন্তা করি। যদি আমাকে প্রশ্ন করা হয় যে, তুমি কে– দরবেশ, আবেদ না নেকবখত যে, মানুষ তোমার সাথে সাক্ষাৎ করে? তবে আমি কি বলব? আমি তো কিছুই নই। এর পর তিনি নিজেকে শাসিয়ে বললেন ঃ যৌবনে তুমি ফাসেক ছিলে। এখন বার্ধক্যে রিয়াকার হয়ে গেছ। হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বতকারীরা যখন পরস্পরে মিলিত হয়ে একে অপরকে দেখে আনন্দিত হয়, তখন তাদের গোনাহসমূহ ঝরে পড়ে, যেমন শীতকালে বৃক্ষের পাতা শুকিয়ে ঝরে পড়ে। হযরত ফোযায়ল বলেন ঃ আপন ভ্রাতার মুখমন্ডল ভালবাসা ও করুণার দৃষ্টিতে দেখা এবাদত।

আল্লাহর ওয়াস্তে বন্ধুত্ব এবং পার্থিব স্বার্থে বন্ধুত্ব ঃ জানা উচিত, সংসর্গ দু'প্রকার। একটি ঘটনাপ্রসূত; যেমন একে অপরের পড়শী হওয়ার কারণে সংসর্গ হওয়া অথবা পাঠশালায় সঙ্গে থাকার কারণে অথবা বাজারে একত্রিত হওয়ার কারণে কিংবা এক জায়গায় চাকুরী করার কারণে কিংবা সফরসঙ্গী হওয়ার কারণে সংসর্গ হওয়া। অপরটি, যে সংসর্গ ইচ্ছাকৃতভাবে সৃষ্টি করা হয়। এখানে দ্বিতীয় প্রকার সংসর্গ বর্ণনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য। কেননা, ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ব নিশ্চিতরূপেই এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। তাই ইচ্ছাকৃত কর্মেই সওয়াব ও উৎসাহ প্রদান করা হয়। সংসর্গের অর্থ কাছে বসা ও মেলামেশা করা। কাউকে প্রিয় মনে করলেই মানুষ তার কাছে বসে এবং তার সাথে মেলামেশা করে। অপ্রিয় ব্যক্তির কাছ থেকে দূরে সরে থাকাই মানুষের স্বভাব। মানুষের এই মহব্বত চার প্রকার হতে পারে। প্রথম প্রকার, একজন অপরজনকে কেবল তার সত্তার কারণে মহব্বত করা। এটা সম্ভব। কেননা, যখন একজন অপরজনকে দেখবে, চিনবে এবং তার চরিত্র প্রত্যক্ষ করবে, তখন সে তাকে ভাল বলে জানবে এবং অপার স্বাদ অনুভব করবে। ভাল মনে করা মজ্জাগত মিল ও একাত্মতার অনুগামী হয়ে থাকে। মাঝে মাঝে দেখা যায় দু'ব্যক্তির মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতি হয়ে যায়। অথচ এর কারণ না বাহ্যিক লাবণ্য হয়ে থাকে, না অভ্যাসের সৌন্দর্য হয়ে থাকে; বরং এর কারণ হয় অন্তর্গত মিল ও সাদৃশ্য। এই অন্তর্গত মিল ও সাদৃশ্য গোপন বিষয় এবং এর কারণসমূহও মানুষের অজানা। রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিম্নোক্ত হাদীসে এ রহস্যই বর্ণনা করেছেন–

الارواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف ـ

অর্থাৎ, আত্মাসমূহ সৈনিকের ন্যায় একত্রিত রয়েছে। তাদের মধ্যে যারা আদিকালে পরস্পর পরিচিত হয়, তারা দুনিয়াতে পরস্পর সম্প্রীতি স্থাপন করে। আর যারা অপরিচিত থেকে যায়, তারা একে অন্যের কাছ থেকে আলাদা থাকে।

এতে বলা হয়েছে, পরিচিত না হওয়া পৃথক থাকার এবং সম্প্রীতি মিলের পরিণতি। কোন কোন আলেম এ বিষয়টি এভাবে বর্ণনা করেছেন- আল্লাহ তা'আলা আত্মাসমূহকে সৃষ্টি করে সেগুলোকে দু'দলে বিভক্ত করেছেন এবং আরশের চারপাশে প্রদক্ষিণ করিয়েছেন। দু'দলের মধ্য থেকে যে দু' দু'জনের মধ্যে পরিচয় হয়ে গেছে, তারা দুনিয়াতেও সম্প্রীতি সহকারে বাস করে। এক হাদীসে আছে- দু'মুমিনের আত্মা এক মাসের দূরত্ব থেকে এসে মিলিত হয়; অথচ তারা পরস্পরকে কখনও দেখেনি। বর্ণিত আছে, মক্কা মোয়াযযমায় এক ভাঁড় মহিলা ছিল। মদীনায়ও অমনি আরেক মহিলা ছিল। মক্কার ভাঁড় মহিলা একবার মদীনায় গিয়ে ঘটনাচক্রে মদীনার ভাঁড় মহিলার গৃহে অতিথি হয়ে একদিন হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হল এবং তাঁকে খুব হাসাল। হযরত আয়েশা জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কার গৃহে মেহমান হয়েছ? সে বলল ঃ অমুক মহিলার গৃহে। হযরত আয়েশা বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলার রসূল সত্যই বলেছেন- الارواح جنود الخ

অভিজ্ঞতাও সাক্ষ্য দেয়, পারস্পরিক মিলের ফলেই সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। মন এবং আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক চরিত্রের মধ্যে মিল হওয়া বোধগম্য, কিন্তু যেসব কারণে এই মিল হয়, তা আবিষ্কার করা মানুষের সাধ্যের অতীত। জ্যোতির্বিদরা এ ব্যাপারে যেসব কথা বলে, তা প্রলাপোক্তি ছাড়া কিছু নয়। সুতরাং যে রহস্য মানুষের সামনে প্রকাশ করা হয়নি, তা নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন কি? কেননা, মানুষকে জ্ঞান অল্পই দান করা হয়েছে। অবশ্য এ বিষয়টি বুঝার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাই আমাদের জন্যে যথেষ্ট। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যদি কোন মুমিন এমন মজলিসে যায়, যেখানে একশ মোনাফেক এবং একজন মাত্র মুমিন রয়েছে, তবে সে মুমিনের কাছেই গিয়ে বসবে। পক্ষান্তরে যদি কোন

মোনাফেক এমন মজলিসে যায়, যেখানে একশ' জন মুমিন ও একজন মাত্র মোনাফেক রয়েছে, তবে সে সেই মোনাফেকের সাথেই গিয়ে বসবে। এতে বুঝা যায়, বস্তুর আকর্ষণ তার অনুরূপ বস্তুর প্রতি থাকে। হযরত মালেক ইবনে দীনার বলতেন ঃ দশ ব্যক্তির মধ্যে দু'জনের ঐকমত্য তখনই হবে, যখন একের মধ্যে অপরের কোন গুণ বিদ্যমান থাকবে। মানুষের আকার-আকৃতি পক্ষীকুলের জাত ও শ্রেণীর মত। উড়ার কাজে দুই জাতের পক্ষী কখনও একমত হয় না এবং মিল ছাড়া তাদের উড্ডয়ন এক সাথে হয় না। সেমতে প্রসিদ্ধ উক্তি আছে-

کبوتر باکبوتر باز باباز - کند همجنس با همجنس پرواز

অর্থাৎ, কবুতর কবুতরের সাথে, বাজপাখী বাজপাখীর সাথে এবং এক জাতের পক্ষী তার সমজাতীয় পক্ষীর সাথে উড়ে।

হযরত মালেক ইবনে দীনার (রঃ) একদিন কাককে কবুতরের সাথে উড়তে দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেন, যে, এরা কিরূপে সঙ্গী হল। এরা তো এক জাতের নয়। এর পর গভীরভাবে লক্ষ্য করে দেখলেন, এরা উভয়েই খোঁড়া। কাজেই এরা একমত হয়ে গেছে। তাই জনৈক দার্শনিক বলেন, প্রত্যেক মানুষ তার সমআকৃতির মানুষের সাথে সখ্যতা স্থাপন করে,। যেমন পাখীরা তাদের সমজাতের সাথে আকাশে উড়ে। দুব্যক্তি কয়েকদিন একত্রিত থাকলে তারা যদি সমআকৃতিবিশিষ্ট না হয়, তবে অবশ্যই পৃথক হয়ে যাবে।

মোট কথা, মানুষের পারস্পরিক মহব্বত কখনও তার সত্তার কারণে হয়- বর্তমান অথবা ভবিষ্যতের কোন ফায়দার কারণে নয়। বরং অন্তর্গত মজ্জা ও গোপন চরিত্রই মানুষকে এই মহব্বতে উদ্বুদ্ধ করে। রূপলাবণ্যের মহব্বতও এর অন্তর্ভুক্ত। যদি তাতে কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা উদ্দেশ্য না হয়। কেননা, কাম-প্রবৃত্তি ছাড়াও সুন্দর মুখাকৃতি স্বতন্ত্রভাবে আনন্দদায়ক হয়ে থাকে। ফলমূল, কলি, পুষ্প, লাল রঙ মিশ্রিত সেব, প্রবাহমান পানি এবং সবুজের মেলা দৃষ্টিকে প্রচুর আনন্দ দান করে। অথচ এগুলোর সত্তা ছাড়া অন্য কোন কুবাসনা মাঝখানে থাকে না। এই মহব্বত মজ্জাগত, খাহেশপ্রসূত এবং খোদাদ্রোহীদেরও হয় বিধায় আল্লাহর জন্য মহব্বত এর অন্তর্ভুক্ত নয়, কিন্তু এই মহব্বতের মধ্যে কোন কুউদ্দেশ্য ঢুকে পড়লে তা মন্দ হয়ে যাবে। উদাহরণতঃ হালাল নয় এমন সুন্দরী মহিলাকে কামপ্রবৃত্তি

চরিতার্থ করার উদ্দেশে মহব্বত করা। আর যদি কোন উদ্দেশ্য না ঢুকে তবে এই মহব্বত বৈধ- প্রশংসনীয়ও নয়, নিন্দনীয়ও নয়। বলাবাহুল্য, মহব্বত তিন প্রকার– প্রশংসনীয়, নিন্দনীয় ও বৈধ।

দ্বিতীয় প্রকার মহব্বত হল, কোন উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্যে একজন অপরজনকে মহব্বত করা। এই মহব্বত উদ্দেশ্যের মাধ্যম হয়ে থাকে। বলাবাহুল্য, প্রিয় বস্তুর মাধ্যমও প্রিয় হয়ে থাকে। যে ব্যক্তিকে অন্য বস্তুর খাতিরে মহব্বত করা হয়, প্রকৃতপক্ষে শুধু সে প্রিয় নয়, বরং অন্য বস্তুটিও প্রিয় হয়ে থাকে। তবে ব্যক্তিটি প্রিয় বস্তুর উপায় বিধায় সেও প্রিয়। এ কারণেই মানুষ টাকা-পয়সাকে প্রিয় মনে করে। অথচ টাকা-পয়সার সত্তার সাথে মানুষের উদ্দেশ্য জড়িত নয়। কেননা, টাকা-পয়সা খাওয়াও যায় না, পরাও যায় না, কিন্তু এটা অন্য প্রিয় বস্তু লাভ করার উপায়। অনেক মানুষের অবস্থাও তাই। অন্যরা তাদেরকে টাকা পয়সার ন্যায় মহব্বত করে। কারণ, তারা উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় হয়ে থাকে। অর্থাৎ, তাদের মাধ্যমে যশ, অর্থ অথবা জ্ঞান অর্জিত হয়। উদাহরণতঃ মানুষ শাসককে এ কারণেই মহব্বত করে যে, তার অর্থ অথবা যশ দ্বারা উপকার হয়। অতএব যে উদ্দেশ্যের জন্যে কোন প্রিয় ব্যক্তিকে মাধ্যম করা হয় তা যদি কেবল পার্থিব হয়, তবে এই মাধ্যমের মহব্বত আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বত হবে না। যদি উদ্দেশ্য পার্থিব হওয়ার মধ্যেই সীমিত না হয়, কিন্তু যে মহব্বত করে, তার উদ্দেশ্য যদি কেবলই পার্থিব উপকার হয়, তবে তাও আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বত হবে না। যেমন, শাগরেদ ওস্তাদকে এলেম হাসিলের জন্যে মহব্বত করে। এখানে এলেমের উপকারিতা যদিও কেবল পার্থিব হওয়ার মধ্যেই সীমিত নয়; কিন্তু শাগরেদের উদ্দেশ্য যদি তা দ্বারা কেবল দুনিয়া অর্জন ও জনপ্রিয়তা লাভই হয়, তবে তার মহব্বত আল্লাহর ওয়াস্তে গণ্য হবে না। অবশ্য যদি আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশে এলেম হাসিল করে, তবে ওস্তাদের মহব্বত আল্লাহর ওয়াস্তে হবে।

এই মহব্বত দু'প্রকার। একটি নিন্দনীয় ও অপরটি বৈধ। যদি এলেমকে নিন্দনীয় উদ্দেশ্য হাসিলের উপায় করার নিয়ত থাকে, তবে মহব্বতও নিন্দনীয় হবে। আর বৈধ উদ্দেশ্য নিয়ত থাকলে মহব্বতও বৈধ হবে।

তৃতীয় প্রকার মহব্বত হল, একজন অপরজনকে আখেরাতের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে মহব্বত করা। এই মহব্বত আল্লাহর ওয়াস্তে গণ্য হবে। উদাহরণত কোন ব্যক্তি নিজের ওস্তাদ কিংবা পীরকে এ কারণে মহব্বত করে যে, তার মাধ্যমে এলেম ও আমল দুরস্ত হবে এবং এই এলেম ও আমল দ্বারা আখেরাতের কল্যাণ সাধিত হবে। অনুরূপভাবে যে ওস্তাদ তার শাগরেদকে একই কারণে, মহব্বত করে, তার মহব্বতও আল্লাহর ওয়াস্তে গণ্য হবে। এমনিভাবে যে ব্যক্তি তার ধন-সম্পদ খয়রাত করে এবং মেহমান সমবেত করে, তাদের জন্যে উৎকৃষ্ট ও সুস্বাদু খাদ্য আল্লাহর নৈকট্য লাভের নিয়তে রান্না করায়, সে যদি কোন পারদর্শী বাবুর্চিকে মহব্বত করে, তবে এই মহব্বতও আল্লাহর জন্যে হবে। আমরা আরও অগ্রসর হয়ে বলি, যে ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির যাবতীয় পার্থিব প্রয়োজনাদির দায়িত্ব গ্রহণ করে, অর্থাৎ খাদ্য পোশাক, বাসস্থান ইত্যাদি সকল প্রয়োজন নিজের কাছ থেকে সরবরাহ করে, যাতে সেই ব্যক্তি এলেম ও আমলের জন্যে নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ পায় এবং সে ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তিকে এ কারণে মহব্বত করে, তবে সেও আল্লাহর জন্যে মহব্বতকারী হবে। সেমতে পূর্ববর্তীদের মধ্যে কিছু সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন, যাদের পার্থিব প্রয়োজনাদির দায়িত্ব কতক ধনী ব্যক্তি গ্রহণ করেছিল। ফলে তারা উভয়ই আল্লাহর জন্যে মহব্বতকারী ছিলেন। আমরা আরও বলি, যে ব্যক্তি শয়তানী কুমন্ত্রণা থেকে আত্মরক্ষা এবং নিজের দ্বীনদারী বাঁচিয়ে রাখার জন্যে কোন সতী নারীকে বিবাহ করে এবং স্ত্রীকে ধর্মীয় উদ্দেশ্য হাসিলের উপায় হিসাবে মহব্বত করে, তার মহব্বতও আল্লাহর জন্যে হবে। এ কারণেই পরিবার-পরিজনের জন্যে ব্যয় করার অনেক সওয়াব হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এমনকি, খাদ্যের লোকমা স্ত্রীর মুখে তুলে দিলেও সওয়াব পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে আমরা বলি, যদি কোন ব্যক্তির মধ্যে আল্লাহর নৈকট্য ও দুনিয়া অর্জন উভয় বিষয়ের উপায় একত্রিত থাকে এবং অন্য এক ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহ তাআলা ও দুনিয়ার মহব্বত একত্রিত থাকে, তারা উভয় বিষয়ের সুবিধার জন্যে একে অপরকে মহব্বত করে, তবে তারাও আল্লাহ জন্যে মহব্বতকারী গণ্য হবে। কেননা, আল্লাহর মহব্বত হওয়ার জন্যে এটা শর্ত নয় যে, দুনিয়ার মহব্বত সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থাকবে। এর প্রমাণ, পয়গম্বরগণকে যে দোয়া করতে আদেশ করা হয়েছে, তাতে দুনিয়া ও

আখেরাত উভয়টি একত্রিত করা হয়েছে। সেমতে এক দোয়া এই ঃ

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً ۔

অর্থাৎ, পরওয়ারদেগার, আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দাও এবং আখেরাতে কল্যাণ দাও।

হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর দোয়ায় বলেন ঃ ইলাহী, আমার বিরুদ্ধে আমার শত্রুকে হাসিও না। আমার কারণে আমার বন্ধুর ক্ষতি করো না, আমার ধর্ম কাজে বিপদ দিয়ো না এবং দুনিয়াকে আমার সর্ববৃহৎ লক্ষ্য করো না। এ দোয়ায় শত্রুর হাসি দূর করা পার্থিব উপকার। তিনি একথা বলেননি যে, দুনিয়াকে কখনও আমার লক্ষ্য করো না; বরং দোয়ায় বলেছেন, দুনিয়াকে আমার সর্ববৃহৎ লক্ষ্য করো না। আমাদের পয়গম্বর মুহাম্মদ (সাঃ) এক দোয়ায় বলেছেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ رَحْمَةً اَنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۔

অর্থাৎ, ইলাহী, আমি তোমার কাছে সেই রহমত প্রার্থনা করছি, যদ্দ্বারা তোমার মাহাত্ম্যের গৌরব দুনিয়া ও আখেরাতে অর্জন করি। তিনি আরও বলেছেন–

اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ مِنْ بَلَاءِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْاٰخِرَةِ ۔

অর্থাৎ, ইলাহী আমাকে দুনিয়া আখেরাতের বিপদ ও আযাব থেকে নিরাপত্তা দান কর। মোট কথা, পার্থিব আনন্দ দু'প্রকার। এক, যা আখেরাতের আনন্দের পরিপন্থী এবং তাতে বাধা সৃষ্টিকারী। এ ধরনের আনন্দ থেকে পয়গম্বরগণ নিজেরা বিরত রয়েছেন এবং অপরকে বিরত থাকতে বলেছেন। দ্বিতীয়, যা আখেরাতের আনন্দের অন্তরায় নয়। এসব আনন্দ থেকে পয়গম্বরগণ কখনও হাত গুটিয়ে নেননি; যেমন বিবাহ করা এবং হালাল খাওয়া ইত্যাদি।

চতুর্থ প্রকার মহব্বত হল, একজন অন্যজনকে নিছক আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বত করা। অর্থাৎ, এতে এলেম ও আমল সংক্রান্ত কোন উদ্দেশ্য হাসিল করা লক্ষ্য হবে না এবং আল্লাহর সত্তা ব্যতীত অন্য কিছু উদ্দেশ্য হবে না। মহব্বতের এই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকারটি সর্বাধিক সূক্ষ্ম ও গোপন হলেও এর অস্তিত্ব সম্ভব। কেননা, প্রবল হল, মহব্বতের প্রভাব

হল, প্রিয়জনকে অতিক্রম করে তার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি ও বস্তু পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া। উদাহরণতঃ কারও প্রতি কারও মহব্বত বেশী হয়ে গেলে সে প্রিয়জনের প্রিয়জন, খাদেম এবং প্রশংসাকরীকেও মহব্বত করে থাকে। বাকিয়্যা ইবনে ওলীদ বলেন ঃ যখন ঈমানদার অন্য ঈমানদারকে মহব্বত করে, তখন তার কুকুরকেও মহব্বত করে। তার এই উক্তি বাস্তবেও সঠিক। বিখ্যাত আশেকদের অবস্থা এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয় এবং কবিদের কবিতা থেকেও একথা বুঝা যায়। এ কারণেই প্রিয়জনের পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ রেখে দেয়া হয় এবং গৃহ, মহল্লা ও পড়শীদেরকে মহব্বত করা হয়।

মোট কথা, চাক্ষুষ অভিজ্ঞতায় জানা জায়, মহব্বত প্রিয়জনের সত্তা অতিক্রম করে প্রিয়জনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তবে এটা প্রবল মহব্বতের বৈশিষ্ট্য। এমনিভাবে যখন আল্লাহ্ তাআলার মহব্বত প্রবল হয়ে অন্তরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে তখন আল্লাহ্ ছাড়া যত বস্তু রয়েছে, সবগুলোর প্রতিই তা সম্প্রসারিত হয়ে যায়। কারণ, আল্লাহ্ ছাড়া যত কিছু রয়েছে, সবগুলো তাঁর কুদরতের পরিচায়ক। এ কারণেই রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর কাছে কেউ নতুন ফল আনলে তিনি তা চোখে লাগাতেন এবং তাযীম করে বলতেন- আমার পরওয়ারদেগার এই মাত্র একে অস্তিত্ব দান করেছেন। (অর্থাৎ, কোন পাপী হাত পা একে দলিত করেনি এবং মাটিতে পড়ে থাকেনি; বরং এই মাত্র আদেশ পেয়ে অদৃশ্য জগত থেকে অস্তিত্বের জগতে নতুন আগমন করেছে।) সারকথা, আল্লাহর মহব্বত প্রবল হয়ে যখন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিতে ছড়িয়ে পড়ে, তখন যে বস্তু সত্তাগতভাবে অপছন্দনীয়, তাও পছন্দনীয় মনে হতে থাকে। সে বস্তু বেদনাদায়ক হলেও মহব্বতের আতিশয্যে ব্যথা অনুভূত হয় না; বরং এটা আমার প্রিয়জনের- এই আনন্দের নীচে ব্যথা চাপা পড়ে যায়। এ কারণেই আল্লাহর প্রেমে কোন কোন প্রেমিকের অবস্থা এই দাঁড়ায় যে, তারা বলে, আমরা মসিবত ও নেয়ামতের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না। কেননা, উভয়টিই আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে আসে।

انچه از دوست میرسد نیکوست বন্ধুর কাছ থেকে যা আসে তা ভালই। কেউ কেউ বলেন ঃ আল্লাহর নাফরমানী করে যদি ক্ষমাও পাওয়া যায়, তবু আমি নাফরমানী করতে চাই না। সমনূন (রহঃ)

এ বিষয়টি একটি কবিতায় নিম্নোক্তরূপে ব্যক্ত করেছেন–

হে আল্লাহ! তোমাকে ছাড়া আমার স্বস্তি নেই। তুমি যেমন ইচ্ছা তা পরীক্ষা করে নাও।

আল্লাহর জন্যে শত্রুতার স্বরূপ ঃ প্রকাশ থাকে যে, যাদের ক্ষেত্রে আল্লাহর জন্যে মহব্বত করা ওয়াজিব, তাদের ক্ষেত্রেই আল্লাহর জন্যে শত্রুতা পোষণ করা জরুরী। উদাহরণতঃ তুমি এক ব্যক্তিকে এ কারণে মহব্বত কর যে, সে আল্লাহ তা'আলার অনুগত ও প্রিয় বান্দা। এখন যদি সে আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী করে, তবে তার সাথে শত্রুতা রাখা তোমার জন্যে অপরিহার্য হবে। কেননা, সে আল্লাহর নাফরমান ও তাঁর ক্রোধের পাত্র হয়েছে। মোট কথা, যে কারণে মহব্বত হয়, তার বিপরীত কারণ পাওয়া গেলে শত্রুতা হবেই। এদিক দিয়ে মহব্বত ও শত্রুতা একটি অপরটির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এদের প্রত্যেকটি অন্তরে বদ্ধমূল থাকে এবং প্রবল হওয়ার সময় প্রকাশ পায়। যা প্রকাশ পায়, তদনুযায়ী ক্রিয়াকর্ম ফুটে উঠে। অর্থাৎ, মহব্বত থেকে নৈকট্য ও একাত্মতা প্রকাশ পায় এবং শত্রুতা থেকে দূরত্ব ও বিরোধিতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। কাজে প্রকাশ পাওয়ার পর প্রথমটিকে পরিভাষায় মোআলাত এবং দ্বিতীয়টিকে মোআদাত বলা হয়। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)-কে বলেছে– তুমি আমার ব্যাপারে কারও সাথে মোআলাত অথবা মোআদাত করেছ কি?

কোন ব্যক্তির মধ্যে এককভাবে মোআলাত কিংবা মোআদাত পাওয়া গেলে সেখানে ব্যাপার সহজ। অর্থাৎ, কারও মধ্যে কেবল আল্লাহর আনুগত্য আছে বলে জানলে তাকে তুমি মহব্বত করতে পার কিংবা কেবল পাপাচার আছে বলে জানলে তার সাথে শত্রুতা রাখতে পার, কিন্তু সমস্যা তখন দেখা দেয়, যখন কারও মধ্যে পাপ ও পুণ্য উভয়টি পাওয়া যায়। তখন তুমি বলতে পার, এর একটি অপরটির বিপরীত বিধায় মহব্বত ও শত্রুতা একত্রিত করব কিরূপে? এর জওয়াব, আল্লাহ তাআলার জন্যে এই উভয় বিষয়ের মধ্যে বৈপরীত্য নেই, যেমন মানুষের ক্ষেত্রে নেই। কেননা, এক ব্যক্তির মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য সমন্বিত হতে পারে, যার কিছু পছন্দনীয় ও কিছু অপছন্দনীয়। কাজেই তুমি সেই ব্যক্তিকে কোন কারণে মহব্বত করবে এবং কোন কারণে শত্রুতা করবে। উদাহরণতঃ কোন ব্যক্তির স্ত্রী অত্যন্ত সুন্দরী কিন্তু বজ্জাত। এমতাবস্থায়

সে তাকে এক কারণে মহব্বত করবে এবং এক কারণে ঘৃণা করবে। প্রশ্ন হয়, প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে ইসলাম আনুগত্যের মাপকাঠি। অতএব ইসলাম সত্ত্বেও মুসলমানের সাথে শত্রুতা রাখা যাবে কিরূপে? এর জওয়াব, ইসলামের কারণে মুসলমানকে মহব্বত করবে এবং গোনাহের কারণে তার সাথে শত্রুতা করবে। কাফের ও পাপাচারীর সাথে শত্রুতায় যেমন একটু পার্থক্য হবে, তেমনি ইসলামের কারণে মহব্বত ও গোনাহের কারণে শত্রুতার মধ্যে একটু পার্থক্য করলেই চলবে এবং এতটুকু মহব্বত দ্বারাই তার প্রাপ্য আদায় হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে আনুগত্য ও ক্রটিকে নিজের ব্যাপারে আনুগত্য ও ক্রটির অনুরূপ মনে কর। উদাহরণতঃ যে ব্যক্তি কোন উদ্দেশে তোমার সাথে একমত হয় এবং অন্য উদ্দেশে বিরোধিতা করে, তার সাথে এমন মধ্যবর্তী অবস্থা অবলম্বন কর যে, তার প্রতি সন্তুষ্টও হবে না এবং অসন্তুষ্টও হবে না। আল্লাহ তাআলার ব্যাপারেও তোমার এরূপ অবস্থা হওয়া উচিত। এখন প্রশ্ন হল, শত্রুতা কিভাবে প্রকাশ করা যাবে? জওয়াব, কথায় ও কাজে শত্রুতা প্রকাশিত হতে পারে। কথায় এভাবে যে, কখনও তার কর্মে সাহায্য করবে না এবং কখনও তার কর্ম নষ্ট করার চেষ্টা করবে, কিন্তু শত্রুতা অপরাধ অনুযায়ী হতে হবে । কেউ যদি ভুল করে নিজেও অনুতপ্ত হয় এবং পরবর্তীতে না করে, তবে ক্ষমা করে দেয়াই উত্তম। যদি কেউ একটির পর একটি সগীরা অথবা কবীরা গোনাহ করতে থাকে, তবে তোমার মধ্যে ও তার মধ্যে পূর্বে গাঢ় বন্ধুত্ব না থাকলে এভাবে শত্রুতার চিহ্ন প্রকাশ করা জরুরী যে, তুমি তার কাছ থেকে পৃথক হয়ে যাবে এবং তার প্রতি কম মনোযোগ দেবে অথবা গাল মন্দ করবে। এটা পৃথক হয়ে যাওয়ার তুলনায় কঠিন। সুতরাং সগীরা গোনাহে আলাদা হয়ে যাবে এবং কবীরা গোনাহে গালিগালাজ করবে।

অনুরূপভাবে কাজের মাধ্যমে শত্রুতা প্রকাশ করারও দুটি স্তর রয়েছে। নিম্নস্তর হচ্ছে সাহায্য ও আনুকূল্য বর্জন করা এবং উচ্চস্তর হচ্ছে তার কাজ নষ্ট করে দেয়া এবং তার কোন উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে না দেয়া। যেমন, শত্রুরা একে অপরের উদ্দেশ্য সাধনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু সেসব উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে হওয়া উচিত, যদ্দ্বারা গোনাহের পথ রুদ্ধ হয়ে যায় এবং সে গোনাহ করতে সক্ষম না হয়। পক্ষান্তরে গোনাহ বর্জনে যেসকল উদ্দেশ্যের কোন প্রভাব নেই, সেসব উদ্দেশ্য সাধনে বাধা দেয়া উচিত

নয়। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি মদ্যপান করে আল্লাহর নাফরমানী করেছে। এখন সে একজন মহিলাকে বিবাহ করতে চায়। বলাবাহুল্য, বিবাহ না মদ্যপানে বাধা দেয় না উৎসাহ প্রদান করে। কাজেই তুমি সক্ষম হলে তাকে সাহায্য করে বিবাহ করিয়ে দাও। আর ইচ্ছা করলে বাধা দিয়ে বিবাহ ভণ্ডুল করে দাও। এমতাবস্থায় বাধা দেয়া তোমার জন্যে জরুরী নয়। হাঁ, ক্রোধ প্রকাশ করার জন্যে সাহায্য না করলে দোষ নেই। সে যদি তোমার কোন আত্মীয়ের সাথে বিশেষ অপরাধ করে থাকে, তবে তার উদ্দেশ্য সাধনে সাহায্য করা খুব ভাল। এ সম্পর্কেই নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়েছে—

وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُّؤْتُوا أُولِى الْقُرْبٰى وَالْمَسَاكِيْنَ وَالْمُهَاجِرِيْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا أَلَا تُحِبُّوْنَ أَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ ـ

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে গুণী ও ধনী ব্যক্তিরা যেন আত্মীয়, মিসকীন ও মোহাজেরদের দান না করার জন্যে কসম না খায়। তারা যেন ক্ষমা ও মার্জনা করে। তোমরা কি চাও না আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা ও মার্জনা করুন?

এই আয়াতের শানে নুযুল হল, মেসতাহ্ ইবনে আছাছা হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে অপবাদ রটনায় যোগদান করেছিল। হযরত আবু বকর (রাঃ) পূর্বে তাকে অর্থ সাহায্য দিতেন। এ ঘটনার পর তিনি তাকে কিছু দেবেন না বলে কসম খেলেন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। এখানে মেসতাহের অপরাধ নিঃসন্দেহে গুরুতর ছিল। সে হযরত আবু বকরের বিরুদ্ধে অন্যায় করেছিল, কিন্তু সিদ্দীকগণের নীতি হল, কেউ তাদের উপর জুলুম করলে ক্ষমা করে দেয়া। তাই আয়াতে এ শিক্ষাই ব্যক্ত করা হয়েছে। এর পর হযরত আবু বকর মেসতাহের অর্থ সাহায্য পুনরায় চালু করে দেন।

যে নিজের উপর জুলুম করে তার প্রতি অনুগ্রহ করাই উত্তম, কিন্তু যে অপরের উপর জুলুম করে এবং আল্লাহ তাআলার নাফরমানী করে, তার প্রতি অনুগ্রহ করা মজলুমের প্রতি অন্যায় করারই নামান্তর। অথচ মজলুমের হকের প্রতি খেয়াল রাখা এবং জালেম থেকে মুখ ফিরিয়ে মজলুমের মনকে শক্ত করা আল্লাহ্ তাআলা পছন্দ করেন, কিন্তু যদি তুমি

নিজেই মজলুম হও, তবে ক্ষমা করে দেয়াই তোমার জন্যে উত্তম। গোনাহগারদের সাথে শত্রুতা প্রকাশ করার ব্যাপারে সকলেই একমত যে, জালেম, বেদআতী এবং আল্লাহ তাআলার সেসব নাফরমানীতে লিপ্ত ব্যক্তিদের সাথে শত্রুতা প্রকাশ করা উচিত, যদ্দ্বারা অপরের ক্ষতি হয়। আর যারা নিজের বিরুদ্ধে গোনাহ করে, তাদের ব্যাপারেও পূর্ববর্তীদের পদ্ধতি ছিল ভিন্ন ভিন্ন। কেউ এমন গোনাহগারদের প্রতি অনুগ্রহের দৃষ্টি দিয়েছেন এবং কেউ অতি মাত্রায় অপছন্দ করে তাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ ত্যাগ করেছেন। সেমতে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল সামান্য বিষয়ে বুযুর্গদের সাথে মেলামেশা বর্জন করতেন। একবার ইয়াহইয়া ইবনে মায়ীন বলেছিলেন– কিছু চাই না। তবে বাদশাহ কিছু পাঠিয়ে দিলে তা কবুল করে নেব। এ কথার কারণে ইমাম আহমদ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ বর্জন করেন। অনুরূপভাবে তিনি হারেস মুহাসেবী (রহঃ)-এর সাথেও সাক্ষাৎ বর্জন করেন এ কারণে যে, তিনি মুতাযেলা সম্প্রদায়ের খণ্ডনে একটি পুস্তিকা রচনা করেছিলেন। ইমাম আহমদ বললেন ঃ এ পুস্তিকায় তুমি প্রথমে মুতাযেলীদের আপত্তি উদ্ধৃত করেছ, এর পর জওয়াব দিয়েছ। ফলে তুমি নিজেই মানুষকে সন্দেহে পতিত করেছ। প্রশ্ন হয়, শত্রুতা প্রকাশের নিম্নস্তর হচ্ছে সাক্ষাৎ বর্জন করা, মুখ ফিরিয়ে নেয়া এবং সঙ্গ সাহায্য বন্ধ করে দেয়া। এসব বিষয় কি ওয়াজিব? মানুষ কি এগুলো না করলে গোনাহগার হবে? জওয়াব হচ্ছে, বাহ্যিক জ্ঞান অনুযায়ী এসব বিষয় করতে মানুষ বাধ্য নয় এবং এগুলো ওয়াজিব হওয়ারও বিধান পাওয়া যায় না। কেননা, আমরা নিশ্চিতরূপে জানি যে, যারা রসূলে করীম (সাঃ)-এর যমানায় মদ্যপান করেছে এবং কুকর্ম করেছে, তারা তাঁর সাক্ষাৎ থেকে সম্পূর্ণ বাদ পড়েনি; বরং কেউ কেউ তাদের গালমন্দ করত, শত্রুতা প্রকাশ করত, মুখ ফিরিয়ে নিত, কিন্তু কোনরূপ বাধা সৃষ্টি করত না। আবার কেউ কেউ তাদেরকে করুণার দৃষ্টিতেও দেখত এবং তাদের কাছ থেকে দূরে থাকা পছন্দ করত না।

আল্লাহর জন্যে শত্রুতার স্তর ঃ প্রশ্ন হয়, কর্মের মাধ্যমে শত্রুতা প্রকাশ করা ওয়াজিব না হলেও এটা যে মোস্তাহাব, তাতে তো কোন সন্দেহ নেই। অবাধ্য ও ফাসেকদের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। অতএব তাদের সাথে ব্যবহারে পার্থক্য কিরূপে করতে হবে? সকলের সাথে একই রকম ব্যবহার করা উচিত কিনা? এর জওয়াব হচ্ছে, খোদাদ্রোহীরা সাধারণতঃ

তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। (১) কাফের, (২) সেই বেদআতী, যে তার বেদআতের প্রতি অন্যকে আহ্বান করে এবং (৩) যে কাজেকর্মে গোনাহ করে, কিন্তু সঠিক আকীদা রাখে। এখন প্রত্যেক শ্রেণীর সাথে ব্যবহারের স্তর আলাদা বর্ণনা করা হচ্ছে।

প্রথমে কাফেরের বিধান শুন। কাফের যুদ্ধাবস্থায় থাকলে সে হত্যা ও গোলাম করার যোগ্য। আর যিম্মী হলে তাকে নির্যাতন করা বৈধ নয়। তবে মুখ ফিরিয়ে রাখতে হবে, তার পথেঘাটে নত হয়ে চলতে হবে। তুমি প্রথমে তাকে সালাম বলবে না। সে "আসসালামু আলাইকা" বললে তুমি জওয়াবে 'ওয়া আলাইক' বলবে। তার সাথে কথাবার্তা বলা, লেনদেন করা এবং সঙ্গে খাওয়া জায়েয, কিন্তু এগুলো না করা উত্তম, কিন্তু বন্ধুদের সাথে যেরূপ খেলাখুলি মেলামেশা করা হয়, তা যিম্মীর সাথে করা কঠোর মাকরূহ। আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ

لَاتَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْا اٰبَاءَهُمْ اَوْ اَبْنَاءَهُمْ ـ

অর্থাৎ, আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাসী সম্প্রদায়কে তুমি পাবে না যে, তারা সেই ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব করে, যে আল্লাহ ও রসূলের বিরোধিতা করে, যদিও সে তাদের পিতা অথবা পুত্র হয়। আল্লাহ আরও বলেন ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَتَّخِذُوْا عَدُوِّىْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَاءَ ـ

অর্থাৎ, মুমিনগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের অভিন্ন শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।

রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ মুসলমান ও মুশরিক এত দূরে যে, তাদের একজনের অগ্নি অন্যজনের দৃষ্টিগোচর হয় না।

দ্বিতীয়তঃ সে বেদআতী, যে তার বেদআতের প্রতি অন্যকে আহবান করে। তার বিধান হচ্ছে, যদি বেদআত কাফের করে দেয়ার মত হয় তবে তার ব্যাপারটি যিম্মীর চেয়ে গুরুতর। আর যদি এমন বেদআত হয়, যদ্দারা কাফের হয় না, তবে তার ব্যাপার তার মধ্যে ও আল্লাহ তাআলার মধ্যে কাফেরের তুলনায় হালকা, কিন্তু মুসলমানদের উচিত তাকে কাফেরের তুলনায় অধিক অপছন্দ করা। কেননা, কাফেরের অনিষ্ট মুসলমানদের দিকে সংক্রামক নয়। কেননা, মুসলমানরা তাকে কাফের

বলে বিশ্বাস করে। ফলে তার কথার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না এবং সে নিজেও মুসলমান হওয়ার দাবী করে না, কিন্তু বেদআতী একথাই বলে যে, সে যে বিষয়ের প্রতি আহ্বান করে সেটাই সত্য। সুতরাং তার অনিষ্ট অন্যের দিকে সংক্রমিত হয়। অতএব তার সাথে শত্রুতা রাখা, সাক্ষাৎ বর্জন করা, তাকে ঘৃণা করা, মন্দ বলা এবং মানুষকে তার কাছে আসতে না দেয়া চরম পর্যায়ের মোস্তাহাব। সে নির্জনে সালাম করলে জওয়াব দিতে দোষ নেই, কিন্তু যদি জানা যায়, সালামের জওয়াব না দিলে বেদআতের প্রতি তার মন বীতশ্রদ্ধ হবে; তার জওয়াব না দেয়া উত্তম। কেননা, সালামের জওয়াব দেয়া যদিও ওয়াজিব, কিন্তু সামান্য উপযোগিতার কারণেও তা ওয়াজিব থাকে না। উদাহরণতঃ কেউ প্রস্রাব পায়খানায় থাকলে সালামের জওয়াব দেয়া তার জন্যে ওয়াজিব নয়। বেদআতীকে শিক্ষা দেয়া একটি জরুরী উপযোগিতা। যদি বেদআতী জনসমাবেশে সালাম করে, তবে জওয়াব বর্জন করা উত্তম, যাতে জনসাধারণ তাকে ঘৃণা করে এবং তার বেদআতকে খারাপ মনে করে। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি বেদআতীকে ধমকায়, তার কথা ও কাজ অমান্য করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার অন্তরকে শান্তি ও ঈমান দ্বারা পূর্ণ করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি বেদআতকে অপমানিত করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে কেয়ামতের দিন নিরাপত্তা দেবেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি বেদআতীর সাথে নম্রতা করে, তার প্রতি সম্মান দেখায় অথবা প্রফুল্ল বদনে তার সাথে সাক্ষাৎ করে, সে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার অবতীর্ণ বিষয়কে তুচ্ছ মনে করে।

তৃতীয় পর্যায়, যে কাজকর্মে গোনাহ্ করে, কিন্তু সঠিক আকীদা পোষণা করে, এরূপ গোনাহ তিন প্রকার।

প্রথম প্রকার গোনাহ, যদ্দ্বারা মানুষের ক্ষতি হয়; যেমন জুলুম, ছিনতাই, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান, পরনিন্দা ইত্যাদি। যারা এ ধরনের গোনাহ করে, তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া উত্তম। কেননা, মানুষের জন্যে কষ্টদায়ক গোনাহ কঠোর হয়ে থাকে এবং এক গোনাহ্ অপর গোনাহ্ থেকেও কঠোর হয়ে থাকে। যেমন, খুনের জুলুম, অর্থের জুলুম ও ইযযতের জুলুম। এই গোনাহকারীদেরকে অপমান করা ও তাদের প্রতি বিমুখ হওয়া খুবই জরুরী।

দ্বিতীয় প্রকার সে গোনাহগার, যে গোলযোগ সৃষ্টি করে, মানুষকে গোলযোগে উৎসাহিত করে। এতে মানুষের কষ্ট না হলেও তাদের ধর্ম বিনষ্ট হয়। এটা প্রথম প্রকারের নিকটবর্তী এবং তা থেকে কিছু হালকা। এর বিধানও অপমান করা, মুখ ফিরিয়ে নেয়া, আলাদা থাকা এবং সালামের জওয়াব না দেয়া।

তৃতীয় প্রকার সেই গোনাহগার, যে মদ্যপান অথবা কোন ওয়াজিব বর্জন করে ফাসেক হয়ে যায়। এরূপ ব্যক্তির ব্যাপার হালকা, কিন্তু গোনাহ করা অবস্থায় তাকে দেখলে প্রয়োজনে মারপিট করে হলেও কার্যকর পন্থায় বাধা দিতে হবে। কেননা, কুকর্ম থেকে নিষেধ করা ওয়াজিব। যদি গোনাহে লিপ্ত অবস্থায় দেখা না যায় কিন্তু জানা থাকে যে, সে অমুক গোনাহে অভ্যস্ত, তবে উপদেশে কাজ হবে মনে করলে উপদেশ দেয়া ওয়াজিব। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে নম্রভাবে অথবা কঠোরভাবে উপদেশ দেবে। আর যদি জানা যায়, উপদেশে কাজ হবে না, তবে সালামের জওয়াব না দেয়া এবং মেলামেশা বর্জন করার ব্যাপারে আলেমগণের মতভেদ রয়েছে। বিশুদ্ধ মতে এটা নিয়তের উপর নির্ভরশীল। যে পাপাচারের গোনাহ বান্দা ও আল্লাহ তা'আলার মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে এবং তাতে কেবল গোনাহগারেরই ক্ষতি হয়, তা যে খুব হালকা ব্যাপার, তার দলীল এই হাদীস– জনৈক মদ্যপায়ীকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে কয়েকবার প্রহার করা হয়। এর পরও সে মদ্যপান থেকে বিরত হল না। ফলে আবারও ধৃত হয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে আনীত হল। জনৈক সাহাবী বললেন ঃ তার প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত। সে অত্যধিক মদ্যপান করে। রসূলে করীম (সাঃ) সাহাবীকে বললেন ঃ আপন ভ্রাতার বিরুদ্ধে শয়তানের সাহায্যকারী হয়ো না। এ থেকে বুঝা গেল, নম্রতা করা রুক্ষতা ও কঠোরতার তুলনায় উত্তম।

সংসর্গের গুণাবলী ঃ প্রকাশ থাকে যে, প্রত্যেক মানুষ সংসর্গের যোগ্যতা রাখে না। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ মানুষ তার বন্ধুর রীতিনীতি অনুসরণ করে। কাজেই তোমাদের কেউ কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে তাকে যাচাই করে নেবে। সুতরাং যার সংসর্গ অবলম্বন করা হবে, তার মধ্যে কিছু স্বতন্ত্র গুণাবলী থাকা অবশ্যই জরুরী। সংসর্গের মাধ্যমে যে সকল উপকারিতা কাম্য হয়ে থাকে, সেগুলোর দিক দিয়ে এসব গুণ সংসর্গের জন্যে শর্ত হওয়া উচিত। কেননা, উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে

পৌঁছার জন্যে যা জরুরী, তাকেই শর্ত বলা হয়। অতএব জানা গেল, উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখেই শর্তের বিকাশ ঘটে।

পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় প্রকার উপকারিতাই সংসর্গের মাধ্যমে কাম্য হয়ে থাকে। পার্থিব উপকারিতা হল অর্থ অথবা প্রভাব-প্রতিপত্তি দ্বারা উপকৃত হওয়া কিংবা শুধু সাক্ষাৎ ও সাহচর্য দ্বারা মনোরঞ্জন করা ইত্যাদি। এগুলো বর্ণনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। ধর্মীয় উপকারিতাসমূহের মধ্যেও অনেক উপকারিতার সমাহার হয়ে থাকে; যেমন এক, জ্ঞানগরিমা ও কর্মের দ্বারা উপকৃত হওয়া; দুই, এবাদতে উত্ত্যক্তকারী ও বাধাদানকারীদের জ্বালাতন থেকে নিরাপদ থাকার দিক দিয়ে প্রভাব-প্রতিপত্তির দ্বারা উপকৃত হওয়া; তিন, যাতে জীবিকার অন্বেষণে সময় নষ্ট না হয় সেজন্যে কারও টাকা পয়সা দ্বারা উপকার লাভ করা; চার, প্রয়োজন ও অভাব অনটনে সাহায্য নেয়া, পাঁচ, কেবল দোয়ার বরকত হাসিল করা। ছয়, আখেরাতে সুপারিশ আশা করা। পূর্ববর্তী জনৈক মনীষী বলেন ঃ অনেক বন্ধু তৈরী কর। কেননা, প্রত্যেক ঈমানদার বন্ধুই তোমার জন্যে সুপারিশ করবে। সুতরাং আশ্চর্য নয় যে, তুমি কোন বন্ধুর শাফায়াতে জান্নাতে দাখিল হয়ে যাবে। এক তফসীরে–

وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ -

আয়াতের অর্থ এই বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাআলার বন্ধুদের পক্ষে ঈমানদারদের শাফায়াত কবুল করে বন্ধুদেরকে তাদের সাথে জান্নাতে দাখিল করবেন। কথিত আছে, কোন বান্দার মাগফেরাত হয়ে গেলে সে তার বন্ধুদের জন্যে সুপারিশ করবে। এ কারণেই কিছুসংখ্যক পূর্ববর্তী মনীষী সংসর্গ, সম্প্রীতি ও মেলামেশা করতে উৎসাহ প্রদান করেছেন! তাদের মতে একাকিত্ব ও বিচ্ছিন্নতা মন্দ কাজ।

উপরোক্ত ধর্মীয় উপকারিতাসমূহের প্রত্যেকটিরই কিছু পূর্বশর্ত রয়েছে। যার অবর্তমানে এসব উপকারিতা অর্জিত হয় না। এসব শর্তের বিস্তারিত বর্ণনা সুদীর্ঘ। তবে সংক্ষেপে বলা যায়, যে ব্যক্তির সংসর্গ অবলম্বন করা হবে, তার মধ্যে পাঁচটি বিষয় থাকা বাঞ্ছনীয়। প্রথম, জ্ঞানবুদ্ধি, দ্বিতীয়, সচ্চরিত্রতা, তৃতীয়, পাপাচারী না হওয়া, চতুর্থ, বেদআতী না হওয়া এবং পঞ্চম, সংসারলোভী না হওয়া।

জ্ঞানবুদ্ধির প্রয়োজন এজন্য যে, এটাই আসল পুঁজি। নির্বোধ ব্যক্তির সংসর্গে কোন কল্যাণ নেই। এ সংসর্গের পরিণাম নির্জনতা ও বিচ্ছিন্নতা; যদিও তা অনেক দিনের হয়। হযরত আলী (রাঃ) এক কবিতায় বলেন, তুমি আমার কথা মেনে মূর্খের বন্ধুত্ব থেকে দূরে থাক। মূর্খের বন্ধুত্ব জ্ঞানীকে বরবাদ করে দেয়। মূর্খের সাথে বন্ধুত্বের পরিণামস্বরূপ মানুষ তোমাকে মূর্খ বলে স্মরণ করবে। সা'দী সিরাজী তাঁর পান্দেনামায় এ বিষয়টিই এভাবে ব্যক্ত করেছেন–

زجاهل حذرکردن اولی بود - کزوتنگ دنیا وعقبی بود -

অর্থাৎ, মূর্খের কাছ থেকে বেঁচে থাকা উত্তম। কারণ, এতে ইহকাল ও পরকালে দোষী হতে হয়। কেননা, নির্বোধ ব্যক্তি উপকার ও সাহায্যের নিয়তে কোন কিছু করলে তা বন্ধুর জন্যে ক্ষতির কারণ হয়ে যেতে পারে। এ কারণেই বলা হয়– নির্বোধের কাছ থেকে আলাদা থাকা আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের নামান্তর। আমাদের মতে সে ব্যক্তিই বুদ্ধিমান, যে বাস্তবতার আলোকে বিষয়সমূহ হৃদয়ঙ্গম করে।

সচ্চরিত্রতার প্রয়োজন এ কারণে যে, অধিকাংশ বুদ্ধিমান ব্যক্তি বাস্তবতার আলোকে বিষয়সমূহ হৃদয়ঙ্গম করে, কিন্তু তাদের উপর যখন ক্রোধ কিংবা প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে যায় অথবা কৃপণতা ও কাপুরুষতার চাপ পড়ে, তখন তারা প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে বসে এবং যে বিষয়কে তারা ভাল মনে করে, তার বিপরীত কাজ করে। কারণ, তারা নিজেদের স্বভাবকে দমন করতে এবং চরিত্র সংশোধন করতে অক্ষম হয়ে থাকে। এরূপ ব্যক্তির সংসর্গ অবলম্বনে কোন ফায়দা নেই।

পাপাচারীর সংসর্গ অবলম্বন না করার কারণ, যে পাপাচারী তার পাপাচারে পীড়াপীড়ি করে, ফলে তার সংসর্গেও কোন উপকার হয় না। কেননা, যে আল্লাহকে ভয় করে, সে কবীরা গোনাহে পীড়াপীড়ি করে না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে না, তার বন্ধুত্বে ভরসা করা অনুচিত। স্বার্থ বদলে গেলে সে-ও বদলে যাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

وَلَاتُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ـ

অর্থাৎ, তার আনুগত্য করো না; যার অন্তরকে আমি আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি, আর যে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে।

فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ـ

অর্থাৎ, যে এ বিষয়ে বিশ্বাসী নয়, সে যেন আপনাকে এর প্রতি বিমুখ না করে দেয় এবং যে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে।

فَاَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلّٰى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ـ

অর্থাৎ, অতঃপর মুখ ফিরিয়ে নিন সে ব্যক্তির দিক থেকে, যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং কেবল পার্থিব জীবন কামনা করে।

وَاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ ـ

অর্থাৎ, আমার প্রতি প্রবর্তন করে, আপনি তার পথ অনুসরণ করুন।

এছাড়া পাপাচার ও পাপাচারীকে দেখলে এবং তার সাথে মেলামেশা করলে গোনাহ অন্তরের জন্যে সহজ হয়ে যায় এবং গোনাহের প্রতি অন্তরে ঘৃণা থাকে না। হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যিব (রহঃ) বলেন ঃ জালেমদের প্রতি তাকিয়ো না। তাকালে তোমার ভাল আমল বরবাদ হয়ে যাবে। পাপাচারীদের থেকে আলাদা থাকার মধ্যেই নিরাপত্তা নিহিত। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلَامًا ـ

অর্থাৎ, যখন মূর্খরা তাদের সাথে কথা বলে তখন তারা বলে– সালামত (নিরাপত্তা)। অর্থাৎ, আমরা যেন তোমাদের গোনাহ থেকে সালামত থাকি।

বেদআতীর কাছ থেকে দূরে থাকার প্রয়োজন এজন্যে যে, তার সংসর্গে থাকলে তার বেদআত ও অনিষ্ট অপরের মধ্যে সংক্রমিত হওয়ার আশংকা থাকে। বেদআতী ব্যক্তি মেলামেশা থেকে বঞ্চিত ও পৃথক থাকারই যোগ্য। এমতাবস্থায় তার সংসর্গ কিরূপে অবলম্বন করা যায়। হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যিবের (রহঃ) রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত ওমর (রাঃ) ধর্মপরায়ণ বন্ধুর অন্বেষণে উৎসাহ দিতে গিয়ে বলেন ঃ সত্যিকার বন্ধুকে অপরিহার্য করে নাও এবং তার সমর্থনে জীবন অতিবাহিত কর। কেননা, সে সুখের সময় তোমার শোভা এবং অসময়ে তোমার সহায় হবে। শত্রুর কাছ থেকে সরে থাক। নতুবা তার কুকর্ম শিখে ফেলবে। কাজ-কারবারে খোদাভীরুদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ কর।

যারা দুনিয়ালোভী, তাদের সংসর্গ বিষতুল্য। কেননা, অপরের অনুকরণ করা মানুষের মজ্জাগত স্বভাব। বরং একজন তার সহচর অন্যজনের স্বভাব থেকে কিছু চুরি করে নেয়; অথচ সহচর তা টেরও পায় না। সুতরাং দুনিয়ালোভীর সাথে উঠাবসা করলে দুনিয়ার লোভই উন্নতি লাভ করবে। পক্ষান্তরে সংসারত্যাগীর সাথে উঠাবসা করলে সংসার ত্যাগের প্রেরণাই বৃদ্ধি পাবে। এ কারণেই দুনিয়াদারদের সংসর্গ মাকরূহ এবং পরকালের প্রতি আগ্রহীদের সংসর্গ মোস্তাহাব।

উপরে সচ্চরিত্রতার বিষয়টি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। আলকামা আতারদী জীবন সায়াহ্নে তার পুত্রকে ওসিয়ত করতে গিয়ে বিষয়টি বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ বৎস, তোমার কারও সংসর্গে থাকার প্রয়োজন হলে এমন ব্যক্তির সাথে থাকবে, যার খেদমত করলে সে তোমার হেফাযত করবে। তার কাছে বসলে সে তোমাকে সৌন্দর্য দান করবে। তোমার তরফ থেকে কোন কষ্ট পেলে সে তা বরদাশত করবে। তুমি কল্যাণের হাত প্রসারিত করতে চাইলে সে প্রসারিত করবে। তোমার কোন গুণ দেখলে সে তা গণ্য করবে এবং কোন দোষ দেখলে তা প্রতিহত করবে। তুমি তার কাছে কিছু চাইলে সে দেবে। তুমি বিপদগ্রস্ত হলে সে সমবেদনা প্রকাশ করবে। তোমার কথা সত্য বলে বিশ্বাস করবে। তুমি কোন কাজ করতে চইলে সে তোমাকে নিজের উপর অগ্রাধিকার দেবে। বলাবাহুল্য, এ ওসিয়ত সংসর্গের সকল কর্তব্য অন্তর্ভুক্ত করেছে। সবগুলো কর্তব্য পালন করা এতে শর্ত করা হয়েছে। ইয়াহইয়া ইবনে আকসাম (রাহঃ) বলেন ঃ খলীফা মামুন এই ওসিয়তের কথা শুনে বললেন ঃ এরূপ লোক কোথায়? কেউ বলল ঃ আপনি কি এই ওসিয়তের কারণ বুঝতে পেরেছেন? খলীফা বললেন ঃ না। লোকটি বলল ঃ আলকামার উদ্দেশ্য ছিল কারও সংসর্গ অবলম্বন না করা। তাই তিনি এতশব শর্ত জুড়ে দিয়েছেন। জনৈক আবেদ ব্যক্তি বলেন ঃ সেই লোকের সংসর্গ অবলম্বন করবে, যে তোমার ভেদ গোপন করে, দোষত্রুটি প্রকাশ না করে, বিপদে সাহায্য করে, উত্তম বস্তুসমূহে তোমাকে অগ্রাধিকার দেয়, তোমার চরিত্র মাধুর্য প্রচার করে এবং দোষ অব্যক্ত রাখে। এরূপ লোক পাওয়া না গেলে নিজের সংসর্গই অবলম্বন করবে। হযরত আলী (রাঃ) এক কবিতায় বলেন ঃ সেই তোমার সত্যিকার বন্ধু যে তোমার সাথে থাকে, তোমার কল্যাণের জন্যে নিজের ক্ষতি করে। দৈব-দুর্বিপাকে পড়ে

তোমার অবস্থা শোচনীয় হলে সে নিজের সুখ বিসর্জন দিয়ে তোমাকে সুখদান করে। জনৈক আলেম বলেন ঃ কেবল দু'ব্যক্তির সংসর্গ অবলম্বন করা উচিত। এক, যার কাছ থেকে তুমি কিছু ধর্মীয় বিষয় শিক্ষা করতে পার, ফলে তোমার উপকার হবে। দুই, যাকে তুমি কিছু ধর্মের কথাবার্তা বললে সে মেনে নেবে। এছাড়া তৃতীয় ব্যক্তির ধারে-কাছেও যেয়ো না। কেউ কেউ বলেন ঃ মানুষ চার প্রকার– (১) সম্পূর্ণ মিষ্ট, যা খেয়েও খাওয়ার স্পৃহা থেকে যায়, (২) সম্পূর্ণ তিক্ত, যা খাওয়া যায় না, (৩) টক-মিষ্ট; এরূপ ব্যক্তি তোমার কাছ থেকে কিছু হাসিল করার আগেই তুমি তার কাছ থেকে কিছু হাসিল কর এবং (৪) লবণযুক্ত; এরূপ ব্যক্তিকে কেবল প্রয়োজনের সময় কাজে লাগানো উচিত।

হযরত ইমাম জা'ফর সাদেক (রঃ) বলেন ঃ পাঁচ ব্যক্তির সঙ্গ অবলম্বন করো না। প্রথম, মিথ্যাবাদী। তুমি তার কাছে প্রতারিত হবে। সে মরীচিকার মত– দূরবর্তীকে নিকটবর্তী করবে এবং নিকটবর্তীকে দূরবর্তী করবে। দ্বিতীয়, নির্বোধ। তুমি তার কাছে কিছুই পাবে না। সে তোমার উপকার করতে চেয়েও নির্বুদ্ধিতাবশতঃ অপকার করে বসবে। তৃতীয়, কৃপণ। তুমি তার প্রতি মাত্রাতিরিক্ত মুখাপেক্ষী হলে সে তোমার সাথে বন্ধুত্ব ছিন্ন করবে। চতুর্থ, কাপুরুষ। সে বিপদ মুহূর্তে তোমাকে ছেড়ে পালাবে। পঞ্চম, ফাসেক। সে এক লোকমা অথবা এরও কমের বিনিময়ে তোমাকে বিক্রি করে দেবে। 'লোকমার কম' কি– জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ লোকমা আশা করার পর তা না পাওয়া। হযরত জুনায়দ বলেন ঃ আমার কাছে কোন চরিত্রহীন কারী এসে বসলে তার তুলনায় চরিত্রবান ফাসেকের বসা ভাল মনে হয়। ইবনুল হাওয়ারী বলেন ঃ আমাকে আমার ওস্তাদ আবু সোলায়মান বলেছেন– হে আহমদ! দু'ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারও কাছে বসো না। এক, যার কাছ থেকে তুমি সাংসারিক কাজ-কারবারে উপকার লাভ করতে পার এবং দুই, যার সাথে থাকলে তোমার আখেরাতের উপকার হয়। সহল তস্তরী বলেন ঃ তিন ব্যক্তির সংসর্গ থেকে বেঁচে থাকা উচিত– প্রথম, অত্যাচারী গাফেলের কাছ থেকে; দ্বিতীয়, দ্বীনের ব্যাপারে অবহেলা প্রদর্শনকারী আলেমের কাছ থেকে এবং তৃতীয়, মূর্খ সুফীর কাছ থেকে।

এখন জানা উচিত, সংসর্গের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে শর্তসমূহ নির্ধারিত হবে। কেননা, আখেরাতের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে

সংসর্গের যেসকল শর্ত রয়েছে, সেগুলো দুনিয়ার উদ্দেশ্য হাসিলের শর্ত থেকে ভিন্নতর হবে। সেমতে বিশর বলেন ঃ ভাই তিন প্রকার। এক, আখেরাতের জন্যে, এক দুনিয়ার জন্যে এবং এক চিত্ত বিনোদনের জন্যে। এক ব্যক্তির মধ্যে সবগুলো বিষয় কমই থাকে। বরং এগুলো কয়েক ব্যক্তির মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে পাওয়া যায়। অতএব তাদের মধ্যে শর্তও বিভিন্ন হওয়া জরুরী। কথিত আছে, মানুষ বৃক্ষ এবং উদ্ভিদসদৃশ। কোন কোন বৃক্ষ ছায়া দান করে; কিন্তু ফল দেয় না। তারা এমন লোক, যাদের কাছ থেকে দুনিয়া আখেরাত কোথাও উপকার পাওয়া যায় না। কেননা, দুনিয়ার উপকার-অপকার অপসৃয়মান ছায়ার ন্যায় দ্রুত লোপ পায়। কতক বৃক্ষ ফল দেয় কিন্তু ছায়া দেয় না। এগুলো সেই লোকদের মত, যারা পরকালের কাজে আসে– দুনিয়ার কোন কাজে আসে না। কতক বৃক্ষ থেকে ফল ও ছায়া উভয়টিই পাওয়া যায়। কতক বৃক্ষ ফল ছায়া কোনটিই দেয় না; যেমন বাবলা বৃক্ষ। এটা কেবল কাপড় ছিন্ন করে– খাওয়াও যায় না, পানও করা যায় না। জন্তুদের মধ্যে এর মত রয়েছে ইঁদুর ও বিচ্ছু এবং মানুষের মধ্যে তারা, যাদের দ্বারা দ্বীন ও দুনিয়ার কোন উপকার হয় না; বরং মানুষকে কেবল পীড়াই দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

يَدْعُوْا لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَّفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلٰى وَلَبِئْسَ الْعَشِيْرُ -

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে জানা গেল, কেউ যদি এমন সহচর না পায়, যার সাথে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে বর্ণিত উদ্দেশ্যাবলীর কোন একটি অর্জন করা যায়, তবে তার জন্যে একাকিত্বই উত্তম। হযরত আবু যর (রাঃ) বলেন ঃ যাদের সামনে মানুষ লজ্জাবোধ করে, তাদের কাছে বসে তোমার এবাদত পুনরুজ্জীবিত কর। হযরত ইমাম আহমদ (রহঃ) বলেন ঃ আমাকে এমন লোকদের সংসর্গই বিপদে ফেলেছে, যাদের সামনে আমি লজ্জা করতাম না। ওসমান বলেন ঃ বৎস, আলেমগণের কাছে বস এবং তাদের হাঁটুর সাথে হাঁটু মেলাও। কেননা, অন্তর এলেম ও হেকমত দ্বারা এমনভাবে সজীব হয়, যেমন মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষিত হলে মৃত মাটি জীবিত হয়ে উঠে। এখন আমরা সংসর্গের কর্তব্য ও অপরিহার্য বিষয়সমূহ যথাযথ পালন করার উপায় লিপিবদ্ধ করছি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সাহচর্য ও বন্ধুত্বের কর্তব্য

প্রকাশ থাকে যে, বিবাহ যেমন স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে একটি বন্ধন; তেমনি ভ্রাতৃত্ব এবং বন্ধুত্বও দু'ব্যক্তির মধ্যে একটি বন্ধন। বিবাহের মধ্যে যেমন কতিপয় হক আদায় করা ওয়াজিব, তেমনি ভ্রাতৃত্ব বন্ধনেও কিছু হক তামিল করা জরুরী। উদাহরণতঃ যার সাথে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করবে, তোমার উপর তার মোটামুটি আট প্রকার হক থাকবে। প্রথম হক তোমার ধন-সম্পদে। রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ দু'ভাই দু'হাত সদৃশ, যার একটি অপরটিকে ধৌত করে। এখানে দু'হাত সদৃশ বলা হয়েছে, পা সদৃশ বলা হয়নি। কেননা, উভয় হাত একই উদ্দেশ্য সাধনে একে অপরের সাহায্য করে। অনুরূপভাবে উভয় ভাইয়ের ভ্রাতৃত্ব তখন পূর্ণাঙ্গ হয়, যখন তারা একই লক্ষ্য অর্জনে একে অপরকে সঙ্গ দেয়। ফলে তারা যেন একাত্ম হয়ে যায়। এই একত্বের দাবীস্বরূপ তারা লাভ-লোকসান ও আপদে বিপদে একে অপরের শরীক হবে।

ধন-সম্পদ দ্বারা বন্ধু-বান্ধবের সাথে সদ্ব্যবহার করার তিনটি স্তর রয়েছে। সর্বনিম্নস্তর হচ্ছে বন্ধুকে খাদেম ও পরিচারক মনে করা এবং নিজের বাড়তি সম্পদের মাধ্যমে তার দেখাশুনা করা। সুতরাং যখন বন্ধুর প্রয়োজন দেখা দেয় এবং তোমার কাছে অতিরিক্ত ধন-সম্পদ থাকে, তখন চাওয়া ছাড়াই তা তার হাতে সমর্পণ কর। এমতাবস্থায় যদি চাওয়ার দরকার হয়, তবে ভ্রাতৃত্বের কর্তব্য পালনে তুমি ত্রুটি করেছ বলতে হবে। দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে বন্ধুকে নিজের স্থলাভিষিক্ত মনে করা এবং ধন-সম্পদে তার শরীকানা পছন্দ করা; এমন কি, নিজের ধন-সম্পদ আধাআধি বন্টন করে দেয়া। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ পূর্ববর্তীগণ বন্ধুর সাথে এরূপ ব্যবহারই করতেন। তাঁরা একটি চাদর পর্যন্ত দ্বিখণ্ডিত করে অর্ধেক নিজে রাখতেন এবং অর্ধেক বন্ধুকে দিয়ে দিতেন। তৃতীয় ও সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে বন্ধুকে নিজের উপর অগ্রাধিকার দেয়া এবং তার প্রয়োজনকে নিজের প্রয়োজনের অগ্রে স্থান দেয়া, এটা সিদ্দীকগণের স্তর। এ স্তরের পূর্ণতা হচ্ছে অপরকে নিজের উপর অগ্রাধিকার দেয়া। বর্ণিত আছে, একবার খলীফার সামনে কয়েকজন সুফীর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করা হলে খলীফা

সকলের গর্দান উড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন। এই সুফীগণের মধ্যে আবুল হোসাইন নূরী (রহঃ)-ও ছিলেন। তিনি সবার আগে জল্লাদের সামনে গেলেন এবং বললেন ঃ সর্বপ্রথম আমাকে হত্যা কর। এর কারণ জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি বললেন ঃ আমি এই মুহূর্তে আমার ভাইদের জীবনকে আমার জীবনের উপর অগ্রাধিকার দিতে চাই। এই উক্তির কারণে খলীফা সকলকে মুক্ত করে দিলেন।

যদি উপরোক্ত তিনটি স্তরের কোন একটি স্তর তুমি তোমার বন্ধুর সাথে অর্জন করতে না পার, তবে বুঝে নেবে, ভ্রাতৃত্বের বন্ধন এখনও তোমার অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বরং তুমি কেবল সাধারণ নিয়ম ও প্রথা অনুযায়ী মানুষের সাথে মেলামেশা করে যাচ্ছ। বিবেক ও ধর্মের দৃষ্টিতে এটা মোটেই ধর্তব্য নয়। মায়মুন ইবনে মেহরান বলেন ঃ যে ব্যক্তি বন্ধুকে বাহুল্য মনে করে না, সে এমন ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব করুক, যার হাত আল্লাহ কবুল করেন। পূর্ববর্তী ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ সর্বনিম্ন স্তরও পছন্দ করতেন না। বর্ণিত আছে, ওতবা তাঁর বন্ধুর গৃহে এসে বললেন ঃ তোমার ধন-সম্পদ থেকে এখন চার হাজার দেরহাম আমার প্রয়োজন। বন্ধু বলল ঃ দু'হাজার নিয়ে যাও। এতে ওতবা মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন ঃ তুমি দুনিয়াকে আল্লাহ তা'আলার উপর অগ্রাধিকার দিয়েছ। তোমার লজ্জা করা উচিত, আল্লাহর জন্যে বন্ধুত্বের দাবী করে একথা বলছ। যে ব্যক্তি ভ্রাতৃত্বের সর্বনিম্ন স্তরের অধিকারী, তার সাথে দুনিয়ার কাজ কারবার করা উচিত নয়। আবু হাযেম বলেন ঃ তোমার আল্লাহর ওয়াস্তে কোন ভাই থাকলে তার সাথে পার্থিব কাজ কারবার করো না। এখানে উদ্দেশ্য সে ব্যক্তি, যে ভ্রাতৃত্বের সর্বনিম্নস্তরের অধিকারী। ভ্রাতৃত্বের সর্বোচ্চ স্তরের কারণেই আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে মুমিনের প্রশংসা করেছেন–

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ অর্থাৎ, তাদের ব্যাপারাদি তাদের মধ্যে পরামর্শক্রমে সম্পন্ন হয় এবং আমি তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছি, তা তারা ব্যয় করে। অর্থাৎ, তাদের ধন-সম্পদ মিশ্রিত ছিল। কেউ নিজের আসবাবপত্র অন্যের কাছ থেকে আলাদা রাখত না। জনৈক বুযুর্গ এমন ছিলেন যে, কেউ "আমার জুতা" বললে তিনি তার সঙ্গ পরিত্যাগ করতেন। ফাতাহ মুসেলী তাঁর এক বন্ধুর বাড়ী গেলেন। বন্ধু বাড়ীতে ছিলেন না। তিনি তাঁর স্ত্রীকে টাকার সিন্দুক আনতে

বললেন। অতঃপর তিনি তার প্রয়োজনীয় অর্থ সিন্দুক থেকে নিয়ে চলে গেলেন। গৃহকর্তা বাড়ী ফিরে এলে বাঁদী তাকে ঘটনা বলল। বন্ধু আনন্দিত হয়ে বললেন ঃ যতি তোর কথা সত্য হয়, তবে তুই আল্লাহর ওয়াস্তে মুক্ত। জনৈক ব্যক্তি হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর খেদমতে এসে বলল ঃ আমি আপনার সাথে আল্লাহর ওয়াস্তে ভ্রাতৃত্ব করতে চাই। তিনি বললেন ঃ তুমি এই ভ্রাতৃত্বের দায়িত্ব সম্পর্কে অবগত আছ কি? সে আরজ করল ঃ আমাকে বলে দিন। তিনি বললেন ঃ এই ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের পর তুমি তোমার দীনার ও দেরহামে আমার চেয়ে অধিক হকদার থাকবে না। লোকটি বলল ঃ আমি এখন পর্যন্ত এই স্তরে পৌঁছতে পারিনি। তিনি বললেন ঃ তা হলে আমার কাছ থেকে বিদায় নাও।

ইমাম জয়নুল আবেদীন (রঃ) জনৈক ব্যক্তিকে বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ তার ভাইয়ের পকেটে অথবা থলেতে হাত ঢুকিয়ে যা ইচ্ছা তা তার অনুমতি ছাড়া নেয় কিনা? লোকটি আরজ করল ঃ না। তিনি বললেন ঃ তা হলে তোমরা ভাই ভাই নও। কিছু লোক হযরত হাসান বসরীর খেদমতে এসে আরজ করল ঃ আপনি কি নামায পড়ে নিয়েছেন? তিনি বললেন, হাঁ। লোকেরা বলল ঃ বাজারের লোকেরা তো এখনও পড়েনি। তিনি বললেন ঃ বাজারের লোকদের কাছ থেকে ধর্মের রীতিনীতি কে শিক্ষা করে? আমি তো আরও শুনেছি, তাদের কেউ তার ভাইকে দেরহাম দেয় না। একথাটি তিনি বিস্ময়ভরে বললেন। জনৈক ব্যক্তি হযরত ইবরাহীম আদহামের খেদমতে উপস্থিত হল। তিনি তখন বায়তুল মোকাদ্দাস গমনে উদ্যত ছিলেন। লোকটি আরজ করল ঃ আমি আপনার সঙ্গী হতে চাই। তিনি বললেন ঃ এই শর্তে হতে পারে যে, তোমার দ্রব্য-সামগ্রীতে আমার ক্ষমতা তোমার চেয়ে বেশী হবে। লোকটি বলল ঃ এটা আমি পছন্দ করি না। তিনি বললেন ঃ তোমার সত্য কথায় আমি প্রীত হলাম। বর্ণিত আছে, কেউ তাঁর সঙ্গী হলে সঙ্গী তাঁর মর্জির বিপক্ষে কিছু করত না। তিনিও মর্জিমাফিক ব্যক্তিকেই সঙ্গে নিতেন। একবার এক ব্যক্তিকে পদব্রজে পথ চলতে দেখে হযরত ইবরাহীম আদহাম আপন সঙ্গীর গাধাটি তার অনুমতি ছাড়াই তাকে দিয়ে দিলেন। সঙ্গী এসে বিষয়টি জানতে পেরে চুপ করে রইল এবং খারাপ মনে করল না। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন ঃ জনৈক সাহাবীর কাছে হাদিয়াস্বরূপ ছাগলের মস্তক এলে তিনি চিন্তা করলেন, আমার অমুক ভাই এ জিনিসটির অধিক

মুখাপেক্ষী। সেমতে তিনি মস্তকটি তার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি তৃতীয় একজনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন এবং তৃতীয় জন চতুর্থ জনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এভাবে মস্তকটি সাত জনের হাত ঘুরে পুনরায় প্রথম সাহাবীর হাতেই গেল। বর্ণিত আছে হযরত মসরুক একবার মোটা অংকের টাকা ধার করেন। তাঁর বন্ধু খায়সামা ঋণগ্রস্ত ছিলেন। তিনি গিয়ে খায়সামার অজান্তে তার ঋণ শোধ করে দেন। এর পর খায়সামা গোপনে হযরত মসরূকের ঋণ শোধ করে দেন। যখন রসূলে করীম (সাঃ) আবদুর রহমান ইবনে আওফ ও সাদ ইবনে রবীর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দেন, তখন আবদুর রহমান ইবনে আওফ তার নিজের ও তার ধন-সম্পদের মধ্যে ক্ষমতা দিয়ে বললেন ঃ এগুলো তোমার, তুমি যা ইচ্ছা করতে পার। হযরত সা'দ বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাকে এগুলোতে বরকত দান করুন। অতঃপর এগুলো কবুল করে তিনি তাই করলেন, যা হযরত আবদুর রহমান করেছিলেন। এখানে হযরত সা'দের কাজটি ছিল সমতা আর হযরত আবদুর রহমান প্রথমে যা করেছিলেন, তা ছিল আত্মত্যাগ। এতদুভয়ের মধ্যে আত্মত্যাগই শ্রেষ্ঠ। হযরত আবু সোলায়মান দারানী বলেন ঃ যদি ধরে নেয়ার পর্যায়ে সমস্ত দুনিয়া আমার হস্তগত হয়ে যায় এবং আমি তা কোন বন্ধুর মুখে দিয়ে দেই, তবে একেও আমি তার জন্যে কমই মনে করব। এটাও তাঁরই উক্তি, আমি খাদ্যের লোকমা তো কোন বন্ধুকে খাওয়াই বটে, কিন্তু তার স্বাদ আমার গলায় অনুভব করি। বন্ধুদের জন্যে ব্যয় করা ফকীরদের জন্যে ব্যয় করার চেয়ে উত্তম বিধায় হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ বিশ দেরহাম কোন বন্ধুকে দেয়া আমার কাছে একশ' দেরহাম কোন ফকীরকে খয়রাত করা অপেক্ষা উত্তম। এটাও তাঁরই উক্তি, যদি আমি এক সা' খাদ্য তৈরী করে বন্ধুদেরকে আমন্ত্রণ করি, তবে এটা আমার কাছে একটি গোলাম মুক্ত করার চেয়ে ভাল।

বলাবাহুল্য, আত্মত্যাগের ক্ষেত্রে সকলেই রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এরই অনুসরণ করে থাকেন। তাঁর নীতি তাই ছিল। সেমতে বর্ণিত আছে, তিনি একবার এক সাহাবীর সাথে জঙ্গলে তশরীফ নিয়ে যান এবং সেখানে দু'টি মেসওয়াক চয়ন করেন। তন্মধ্যে একটি ছিল সোজা অপরটি বাঁকা। তিনি সোজা মেসওয়াকটি সাহাবীকে দিয়ে দিলে সাহাবী আরজ করলেন ঃ আমার তুলনায় আপনি এর অধিক হকদার। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ

করলেন ঃ যে ব্যক্তি তার বন্ধুর সাথে এক মুহূর্তও থাকে, তাকে সংসর্গের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে যে, সে এতে আল্লাহ্ তা'আলার হক আদায় করেছিল কিনা? এ হাদীসে এরশাদ হয়েছে, সংসর্গে স্বার্থত্যাগ করা হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলার হক আদায় করা। অন্য এক দিন রসূলে করীম (সাঃ) এক কূপে গোসল করতে গেলেন। হযরত হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান একটি চাদর দিয়ে তাঁকে আড়াল করে দাঁড়ালেন। তাঁর গোসল সমাপ্ত হলে হুযায়ফা গোসল করতে বসলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) চাদর হাতে নিয়ে তাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে রইলেন। হুযায়ফা (রাঃ) আরজ করলেন ঃ আপনার প্রতি আমার পিতামাতা উৎসর্গ হোক– আপনি এরূপ করবেন না, কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ) মানলেন না। তিনি গোসল শেষ হওয়া পর্যন্ত চাদর দিয়ে আড়াল করে রইলেন। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে ঃ যখন দু'ব্যক্তি পরস্পরের সঙ্গী হয়, তখন তাদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার অধিক প্রিয় সেই হয়, যে তার সঙ্গীর সাথে অধিক কোমল হয়। বর্ণিত আছে, মালেক ইবনে দীনার ও মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসে, হযরত হাসান বসরীর গৃহে এমন এক এক সময় গিয়ে হাযির হলেন যখন তিনি গৃহে ছিলেন না। মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসে' হযরত হাসানের চৌকির নীচে থেকে একটি খাদ্য ভর্তি পিয়ালা বের করে খেতে লাগলেন। মালেক ইবনে দীনার বললেন ঃ যে পর্যন্ত গৃহকর্তা না আসে, তোমার এ খাদ্য খাওয়া উচিত নয়, কিন্তু মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসে' তাঁর কথা মানলেন না, খেতে থাকলেন। ইতিমধ্যে হযরত হাসান বসরী গৃহে ফিরে এসে বললেন ঃ মালেক, পূর্বে আমাদের অবস্থা এমনি ছিল। আমরা ছিলাম পরস্পরের অকপট ও অকৃত্রিম বন্ধু। তোমাদের ও তোমাদের সমসাময়িকদের জন্মগ্রহণ পর্যন্ত এই অবস্থা অব্যাহত ছিল। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বন্ধুদের গৃহে লৌকিকতা না করা স্বচ্ছ বন্ধুত্বের পরিচায়ক।

আল্লাহ তাআলা স্বয়ং বলেন ঃ أَوْمَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيْقِكُمْ অর্থাৎ, তার গৃহ থেকে খাওয়া তোমাদের জন্যে গোনাহ নয়, যার চাবির মালিক তোমরা হয়েছ, অথবা বন্ধুর গৃহ থেকে।

পূর্ববর্তীদের রীতি ছিল, তারা আপন গৃহের চাবি বন্ধুর হাতে দিয়ে দিতেন এবং যাবতীয় ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার তাকে দান করতেন, কিন্তু বন্ধু তাকওয়ার কারণে তাদের সম্পদ থেকে খেত না। অবশেষে

আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াত নাযিল করে বন্ধুদের মালে খোলামেলা ব্যবহার করার অনুমতি দান করলেন।

বন্ধুর দ্বিতীয় হক হচ্ছে সওয়াল করার পূর্বে তার অভাব দূর করা এবং নিজের বিশেষ প্রয়োজনের উপর তার প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিয়ে তাকে সাহায্য করা। বন্ধুকে সাহায্য করার কয়েকটি স্তর আছে। তন্মধ্যে সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে সওয়াল করার সময় তার প্রয়োজন মেটানো এবং হাসিমুখে ও খুশী মনে তা করা। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ যখন তুমি কোন বন্ধুর সামনে নিজের প্রয়োজন পেশ কর এবং সে তা পূর্ণ করে না, তখন পুনরায় তাকে স্মরণ করিয়ে দাও। সম্ভবতঃ সে ভুলে গেছে। যদি এর পরও পূর্ণ না করে; তবে তার উপর আল্লাহু আকবার বলে এই আয়াত পাঠ করে নাও- وَالْمَوْتٰى يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ الاية অর্থাৎ, সে এবং মৃত ব্যক্তি এমতাবস্থায় সমান।

ইবনে বাশরামা তার বন্ধুর একটি বড় কাজ করে দিলে বন্ধু তার কাছে কিছু উপঢৌকন নিয়ে হাযির হল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটা কেন? বন্ধু বলল ঃ এটা এজন্যে যে, আপনি আমার একটি বড় কাজ করে দিয়েছেন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাকে সালামতে রাখুন; তোমার সম্পদ তোমার কাছেই রাখ। তুমি যখন কোন বন্ধুর সামনে নিজের প্রয়োজনের কথা বল, তখন সে যদি তা পূর্ণ করতে সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা না করে, তা হলে ওযু করে তার উপর জানাযার নামায পড়ে নাও এবং তাকে মৃত মনে কর। হযরত জা'ফর সাদেক (আঃ) বলেন ঃ আমি আমার শত্রুদের অভাব-অনটন অনতিবিলম্বে পূর্ণ করি। কেননা, আমার আশংকা হয়, তাদেরকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিলে তারা আমার প্রতি বেপরওয়া হয়ে যাবে। শত্রুদের সাথে এই ব্যবহার হলে বন্ধুদের সাথে কিরূপ হবে, তা অনুমান করতে কষ্ট হয় না। পূর্ববর্তীগণের মধ্যে কিছু লোক ছিলেন, যাঁরা বন্ধুর পরিবারবর্গের দেখাশুনা তার মৃত্যুর পর চল্লিশ বছর পর্যন্ত করতেন; তাদের অভাব-অনটন দূর করতেন এবং প্রত্যহ তাদের কাছে গিয়ে নিজের অর্থকড়ি ব্যয় করতেন। ফলে মৃতের এতীম শিশুরা কেবল নিজের পিতাকে চোখে দেখত না; কিন্তু তার স্নেহ-মমতা বিদ্যমান পেত। সত্যি কথা বলতে কি, যে ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের ফলাফল এরূপ নয়, তাতে কোন কল্যাণ নেই। মায়মুন ইবনে মেহরান বলেন ঃ যে ব্যক্তির বন্ধুত্বে তোমার উপকার হয় না, তার শত্রুতাও তোমার জন্যে

ক্ষতিকর নয়। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ সাবধান, পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলার কিছু পাত্র আছে, তা হচ্ছে অন্তর। সে পাত্র আল্লাহ তা'আলার কাছে সর্বাধিক প্রিয়, যা সর্বাধিক পরিষ্কার, অধিক শক্ত এবং অধিক নরম। অধিক পরিষ্কার গোনাহের ব্যাপারে, অধিক শক্ত ধর্মকর্মে এবং অধিক নরম ভাই-বন্ধুদের ক্ষেত্রে।

সারকথা, তোমার কাছে তোমার ভাইয়ের প্রয়োজন তোমার নিজের প্রয়োজনের মত হয়ে যাওয়া উচিত; বরং তার চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তুমি যেমন নিজের অবস্থা সম্পর্কে গাফেল হও না, তেমনি বন্ধুর অবস্থা সম্পর্কে গাফেল হবে না। তার সওয়াল ও প্রয়োজন ব্যক্ত করার দরকার নেই। তাকে এমনভাবে সাহায্য কর যেন তুমি জানই না যে, সাহায্য করছ। সে যে তোমার সাহায্য কবুল করে, এজন্যে তার কাছে কৃতজ্ঞ থাক। কেবল অভাব দূর করেই ক্ষান্ত থেকো না; বরং চেষ্টা কর যাতে সম্মান প্রদর্শন ও ত্যাগ স্বীকারের সূচনা তোমার পক্ষ থেকে হয়। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলতেন ঃ আমার বন্ধু আমার কাছে সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজনের চেয়েও অধিক প্রিয়। কারণ, পরিবার-পরিজন আমাকে সংসারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, আর বন্ধু আখেরাতের কথা অন্তরে জাগরিত করে।

তিনি আরও বলেন ঃ যে ব্যক্তি তার বন্ধুকে বিদায় দেয়ার সময় তার পেছনে কিছুদূর চলে, আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিন কয়েকজন ফেরেশতাকে জান্নাত পর্যন্ত তার পেছনে চলার জন্যে আরশের নীচ থেকে প্রেরণ করবেন। হযরত আতা (রহঃ) বলেন ঃ তিন অবস্থায় তুমি তোমার বন্ধুর খবর নাও– পীড়িত হলে তার সেবাযত্ন কর, কাজে ব্যস্ত থাকলে তাকে সাহায্য কর এবং বিস্মৃত হলে স্মরণ করিয়ে দাও। বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দরবারে হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) ডানে-বামে তাকিয়ে কাউকে যেন খুঁজছিলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞেস করলে তিনি আরজ করলেন ঃ আমি এক ব্যক্তিকে মহব্বত করি। তাকে দেখতে পাচ্ছি না। রসূলে পাক (সাঃ) বললেন ঃ তোমরা যখন কাউকে মহব্বত কর, তখন তার নাম, পিতার নাম ও ঠিকানা জিজ্ঞেস করে নাও। এর পর সে অসুস্থ হলে তার সেবা শুশ্রূষা কর এবং কাজে ব্যস্ত থাকলে সাহায্য কর। হযরত শা'বী বলেন ঃ যে ব্যক্তি অন্যের সাথে উঠাবসা করে, এর পর বলে, আমি তার মুখাকৃতি চিনি; কিন্তু নাম জানি না; এ ধরনের পরিচয়

নির্বোধদের। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ আপনার মতে সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি কে? তিনি বললেন ঃ যে আমার সাথে উঠাবসা করে। তিনি আরও বলেন ঃ যে আমার মজলিসে তিন বার আসে, আমি বুঝতে পারি, তার প্রতিদান দুনিয়ার দ্বারা হবে না। সায়ীদ ইবনে আছ (রাঃ) বলেন ঃ যে আমার সাথে উঠা বসা করে, আমার কাছে তার হক তিনটি– আমার কাছে থাকলে তাকে মারহাবা বলা, কথা বললে তা মনোযোগ দিয়ে শুনা এবং কাছে বসলে তাকে ভালরূপে জায়গা দেয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ (তারা পরস্পরে দয়াশীল।) এতেও পারস্পরিক দয়া, মমতা ও সম্মানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। স্নেহ ও অনুগ্রহের পরিশিষ্ট হল কোন সুস্বাদু খাদ্য একা না খাওয়া এবং তাকে ছাড়া কোন আনন্দ মজলিসে যোগদান না করা; বরং তার বিরহে বিষণ্ন ও আতংকগ্রস্ত থাকা।

বন্ধুর তৃতীয় হক হচ্ছে, কয়েকটি স্থানে নিশ্চুপ থাকা এবং মুখ না খোলা। প্রথম, তার দোষ তার সামনে বা পেছনে বর্ণনা না করা; বরং দোষক্রটি সম্পর্কে না জানার ভান করা। দ্বিতীয়, তার কথা খন্ডন না করা। তৃতীয়, তার অবস্থা অন্বেষণ না করা। তাকে পথিমধ্যে অথবা কোন কাজে দেখা গেলে এবং সে কোথায় থেকে আসছে এবং কোথায় যাচ্ছে– এসব বিষয় নিজে বর্ণনা না করলে তাকে জিজ্ঞেস করার ব্যাপারে চুপ থাকবে। কেননা, মাঝে মাঝে তা বর্ণনা করা তার পক্ষে কঠিন হতে পারে অথবা ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যার আশ্রয় নিতে হতে পারে। চতুর্থ, বন্ধু যেসব গোপন কথা তোমার কাছে বলেছে সেগুলো ফাঁস করা থেকে বিরত থাকবে; অন্য কারও কাছে কখনও বলবে না। এমন কি, নিজের অথবা তার বন্ধুর কাছেও না। বন্ধুত্ব শেষ হয়ে গেলেও তার গোপন কথা ফাঁস করা আন্তরিক ভ্রষ্টতার লক্ষণ। পঞ্চম, বন্ধুর আপনজন, আত্মীয়স্বজন ও পরিবার-পরিজনকে তিরস্কার করা থেকে বিরত থাকবে। ষষ্ঠ, কেউ তাকে গালি দিলে তার সামনে সেই গালির কথা বলবে না। কেননা, গালি যেন সেও দেয়, যে মুখের উপর তা উদ্ধৃত করে। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) কারও সামনে এমন কথা উদ্ধৃত করতেন না, যা তার অপ্রিয়। কথা উদ্ধৃতকারী দ্বারা প্রথমে কষ্ট হয়, এর পর আসল বক্তা দ্বারা। অন্য কেউ বন্ধুর প্রশংসা করলে তা গোপন করা উচিত নয়। কেননা, প্রথমে আনন্দ উদ্ধৃতকারীর দ্বারা হয়, এর পর প্রকৃত বক্তা দ্বারা। এছাড়া

প্রশংসা গোপন করা হিংসার অন্তর্ভুক্ত। মোট কথা, বন্ধুর অপ্রিয় বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে নিরব থাকা উচিত। বন্ধুর নিন্দাও দোষ এবং তার পরিবারের দোষ বর্ণনা করা গীবতের অন্তর্ভুক্ত, যা প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে হারাম। দু'টি বিষয় চিন্তা করলে তুমি তোমার বন্ধুর দোষ বর্ণনা করার জন্যে মুখ খুলবে না। প্রথমত তুমি নিজের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা কর। যদি তাতে কোন দোষ দেখ, তবে বন্ধুর দোষকে অসহনীয় মনে করো না। তুমি মনে কর, যেমন আমি একটি দোষ করার ব্যাপারে অপারগ এবং তা বর্জন করতে অক্ষম, তেমনি সে-ও হয়ত একটি অভ্যাসে নিজেকে সংযত রাখতে পারে না। সম্পূর্ণ দোষমুক্ত মানুষ কোথায়? আর যদি তুমি বন্ধুকে সকল দোষ থেকে মুক্তই দেখতে চাও, তবে মানুষ থেকে দূরে চলে যাও এবং কারও সংসর্গ অবলম্বন করো না। কেননা, জগতে যত মানুষ আছে, তাদের মধ্যে দোষও আছে, গুণও আছে। কারও গুণ বেশী থাকলে তাকেই সংসর্গের জন্যে উত্তম মনে করে নাও। মোট কথা, ভদ্র ঈমানদার ব্যক্তি সর্বদা নিজের বন্ধুর গুণাবলীই দৃষ্টিতে রাখে, যাতে অন্তর থেকে তার প্রতি বন্ধুত্ব ও সদ্ভাব অংকুরিত হয়। পক্ষান্তরে কপট ও নীচ ব্যক্তি সর্বদা দোষ ক্রুটির দিকে তাকিয়ে থাকে।

হযরত ইবনে মোবারক (রাহঃ) বলেন ঃ ঈমানদার ওযর তালাশ করতে থাকে এবং কপট ভুলভ্রান্তি অন্বেষণ করে। হযরত ফোযায়ল (রহঃ) বলেন ঃ বন্ধুদের ক্রুটি ক্ষমা করা মহত্ত্ব। এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

استعيذوا بالله من جار السوء الذى ان راى خيرا ستره وان راى شرا ظهره -

অর্থাৎ, মন্দ প্রতিবেশী থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর। সে ভাল কাজ দেখলে তা গোপন করে এবং মন্দ দেখলে প্রকাশ করে দেয়।

এমন কোন লোক নেই, যাকে কয়েকটি গুণের কারণে ভাল বলা যাবে না। অনুরূপভাবে তাকে মন্দও বলা যায়। বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রসূলে করীম (সাঃ)-এর সামনে অন্য এক ব্যক্তির প্রশংসা করল। পরবর্তী দিন তারই নিন্দা করল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ কাল তুমি তার প্রশংসা করেছিলে, আজ নিন্দা করছ? সে আরজ করল ঃ কালও আমি

তার সম্পর্কে সত্য বলেছিলাম এবং আজও মিথ্যা বলছি না। সে কাল আমাকে সন্তুষ্ট রেখেছিল। তাই তার যেসব গুণ আমার জানা ছিল, সেগুলো বর্ণনা করেছি, কিন্তু আজ সে আমাকে অসন্তুষ্ট করেছে। তাই তার যেসব দোষ আমি জানতাম, সেগুলো বর্ণনা করছি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ ان من البيان لسحرا (কোন কোন বর্ণনা জাদুতুল্য)। বিষয়টিকে তিনি খারাপ মনে করেই জাদুর সাথে তুলনা করেছেন। অন্য এক হাদীসে আছে- البذاء والبيان شعبتان من النفاق (অশ্লীল কথাবার্তা ও বাকচাতুর্য মোনাফেকীর দুটি শাখা)। আরও বলা হয়েছে- ان الله يكره لكم البيان كل البيان (আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্যে বাকচাতুর্য অপছন্দ করেন)।

হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন ঃ মুসলমানদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে কেবল আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যই করে এবং কোন গোনাহ করে না। পক্ষান্তরে এমনও কেউ নেই, যে কেবল নাফরমানীই করে- আনুগত্য করে না। অতএব যার আনুগত্য নাফরমানীর উপর প্রবল, সেই আদেল। আল্লাহ তাআলার হকের ব্যাপারে এরূপ ব্যক্তি যখন আদেল সাব্যস্ত হয়, তখন তুমি যদি নিজের হকের ব্যাপারে এরূপ ব্যক্তিকে আদেল মনে কর, তবে এটা অধিক বাঞ্ছনীয় নয় কি? বন্ধুর দোষত্রুটি বর্ণনা করার ব্যাপারে নিশ্চুপ থাকা যেমন ওয়াজিব, তেমনি অন্তর দিয়ে নিশ্চুপ থাকাও ওয়াজিব। অর্থাৎ, তার প্রতি অন্তরে কুধারণা ঘোষণা করা অন্তরের গীবত। এটাও শরীয়তে নিষিদ্ধ। এর চূড়ান্ত পর্যায় যে পর্যন্ত বন্ধুর কাজকে ভাল অর্থে নেয়া সম্ভবপর হয়, সেই পর্যন্ত তা খারাপ অর্থে নেয়া উচিত নয়, কিন্তু যে দোষ নিশ্চিত ও প্রত্যক্ষরূপে প্রকাশ পায় তা তাকে বলা গেলেও যথাসম্ভব সেটি ভুলক্রমে হয়েছে বলে ধরে নেয়া জরুরী।

কুধারণা দু'প্রকার। এক, লক্ষণ বিদ্যমান থাকার কারণে কুধারণা হওয়া। এরূপ কুধারণা মানুষ মন থেকে দূর করতে পারে না। দুই, কুবিশ্বাসপ্রসূত কুধারণা। উদাহরণতঃ বন্ধু এমন কোন কাজ করল, যা ভালও হতে পারে, মন্দও হতে পারে, কিন্তু তার প্রতি তোমার বিশ্বাস ভাল নয় বিধায় তুমি কাজটিকে খারাপ অর্থেই ধরে নিচ্ছ। অথচ কোন লক্ষণ বিদ্যমান নেই, যদ্দারা কাজটি খারাপ হতে পারে। এ ধরনের কুধারণা

অন্তরের নষ্টামি বৈ কিছু নয় এবং এটা কেবল বন্ধুর বেলায়ই নয়, যে কোন মুসলমান সম্বন্ধে এরূপ কুধারণা পোষণ করা হারাম। তাই রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ

ان الله قد حرم على المؤمن دمه وماله وعرضه وان يظن به ظن السوء ـ

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা মুমিনের উপর অন্য মুমিনের রক্ত, ধনসম্পদ, মান-সম্মান ও তার প্রতি কুধারণা পোষণ হারাম করেছেন।

তিনি আরও বলেন ঃ فان الظن اكذب الحديث (তোমরা কুধারণা থেকে বেঁচে থাক। কেননা, কুধারণা অধিকতর মিথ্যা বিষয়)। কুধারণার ফলস্বরূপ মানুষ গোপনে অন্যের অবস্থা সম্পর্কে ঘাঁটাঘাঁটি করে এবং অলক্ষ্যে তার কর্মকাণ্ডের প্রতি নজর রাখে। অথচ রসূলে পাক (সাঃ) বলেন ঃ

ولاتجسسوا ولا تحسسوا ولاتقاطعوا ولاتدابروا وكونوا عباد الله اخوانا ـ

অর্থাৎ. তোমরা একে অপরের গোপন তথ্য ঘাঁটাঘাঁটি করো না। একে অপরের পেছনে লেগে থেকো না, পরস্পরে সম্পর্কচ্ছেদ করো না। একে অন্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ো না এবং আল্লাহর সমস্ত বান্দা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও।

এ থেকে জানা গেল, দোষক্রটি গোপন করা এবং তা না জানার ভান করা ধর্মপরায়ণদের অভ্যাস। দোষ গোপন করা এবং সদগুণ প্রকাশ করার ফযীলতের জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট যে, দোয়া মাসুরায় আল্লাহ তাআলাকে এসব গুণে গুণান্বিত করে বলা হয়েছে- يا من اظهر بالجميل وستر القبيح। অর্থাৎ, যিনি সদগুণ প্রকাশ করেন এবং দোষ গোপন করেন। বলাবাহুল্য, আল্লাহর চরিত্রে চরিত্রবান হওয়াকেই আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন। তিনি যখন দোষ গোপন করেন এবং বান্দার গোনাহ ক্ষমা করেন, তখন তুমি এরূপ ব্যক্তিকে কিরূপে ক্ষমা করবে না, যে তোমার সমপর্যায়ভুক্ত অথবা তোমার চেয়ে অধিক মর্যাদাবান এবং কোন অবস্থাতেই তোমার গোলাম অথবা সৃষ্ট নয়। একবার হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর অনুচরবর্গকে বললেন ঃ যখনা তোমরা তোমাদের কোন ভাইকে

নিদ্রাবস্থায় দেখ এবং বাতাস তার উপর থেকে বস্ত্র উড়িয়ে নেয়, তখন তোমরা কি কর? তারা নিবেদন করল ঃ আমরা তাকে বস্ত্র দ্বারা আবৃত করে দেই। তিনি বললেন ঃ না, বরং তোমরা তার গুপ্তাঙ্গ উন্মুক্ত করে দাও। অনুচররা আরজ করল ঃ সোবহানাল্লাহ্! কে এরূপ করে? তিনি বললেন ঃ যখন তোমাদের কেউ নিজের ভাই সম্পর্কে কোন কথা শুনে, তখন তার সাথে অন্য আরও খারাপ কথা মিলিয়ে দেয়। খবরদার! ততক্ষণাৎ পর্যন্ত মানুষের ঈমান কামেল হয় না যে পর্যন্ত নিজের ভাইয়ের জন্যে তা-ই পছন্দ না করে, যা নিজের জন্যে পছন্দ করে। ভ্রাতৃত্বের সর্বনিম্ন স্তর হল অন্যের কাছে যে ব্যবহার প্রত্যাশা করবে, আপন ভাইয়ের সাথে সেই ব্যবহার করা। বলাবাহুল্য, মানুষ অন্যের কাছে এমনি প্রত্যাশা করে যে, সে তার দোষত্রুটি থেকে চোখ ফিরিয়ে নিক। এই প্রত্যাশার পরিপন্থী কর্ম কারও কাছ থেকে প্রকাশ পেলে তাকে লাল চোখ দেখানো হয়। অতএব এটা আশ্চর্যের বিষয় যে, নিজে অন্যের কাছে চোখ ফিরিয়ে নেয়া আশা করবে; কিন্তু অন্যের দোষ দেখে সে তা গোপন করবে না! এরূপ বে-ইনসাফের জন্যে কোরআনে অভিসম্পাত বর্ণিত আছে। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ
وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْوَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ -

অর্থাৎ, অভিসম্পাত মাপে প্রবঞ্চনাকারীদের জন্যে, যারা লোকের কাছ থেকে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে এবং যখন লোকদেরকে মেপে দেয় অথবা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়।

যার মন অন্যের জন্যে যতটুকু ইনসাফ পছন্দ করে, অন্যের কাছ থেকে তার চেয়ে বেশী ইনসাফ পেতে চায়, সে এই আয়াতের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। মানুষের অন্তর্নিহিত একটি রোগই অন্যের দোষ গোপনে ত্রুটি করার মূল কারণ। হিংসা-বিদ্বেষ মানুষের অন্তরকে নষ্টামিতে পরিপূর্ণ করে দেয়। এগুলো তার অন্তরে সুযোগ না হওয়া পর্যন্ত চাপা ও বন্দী থাকে। সুযোগ পেলেই বাঁধ ভেঙ্গে যায় এবং লজ্জা শরমের বাধা অপসারিত হয়। তখনই অন্তরের ভ্রষ্টামি নিঃসৃত হতে থাকে। সুতরাং যখন অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ থাকে, তখন কারও সাথে ভ্রাতৃত্ব করা উচিত নয়। বরং আলাদা থাকা উত্তম। জনৈক দার্শনিক বলেন ঃ ভাইদের সাথে বাহ্যতঃ

রাগারাগি করা অন্তরে হিংসা-দ্বেষ রাখার চেয়ে উত্তম। যার অন্তরে কোন মুসলমানের প্রতি হিংসা থাকে, তার ঈমান দুর্বল এবং তার ব্যাপারটি বিপজ্জনক। এরূপ অন্তর খোদায়ী দীদারের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। আবদুর রহমান ইবনে জুবায়র তাঁর পিতার ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, তিনি ইয়ামনে থাকাকালে তাঁর প্রতিবেশী ছিল জনৈক ইহুদী। সে তাঁর কাছে তওরাতের বিষয়াদি বর্ণনা করত। একদিন ইহুদী সফর থেকে ফিরে এলে তিনি তাকে বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আমাদের মধ্যে একজন পয়গম্বর প্রেরণ করেছেন। তিনি আমাদেরকে মুসলমান হতে বললে আমরা মুসলমান হয়ে গেছি। আমাদের জন্যে একটি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, যা তওরাতের সত্যায়ন করে। ইহুদী বলল ঃ তুমি সঠিক বলছ, কিন্তু তোমাদের পয়গম্বর যে বিধান এনেছেন, তা তোমরা পালন করতে পারবে না। আমরা এই পয়গম্বর এবং তাঁর উম্মতের পরিচয় তওরাতে এভাবে পাই যে, কোন ব্যক্তি তার অন্তরে বিদ্বেষ রেখে দরজার চৌকাঠের বাইরে পা রাখবে না। নিজের কাছে গচ্ছিত ভেদ ফাঁস না করাও একটি মৌখিক হক। প্রয়োজনবোধে– অমুক কোন গোপন কথা আমাকে বলেনি বলে অস্বীকার করাও জায়েয। এটা মিথ্যা হলেও এরূপ ক্ষেত্রে সত্য কথা বলা ওয়াজিব নয়। নিজের দোষত্রুটি ও ভেদের কথা গোপন করা মিথ্যা বলার মাধ্যমে হলেও যেমন জায়েয, তেমনি বন্ধুর খাতিরে এতটুকু পাপ করাও বৈধ। কেননা, বন্ধু নিজেরই স্থলাভিষিক্ত; যেন এক প্রাণ দু'দেহ। এটাই বন্ধুত্বের স্বরূপ। তাই বন্ধুকে দেখিয়ে কোন আমল করলে তাতে রিয়া হবে না এবং আমলটি আন্তরিক আমল থেকে বের হয়ে বাহ্যিক আমল হয়ে যাবে না। কেননা, বন্ধুর আমল জানা নিজের আমল জানার মতই। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

من ستر عورة اخيه ستره الله تعالى فى الدنيا والاخرة .

যে ব্যক্তি নিজের ভাইয়ের দোষ গোপন করবে, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন। অন্য রেওয়ায়েতে আছে–

من ستر عورة اخيه فكانما احيا مؤودة

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের দোষ গোপন করে, সে যেন কবরে প্রোথিতকে জীবিত করে। আরও বলা হয়েছে–

اذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهو امانة .

অর্থাৎ, যখন কেউ কথা বলে, অতঃপর অন্য দিকে তাকায়, তখন তার কথাটি আমানত হয়ে যায়।

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, তিনটি মজলিস ছাড়া সকল মজলিসের কথাবার্তাই আমানত। প্রথম, যে মজলিসে অন্যায় খুন করা হয়। দ্বিতীয়, যে মজলিসে যিনাকে হালাল মনে করা হয়। তৃতীয়, যে মজলিসে অবৈধ উপায়ে মাল বৈধ করা হয়। এক হাদীসে আছে– যারা পরস্পরে একত্রে বসে, তারা আমানত সহকারে বসে। তারা একে অন্যের অপ্রিয় কথা প্রকাশ করবে না। জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তিকে প্রশ্ন করা হল ঃ আপনি গোপন বিষয়সমূহের হেফাজত কিরূপে করেন? তিনি বললেন ঃ আমি গোপন বিষয়সমূহের জন্যে কবর হয়ে যাই। বলা হয়, ভাল মানুষদের বক্ষ গোপন ভেদ সমূহের কবর হয়ে থাকে। নির্বোধের মন মুখে থাকে এবং বুদ্ধিমানের জিহ্বা অন্তরে থাকে। নির্বোধ মনের কথা গোপন রাখতে পারে না– অজ্ঞাতেই প্রকাশ করে দেয়। এ কারণেই নির্বোধদের সাথে সাক্ষাৎ বর্জন, তাদের সংসর্গ, এমন কি তাদের চেহারা দর্শন থেকে পর্যন্ত বেঁচে থাকা ওয়াজিব। জনৈক ব্যক্তি বলেন ঃ আমি ভেদ গোপন করি এবং গোপন করার বিষয়টিও গোপন করি। ইবনুল মুরতায বলেন ঃ আমাকে কেউ কোন কথা গোপন রাখতে বললে আমি নিজের বক্ষে তাকে সমাধিস্থ করে দেই।

অন্য একজন আরও এগিয়ে গিয়ে বলেন ঃ আমার বক্ষের গোপন কথা মৃতের মত নয়। কেননা, মৃত ব্যক্তির হাশরে পুনরুত্থিত হবার আশা থাকে। বরং আমি গোপন কথা এমনভাবে বিস্মৃত হয়ে যাই, যেন সে সম্পর্কে এক মুহূর্তের জন্যও অবগত ছিলাম না। এক ব্যক্তি তার একটি গোপন কথা তার বন্ধুকে বলে জিজ্ঞেস করল ঃ কথাটি তোমার মনে আছে? বন্ধু জওয়াব দিল ঃ না, ভুলে গেছি। আবু সায়ীদ সওরী (রহঃ) বলেন ঃ তুমি কোন ব্যক্তির সাথে ভ্রাতৃত্ব করতে চাইলে প্রথমে তাকে রাগান্বিত কর। এর পর এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত কর, যাতে সে তার কাছে তোমার অবস্থা ও গোপন কথা জিজ্ঞেস করে। যদি সে তোমার সম্পর্কে ভাল বলে এবং তোমার গোপন তথ্য ফাঁস না করে, তবে তার সাথে বন্ধুত্ব কর। আবু যায়েদকে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি কিরূপ লোকের সংসর্গ অবলম্বন করেন? তিনি বললেন ঃ যে আমার সেই গোপন অবস্থা জানে, যা আল্লাহ তা'আলা জানেন। এর পর তা এমনভাবে গোপন করে,

যেমন আল্লাহ তা'আলা গোপন করেন। যুন্নুন মিসরী (রহঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি তোমাকে নিষ্পাপ দেখতে পছন্দ করে না, তার সঙ্গ লাভে কোন কল্যাণ নেই। আর যে ব্যক্তি রাগের অবস্থা গোপন তথ্য ফাঁস করে দেয়, সে দুরাচার। প্রসন্ন অবস্থায় বিশ্বস্ত থাকা তো প্রত্যেক সুস্থ মনেরই স্বভাব।

হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) একবার তাঁর পুত্র আবদুল্লাহকে (রাঃ) বললেন ঃ আমি দেখি, আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাঃ) তোমাকে বয়োবৃদ্ধদের উপর অগ্রগণ্য মনে করেন। তাই আমি পাঁচটি বিষয় বলছি; এগুলো মনে রেখো। প্রথম, তাঁর কোন গোপন তথ্য ফাঁস করো না। দ্বিতীয়, তাঁর কাছে কারও গীবত করো না। তৃতীয়, তাঁর সামনে কোন মিথ্যা কথা বলো না। চতুর্থ, তাঁর কোন আদেশ অমান্য করো না। পঞ্চম, এমন কাজ করো না, যদ্দ্বারা তুমি তাঁর কাছে বিশ্বাসঘাতক প্রমাণিত হও।

বন্ধুর কথার মাঝখানে বাধা না দেয়াও অন্যতম মৌখিক হক। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ কোন নির্বোধের কথার মাঝখানে বাধা দিয়ো না। সে তোমাকে নির্যাতন করবে। জ্ঞানীর কথায়ও বাধা সৃষ্টি করো না। সে তোমাকে শত্রু মনে করবে। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি নিজে বাতিল হয়েও অন্যের কথা কাটাকাটি বর্জন করবে, তার জন্যে জান্নাতের এক প্রান্তে গৃহ নির্মিত হবে। যে ব্যক্তি হক থাকা সত্ত্বেও কথা কাটাকাটি বর্জন করবে, তার জন্যে সর্বোচ্চ জান্নাতে বাসস্থান নির্মাণ করা হবে। এটা কথা কাটাকাটি বর্জন করার সওয়াব। অথচ নিজে বাতিল হলে কথা না কেটে চুপ থাকা ওয়াজিব এবং হক হলে চুপ থাকা নফল, কিন্তু নফলের সওয়াব বেশী হওয়ার কারণ, হকের উপর থেকে চুপ থাকা অত্যন্ত কঠিন বাতিল হয়ে চুপ থাকার তুলনায়। সওয়াব কষ্ট পরিমাণে হয়ে থাকে। কথা কাটাকাটি করা দু'ভাইয়ের মধ্যে হিংসার অনল প্রজ্বলিত হওয়ার শক্তিশালী কারণ। তাই বিরোধ প্রথমে মতামতে, এর পর কথাবার্তায় এবং অবশেষে দেহের মধ্যে হয়ে থাকে। অতএব কথা কাটাকাটি যেন পারস্পরিক সম্পর্কচ্ছেদও বটে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ তোমরা পরস্পরে সম্পর্কচ্ছেদ করো না, পরস্পরে শত্রুতা রেখো না এবং পরস্পরকে হিংসা করো না। তিনি আরও বলেন ঃ

المسلم اخو المسلم لايظلمه ولايحرمة ولايخذله يحسب للمرء من الشر ان يحقر اخاه المسلم -

অর্থাৎ, মুসলমান মুসলমানের ভাই। তারা একে অপরকে জুলুম করে না, বঞ্চিত করে না এবং লাঞ্ছিতও করে না। ব্যক্তির জন্যে এতটুকু অনিষ্টই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলমান ভাইকে ঘৃণা করে। সর্বাধিক ঘৃণা হচ্ছে কথা কেটে দেয়া। কেননা, যে অপরের কথা প্রত্যাখ্যান করে, সে হয় তাকে মূর্খ ও নির্বোধ মনে করে, না হয় তার ভ্রান্তি প্রমাণিত করে। উভয় বিষয় ঘৃণা, বিদ্বেষ ও আতংকের কারণ। হযরত আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের কাছে এলেন। আমরা তখন পরস্পর কথা কাটাকাটি করছিলাম। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন ঃ কথা কাটাকাটি পরিহার কর। এতে মঙ্গল কম এবং ভাইদের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি হয়।

জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ মানুষের মধ্যে সর্বাধিক অক্ষম সে ব্যক্তি, যে বন্ধু অন্বেষণে ক্রটি করে এবং এর চেয়েও অক্ষম সে ব্যক্তি, যে বন্ধু লাভ করে হারিয়ে ফেলে। বলাবাহুল্য, অধিক কথা কাটাকাটি হল বন্ধু হারানো, বিচ্ছিন্নতা ও শত্রুতা সৃষ্টির কারণ। হযরত হাসান (রহঃ) বলেন ঃ হাজার ব্যক্তির বন্ধুত্বের বিনিময়ে হলেও এক ব্যক্তির শত্রুতা ক্রয় করবে না। সারকথা, কথা কাটাকাটির একমাত্র কারণ হচ্ছে নিজের জ্ঞান-গরিমা ও শ্রেষ্ঠত্ব অধিক প্রকাশ করা। এতে অহংকার, ঘৃণা, মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতা ইত্যাদি সবকিছু পাওয়া যায়। অতএব ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের মধ্যে এসব বিষয় কিরূপে শামিল হবে? হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত, রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ আপন ভাইয়ের কথা কেটে দিয়ো না, তার সাথে ঠাট্টা করো না এবং এমন ওয়াদা করো না যা পালন করবে না। অন্য এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে ঃ তোমরা মানুষকে টাকা পয়সা দাও, কিন্তু তোমাদের কাছ থেকে তাদের পাওয়া উচিত প্রসন্নতা ও সচ্চরিত্রতা। বলাবাহুল্য, কথা কাটাকাটি করা সচ্চরিত্রতার পরিপন্থী। পূর্ববর্তীগণ এ কাজটি করতে এত ভয় পেতেন যে, তাঁরা বন্ধুর কথা পুনরুক্তি করতেন না। তাঁদের নীতি ছিল, বন্ধুকে যদি বলা হয়, চল, আর সে জিজ্ঞেস করে, কোথায়? তবে তার সঙ্গ ত্যাগ করতে হবে। এক্ষেত্রে চল বলার সাথে সাথে চলা শুরু করতে হবে, জিজ্ঞেস করা যাবে না। আবু সোলায়মান দারানী বলেন ঃ আমার এক বন্ধু ইরাকে বসবাস করত। অভাব অনটনের সময় আমি তার কাছে গিয়ে বলতাম ঃ তোমার অর্থ-সম্পদ থেকে আমাকে কিছু দাও। সে একটি থলে আমার সামনে

রেখে দিত। আমি থলে থেকে প্রয়োজন মত টাকা পয়সা নিয়ে নিতাম। একদিন আমি তার কাছে গিয়ে বললাম ঃ আমার কিছু অর্থের দরকার। সে বলল ঃ কি পরিমাণ? এ কথা শুনতেই বন্ধুত্বের মিষ্টতা আমার অন্তর থেকে উধাও হয়ে গেল। অন্য এক বুযুর্গ বলেন ঃ যখন তুমি তোমার বন্ধুর কাছে কিছু চাও এবং সে জিজ্ঞেস করে– কি করবে? তখন সে ভ্রাতৃত্বের হক বর্জন করে দেয়।

ভ্রাতৃত্বের চতুর্থ হক হচ্ছে, মুখে কথা বলা। কেননা, বন্ধুর সামনে মন্দ কথা বলা থেকে বিরত থাকা যেমন ভ্রাতৃত্বের দাবী, তেমনি বন্ধুর পছন্দীয় কথাবার্তা তার সামনে বর্ণনা তার দাবী। বরং এ বিষয়টি ভ্রাতৃত্বের বৈশিষ্ট্য। কিছু উপকার অর্জনের জন্যেই বন্ধুত্ব স্থাপন করা হয়– অপকার থেকে বেঁচে থাকার জন্যে নয়। চুপ থাকার অর্থ মুখের দ্বারা অপরকে জ্বালাতন না করা। অতএব মানুষের উচিত বন্ধুর সাথে কথা বলা, আলাপ করা এবং প্রয়োজনীয় জিজ্ঞাসাবাদ করা। উদাহরণতঃ বন্ধু পেরেশানীর সম্মুখীন হলে অথবা কোন সংকটে পড়লে তার সাথে সমবেদনা প্রকাশ করবে এবং মুখে বলবে, আমিও তোমার দুঃখে দুঃখিত। যেসব পরিস্থিতিতে বন্ধু সুখী ও আনন্দিত হয়, সেগুলোতেও শরীক হওয়ার কথা মুখে ব্যক্ত করবে। কেননা, সুখে দুঃখে অংশীদার হওয়াই বন্ধুত্বের অর্থ। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ اذا احب احدكم اخاه فليخبره (তোমাদের কেউ তার ভাইকে মহব্বত করলে তাকে মহব্বত সম্পর্কে অবহিত করে দেবে)। কেননা, অবহিত করলে মহব্বত বৃদ্ধি পায়। উদাহরণতঃ যদি কারও প্রতি তোমার মহব্বত হয়ে যায় এবং সে তা না জানে, তবে মহব্বতের উন্নতি হবে না। পক্ষান্তরে সে জানতে পারলে তোমার প্রতিও তার মনে মহব্বত সৃষ্টি হবে। তুমি যখন জানবে, তোমার প্রতি তারও মহব্বত রয়েছে, তখন তার প্রতি তোমার মহব্বত অবশ্যই বেড়ে যাবে। এমনিভাবে উভয়পক্ষ থেকে পলে পলে মহব্বত বৃদ্ধি পেতে থাকবে। শরীয়তে ঈমানদারদের পারস্পরিক মহব্বত কাম্য ও পছন্দনীয়। এ কারণেই শরীয়ত প্রবর্তক রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই মহব্বতের উপায় শিক্ষা দিয়ে বলেছেন ঃ

تهادوا وتحابوا অর্থাৎ, একে অপরকে উপঢৌকন দাও এবং মহব্বত কর।

মুখে বলার আরেক হক হল, বন্ধুর মনপূত নামে তাকে ডাকা। সামনে ও পেছনে তার সেই পছন্দসই নামটি উচ্চারণ করতে হবে। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ তোমরা যদি বন্ধুর সাথে ব্যবহারে তিনটি বিষয় মেনে চল, তবে তোমাদের সাথে তার বন্ধুত্ব-অকৃত্রিম হয়ে যাবে। এক, সাক্ষাৎ করার সময় প্রথমে বন্ধুকে সালাম কর। দুই, যত্ন সহকারে তাকে বসাও। তিন, যে নাম তার পছন্দসই, সে নামে তাকে ডাক। আরেকটি হক হচ্ছে, যার সামনে বন্ধু নিজের তারীফ পছন্দ করে, তার সামনে যেসব গুণ তুমি জান, সেগুলো বর্ণনা কর। এটা মহব্বতে আকৃষ্ট করার একটি বড় উপায়। সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজনের তারীফ করাও তেমনি, কিন্তু এই তারীফ মিথ্যা ও অতিরঞ্জিত না হওয়া উচিত। এর চেয়ে জরুরী বিষয়, যদি অন্য ব্যক্তি বন্ধুর প্রশংসা করে তবে সানন্দে বন্ধুর কাছে এই প্রশংসা বর্ণনা করবে। এটা গোপন করা নিছক হিংসা ছাড়া কিছুই হবে না। আর একটি হক, বন্ধু যদি তোমার সাথে কোন উত্তম ব্যবহার করে, তবে তুমি তার শোকর আদায় করবে। এমন কি, যদি সদ্ব্যবহারের ইচ্ছা করে এবং তা পূর্ণ না হয়, তবুও শোকর আদায় করবে। যে বিষয়টি মহব্বত আকর্ষণে সর্বাধিক কার্যকর তা হচ্ছে, বন্ধুর পেছনে কেউ তাকে মন্দ বললে কিংবা তার মানহানির চেষ্টা করলে তুমি তার পক্ষ সমর্থনে তৎপর হয়ে যাবে এবং বক্তাকে চুপ করিয়ে দেবে। এ পরিস্থিতিতে চুপ থাকা হিংসা ও আন্তরিক ঘৃণার কারণ এবং বন্ধুত্বের হক আদায়ে ত্রুটির পরিচায়ক হবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) দু'বন্ধুকে দু'হাতের সাথে তুলনা করেছেন। এর কারণ এটাই যে, এক বন্ধু অপর বন্ধুর সাহায্য করবে এবং তার স্থলাভিষিক্ত হবে। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে- المسلم اخو المسلم لايظلمه ولايخذله অর্থাৎ, মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার উপর জুলুম করবে না এবং তাকে লাঞ্ছিত করবে না। বন্ধুর নিন্দা শুনা সাক্ষাৎ তাকে লাঞ্ছিত করা এবং শত্রুর হাতে সমর্পণ করার শামিল। কেননা, বন্ধুর ইযযত ক্ষত-বিক্ষত হতে দেয়া তার দেহের মাংস খন্ড-বিখন্ড হতে দেয়ার নামান্তর। একে এরূপ মনে কর, যেমন, কুকুর তোমাকে ছিঁড়ে ফেলছে এবং তোমার মাংসখন্ড ছিটকে দিচ্ছে, কিন্তু তোমার ভাই চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখছে এবং তোমার প্রতি অনুকম্পা করছে না। এ দৃশ্য তোমার কাছে কেমন খারাপ মনে হবে। অথচ ইযযত ভূলুণ্ঠিত হওয়া মাংস খন্ড-বিখন্ড হওয়ার চেয়েও অধিক

অপ্রিয় হয়ে থাকে। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা গীবতকে মৃতের মাংস খাওয়ার সাথে তুলনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ

أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ أَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ অর্থাৎ, তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ করে? বস্তুতঃ তোমরা একে অপছন্দ কর। আত্মা স্বপ্নে লওহে মাহফুয প্রত্যক্ষ করে। ফেরেশতারা এই প্রত্যক্ষ করা বিষয়সমূহকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর আকারে প্রদর্শন করে। তারা গীবতকে মৃতের মাংস খাওয়ার আকারে পেশ করে থাকে। যদি কেউ স্বপ্নে দেখে, সে মৃতের মাংস খাচ্ছে, তবে এর ব্যাখ্যা হবে, সে মানুষের গীবত করে। কেননা, কোন বিষয়কে আকৃতি দান করার সময় ফেরেশতারা সেই বিষয়ের মর্মগত মিলের প্রতিও লক্ষ্য রাখে। এই বক্তব্যের উদ্দেশ্য হল ভ্রাতৃত্বের হকের প্রতি লক্ষ্য রাখা, শত্রুর নিন্দাবাদের সময় বন্ধুর পক্ষ সমর্থন করা এবং নিন্দুকের নিন্দা থেকে তাকে মুক্তি দেয়া ওয়াজিব।

হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ বন্ধুর গীবতের সময় তুমি তাকে এমনভাবে উল্লেখ করবে, যেমন তুমি চাও যে, তোমার গীবতের সময় কেউ তোমাকে উল্লেখ করুক। এমতাবস্থায় দুটি বিষয় হৃদয়ঙ্গম করা তোমার জন্যে উপকারী। প্রথম, মনে কর, যে কথা তোমার বন্ধুর ব্যাপারে কেউ বলল, তা যদি তোমার ব্যাপারে বলা হত এবং তোমার বন্ধু সেখানে উপস্থিত থাকত, তবে তোমার বন্ধুর কাছে তুমি কি আশা করতে? তখন বন্ধুর যে বক্তব্য তোমার পছন্দ হত, তাই তার ব্যাপারে বিদ্রূপকারীদের সাথে তোমার বলা উচিত। দ্বিতীয়, মনে কর, তোমার বন্ধু দেয়ালের পেছনে দন্ডায়মান এবং তোমার বক্তব্য শুনছে। তার ধারণা, তুমি তার উপস্থিতি জান না। তখন তার পক্ষ সমর্থনে তুমি যা বলবে, তাই তার অবর্তমানেও বলা উচিত। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আমার কোন ভাইয়ের আলোচনা তার অনুপস্থিতিতে হলে আমি মনে করে নেই, সে এখানে উপবিষ্ট রয়েছে। ফলে আমি এমন কথা বলি, যা সে উপস্থিত থাকলে পছন্দ করত। অপর এক বুযুর্গ বলেন ঃ যখন আমার বন্ধুর আলোচনা হয়, তখন আমি নিজেকে তার আকৃতিতে মনে করে নেই এবং তার সম্পর্কে এমন কথা বলি, যা আমার সম্পর্কে কেউ বললে পছন্দ করি। মানুষ নিজের জন্যে যা পছন্দ করে, নিজের ভাইয়ের জন্যেও তাই পছন্দ করা খাঁটি মুসলমানী। হযরত আবু দারদা (রাঃ) এক জোয়ালে

দু'টি বলদকে জোতা অবস্থায় দেখলেন, সে দুটো শুয়ে শুয়ে জাবর কাটছে। ইতিমধ্যে একটি বলদ দাঁড়িয়ে শরীর চুলকাতে লাগল। দ্বিতীয় বলদটিও সাথে সাথে দাঁড়িয়ে গেল। তিনি এই দৃশ্য দেখে কেঁদে ফেললেন এবং বললেন ঃ আল্লাহর জন্যে যারা বন্ধুত্ব করে, তাদের অবস্থাও এমনিই। তারা উভয়েই আল্লাহর জন্যে কাজে নিয়োজিত থাকে। একজন দাঁড়ালে অন্যজনও তার অনুরূপ দাঁড়িয়ে যায়। একে অপরের অনুরূপ হওয়ার মাধ্যমেই এখলাস পূর্ণতা লাভ করে। যার মহব্বতে এখলাস নেই সে মোনাফেক। এখলাস হচ্ছে সম্মুখে-পিছনে, মুখে-অন্তরে, ভিতরে-বাইরে এবং একাকিত্বে ও জনসমক্ষে এক রকম হওয়া। এসব ক্ষেত্রে পার্থক্য হওয়াই বন্ধুত্বের ক্রটি এবং ঈমানদারদের পথের বাধা। যে ব্যক্তি নিজেকে সর্বাবস্থায় এক রকম রাখতে সক্ষম নয়, তার উচিত বন্ধুত্বের নাম মুখে না নেয়া এবং নির্জনবাস অবলম্বন করা। কেননা, বন্ধুত্বের হক আদায় করা কঠিন। তওফীকপ্রাপ্ত ব্যক্তিই বন্ধুত্বের বিরাট সওয়াব হাসিল করার যোগ্য। এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি তোমার প্রতিবেশী, তার হক উত্তমরূপে আদায় কর; তুমি মুসলমান হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি তোমার সংসর্গে আছে, তার হক উত্তমরূপে আদায় কর; তুমি ঈমানদার হয়ে যাবে।

বন্ধুত্বের মৌখিক হকসমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে, শিক্ষা ও উপদেশ প্রদান। কেননা, শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অর্থ-সম্পদের প্রয়োজনীয়তার চেয়ে কম নয়। অর্থসম্পদে বন্ধুকে শরীক করা যখন বন্ধুত্বের হক সাব্যস্ত হয়েছে. তখন শিক্ষায় অংশীদার করা আরও উত্তমরূপে বন্ধুত্বের হক। অর্থাৎ, তুমি যদি শিক্ষায় পারদর্শী হও, তবে যেসব শিক্ষা বন্ধুর জন্যে পরকাল ও ইহকালে উপকারী, সেগুলো তাকে শেখাও। তোমার শিক্ষাদানের পর যদি সে তদনুযায়ী আমল না করে, তবে তাকে উপদেশ দেয়া তোমার কর্তব্য। অর্থাৎ, মন্দ কর্মের অনিষ্ট এবং তা বর্জন করার উপকারিতা তার সামনে বর্ণনা কর, যাতে সে কুকর্ম থেকে বিরত থাকে, কিন্তু এসব উপদেশ নির্জনে দেবে, যাতে অন্য কেউ জানতে না পারে। কেননা, জনসমক্ষে উপদেশ দেয়া, লজ্জা দেয়া ও অপমান করার নামান্তর। পক্ষান্তরে একাকিত্বে উপদেশ দেয়া স্নেহ ও হিতাকাঙ্ক্ষার মধ্যে গণ্য। রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

المؤمن مرأة المؤمن। অর্থাৎ, ঈমানদার একজন ঈমানদারের

আয়না। উদ্দেশ্য, সে তার দ্বারা এমন বিষয় জেনে নিতে পারে, যা নিজে নিজে জানতে পারে না। একজন মুমিন তার মুমিন ভাইয়ের মাধ্যমে নিজের দোষ সম্বন্ধে অবগত হতে পারে, যেমন আয়না দ্বারা মানুষের বাহ্যিক দোষসমূহ জেনে নিতে পারে। হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন ঃ যে তার ভাইকে গোপনে বুঝায়, সে তাকে উপদেশ দেয় এবং সৌন্দর্যমন্ডিত করে। আর যে শাসন করে, সে অপমান করে এবং দোষ দেয়। মুসইরকে জিজ্ঞাসা করা হল ঃ যে ব্যক্তি আপনাকে আপনার দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত করে, তাকে আপনি ভালবাসেন কি না? তিনি বললেন ঃ যদি সে আমাকে একান্তে নিয়ে নসীহত করে, তবে অবশ্যই আমি তাকে ভালবাসি। পক্ষান্তরে জনসমক্ষে নসীহত করলে আমি তাকে ভালবাসি না। তিনি ঠিকই বলেছেন। কেননা, জনসমক্ষে নসীহত করা অপমান বৈ কিছুই নয়। কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয়জনকে শাসন করবেন; কিন্তু জনসমক্ষে নয়; বরং তাদেরকে নিজের আশ্রয়ে রেখে আলাদাভাবে তাদের গোনাহ সম্পর্কে গোপনে অবহিত করবেন। তাদের মোহরবন্ধ আমলনামা সেই ফেরেশতাদের হাতে দেয়া হবে, যারা তাদের সাথে জান্নাত পর্যন্ত যাবে। জান্নাতের দরজায় পৌঁছার পর ফেরেশতারা মোহরবন্ধ আমলনামা তাদের হাতে সমর্পণ করবে, যেন তারা তা পাঠ করে নেয়। অপরপক্ষে যারা আল্লাহ তা'আলার ক্রোধের পাত্র, তাদেরকে জনসমক্ষে ডাকা হবে এবং তাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তাদের গোনাহের সাক্ষ্য দেবে। এতে তাদের অপমান লাঞ্ছনা চরমে পৌঁছবে। আল্লাহ তা'আলা সেদিনের অবমাননা থেকে আমাদের সকলকে আপন আশ্রয়ে রাখুন! যুন্নুন মিসরী (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলার সংসর্গ একাত্মতার মাধ্যমে অবলম্বন কর, মানুষের সংসর্গ উপদেশের মাধ্যমে, প্রবৃত্তির সংসর্গ বিরোধিতার মাধ্যমে এবং শয়তানের সংসর্গ শত্রুতার মাধ্যমে অবলম্বন কর।

প্রশ্ন হয়, উপদেশের মধ্যে তো দোষ উল্লেখ করতে হবে। এতে অন্তরে ঘৃণা উৎপন্ন হবে। এমতাবস্থায় উপদেশ ভ্রাতৃত্বের হক কিরূপে হবে? জওয়াব, সে দোষ উল্লেখ করলে অন্তরে ঘৃণা উৎপন্ন হয়, যে দোষের উপস্থিতি বন্ধু নিজে নিজেই জানে, কিন্তু যে দোষ আছে বলে সে নিজে অবগত নয়, সে সম্পর্কে অবগত করা সাক্ষাৎ স্নেহ ও অনুগ্রহ। বন্ধু বুদ্ধিমান হলে এতে তার অন্তর উপদেশদাতার প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট

হবে। নির্বোধদের সম্পর্কে আমাদের কোন বক্তব্য নেই। কেননা, তোমার কোন নিন্দনীয় কাজ অথবা মন্দ অভ্যাস সম্পর্কে কেউ তোমাকে অবহিত করলে এটা এমন হবে, যেমন তোমার কাপড়ের মধ্যে কোন বিচ্ছু অথবা সর্প লুকিয়ে আছে এবং তোমার সর্বনাশ করতে উদ্যত রয়েছে। এমতাবস্থায় অন্য এক ব্যক্তি তোমাকে এই সর্প সম্পর্কে অবহিত করল। এখন তুমি যদি এই ব্যক্তির উপদেশ খারাপ মনে কর, তবে তোমার চেয়ে অধিক নির্বোধ কে হবে? বলাবাহুল্য, মন্দ অভ্যাসসমূহও বিচ্ছু এবং সর্পের মতই মানুষের পরকাল ধ্বংস করে দেয়। কেননা এগুলো মানুষের অন্তরাত্মাকে দংশন করে। এগুলোর বিষ দুনিয়ার সর্প-বিচ্ছুর বিষের চেয়ে অনেক বেশী যন্ত্রণাদায়ক। হযরত ওমর (রাঃ) দোষ সম্পর্কে অবহিত করাকে হাদিয়া আখ্যা দিতেন এবং বলতেন, আল্লাহ তাআলা সে ব্যক্তির প্রতি রহম করুন, যে তার ভাইয়ের কাছে তার দোষের হাদিয়া নিয়ে যায়। এ কারণেই হযরত ওমর (রাঃ) একবার হযরত সালমান (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনার মতে আমার যে দোষ আপনি শুনেছেন, তা বর্ণনা করুন। সালমান বললেন ঃ এ বিষয়ে আমাকে মাফ করুন, কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ) পীড়াপীড়ি করলে তিনি বললেন ঃ আমি শুনেছি, আপনার কাছে দু'টি পোশাক আছে। একটি দিনে পরিধান করেন অপরটি রাতের বেলায়। আমি আরও শুনেছি, আপনি দস্তরখানে দু'প্রকার ব্যঞ্জন একত্রিত করেন। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন ঃ এগুলোর জন্যে চিন্তা করবেন না। এ দুটি ছাড়া আরও কিছু শুনেছেন কি? বললেন ঃ না। হুযায়ফা মারআশী একবার ইউসুফ ইবনে সাবাকে লেখেন ঃ আমি শুনেছি তুমি তোমার ধর্ম দুপয়সার বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছ। জনৈক দুধওয়ালা বন্ধুকে তুমি দুধের দাম জিজ্ঞেস করলে সে ছয় পয়সা চাইল, তুমি চার পয়সা বললে সে দিয়ে দিল। অতএব তুমি তোমার মাথার উপর থেকে গাফেলদের পাল্লা নামিয়ে দাও এবং অনবধানতার নিদ্রা থেকে জাগ্রত হও। জেনে রাখ, যে কোরআন পাঠ করে এবং এতে ধনী না হয়ে দুনিয়াদার হয়ে যায়, আমার আশংকা, না জানি সে আল্লাহর আয়াতসমূহের সাথে ঠাট্টাকারী হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা মিথ্যুকদের এই বিশ্লেষণ উল্লেখ করেছেন যে, তারা উপদেশদাতাকে শত্রু মনে করে। এরশাদ হয়েছে–

وَلٰكِنْ لَّا يُحِبُّوْنَ النّٰصِحِيْنَ অর্থাৎ, কিন্তু তারা নসীহতকারীদেরকে ভালবাসেন না।

কিন্তু তুমি যদি জান, তোমার বন্ধু নিজের দোষ সম্পর্কে অবগত থাকা সত্ত্বেও তা ত্যাগ করতে পারছে না, তবে লক্ষ্য করবে সে তা গোপন করে কিনা। যদি গোপন করে, তবে তুমি তা ফাঁস করবে না। আর যদি দোষটি প্রকাশ্যে করে, তবে নম্রতা সহকারে উপদেশ দেবে। যাতে সে তোমার কাছ থেকে পলায়ন না করে। যদি জানা যায়, উপদেশ তার মধ্যে ক্রিয়া করবে না এবং সে নিজের মন থেকে বাধ্য, তবে উপদেশ না দিয়ে চুপ থাকাই উত্তম। এসব কথা সেসব বিষয়ে, যেগুলো বন্ধুর ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্ক রাখে এবং তোমার হকে ত্রুটি করার সাথে সম্পর্ক রাখে। এগুলোতে সহনশীল হওয়া এবং মার্জনা করা ওয়াজিব। অবশ্য বিষয়গুলো যদি এমন হয় যে, মেলামেশা বর্জনে উদ্বুদ্ধ করে, তবে নিরালায় শাসন করা বন্ধুত্ব বর্জন করার চেয়ে উত্তম। শাসনও ইশারা-ইঙ্গিতে করা পরিষ্কার ভাষায় করার চেয়ে ভাল এবং কাগজে লেখে দেয়া মৌখিক বলা অপেক্ষা উত্তম। সহ্য করা সর্বাধিক উত্তম। কেননা, তোমার বন্ধুত্বের উদ্দেশ্য তার সম্মান করা ও হক আদায় করা হওয়া উচিত। এরূপ নিয়ত করা উচিত নয় যে, তাকে তুমি তোমার কাজে লাগাবে এবং সে তোমার সাথে নম্রতা করবে। আবু বকর কাত্তানী বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি আমার সংসর্গে থাকতে লাগল, যা আমার মনের উপর কঠিন ছিল। আমি একদিন তাকে একটি বস্তু দিয়ে দিলাম, যাতে আমার মনের বিরুদ্ধ ভাব দূর হয়ে যায়; কিন্তু তা দূর হল না। এর পর আমি তার হাতে ধরলাম এবং কক্ষের ভেতরে নিয়ে গিয়ে বললাম ঃ তোমার পা আমার গালে রাখ। সে অস্বীকার করলে আমি বললাম ঃ অবশ্যই রাখতে হবে। অতঃপর সে তার পা আমার গালে রাখল। এতে আমার মন থেকে বিরুদ্ধ ভাবটি চলে গেল। আবু আলী রাবতী বলেন ঃ আমি আবদুল্লাহ রাযীর সংসর্গ অবলম্বন করতে চাইলাম। তিনি জঙ্গলে গমন করতেন। আমার বাসনা শুনে তিনি বললেন ঃ শাসক আপনিই হবেন। তিনি বললেন ঃ তা হলে আমার প্রত্যেকটি কথা তোমাকে মানতে হবে। আমি বললাম ঃ শিরোধার্য। এর পর তিনি একটি থলিয়ায় সফরের আসবাবপত্র রাখলেন এবং নিজের পিঠে তুলে নিলেন। আমি যখনই তাকে বলতাম, বোঝাটি আমাকে দিন, তিনি বলতেন ঃ আমি শাসক নই কিনা? আমার কথা মান্য করা তোমার কর্তব্য। এক রাতে বৃষ্টি বর্ষিত হতে লাগল। তাঁর কাছে ছিল একটি চাদর। তিনি আমাকে বসিয়ে দিয়ে

সকাল পর্যন্ত আমার উপর চাদর টেনে দাঁড়িয়ে রইলেন। আমি তখন মনে মনে বলছিলাম ঃ হায়, আমি যদি তাঁকে শাসক মেনে না নিতাম।

বন্ধুত্বের পঞ্চম হক হচ্ছে, বন্ধুর ভুল-ক্রুটি ও অপরাধ মার্জনা করা। বন্ধুর ভুল-ক্রুটি দু'প্রকার হতে পারে। (এক), কোন গোনাহ করার মাধ্যমে ধর্ম কর্মে ক্রুটি করবে, না হয় (দুই), বিশেষভাবে তোমার হকে ক্রুটি করবে। গোনাহ্ করা অথবা গোনাহের উপর কায়েম থাকার কারণে যে ক্রুটি হয় তার জন্যে তোমার উচিত তাকে নম্রভাবে নসীহত করা, যাতে তার বক্রতা দূর হয়ে যায় এবং সে পরহেযগারীর দিকে ফিরে আসে। যদি তুমি নম্রভাবে নসীহত করতে না পার এবং সে গোনাহের উপরই কায়েম থাকে, তবে এরূপ ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব বহাল রাখা অথবা সম্পর্কচ্ছেদ করার ব্যাপারে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের অভিমত বিভিন্ন রূপ। হযরত আবু যর (রাঃ) বলেন ঃ যখন কারও বন্ধু নিজের অবস্থা পাল্টে দেয়, তখন ভাল অবস্থার কারণে যেমন তাকে মহব্বত করেছিল, তেমনি মন্দ অবস্থার কারণে তাকে পরিত্যাগ করা উচিত। তাঁর মতে এটাই হচ্ছে আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বত ও শক্রতার দাবী। হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) ও অন্য কয়েকজন সাহাবী বলেন ঃ যখন তোমার বন্ধুর অবস্থা বদলে যায় এবং পূর্বের অবস্থা না থাকে, তখন এ কারণে তাকে পরিত্যাগ করো না। কেননা, মানুষ কখনও সৎ থাকে এবং কখনও অন্যায় করে ফেলে। সর্বদা এক অবস্থার উপর অটল থাকে না। হযরত নখয়ী (রহঃ) বলেন ঃ তোমার বন্ধু কোন গোনাহ করলে এই গোনাহের কারণে তার সাথে সাক্ষাৎ বর্জন করো না। কেননা, সে আজ গোনাহ করবে– কাল ছেড়ে দেবে। তিনি আরও বলেন ঃ মানুষের সাথে আলেমের ক্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে আলোচনা করো না। কেননা, আলেম ক্রুটি-বিচ্যুতি করে; কিন্তু পরে তা ছেড়ে দেয়। এক হাদীসে আছে– আলেমের ক্রুটি-বিচ্যুতিকে ভয় কর এবং তার সাথে সাক্ষাৎ বর্জন করো না। আশা কর, সে তার কর্মকান্ড পরিত্যাগ করবে। হযরত ওমর (রাঃ) এক ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব করেছিলেন। সে মদীনা ত্যাগ করে সিরিয়ায় চলে গিয়েছিল। একবার এক ব্যক্তি সিরিয়া থেকে মদীনায় আগমন করলে তিনি তাকে শুধালেন ঃ আমার অমুক ভাই কেমন আছে? লোকটি আরজ করল ঃ সে আপনার ভাই হবে কেন? সে তো শয়তানের ভাই। তিনি কারণ জিজ্ঞেস করলে লোকটি বলল ঃ সে অনেক কবীরা গোনাহ্ করেছে এবং অবশেষে মদ্যপান শুরু করেছে। হযরত ওমর

(রাঃ) বললেন ঃ তুমি যখন সিরিয়ায় ফিরে যাও, তখন আমাকে খবর দিয়ো। লোকটি সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হলে হযরত ওমর (রাঃ) একটি চিঠিতে লেখলেন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - حٰمٓ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ -

অর্থাৎ, এই কিতাব পরাক্রমশালী জ্ঞানময় আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ, যিনি পাপ ক্ষমা করেন, তওবা কবুল করেন, যিনি শাস্তিদানে কঠোর, শক্তিশালী। তিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। প্রত্যাবর্তন তাঁরই দিকে। এর পর তিরস্কার ও ভর্ৎসনার কথা লেখলেন। লোকটি পত্র পাঠ করে বলল ঃ আল্লাহ তা'আলা ঠিক বলেছেন এবং ওমর আমাকে নসীহত করেছেন। এর পর সে তওবা করে পূর্বাবস্থায় ফিরে গেল। কথিত আছে, এক ব্যক্তি কারও প্রতি আসক্ত হওয়ার পর তার আল্লাহর ওয়াস্তের বন্ধুকে নিজের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করে বলল ঃ আমি অপরাধ করেছি। এখন তুমি যদি আমার সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক না রাখতে চাও, তবে রেখো না। সে জওয়াব দিল ঃ আমি এরূপ নই যে, তোমার ত্রুটির কারণে বন্ধুত্ব খতম করে দেব। এর পর সে আল্লাহ তা'আলার সাথে প্রতিজ্ঞা করল, যে পর্যন্ত বন্ধুকে কাম প্রবৃত্তি থেকে উদ্ধার করা না হয়, সে পানাহার কিছুই করবে না। অতঃপর সে অনশন শুরু করল। সে প্রত্যেক দিন তার বন্ধুকে অবস্থা জিজ্ঞেস করত। বন্ধু বলত ঃ অন্তর পূর্বাবস্থায়ই অটল রয়েছে। সে দুঃখে ও ক্ষুধায় দিন দিন কাতর হতে লাগল। অবশেষে বিনা পানাহারে চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়ে গেল। এর পর বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলে সে বলল ঃ আমার অন্তর থেকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রতি কামাসক্তি সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেছে।

অনুরূপ আর একটি প্রচলিত গল্প হচ্ছে, পূর্ববর্তীগণের মধ্যে দু'বন্ধু ছিল। তাদের একজন সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ল। জনৈক ব্যক্তি অপর বন্ধুকে বলল ঃ আপনি তার সাথে দেখাসাক্ষাৎ ত্যাগ করেন না কেন? সে তো পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। বন্ধু বলল ঃ এ সময়েই তো তার কাছে থাকা আমার জন্যে অধিক জরুরী। এ দুঃসময়ে তাকে বর্জন করব কিরূপে? এখন তার হাত ধরে নম্র ভাষায় তাকে বুঝাব এবং পূর্বেকার

অবস্থায় ফিরে আসতে বলব। কবি সত্যই বলেছেন–

دوست ان دانم كه گيرد دست درست
درپريشان حالى ودرماندگى -

সংকট মুহূর্তে যে বন্ধুর হাত ধরে; আমি তাকেই সত্যিকার বন্ধু মনে করি।

বনী ইসরাঈলের গল্পে বর্ণিত আছে, দু'বন্ধু এক পাহাড়ে বসে এবাদত করত। তাদের একজন গোশত কেনার জন্যে পাহাড়ের পাদদেশে নেমে এল। সে কসাইয়ের দোকানে এক বেশ্যাকে দেখে তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ল এবং নির্জনে তার সাথে কুকর্ম করল। তিন দিন পর্যন্ত সে বেশ্যার কাছেই পড়ে রইল এবং লজ্জার কারণে বন্ধুর কাছে ফিরে গেল না। বন্ধু তিন দিন তাকে না দেখে শহরে চলে এল এবং মানুষের কাছে জিজ্ঞেস করে করে বেশ্যার বাড়ীতে তার সন্ধান পেল। দেখামাত্রই সে তার গলা জড়িয়ে ধরল এবং চুম্বনের পর চুম্বন করতে লাগল। প্রথমোক্ত বন্ধু নিজের অপরাধের কারণে অত্যন্ত লজ্জিত ছিল বিধায় বলতে লাগল ঃ তুমি কে? আমি তোমাকে চিনি না। সে বলল ঃ বন্ধু, তোমার অবস্থা আমি জেনে ফেলেছি। এ সময়ে তুমি আমার যতটুকু প্রিয়, ততটুকু পূর্বে কখনও ছিলে না। বন্ধু যখন দেখল, অপরাধ করা সত্ত্বেও সে তাকে অবজ্ঞার চোখে দেখছে না, তখন তার সাথে চলে এল এবং পূর্বে যেমন ছিল, তেমনি হয়ে গেল। অপরাধী বন্ধুর ব্যাপারে পূর্ববর্তীগণের এটাই ছিল নীতি। এ নীতি হযরত আবু যর (রাঃ)-এর নীতি অপেক্ষা অধিক সূক্ষ্ম এবং বিচক্ষণতাপূর্ণ। তবে তাঁর নীতিও নিঃসন্দেহে ভাল এবং নিরাপদ। প্রশ্ন হতে পারে, গোনাহগারের সাথে তো শুরুতেই বন্ধুত্ব করা জায়েয নয়। অতএব বন্ধু গোনাহ করলে তার কাছ থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া ওয়াজিব হওয়া উচিত। এমতাবস্থায় পূর্ববর্তীগণের নীতি অধিক সূক্ষ্ম এবং বিচক্ষণতাপূর্ণ হবে কিরূপে? জওয়াব হচ্ছে, এ নীতির মধ্যে নম্রতা, অন্তরকে আকৃষ্ট করা এবং অনুকম্পা বিদ্যমান রয়েছে। ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি গোনাহ থেকে ফিরে এসে তওবা করতে পারে। কেননা, সংসর্গ ও মেলামেশা অব্যাহত থাকার কারণে লজ্জা ও অনুতাপ উত্তরোত্তর স্থায়িত্ব লাভ করবে। পক্ষান্তরে অপরাধী সংসর্গ আশা করতে না পারলে গোনাহের উপর স্থির থেকে যাবে। বিচক্ষণতার সাথে এ নীতিটি অধিক

সামঞ্জস্যশীল হওয়ার কারণ, বন্ধুত্ব আত্মীয়তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে যায়। বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়ে গেলে তার হক দৃঢ় ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং তা বজায় রাখা ওয়াজিব হয়। বন্ধুত্ব বজায় রাখা এবং তা মেনে চলার এক পন্থা হচ্ছে প্রয়োজনের মুহূর্তে বন্ধুকে ত্যাগ না করা। ধর্মীয় প্রয়োজন অন্য সকল প্রয়োজনের তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ। গোনাহ্ করার কারণে বন্ধু যে বিপদে পতিত হয়, তার কারণে ধর্মীয় প্রয়োজন প্রবল হয়ে দেখা দেয়। এমতাবস্থায় তার রেয়াত করা, তাকে পরিত্যাগ না করা এবং তার প্রতি নম্রতা প্রদর্শন করা একান্ত জরুরী, যাতে এই ব্যবহার তাকে বিপদমুক্তিতে সহায়তা করে। বস্তুতঃ বিপদাপদের জন্যেই বন্ধুত্ব হয়। ধর্ম নষ্ট হওয়ার মত বড় বিপদ আর কি হতে পারে? গোনাহ্গার ব্যক্তি যখন কোন পরহেযগারের সংসর্গে থাকে এবং তার খোদাভীতি ও ওজিফা প্রত্যক্ষ করে, তখন কিছু দিনের মধ্যে সেও গোনাহ্ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং গোনাহের উপর স্থির থাকতে লজ্জাবোধ করে। যেমন, কোন অলস ব্যক্তি কোন কর্মপটুর সাথে থাকলে সে অলস থাকতে পারে না। কর্মপটু হয়ে যায়। জাফর ইবনে সোলায়মান বলেন ঃ যখন আমার আমলে শৈথিল্য দেখা দেয় তখন মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসে'কে দেখি এবং এবাদতে তাঁর একাগ্রতার কথা কল্পনা করি। এতে আমার এবাদতের আনন্দ পূর্ববৎ হয়ে যায়। অলসতা দূর হয়ে যায় এবং আমি এক সপ্তাহ পর্যন্ত খুব কর্মচঞ্চল থাকি। এ সম্পর্কে সুচিন্তিত বক্তব্য, বন্ধুত্ব বংশগত ক্রমধারার অনুরূপ। গোনাহের কারণে বংশের কাউকে পরিত্যাগ করা উচিত নয়। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা নবী করীম (সাঃ)-কে তাঁর নিকট আত্মীয়দের সম্পর্কে এরশাদ করেন ঃ

فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ অর্থাৎ, যদি তারা আপনার নাফরমানী করে, তবে বলে দিন ঃ আমি তোমাদের কর্ম থেকে মুক্ত।

এখানে আমি তোমাদের থেকে মুক্ত একথা বলা হয়নি। বলাবাহুল্য, আত্মীয়তা ও বংশগত অধিকারের খাতিরেই এরূপ বলা হয়নি। হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন। তাঁকে বলা হল ঃ আপনার অমুক ভাই এমন সব গোনাহে জড়িয়ে পড়েছে, আপনি তাকে পরিত্যাগ করেন না কেন? তিনি বললেন ঃ আমি তার কর্মকাণ্ড খারাপ মনে করি, কিন্তু সে আমার ভাই, তাকে পরিত্যাগ করতে পারি না। ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ব

আত্মীয়তার ভ্রাতৃত্বের তুলনায় অধিক দৃঢ় হয়ে থাকে। জনৈক দার্শনিককে প্রশ্ন করা হল ঃ ভাই ও বন্ধুর মধ্যে আপনার কাছে কে অধিক প্রিয়? তিনি জওয়াব দিলেন ঃ আমি ভাইকেও তখন মহব্বত করি, যখন সে আমার বন্ধু হয়। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ তোমার অনেক ভাই তোমার মায়ের গর্ভে থেকে জন্মগ্রহণ করেনি। এ কারণেই বলা হয়েছে, আত্মীয়তা বন্ধুত্বের মুখাপেক্ষী, কিন্তু বন্ধুত্ব আত্মীয়তার মুখাপেক্ষী নয়। হযরত ইমাম জাফর সাদেক (রঃ) বলেন ঃ এক দিনের বন্ধুত্ব সৌজন্য, এক মাসের বন্ধুত্ব আত্মীয়তা এবং এক বছরের বন্ধুত্ব নিকট আত্মীয়তা। যে কেউ এটা ছিন্ন করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে ছিন্ন করবেন। মোট কথা, বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়ে যাওয়ার পর তা বজায় রাখা ওয়াজিব। তবে প্রথমেই গোনাহগারের সাথে বন্ধুত্ব নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ, পূর্ব থেকে তার কোন হক থাকে না। পূর্ব থেকে যদি তার আত্মীয়তার হক থাকে, তবে তার সাথে সাক্ষাৎ বর্জন করা উচিত নয়; বরং ভাল ব্যবহার করা উচিত। এর প্রমাণ, প্রথমেই বন্ধুত্ব না করা নিন্দনীয়ও নয়, অপছন্দনীয়ও নয়; বরং বলা হয়, একাকিত্বই উত্তম, কিন্তু ভ্রাতৃত্ব চিরতরে ছিন্ন করতে নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত আছে। এটা স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে খারাপ। এটা তালাক ও বিবাহের মতই। বিবাহ না করার চেয়ে তালাক দেয়া আল্লাহ তাআলার কাছে অধিক দূষণীয়। রসূলে করীম (সাঃ) ভ্রাতৃত্ব ছিন্ন করার ব্যাপারে এরশাদ করেন ঃ

شرار عباد الله المشاءون بالنميمة والمفرقون بين الاحبة ـ

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার দুষ্ট বান্দা তারাই যারা পরনিন্দা করে বেড়ায় এবং বন্ধুদের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে।

জনৈক পূর্ববর্তী বুযুর্গ বলেন ঃ শয়তান চায় তোমার বন্ধু এমন কোন কাজ করুক, যদ্দরুন তুমি তাকে পরিত্যাগ কর এবং মেলামেশা বর্জন কর। এখন তুমি যদি তাই কর, তবে শয়তানের মনোবাঞ্ছাই পূর্ণ হবে এবং তার উভয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। অর্থাৎ, মানুষকে গোনাহে জড়িত করা যেমন শয়তানের কাম্য, তেমনি বন্ধুদের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়াও তার পছন্দনীয়। সুতরাং কোন বন্ধু যখন ভুল করে এবং শয়তানের এক উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যায়, তখন বন্ধুর সাথে দেখাশোনা বর্জন করে শয়তানের দ্বিতীয়

উদ্দেশ্য পূর্ণ করার আবশ্যকতা আছে কি? এক ব্যক্তি গোনাহ করার পর অপর ব্যক্তি যখন তাকে গালিগালাজ করল, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) দ্বিতীয় ব্যক্তিকে ধমকে দিলেন এবং বললেন ঃ আপন ভাইয়ের বিরুদ্ধে শয়তানের সাহায্যকারী হয়ো না। অর্থাৎ, এক উদ্দেশ্য তো তার সিদ্ধ হয়ে গেছে, দ্বিতীয়টি তুমি সিদ্ধ করো না।

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে বন্ধুত্ব অব্যাহত রাখা এবং প্রথমে বন্ধুত্ব না করার মধ্যে পার্থক্য ফুটে উঠেছে। একে এভাবেও বলা যায়, গোনাহ্গারদের সাথে মেলামেশা যেমন নিষিদ্ধ, তেমনি বন্ধুদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করাও নিষিদ্ধ। সুতরাং বিষয় দুটি পরস্পর বিরোধী, কিন্তু বন্ধুত্বের হক মানতে থাকা অপরটিকে জোরদার করে। তাই এটাই উত্তম।

এ পর্যন্ত বন্ধুর ধর্ম সম্পর্কিত ত্রুটিবিচ্যুতির অবস্থা বর্ণিত হল। যেসকল ত্রুটি-বিচ্যুতি বিশেষভাবে বন্ধুর সাথে সম্পর্কযুক্ত, সেগুলো সকলের মতেই মার্জনা করা উত্তম; বরং যেসকল ত্রুটির কোন ভাল অজুহাত হতে পারে, সেগুলো সেই অর্থেই ধরে নেয়া ওয়াজিব। সেমতে বলা হয়, বন্ধুর জন্য তার বন্ধুর অপরাধের কোন ওযর বের করা উচিত। এর পরও মন না মানলে নিজেকেই ধিক্কার দেবে এবং বলবে ঃ তুই কেমন পাষাণ যে, তোর বন্ধু ওযরখাহী করে, আর তুই মানিস না? এতে বুঝা যায়, তুই-ই দোষী– বন্ধুর অপরাধ নয়। সুতরাং বন্ধুকে ভাল বলা সম্ভব না হলে কমপক্ষে তার প্রতি রাগ করবে না, কিন্তু তা হতে পারে না। কেননা, ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন ঃ যাকে ক্রুদ্ধ করা হয়; কিন্তু সে ক্রুদ্ধ হয় না, সে গাধা যাকে মানানো হয়, কিন্তু সে মানে না, সে শয়তান সুতরাং মানুষের জন্যে গাধা হওয়াও উচত নয় এবং শয়তান হওয়াও উচিত নয়। বরং নিজেই বন্ধুর স্থলবর্তী হয়ে নিজেকে মানাবে এবং না মেনে শয়তান হওয়া থেকে বিরত থাকবে।

বন্ধু সত্য মিথ্যা যে কোন ওযর পেশ করুক, তা মেনে নেয়া উচিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

من اعتذر اليه اخوه فلم يقبل عذره فعليه مثل اثم صاحب المكس -

অর্থাৎ. যার সামনে তার ভাই ওযর পেশ করে এবং সে কবুল করে না, তার সে ব্যক্তির মত পাপ হবে, যে বলপূর্বক কর আদায় করে।

অন্য এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে ঃ

المؤمن سريع الغضب سريع الرضاء ـ

অর্থাৎ, মুমিন দ্রুত রাগ করে এবং দ্রুত রাযী হয়ে যায়।

এখানে মুমিন রাগ করে না বলা হয়নি। অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ والكاظمين الغيظ অর্থাৎ, এবং যারা ক্রোধ দমন করে। এখানে "যারা ক্রোধ করে না" বলা হয়নি। এর কারণ, অভ্যাসের দিক দিয়ে এটা সম্ভবপর নয় যে, কাউকে আঘাত করা হবে, আর সে ব্যথা অনুভব করবে না। অবশ্য আঘাত সহ্য করা এবং রাগ হজম করে নেয়া সম্ভব। এমতাবস্থায় রাগের বিপরীত আমল করা যায়। রাগ প্রতিশোধ নেয়ার দাবী করে। এখানে প্রতিশোধ বর্জন করা তো সম্ভব, কিন্তু রাগ অন্তর থেকে সম্পূর্ণ বহিষ্কার করা সম্ভব নয়।

আবু সোলায়মান দারানী আহমদ ইবনে আবিল হাওয়ারী (রঃ) থেকে বর্ণনা করেন, এ যুগে তুমি কারও সাথে বন্ধুত্ব করলে বন্ধুর কোন মন্দ বিষয় জেনে তাকে শাসন করো না। যদি শাসন কর তবে জওয়াবে পূর্বের চেয়েও মন্দ বিষয় দেখার আশংকা রয়েছে। আহমদ বলেন ঃ আমি বিষয়টি পরীক্ষা করে সত্য পেয়েছি। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ বন্ধুর অপরাধে সবর করা তাকে শাসন করার চেয়ে ভাল। শাসন করা দেখা সাক্ষাৎ বর্জনের তুলনায় এবং দেখা সাক্ষাৎ বর্জন গীবত করার তুলনায় উত্তম। গীবত করার সময় শত্রুতায় বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً ـ

অর্থাৎ, আশা করা যায়, আল্লাহ তোমাদের মধ্যে ও শত্রুদের মধ্যে সম্প্রীতি সৃষ্টি করে দেবেন। নবী করীম (সাঃ) বলেন ঃ

احبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما

وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ـ

অর্থাৎ, তোমার বন্ধুকে মাঝারি ধরনের মহব্বত কর। সে হয় তো কোনদিন তোমার শত্রু হয়ে যাবে। তোমার শত্রুর সাথে মাঝারি ধরনের শত্রুতা রাখ। হয় তো সে কোন দিন তোমার বন্ধু হয়ে যাবে।

বন্ধুত্বের ষষ্ঠ হক হল বন্ধুর জন্যে তার জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরে এমন দোয়া করা, যা নিজের জন্যে পছন্দ করা হয়। অনুরূপভাবে তার পরিবার ও আত্মীয়দের জন্যে দোয়া করা। নিজের জন্যে যেমন দোয়া করবে, বন্ধুর জন্যেও তেমনি দোয়া করবে। কেননা, বাস্তবে তার জন্যে দোয়া করার মানেই নিজের জন্যে দোয়া করা। রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

اذا دعا الرجل لاخيه بظهر الغيب قال الملك لك مثل ذلك ـ

অর্থাৎ, যখন কেউ তার বন্ধুর অনুপস্থিতিতে তার জন্য দোয়া করে, তখন ফেরেশতা বলে ঃ তোমার জন্যেও অনুরূপ হবে। এক রেওয়ায়েতে ফেরেশতা বলে কথাটির স্থলে বলা হয়েছে– আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ আমি এ দোয়া প্রথমে তোমার জন্যে কবুল করব। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে ঃ বন্ধুর জন্যে দোয়া করলে এত কবুল হয়, যা নিজের জন্যে করলে হয় না। আর এক হাদীসে আছে– دعوة الرجل لاخيه فى الغيب لاترد অর্থাৎ, বন্ধুর অনুপস্থিতে তার জন্যে যে দোয়া করা হয়, তা প্রত্যাখ্যাত হয় না। হযরত আবু দারদা বলেন ঃ আমি সেজদায় আমার সত্তর জন বন্ধুর জন্যে তাদের নাম নিয়ে নিয়ে দোয়া করি। মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ইস্পাহানী বলেন ঃ এমন সৎ বন্ধু পাওয়া কঠিন, যে তোমার মৃত্যুর পর পরিবারের লোকেরা যখন তোমার ত্যাজ্য সম্পত্তি বণ্টন করে এবং তোমার পরিত্যক্ত সম্পত্তি পেয়ে সুখে মত্ত থাকে, তখন সে একা তোমার জন্যে দুঃখ করে, তোমার অতীত আমল ও ভবিষ্যৎ অবস্থা সম্পর্কে শংকাবোধ করে এবং রাতের অন্ধকারে তোমার জন্যে দোয়া করে; অথচ তুমি মাটির স্তূপের নীচে পড়ে থাক। এ ব্যাপারে সে ফেরেশতাদের অনুসরণ করে। হাদীসে আছে– যখন কেউ মারা যায়, তখন লোকে বলে ঃ কি ছেড়ে গেছে? ফেরেশতারা বলে ঃ পরবর্তী জীবনের জন্যে কি পাঠিয়েছে? অতীত আমল ভাল হলে ফেরেশতারা খুশী হয়, তার অবস্থা জিজ্ঞেস করে এবং তার জন্যে সুপারিশ করে। কথিত

আছে, বন্ধুর মৃত্যুর খবর পেয়ে যে ব্যক্তি তার মাগফেরাতের জন্যে দোয়া করে, তাকে এমন লেখা হবে যেন সে জানাযায় উপস্থিত ছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, কবরে মৃতের অবস্থা পানিতে নিমজ্জিত হওয়ার মত হয়। যে পানিতে ডুবতে থাকে, সে সবকিছুরই আশ্রয় নিতে চায়। মৃত ব্যক্তিও নিজের পুত্র, পিতা, ভ্রাতা অথবা আত্মীয়দের দোয়ার প্রতীক্ষায় থাকে। মৃতদের কবরে জীবিতদের দোয়ায় পাহাড়সম নূর এসে যায়। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ মৃতদের জন্যে দোয়া জীবিতদের উপঢৌকনের মত। এক ফেরেশতা দোয়াকে একটি নূরের খাঞ্চায় রেখে নূরের রুমাল দ্বারা আবৃত করে মৃতের কাছে নিয়ে যায় এবং বলে ঃ এই উপঢৌকন তোমার অমুক বন্ধু অথবা অমুক আত্মীয় পাঠিয়েছে। মৃত ব্যক্তি এতে আনন্দিত হয়, যেমন জীবিতরা উপঢৌকন পেয়ে আনন্দিত হয়।

বন্ধুত্বের সপ্তম হক 'ওফা' (বন্ধুত্ব রক্ষাকরণ) ও এখলাস। ওফার অর্থ হল, বন্ধুর জীবদ্দশা পর্যন্ত বন্ধুত্বের উপর দৃঢ় থাকা এবং তার মৃত্যুর পর তার সন্তান-সন্ততি, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে বন্ধুসুলভ ব্যবহার অব্যাহত রাখা। কেননা, বন্ধুত্বের উদ্দেশ্য হচ্ছে আখেরাতে উপকার লাভ। যদি মৃত্যুর পূর্বেই বন্ধুত্ব খতম হয়ে যায়, তবে এত পরিশ্রম ও চেষ্টা অর্থহীন হয়ে যাবে। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আখেরাতে যে সাত ব্যক্তি আল্লাহ্র ছায়ায় স্থান পাবে, তাদের সম্পর্কে বলেন ঃ তাদের মধ্যে দু'ব্যক্তি তারা, যারা পরস্পর আল্লাহ্র ওয়াস্তে বন্ধুত্ব করেছে, তার উপরই স্থির রয়েছে এবং দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ মৃত্যুর পর অল্প ওফাও জীবদ্দশার অনেক ওফা অপেক্ষা উত্তম। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এক বৃদ্ধার তাযীম করেছিলেন। তাঁকে বৃদ্ধার অবস্থা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ এই বৃদ্ধা খাদীজার আমলে আমার কাছে আসত। মোট কথা, বন্ধুর সকল বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনের সম্মান করা বন্ধুত্ব রক্ষার অন্তর্ভুক্ত। তাদের সম্মান প্রদর্শনের প্রভাব বন্ধুর মনে তার নিজের সম্মান করার তুলনায় বেশী হয়। স্নেহ ভালবাসার জোর তখনই জানা যায়, যখন তা বন্ধুকে অতিক্রম করে তার আত্মীয়-স্বজন পর্যন্ত পৌঁছায়। এমনকি, বন্ধুর দরজার কুকুরকে অন্যান্য কুকুরের উপর অগ্রাধিকার দেয়া হয়। সর্বক্ষণ বন্ধুত্ব রক্ষা করা না হলে শয়তান সুযোগ পেয়ে যায়। কেননা, যারা আল্লাহর ওয়াস্তে বন্ধুত্ব

করে, তাদের প্রতি শয়তানের যে হিংসা হয়, তা সেই দু'ব্যক্তির প্রতি হয় না, যারা কোন ভাল কাজে একে অপরের সহায়তা করে। শয়তান সর্বদা বন্ধুদের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করার চেষ্টায় থাকে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ

وَقُلْ لِّعِبَادِىْ يَقُوْلُ الَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ اِنَّ الشَّيْطٰنَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ -

অর্থাৎ, আমার বান্দাদেরকে বলে দিন, তারা যেন উত্তম কথাই বলে, শয়তান তাদের পরস্পরের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করে থাকে।

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর অবস্থা সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَقَدْ اَحْسَنَ بِىْٓ اِذْ اَخْرَجَنِىْ مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِّنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ اَنْ نَّزَغَ الشَّيْطٰنُ بَيْنِىْ وَبَيْنَ اِخْوَتِىْ -

অর্থাৎ, তিনি আমার প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন করেছেন যখন আমাকে জেল থেকে বের করেছেন এবং আপনাদেরকে গ্রাম থেকে নিয়ে এসেছেন; শয়তান আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করার পর।

বলা হয়, যখন দু'ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বত করে, তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ তখনই হতে পারে যখন তাদের কেউ গোনাহ করে। বিশর (রঃ) বলতেন ঃ যখন বান্দা আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে ত্রুটি করে, তখন আল্লাহ তার কাছ থেকে তার বন্ধুকে ছিনিয়ে নেন। এ কারণেই হযরত ইবনে মোবারক বলেন ঃ বন্ধুদের সাথে বসা এবং মিতব্যয়িতার দিকে ফিরে আসাই সর্বাধিক সুস্বাদু বস্তু। যে মহব্বত আল্লাহর ওয়াস্তে হয়, তাকেই চিরন্তন মহব্বত বলা হয়। আর যে মহব্বত কোন স্বার্থের ভিত্তিতে হয়, তা সে স্বার্থ দূর হয়ে গেলেই বিদূরিত হয়ে যায়। আল্লাহর জন্যে মহব্বতের এক ফল এই যে, এতে ধর্মীয় ও জাগতিক কোন ব্যাপারেই হিংসা হয় না। হিংসার কোন কারণও নেই। কেননা, এক বন্ধুর যে সম্পদ থাকে, তার উপকারিতা অপর বন্ধু পায়। আল্লাহ তাআলা এরূপ বন্ধুদেরকে এ গুণেই বিশেষিত করেছেন। তিনি বলেন ঃ

وَلَا يَجِدُوْنَ فِىْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ -

অর্থাৎ, তারা যা প্রাপ্ত হয়েছে, তাতে নিজেদের অন্তরে কোন

স্বার্থপরতা অনুভব করে না এবং তারা নিজেদের উপর অন্যকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। বলাবাহুল্য, অন্তরে স্বার্থ থাকাই হিংসা।

মহব্বত রক্ষাকরণের এক উপায় হল, নিজে যত উচ্চ মর্যাদায়ই পৌঁছে থাক না কেন, বন্ধুর আতিথ্যে নিজের অবস্থা পরিবর্তন না করা। শান-শওকত বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে বন্ধুদের প্রতি শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করা নীচতা। জনৈক বুযুর্গ তাঁর পুত্রকে ওসিয়ত করে বললেন ঃ বৎস, যার মধ্যে নিম্নোক্ত গুণসমূহ থাকে, কেবল তার সংসর্গই অবলম্বন করবে– তার কাছে তোমার কোন প্রয়োজন দেখা দিলে সে তোমার কাছে আসবে। তুমি তার মুখাপেক্ষী না হলে সে তোমার কাছে কিছু আশা করবে না। তার মর্যাদা বেড়ে গেলে সে তোমাকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করবে না।

মহব্বত রক্ষা করার আরেকটি উপায় হল, বন্ধুর বিরহ ও বিচ্ছেদকে অত্যন্ত পীড়াদায়ক মনে করা। ইবনে ওয়ায়নার সম্মুখে এ সম্পর্কিত একটি কবিতা পাঠ করা হলে তিনি বললেন ঃ আমি কিছু লোকের সঙ্গে একত্রে বসবাস করেছি। তাদের কাছ থেকে আলাদা হওয়ার পর ত্রিশ বছর অতীত হয়েছে, কিন্তু কখনও কল্পনায় আসে না যে, তাদের বিরহ বেদনা মন থেকে মুছে গেছে। বন্ধুত্ব রক্ষা করার আর একটি উপায়, বন্ধুর বিরুদ্ধে মানুষের অভিযোগ না শোনা। বিশেষতঃ এমন লোকদেরর কাছ থেকে না শোনা, যারা প্রথমে জাহির করে যে, তারা অমুকের বন্ধু, এর পর তার বিরুদ্ধেই বিদ্বেষসূচক কথাবার্তা বলে। পারস্পরিক বিভেদ সৃষ্টির এটা একটা সূক্ষ্ম উপায়। যে ব্যক্তি বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে এসব বিষয় থেকে আত্মরক্ষা করে না এবং বন্ধুর বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ শ্রবণ করে, তার বন্ধুত্ব ক্ষণভঙ্গুর হয়ে থাকে। জনৈক ব্যক্তি একজন দার্শনিককে বলল ঃ আমি আপনার সাথে বন্ধুত্ব করতে চাই। দার্শনিক বললেন ঃ তিনটি বিষয় মেনে নিলে আমি তোমার সাথে বন্ধুত্ব করব। এক, আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনবে না, দুই– আমার কথার বিরুদ্ধে কোন কাজ করবে না এবং তিন– ছলনা ও অঙ্গভঙ্গি দিয়ে আমাকে দলিত করবে না। বন্ধুত্ব রক্ষা করার আর একটি উপায় হল, বন্ধুর শত্রুর সাথে বন্ধুত্ব করবে না। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন ঃ যখন তোমার বন্ধু তোমার শত্রুর অনুগত হয়ে যায়, তখন তোমার শত্রুতায় উভয়েই অংশীদার হয়।

বন্ধুত্বের অষ্টম হক বন্ধুকে কষ্ট না দেয়া। অর্থাৎ, তার উপর এমন কোন বোঝা চাপাবে না এবং তাকে এমন কোন ফরমায়েশ দেবে না,

যাতে তার কষ্ট হয়। কাজেই তার কাছে তার প্রভাব-প্রতিপত্তি ও অর্থ-সম্পদের সাহায্য এবং আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য হাসিল করতে চাইবে না। মনে করবে, বন্ধুর দোয়ায় বরকত হবে, তার সাক্ষাতে মন প্রফুল্ল হবে এবং ধর্মকর্মে সাহায্য পাওয়া যাবে। বন্ধুর কোন কাজ করে দিলে আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য অর্জিত হবে। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ যে তার বন্ধুর কাছে এমন বস্তু কামনা করে, যা বন্ধু তার কাছে কামনা করে না, সে বন্ধুর প্রতি জুলুম করে। যে তার বন্ধুর কাছ থেকে এমন বস্তু পেতে চায়, যা বন্ধু তার কাছ থেকে পেতে চায়, সে বন্ধুকে কষ্টে ফেলে দেয়। আর যে বন্ধুর কাছে কিছুই চায় না, সে বন্ধুর সাথে সদ্ব্যবহার করে। জনৈক দার্শনিক বলেন ঃ যে ব্যক্তি তার বন্ধুদের মধ্যে নিজেকে মর্যাদার চেয়ে বড় করে রাখবে, সে নিজেও গোনাহগার হবে এবং তার বন্ধুরাও গোনাহগার হবে। যে ব্যক্তি নিজের মর্যাদা অনুযায়ীই বন্ধুদের মধ্যে থাকবে, সে নিজে কষ্ট করবে এবং বন্ধুদেরকেও কষ্ট দেবে। আর যে ব্যক্তি নিজের মর্যাদার চেয়ে কম হয়ে তাদের মধ্যে থাকবে, সে নিজে এবং বন্ধুরা সকলেই আরামে থাকবে। অধিকতর হালকা থাকার উপায় হল, লৌকিকতা দূরে সরিয়ে রাখা; এমনকি, যে কাজে নিজের কাছে লজ্জা করবে না, তাতে বন্ধুদের কাছেও লজ্জা করবে না। হযরত জুনায়েদ বলেন ঃ আল্লাহ্র জন্যে বন্ধুত্বকারী দু'ব্যক্তি যদি একজন অপরজনের কাছে লজ্জা করে, তবে কারও না কারও মধ্যে অবশ্যই রোগ থাকবে।

হযরত আলী মুর্তযা (রাঃ) বলেন ঃ বন্ধুদের মধ্যে সে-ই নিকৃষ্টতম, যে তোমার জন্যে লৌকিকতা প্রদর্শন করে। ফলে তোমাকে তার খাতির-তোয়াজ করতে হয় এবং তা সম্ভব না হলে ওযর পেশ করার প্রয়োজন হয়। হযরত ফোযায়ল (রহঃ) বলেন ঃ মানুষের মধ্যে লৌকিকতার কারণেই বিভেদ সৃষ্টি হয়। একজন অপরজনের কাছে গেলে সে তার জন্যে লৌকিকতা করে। হযরত জুনায়দ (রহঃ) বলেন ঃ আমি চার শ্রেণীর সুফী বুযুর্গগণের সাথে বাস করেছি এবং প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে ত্রিশ ব্যক্তির সংসর্গ লাভ করেছি; অর্থাৎ হারেস মুহাসেবী ও তাঁর অনুসারীবৃন্দ, হাসান সোহী ও তাঁর অনুচরবৃন্দ, সিররী সকতী ও তাঁর দল এবং ইবনে কুরায়বী ও তাঁর সহচরবৃন্দ। তাঁদের মধ্যে যে কোন দুব্যক্তি পরস্পরে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছে এবং লৌকিকতা প্রদর্শন করেছে, তার

কারণ, তাদের একজনের মধ্যে কিছু আধ্যাত্মিক রোগ ছিল।

হযরত ইমাম জাফর সাদেক (আঃ) বলেন ঃ যে বন্ধু আমার সাথে লৌকিকতা করে, বন্ধুদের মধ্যে সেই আমার কাছে সর্বাধিক কঠিন এবং যার সাথে আমি এমনভাবে থাকি, যেমন একাকী থাকি, সে আমার কাছে সবচেয়ে হালকা বন্ধু। জনৈক সুফী বলেন ঃ এমন লোকের সাথে থাক যে, সৎকর্ম করলে তার দৃষ্টিতে বেড়ে না যাও এবং গোনাহ করলে তার কাছে তোমার মর্যাদা হ্রাস না পায় ; উভয় অবস্থাতে তার কাছে সমান থাক। একথা বলার কারণ, এর ফলে লৌকিকতা ও লজ্জা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। কেউ বলেন ঃ দুনিয়াদারদের সাথে আদব সহকারে থাকা উচিত, আখেরাত ওয়ালাদের সাথে জ্ঞান সহকারে এবং সাধকদের সাথে যেভাবে ইচ্ছা থাক। আর একজন বলেন ঃ এমন ব্যক্তির সংসর্গ অবলম্বন কর যে, গোনাহ তুমি করলে তওবা সে করে এবং তার সাথে মন্দ ব্যবহার করলে উল্টা সে ক্ষমা প্রার্থনা করে। তোমার কষ্টের বোঝা নিজে বহন করে এবং তোমাকে কোন কষ্ট দেয় না। এ উক্তির প্রবক্তা বন্ধুত্বের পথ অত্যন্ত সংকীর্ণ করে দিয়েছেন। বাস্তবে প্রত্যেক ধর্মপরায়ণ জ্ঞানী ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব করা উচিত। এ কারণেই হযরত জুনায়দকে যখন কেউ বলল ঃ বর্তমান যুগে বন্ধু বিরল, আল্লাহর ওয়াস্তে বন্ধুত্ব করার মত ব্যক্তি কোথায় ? তখন তিনি তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। লোকটি তিন বার একই কথার পুনরাবৃত্তি করলে তিনি বললেন ঃ যদি এমন বন্ধু চাও যে তোমাকে কষ্ট থেকে বাঁচাবে এবং তোমার কষ্ট নিজের মাথায় তুলে নেবে, তবে এরূপ বন্ধু অবশ্যই বিরল। পক্ষান্তরে যদি এমন বন্ধু চাও, যার খেদমত তুমি করবে এবং সে কষ্ট দিলে তুমি সবর করবে, তবে আমার কাছে এরূপ লোক অনেক আছে, যার সাথে ইচ্ছা বন্ধুত্ব করতে পার। এখন জানা উচিত, মানুষ তিন প্রকার– এক, যার সংসর্গে তোমার উপকার হবে। দুই, তুমি যার কিছু উপকার করতে পারবে এবং তোমা দ্বারা তার কোন ক্ষতি হবে না, কিন্তু তার দ্বারা তোমার উপকারও হয় না। তিন, যার কোন উপকার তুমি করতে পার না; কিন্তু তার সংসর্গে তোমার ক্ষতি হয়। এরূপ ব্যক্তি নির্বোধ চরিত্রহীন। তার সংসর্গ থেকে বেঁচে থাকা উচিত। দ্বিতীয় প্রকার মানুষ থেকে দূরে থেকো না। কেননা, তার দ্বারা দুনিয়াতে উপকার না হলেও আখেরাতে উপকার হবে। তার সুপারিশ,

দোয়া এবং তার খেদমত করার সওয়াব তুমি পাবে। প্রথম প্রকার মানুষ সর্বাবস্থায় সংসর্গের যোগ্য। আল্লাহ্ তাআলা হযরত মূসা (আঃ)-কে এই মর্মে ওহী পাঠালেন, তুমি আমার কথা মানলে তোমার অনেক বন্ধু হয়ে যাবে। অর্থাৎ, তুমি তাদের দুঃখে দুঃখী হলে, তাদের জ্বালাতন সহ্য করলে এবং তাদের প্রতি হিংসা না করলে তারা তোমার বন্ধু হয়ে যাবে। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আমি পঞ্চাশ বছর মানুষের সংসর্গে কাটিয়েছি। কখনও আমার মধ্যে ও তাদের মধ্যে কলহ হয়নি। কেননা, আমি তাদের মধ্যে নিজের ভরসায় বাস করেছি। কারও উপর বোঝা চাপাইনি। যার অভ্যাস এরূপ হবে, তার অনেক বন্ধু হবে। কষ্ট না দেয়ার আর এক উপায় হল, বন্ধুর নফল এবাদতে বিঘ্ন সৃষ্টি ও আপত্তি না করা। কোন কোন সুফী এই শর্তে পারস্পরিক বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা করতেন যে, চারটি বিষয়ে একই রূপ থাকবে। একজন সর্বদা রোযা রাখলে অপরজন বলবে না যে, রোযা ভঙ্গ কর; একজন সর্বদা রোযা না রাখলে অপরজন বলবে না যে, রোযা রাখ; একজন সারা রাত নিদ্রা গেলে অপরজন বলবে না যে, উঠ এবং একজন সারা রাত জেগে নামায পড়লে অপরজন বলবে না যে, ঘুমাও।

জনৈক সাহাবী বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা লৌকিকতাকারীদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

انا والاتقياء من امتى براء من التكلف অর্থাৎ, আমি এবং আমার উম্মতের পরহেযগার লোকেরা লৌকিকতা থেকে মুক্ত।

জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ যে ব্যক্তি তার বন্ধুর বাড়ীতে চারটি কাজ করে, তার বন্ধুত্ব পূর্ণাঙ্গ হয়- এক, বন্ধুর বাড়ীতে পানাহার করা; দুই, পায়খানায় যাওয়া; তিন, নামায পড়া এবং চার, নিদ্রা যাওয়া। অন্য একজন বুযুর্গের সামনে এসব বিষয় আলোচনা করা হলে তিনি বললেন ঃ পঞ্চম কাজটি রয়ে গেছে। তা হল, সস্ত্রীক বন্ধুর গৃহে গেলে সেখানে স্ত্রীর সাথে সহবাস করা। কেননা, এই পাঁচটি কাজের জন্যেই গৃহ নির্মাণ করা হয়। নতুবা আবেদদের এবাদতের জন্যে তো মসজিদই অধিক আরামের জায়গা। এসব কাজ বন্ধুর গৃহে হয়ে গেলে বন্ধুত্ব পূর্ণাঙ্গ, লৌকিকতা দূরীভূত এবং অকপট ভাব অর্জিত হয়ে যায়। আরবের লোকেরা সালামের জওয়াবে বলে- মারহাবা, আহলান ওয়া সাহলান। এতে উপরোক্ত

বিষয়সমূহের প্রতিই ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা, 'মারহাবা' শব্দের উদ্দেশ্য হচ্ছে, তোমার জন্যে আমার মনে ও গৃহে বিস্তৃত জায়গা রয়েছে। 'আহলান' শব্দের অর্থ এ গৃহ তোমার। এখানে তোমার মন বসবে। আমাদের প্রতি তোমার মনে কোন আতংক ভাব থাকবে না। 'সাহ্‌লান' শব্দের অর্থ, তুমি যা চাইবে, তা তোমার জন্যে সহজলভ্য হবে। তা পূর্ণ করা আমাদের পক্ষে কঠিন হবে না। সহজলভ্যতা ও লৌকিকতা বর্জন এভাবে পূর্ণ হবে যে, তুমি নিজেকে বন্ধু অপেক্ষা কম মর্যাদাবান মনে করবে, তার সম্পর্কে ভাল ধারণা রাখবে এবং নিজের প্রতি কুধারণা পোষণ করবে। বন্ধুকে নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করলে বাস্তবে শ্রেষ্ঠ তুমি হবে। আবু মোয়াবিয়া আসওয়াদ বলেন ঃ আমার বন্ধু আমার চেয়ে উত্তম। লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ তা কেমন করে? তিনি বললেন ঃ আমার প্রত্যেক বন্ধু আমাকে নিজের চেয়ে উত্তম মনে করে। যে ব্যক্তি আমাকে নিজের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেয়, সে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ মানুষ তার বন্ধুর রীতিনীতি অনুসরণ করে। আর যে ব্যক্তি তোমার জন্যে তাই পছন্দ না করে, যা নিজের জন্যে পছন্দ করে, তার সংসর্গে কোন কলাণ নেই। সমতার দৃষ্টিতে বন্ধুকে দেখা সর্বোচ্চ স্তর এবং পূর্ণাঙ্গ স্তর হচ্ছে বন্ধুকে শ্রেষ্ঠ মনে করা। এ কারণেই হযরত সুফিয়ান (রহঃ) বলেন ঃ তোমাকে কেউ সর্বনিকৃষ্ট বললে যদি তুমি ক্রুদ্ধ হও, তবে তুমি সর্বনিকৃষ্টই বটে। অর্থাৎ, সর্বদা মনে নিকৃষ্ট হওয়ার বিশ্বাস থাকা উচিত। কেউ নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করলে বন্ধুকে হেয় মনে করবে। অথচ সাধারণ মুসলমানকেও হেয় মনে করা অনুচিত। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

يحسب المرء من الشران يحقر اخاه المسلم অর্থাৎ, মানুষের মন্দ হওয়ার জন্যে তার মুসলমান ভাইকে হেয় মনে করাই যথেষ্ট।

লৌকিকতা বর্জনের এক উপায় হল নিজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বন্ধুদের সাথে পরামর্শ করা এবং তাদের পরামর্শ মেনে নেয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

وَشَاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِ অর্থাৎ, কাজকর্মে তাদের কাছ থেকে পরামর্শ

গ্রহণ কর। নিজের কোন রহস্য বন্ধুদের কাছে গোপন করবে না।

মাওলানা ইয়াকুব কারখী বলেন ঃ আসওয়াদ ইবনে সালেম আমার পিতৃব্য হযরত মারূফ কারখীর বন্ধু ছিলেন। তিনি একবার এসে তাঁকে বললেন – বিশর ইবনে হারেস আপনার সাথে মহব্বতের বন্ধন স্থাপন করতে চান। তিনি আপনার সামনা সামনি এ কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন, তাই আমাকে পাঠিয়েছেন। তাঁর অনুরোধ, আপনি তাঁর সাথে মহব্বতের সম্পর্ক স্থাপন করে নিন এভাবে যে, আপনি জানেন অথবা তিনি। তিনি এমন মহব্বত চান, যা তিনি সওয়াবের কারণ বলে জানেন এবং ধর্তব্য বলে স্বীকার করেন। এ জন্যে তিনি কয়েকটি শর্ত করেন।

এক, মহব্বতের এ ব্যাপারটি জানাজানি না হওয়া চাই। দুই, আপনার ও তার মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ না হওয়া চাই। কারণ, তিনি অধিক সাক্ষাৎ পছন্দ করেন না। হযরত মারূফ বললেন ঃ ভাই! আমি যখন কাউকে মহব্বত করি, তখন দিবারাত্র তার বিচ্ছেদ চাই না এবং সর্বক্ষণ তার সাথে দেখা করি। সর্বাবস্থায় তাঁকে নিজের উপর অগ্রাধিকার দেই। অতঃপর হযরত মারূফ ভ্রাতৃত্বের ফযীলত সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণনা করলেন। বক্তব্যের মাঝখানে বললেন ঃ নবী করীম (সাঃ) হযরত আলী মুর্তযার সাথে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। ফলে তাঁকে জ্ঞানগরিমায় শরীক করেছিলেন। কোরবানীর জন্তু তাঁকে বণ্টন করে দিয়েছিলেন এবং নিজের প্রিয়তমা কন্যাকে তার সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। এসব কিছুর কারণ কেবল বন্ধুত্বই ছিল। যেহেতু তুমি বিশরের আবেদন নিয়ে আমার কাছে এসেছ, তাই আমি তোমাকে সাক্ষী করে বলছি– আমি তার সাথে এই শর্তে আল্লাহর ওয়াস্তে বন্ধুত্ব করলাম, তিনি যদি আমার সাথে দেখা করা অপছন্দ করেন, তবে যেন আমার সাথে দেখা করতে না আসেন, কিন্তু আমার মন যখনই চাইবে, আমি তাঁকে দেখতে চলে যাব। আমরা যেখানে মিলিত হই, তিনি যেন সেখানে আমার সাথে দেখা করেন। তিনি যেন কোন ভেদ আমার কাছে গোপন না করেন এবং সকল অবস্থা সম্পর্কে আমাকে অবহিত করেন। অতঃপর আসওয়াদ ইবনে সালেম এসব কথাবার্তা বিশরের কাছে গিয়ে বললে তিনি আনন্দিত হলেন এবং তাঁর সব কথা মেনে নিলেন।

উপরে আমরা বন্ধুত্বের যাবতীয় হক সংক্ষেপে ও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি। এসব পূর্ণরূপে তখন আদায় হয়, যখন আদায় করার মধ্যে বন্ধুদের উপকার এবং তোমার ক্ষতি হয়। এমনভাবে আদায় করা যাবে না, যাতে তোমার উপকার এবং বন্ধুদের অপকার হয়। আর একটি কাজ করা উচিত। তা হচ্ছে, তুমি নিজেকে বন্ধুদের খাদেমের স্থলাভিষিক্ত মনে করবে এবং নিজের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে তাদের অধিকার আদায়ে নিয়োজিত রাখবে। উদাহরণতঃ চক্ষু দ্বারা তাদেরকে প্রীতির দৃষ্টিতে দেখবে, যাতে তারা এটা বুঝতে পারে। তাদের গুণাবলী দেখবে এবং দোষ-ত্রুটি থেকে অন্ধ হয়ে যাবে। তারা তোমার দিকে মুখ করে কথা বললে তুমি দৃষ্টি অন্য দিকে ফিরিয়ে নেবে না।

বর্ণিত আছে, নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে যারা বসত, তিনি তাদের প্রত্যেককে আপন মোবারক চেহারার ভাগ দিতেন। অর্থাৎ, প্রত্যেকের দিকে মুখ ফেরাতেন। যে কেউ তাঁর কথা শুনত, সে-ই মনে করত, তার প্রতি তাঁর সর্বাধিক কৃপাদৃষ্টি রয়েছে। রসূলে করীম (সাঃ)-এর মজলিস লজ্জা, বিনয় ও বিশ্বস্ততার মজলিস ছিল। তিনি নিজের বন্ধুদের সামনে সর্বাধিক হাসতেন। সহচরেরা যে বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করত, তিনি তাতে অধিক বিস্ময় প্রকাশ করতেন। মুখের সাথে সম্পর্কশীল হকসমূহ ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। কান সম্পর্কিত হক, বন্ধু যখন কিছু বলবে, তখন তার কথা সাগ্রহে শুনবে; তাকে সত্য মনে করে সন্তুষ্টি প্রকাশ করবে এবং আপত্তি উত্থাপন করে কথা কেটে দেবে না। কোন কারণে কথা শুনতে না পারলে ওযর পেশ করবে। বন্ধুর অপ্রিয় কথাবার্তা শ্রবণ থেকে কানকে বাঁচিয়ে রাখবে। হাত সম্পর্কিত হক হচ্ছে, হাতে সম্পন্ন করা হয় এমন বিষয়াদিতে বন্ধুদের সাহায্য করবে। পা সম্পর্কিত হক হচ্ছে, পায়ের দ্বারা বন্ধুদের পেছনে খাদেমের ন্যায় চলবে। যতটুকু তারা আগে বাড়ায় তাদের থেকে ততটুকু আগে বাড়বে এবং তারা যতটুকুই নৈকট্য দেয়; ততটুকুই নিকটে থাকবে । তারা বৈঠকে আগমন করলে তাদের সম্মানে দাঁড়াবে এবং যে পর্যন্ত তারা না বসে, তুমি বসবে না। যেখানে জায়গা থাকবে সেখানেই বসে যাবে। পূর্ণ একাত্মতা হয়ে গেলে এসব হকের মধ্যে কতক সহজও হয়। যেমন, দাঁড়ানো, ওযর পেশ করা ইত্যাদি। লৌকিকতা লুপ্ত

হয়ে গেলে বন্ধুদের সাথে সেই ব্যবহারই করা হয়, যা নিজের সাথে করা হয়। কেননা, এই বাহ্যিক আদবসমূহ অন্তরের পরিচ্ছন্নতার শিরোনাম। অন্তর পরিষ্কার হয়ে গেলে এসব বাহ্যিক আদবের প্রয়োজন থাকে না। যে ব্যক্তির দৃষ্টি সৃষ্টির সংসর্গের দিকে থাকে, সে কখনও বক্র হয়, কখনও সোজা। পক্ষান্তরে যার দৃষ্টি স্রষ্টার দিকে থাকে, সে বাহ্যতঃ সোজা থাকে এবং অন্তরকে মহব্বত ও সৃষ্টির মহব্বত দ্বারা সৌন্দর্যমণ্ডিত করে। কেননা, বান্দার খেদমত আল্লাহর ওয়াস্তে খেদমতসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ। সচ্চরিত্রতা ছাড়া এটা মানুষ অর্জন করতে পারে না।

বন্ধুত্ব সম্পর্কে মনীষী উক্তি ঃ যদি তুমি উত্তমরূপে মেলামেশা করতে চাও, তবে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো অনুশীলন কর।

বন্ধু ও শত্রুর সাথে হাসি মুখে সাক্ষাৎ কর। তাদেরকে হেয় করো না এবং নিজে ভীত হয়ো না। গাম্ভীর্য অবলম্বন কর- এতটুকু নয় যে, অহংকার হয়ে যায়। বিনয়ী হও- এতটুকু নয় যে, লাঞ্ছিত হয়ে যাও। সকল কাজে মধ্যবর্তিতা অবলম্বন কর। বাহুল্য ও স্বল্পতা সকল কাজেই নিন্দনীয়। নিজের দু'দিকে বার বার মুখ ফিরিয়ে দেখো না। যখন বস, সস্থিরে বস, যাতে মনে না হয় যে, তুমি প্রস্থানোদ্যত। অঙ্গুলি ফুটিয়ো না এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি নিয়ে খেলা করো না। নাকে অঙ্গুলি ঢুকিয়ো না। বার বার থুথু নিক্ষেপ করো না এবং বার বার নাক পরিষ্কার করো না। জনসমক্ষে অধিক হাই তুলো না, এমনকি, নামায এবং একাকিত্বেও। মজলিসে হৈ চৈ করো না। কথা লাগাতার ও সাজিয়ে বল, কেউ ভাল কথা বললে তা মনোযোগ দিয়ে শুন। মহিলাদের ন্যায় খুব সাজগোজ করো না এবং গোলামদের মতো নোংরা থেকো না। সুরমা ও তৈল অধিক ব্যবহার করো না। অত্যাচারীকে বীর বলো না। আপন স্ত্রী-পুত্রের কাছেও নিজের অর্থসম্পদের পরিমাণ ব্যক্ত করো না- অন্যদের তো কথাই নেই। কেননা, তাদের ধারণায় ধন-সম্পদ কম হলে তুমি তাদের দৃষ্টিতে হেয় হয়ে যাবে; পক্ষান্তরে বেশী হলে তারা কখনও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে না। তাদেরকে এতটুকু ভীতিগ্রস্ত করো না যাতে তোমার কাছেও না ঘেঁষে এবং এত সোহাগও করো না যাতে মাথায় চড়ে বসে। গোলাম ও চাকরদের সাথে হাসিঠাট্টা করো না। এতে তোমার গাম্ভীর্য ক্ষুণ্ন হবে।

যদি বাদশাহ্ তোমাকে নৈকট্য দান করে তবে তার সাথে এমনভাবে থাক, যেন বর্শার ফলার উপর আছ। বাদশাহ তোমার প্রতি প্রসন্ন থাকলে মনে করো না কোন সময় অপ্রসন্ন হবে না। তার পরিবর্তনকে ভয় করতে থাক। তার সাথে এমন কথাবার্তা বল, যা সে আশা করে। তাকে তোমার প্রতি কৃপাশীল দেখে তার স্ত্রী-পুত্র ও চাকরদের ব্যাপারে দখল দিয়ো না। কেননা, যে বাদশাহের পারিবারিক ব্যাপারে দখল দেয়, সে এমনভাবে ভূমিসাৎ হয়, যে কখনও উঠে দাঁড়াতে পারে না। সুসময়ের বন্ধু থেকে বেঁচে থাক। কেননা, সে শত্রুর চেয়ে ভয়ংকর।

কোন মজলিসে গেলে প্রথমে সালাম কর। যারা পূর্বে এসেছে, তাদেরকে ডিঙ্গিয়ে যেয়ো না; বরং যেখানে খালি জায়গা দেখ, সেখানে বসে পড়। বসার সময় যে নিকটে থাকে তাকে সালাম কর।

পথিমধ্যে প্রথমতঃ বসা উচিত নয়। যদি বস, তবে দৃষ্টি নত রাখ। মজলুমের সাহায্য কর এবং কেউ পথ ভুলে গেলে তাকে পথ বলে দাও। সালামের জওয়াব দাও। কেউ সওয়াল করলে তাকে কিছু দান কর। সৎ কাজের আদেশ কর এবং মন্দ কাজে বাধা দাও। থুথু ফেলার জন্যে জায়গা তালাশ কর। কেবলার দিকে এবং ডান দিকে থুথু নিক্ষেপ করো না, বরং বাম দিকে অথবা পায়ের নীচে নিক্ষেপ কর।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সাধারণ মুসলমান ভাই ও প্রতিবেশীর হক

মানুষ সামাজিক জীব। অপরের সাথে মেলামেশা না করে একাকী জীবন ধারণ করা তার পক্ষে সুকঠিন। তাই মেলামেশার নিয়মনীতি শিক্ষা করা জরুরী। অপরের সাথে তার হক পরিমাণে আদব বজায় রাখা উচিত। আর হক হয়ে থাকে সম্পর্কের পরিমাণে। সম্পর্ক হয় আত্মীয়তার হবে, যা সবচেয়ে খাস; না হয় ইসলামী ভ্রাতৃত্বের হবে, যা সবচেয়ে ব্যাপক; না হয় প্রতিবেশিত্ব কিংবা সফর অথবা পাঠশালার সংসর্গের। এসব সম্পর্কের মধ্যে প্রত্যেকটির অনেক স্তর রয়েছে। উদাহরণতঃ আত্মীয় মাহরাম (মহিলাদের এমন আত্মীয়, যার সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ) হলে তার হক অধিক। মাহরামের চেয়েও অধিক হক পিতামাতার। অনুরূপভাবে প্রতিবেশীর হক গৃহের নিকটত্ব ও দূরত্ব অনুযায়ী বিভিন্ন হয়ে থাকে। মুসলমান ভাইয়ের হকের ব্যাপারটিও অনুরূপ। তার সাথে পরিচয় যত গভীর হবে, হকও তত বেশী হবে। উদাহরণতঃ যার সঙ্গে শুনে পরিচয় লাভ করা হয়, তার হকের তুলনায় সে ব্যক্তির হক বেশী হবে, যার সাথে মুখোমুখি পরিচয় আছে। পরিচয়ের পর মেলামেশার মাধ্যমে হক অধিক সুদৃঢ় হয়ে যায়। এমনিভাবে সংসর্গের স্তরও বিভিন্ন রূপ। উদাহরণতঃ পাঠশালার সংসর্গের হক সফরের সংসর্গের হকের তুলনায় অধিক জোরদার। বন্ধুত্বের অবস্থাও তদ্রূপ। বন্ধুত্ব শক্তিশালী হয়ে গেলে তা ভ্রাতৃত্বে পরিণত হয়। আরও বৃদ্ধি পেলে তা হয় মহব্বত এবং আরও সম্প্রসারিত হলে হয়ে যায় 'খুল্লত'। এ থেকে জানা গেল, খলীল হাবীবের তুলনায় অধিক নিকটবর্তী। কেননা, হাবীব তাকে বলে যে অন্তরে স্থান করে নেয় এবং খলীল তাকে বলে যে শিরা-উপশিরায় গ্রথিত হয়ে যায়। অতএব যে খলীল হবে সে হাবীবও হবে। কিন্তু কেউ হাবীব হলে খলীলও হবে না। অভিজ্ঞতার আলোকে বন্ধুত্বের বিভিন্ন স্তর থাকা সুস্পষ্ট। খুল্লতকে আমরা ভ্রাতৃত্বের উপরে বলেছি। এর অর্থ, যে অবস্থাকে খুল্লত বলা হয় তা ভ্রাতৃত্বের অবস্থার তুলনায় পূর্ণাঙ্গতম। এটি আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এরশাদ থেকে জানতে পারি। তিনি বলেছেন ঃ

لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابابكر خليلا ولكن

صاحبكم خليل الله ـ

অর্থাৎ, যদি আমি কাউকে খলীলরূপে গ্রহণ করতাম, তবে আবু বকরকে খলীল করতাম। কিন্তু আমি হলাম আল্লাহ তা'আলার খলীল। কেননা, খলীল তাকে বলা হয়, প্রিয়জনের মহব্বত যার অন্তরের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে অনুপ্রবেশ করে এবং সমগ্র অন্তরকে বেষ্টন করে নেয়। নবী করীম (সাঃ)-এর অন্তরকে সম্পূর্ণরূপে খোদায়ী মহব্বত ছাড়া অন্য কোন মহব্বত বেষ্টন করেনি। তাই তাঁর খুল্লতে কারও অংশীদারিত্ব হতে পারেনি; অথচ তিনি হযরত আলী (রাঃ)-কে ভাই করেছিলেন এবং বলেছিলেন ঃ

يا على انت منى بمنزلة هارون من موسى الا النبوة ـ

অর্থাৎ, হে আলী, তুমি আমার কাছে এমন, যেমন মূসা (আঃ)-এর কাছে হারুন ছিলেন; তবে হারুন নবী ছিলেন, তুমি নবী নও; এই যা তফাৎ।

এখানে তিনি হযরত আলীর জন্যে নবুওয়ত অস্বীকার করেছেন, যেমন হযরত আবু বকরের জন্যে খুল্লত অস্বীকার করেছেন। সুতরাং হযরত আবু বকর সিদ্দীক ভ্রাতৃত্বে হযরত আলী মুর্তযার সাথে শরীক। তবে আত্মীয়তা ও খুল্লতের যোগ্যতা উভয়টি তাঁর অর্জিত ছিল, যা হযরত আলীর ছিল না। রসূলে করীম (সাঃ) একাধারে আল্লাহ তা'আলার খলীল ও হাবীব দুইই ছিলেন। বর্ণিত আছে, তিনি একদিন হর্ষোৎফুল্ল বদনে মিম্বরে আরোহণ করে বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে খলীল পদে বরণ করেছেন, যেমন হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে করেছিলেন। সুতরাং আমি আল্লাহ্ তা'আলার হাবীব এবং তাঁর খলীল। এ বক্তব্য থেকে জানা গেল, সম্পর্ক শুরু হয় পরিচয় থেকে। এর আগে কোন সম্পর্ক নেই এবং খুল্লতের পরে বন্ধুত্বের কোন স্তর নেই। এগুলো ছাড়া অন্যান্য যেসব স্তর রয়েছে, সেগুলো মধ্যবর্তী স্তর। বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের হক ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। মহব্বত এবং খুল্লতের হকও এগুলোরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু মহব্বত ও ভ্রাতৃত্বের স্তরে যে পরিমাণে পার্থক্য হয়, সে পরিমাণে এগুলোর হকের স্তরেও তফাৎ হয়ে থাকে। চূড়ান্ত হক হল প্রিয়জনকে নিজের প্রাণ ও ধন সম্পদের উপর অগ্রাধিকার দেয়া; যেমন হযরত আবু বকর (রাঃ) নিজের

প্রাণ ও যাবতীয় ধনৈশ্বর্য রসূলে করীম (সাঃ)-এর পদতলে লুটিয়ে দিয়েছিলেন। হযরত তালহা (রাঃ) নিজের দেহকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্যে ঢাল করেছিলেন। এখন আমরা মুসলমান ভাই, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও গোলাম চাকরদের হক চারটি বর্ণনায় লিপিবদ্ধ করতে চাই।

মুসলমান ভাইয়ের হক ঃ মুসলমান ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ হলে তাকে সালাম বলবে। আহ্বান করলে সাড়া দেবে। হাঁচি দিলে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলবে। পীড়িত হলে দেখতে যাবে। মরে গেলে জানাযায় হাযির হবে। তোমার ব্যাপারে কসম খেলে তার কসম বাস্তবায়িত করবে। উপদেশ চাইলে উত্তম উপদেশ দেবে। পশ্চাতে তাকে মন্দ বলবে না; তার জন্যে তা-ই পছন্দ করবে যা নিজের জন্যে পছন্দ করবে এবং তাই অশুভ মনে করবে যা নিজের জন্যে অশুভ মনে করবে। এসব বিষয় হাদীসে বর্ণিত আছে। হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ মুসলমানের হকসমূহের মধ্যে চারটি বিষয় তোমার জন্যে অপরিহার্য। এক, সৎকর্মীকে সাহায্য করা; দুই, যে পাপ করে তার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করা; তিন, যে হতভাগা তার জন্যে দোয়া করা এবং চার, যে তওবা করে, তাকে মহব্বত করা। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলার উক্তি رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ (তারা পরস্পরে অনুকম্পাশীল)– এর অর্থ, এই উম্মতের কোন অসৎ কর্মী ব্যক্তি কোন সৎ কর্মীকে দেখে এরূপ দোয়া করবে– ইলাহী, তুমি তাকে প্রদত্ত কল্যাণে বরকত দান কর, একে তার জন্যে প্রতিষ্ঠিত রাখ এবং তার ফায়দা আমাকে দান কর। পক্ষান্তরে সৎ ব্যক্তি অসৎ ব্যক্তিকে দেখে এরূপ দোয়া করবে– ইলাহী, তাকে হেদায়াত কর, তওবার তওফীক দাও এবং তার পাপ মার্জনা কর।

নোমান ইবনে বশীরের রেওয়ায়েতে নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

مثل المؤمنين فى ودهم وتراحمهم كمثل الجسد اذا اشتكى عضوا منه تداعى سائره بالحمى والسهر -

অর্থাৎ, পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও কৃপার ক্ষেত্রে মুমিনরা এক দেহের মত। যখন দেহের কোন অংশ ব্যথাযুক্ত হয়, তখন সর্বাঙ্গে জ্বর ও অনিদ্রার

কারণ দেখা দেয়। হযরত আবু মূসার রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে–

المؤمن للمؤمن بالبنيان يشد بعضه بعضا ـ

অর্থাৎ, ঈমানদার ঈমানদারের জন্যে দালানের ন্যায়, যার এক অংশ অন্য অংশকে সুদৃঢ় করে। মুসলমান ভাইয়ের একটি হক হচ্ছে তাকে কথা ও কাজের দ্বারা কষ্ট না দেয়া। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ـ

অর্থাৎ, সে-ই প্রকৃত মুসলমান যার হাত ও জিহ্বার অনিষ্ট থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। অন্য এক দীর্ঘ হাদীসে এরশাদ হয়েছে– তুমি যদি এসব কাজ করতে না পার, তবে এতটুকুই কর যে, মানুষের অনিষ্ট করো না। এটা হবে তোমার পক্ষ থেকে একটি সদকা। এক হাদীসে বলা হয়েছে– তোমরা কি জান মুসলমান কে? লোকেরা আরজ করল ঃ আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন ঃ মুসলমান সে ব্যক্তি, যার হাত ও জিহ্বা থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। লোকেরা আরজ করল ঃ তা হলে মুমিন কে? তিনি বললেন ঃ যার তরফ থেকে অন্য মুমিনের জান ও মাল নিরাপদ থাকে। লোকেরা বলল ঃ মুহাজির কে? তিনি বললেন ঃ যে মন্দ কাজ পরিত্যাগ করে এবং তা থেকে বিরত থাকে। জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করল ঃ ইসলাম কি? তিনি বললেন ঃ তোমার অন্তর যদি আল্লাহ তা'আলার আজ্ঞাবহ হয় এবং তোমার হাত ও জিহ্বা থেকে যদি অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে, তবে তাই ইসলাম। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ দোযখীদের উপর খোস-পাঁচড়া চাপিয়ে দেয়া হবে। ফলে অধিক চুলকানোর কারণে তাদের কারও অস্থি বেরিয়ে পড়বে এবং ত্বক ও মাংস উড়ে যাবে। তাকে কেউ নাম ধরে ডাকবে এবং জিজ্ঞেস করবে ঃ তুমি কি কষ্ট পাচ্ছ? সে বলবে ঃ হাঁ, খুব কষ্ট পাচ্ছি। তখন বলা হবে– তুমি যে মুমিনদেরকে জ্বালাতন করতে, এটা তারই শাস্তি। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ আমি এক ব্যক্তিকে জান্নাতে সানন্দে পার্শ্ব পরিবর্তন করতে দেখেছি। দুনিয়াতে সে পথ থেকে একটি বৃক্ষ কেটে দিয়েছিল, যা পথিকদের জন্যে কষ্টের কারণ ছিল। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করলাম, আমাকে কিছু শিক্ষা দিন, যা পালন করে উপকৃত হতে পারি। তিনি বললেন ঃ

اعـزل الاذى عـن طـريـق الـمـسـلـمـيـن ـ অর্থাৎ, মুসলমানদের পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দাও।

এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে– যে কেউ মুসলমানদের পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়, এর বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তার জন্যে একটি পুণ্য লেখবেন, যার ফলস্বরূপ তার জন্যে জান্নাত ওয়াজিব করে দেবেন। আরও বলা হয়েছে, মুসলমান ভাইয়ের প্রতি কষ্টদায়ক দৃষ্টিতে ইশারা করা হালাল নয়। রবী ইবনে খায়সাম বলেন ঃ মানুষ দু'রকম। এক, ঈমানদার। তাকে কষ্ট দিয়ো না এবং দুই মূর্খ। তার সাথে মূর্খ হয়ো না।

মুসলমানের প্রতি বিনয়ী হওয়া এবং অহংকার না করাও একটি হক। আল্লাহ বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰـهَ لَايُـحِـبُّ كُـلَّ مُـخْـتَـالٍ فَـخُـوْرٍ অর্থাৎ, আল্লাহ কোন অহংকারী গর্বিতকে পছন্দ করেন না।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ আল্লাহ তাআলা আমার প্রতি ওহী করেছেন, কেউ যেন কারও সাথে গর্ব না করে। কেউ গর্ব করলে সহ্য করা উচিত। কেননা, আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী (সাঃ)-কে বলেন ঃ

خُـذِ الْـعَـفْـوَ وَاْمُـرْ بِـالْـعُـرْفِ وَاَعْـرِضْ عَـنِ الْـجَـاهِـلِـيْـنَ ـ অর্থাৎ, মার্জনা করুন, সৎ কাজের আদেশ করুন এবং মূর্খদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন।

ইবনে আবী আওফা রেওয়ায়েত করেন ঃ

كـان رسـول الـلـه صـلـى الـلـه عـلـيـه وسـلـم لايـانـف ولايـتـكـبـر ان يـمـشـى مـع الارمـلـة والـمـسـكـيـن فـيـقـضـى حـاجـتـه ـ

অর্থাৎ, রসূলুল্লাহ (সাঃ) গর্ব অহংকার করতেন না। তিনি বিধবা ও মিসকীনদের কাছে গিয়ে তাদের অভাব অনটন দূর করতেন।

এক মুসলমানের নিন্দা অন্য মুসলমানের কাছে না করা এবং একজনের কাছে যা শুনে তা অন্যের কাছে না পৌছানোও একটি হক। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

لايـدخـل الـجـنـة قـتـات অর্থাৎ, যে পরোক্ষে অপরের নিন্দা করে,

সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

খলীল ইবনে আহমদ বলেন ঃ যে তোমার কাছে অপরের নিন্দা বলবে, সে তোমার নিন্দা অপরের কাছে বলবে। আর যে তোমার কাছে অপরের খবর বলবে, সে তোমার খবরও অপরের কাছে বলবে।

আর একটি হক হল, পরিচিতজনের সাথে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিলে তিন দিনের বেশী সাক্ষাৎ বর্জন করবে না। আবু আইউব আনসারী (রাঃ) বলেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন–

لايحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلث ملقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما يبدأ بالسلام ـ

অর্থাৎ, কোন মুসলমানের জন্যে তার মুসলমান ভাইকে তিন দিনের বেশী পরিত্যাগ করা কিংবা পরস্পর দেখা হলে একজনের এদিকে এবং অন্যজনের ওদিকে মুখ ফিরিয়ে রাখা জায়েয নয়। তাদের মধ্যে উত্তম সে ব্যক্তি, যে প্রথমে সালাম করবে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেন ঃ

من اقال مسلما عشرته اقاله الله يوم القيامة অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের ত্রুটি মার্জনা করবে, আল্লাহ্ কেয়ামতের দিন তার ত্রুটি মার্জনা করবেন।

হযরত ইকরিমা বলেন– আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে বললেন ঃ তুমি তোমার ভাইদের অপরাধ মার্জনা করে দিয়েছ, তাই আমি তোমার আলোচনা আলোচকদের মাঝে সমুন্নত করে দিলাম।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ

ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط الا ان تنتهك حرمة الله فينتقم لله ـ

অর্থাৎ, রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজের জন্যে কখনও প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। তবে আল্লাহর সম্মান বিনষ্ট করা হলে তিনি সে জন্যে প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ মানুষ যখন জুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণ না করে মার্জনা করেছে, তখন আল্লাহ্ তাআলা তার সম্মানই বৃদ্ধি করেছেন। এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

ما نقص مال من صدقة وما زاد الله رجلا بعفو الاعز او

ما من احدتواضع الله الا رفعه الله ـ

অর্থাৎ, সদকা করার কারণে সম্পদ হ্রাস পায় না। কেউ মার্জনা করলে আল্লাহ কেবল তার সম্মানই বৃদ্ধি করেন। যে কেউ আল্লাহর ওয়াস্তে বিনয়ী হয়, আল্লাহ তাকে উচ্চতাই দান করেন।

আর একটি হক হল, সম্ভব হলে সাধ্যমত সকলের প্রতি অনুগ্রহ করা। এ ব্যাপারে কে অনুগ্রহের যোগ্য এবং কে অযোগ্য, তা দেখবে না। হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীনের বংশ পরম্পরায় বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ যে অনুগ্রহের যোগ্য, তার প্রতিও অনুগ্রহ কর এবং যে যোগ্য নয়, তার প্রতিও অনুগ্রহ কর। কেননা, যার প্রতি অনুগ্রহ করবে, সে যদি যোগ্য না হয়, তবে তুমি তো অনুগ্রহ করার যোগ্য। একই সিলসিলা থেকে বর্ণিত অপর এক হাদীসে বলা হয়েছে— ঈমানের পর বিবেকের চাহিদা হচ্ছে মানুষের সাথে বন্ধুত্ব করা এবং প্রত্যেক সৎ অসৎ ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ করা। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ কোন ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পবিত্র হাত ধরে ফেললে যতক্ষণ সে নিজেই না ছাড়ত, তিনি নিজের হাত ছাড়াতেন না। তাঁর উরু সহচরদের উরু থেকে এগিয়ে আছে বলে মনে হত না। কেউ তাঁর সাথে কথা বললে তিনি তার দিকে মুখ ফেরিয়ে রাখতেন এবং যতক্ষণ কথা শেষ না হত, তিনি অন্য দিকে মুখ ফিরাতেন না। আর একটি হক হল কোন মুসলমানের কাছে তার অনুমতি ছাড়া না যাওয়া। তিন বার অুনমতি চাওয়ার পর যদি অনুমতি দেয়, তবে ভাল। অন্যথায় ফিরে আসবে। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ অনুমতি তিন বার চাইতে হবে। প্রথমবার সে চুপ করে থাকবে। দ্বিতীয় বার প্রবেশ করার ব্যাপারে পরামর্শ করবে এবং তৃতীয়বার হয় অনুমতি দেবে, না হয় ফিরে যেতে বলবে।

আর একটি হক হচ্ছে, সকল মানুষের সাথে মধুর ব্যবহার করবে এবং প্রত্যেকের সাথে তার যোগ্যতা অনুযায়ী কথাবার্তা বলবে। মূর্খের সাথে জ্ঞানগর্ভ কথাবার্তা বললে নিজেও কষ্ট পাবে এবং অপরকেও কষ্ট দেবে।

বড়দের সম্মান করা এবং ছোটদের প্রতি স্নেহ করাও একটি হক। হযরত জাবেরের রেওয়ায়েতে রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ

لَيْسَ منا من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا ـ

অর্থাৎ, সে আমার দলভুক্ত নয়, যে বড়দের সম্মান করে না এবং ছোটদের প্রতি দয়া করে না। ছোটদেরকে স্নেহ করা ছিল রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর রীতি । এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে– বয়োবৃদ্ধ মুসলমানের সম্মান করা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের শামিল। বয়োবৃদ্ধদের সম্মান করার পরিশিষ্ট হল, অনুমতি ব্যতিরেকে তাদের সামনে কথা না বলা। সেমতে হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন– জোহায়নিয়া গোত্রের এক কাফেলা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হলে তাদের মধ্যে থেকে একটি বালক কথা বলার জন্যে দণ্ডায়মান হল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ থাম। বয়স্ক লোক কোথায়? সে কথা বলুক। এক হাদীসে বলা হয়েছে– যে যুবক কোন বৃদ্ধের সম্মান করে, আল্লাহ্ তাআলা তার জন্যে বৃদ্ধের বয়স পর্যন্ত পৌছার পর কাউকে ঠিক করে দেন, যে তার সম্মান করে। এতে দীর্ঘ জীবন লাভের সুসংবাদ রয়েছে এবং এতে জানা যায়, বৃদ্ধের সম্মান করার তওফীক সে-ই পায়, আল্লাহ্ তাআলা যার জন্যে দীর্ঘ জীবন লেখে দিয়েছেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সফর থেকে এলে শিশুরা তাঁর সাথে দেখা করতে যেত। তিনি তাদের কাছে অবস্থান করতেন। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে বলতেন, শিশুদেরকে আমার কাছে নিয়ে এস। তারা কাছে এলে তিনি সওয়ারীতে কাউকে আগে এবং কাউকে পেছনে বসিয়ে নিতেন। এর পর সাহাবায়ে কেরামকে বলতেন– তোমরাও শিশুদেরকে সওয়ারীতে তুলে নাও। পরে শিশুরা এ নিয়ে গর্ব করত এবং একে অপরকে বলত ঃ আমাকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সওয়ারীতে নিজের সামনে বসিয়েছেন এবং তোকে পেছনে। দোয়া, বরকত ও নাম রাখার জন্যে যে সকল শিশুকে রসূলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে আনা হত, তিনি তাদেরকে নিজের কোলে শুইয়ে দিতেন। প্রায়ই সেসব শিশু তাঁর গায়ে পেশাব করে দিত। কেউ শিশুকে ভয় দেখালে তিনি বলতেন– শিশুর পেশাব বন্ধ করো না; তাকে পেশাব করতে দাও। অবশেষে শিশু পূর্ণরূপে পেশাব করে নিত। অতঃপর তিনি দোয়া করতেন এবং তার নাম রাখতেন। এতে শিশুর পরিবারের লোকেরা আনন্দিত হত এবং এমন

ধারণা করত না যে, শিশুর পেশাবের কারণে রসূলুল্লাহ (সাঃ) কষ্ট পেয়েছেন। তারা শিশুকে নিয়ে চলে গেলে তিনি পেশাব ধুয়ে নিতেন।

সকলের সাথে হাসি-খুশী থাকা এবং নম্র কথা বলাও একটি হক। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামকে বললেন ঃ তোমরা কি জান দোযখ কার জন্যে হারাম? তাঁরা বললেন ঃ আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রসূলই বেশী জানেন। তিনি বললেন ঃ তার জন্যে হারাম, যে নম্র, ভদ্র ও মিশুক। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা সদা প্রফুল্ল ব্যক্তিকে ভালবাসেন। জনৈক ব্যক্তি আরজ করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, এমন আমল বলে দিন যা আমাকে জান্নাতে দাখিল করাবে। তিনি বললেন ঃ সালাম দেয়া ও সুন্দর কথা বলা মাগফেরাতের অন্যতম কারণ। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে-

اتقوا النار ولو بشق تمرة فان لم تجدوا فبكلمة طيبة ـ

অর্থাৎ, তোমরা একখণ্ড শুষ্ক খেজুর দিয়ে হলেও জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষা কর। যদি তাও না পাও তবে পবিত্র কথাবার্তা দিয়ে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেন ঃ জান্নাতের কয়েকটি বাতায়ন আছে, তা দ্বারা বাইরের বস্তু ভিতর থেকে এবং ভিতরের বস্তু বাইরে থেকে দেখা যায়। জনৈক বেদুঈন আরজ করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, এগুলো কাদের জন্যে? তিনি বললেন ঃ যে ভালরূপে কথা বলে, নিরন্নকে অন্ন দেয় এবং রাতের বেলায় তখন নামায পড়ে, যখন মানুষ ঘুমে বিভোর থাকে। হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল বলেন ঃ আমাকে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন- আমি তোমাকে ওসিয়ত করছি, আল্লাহ তাআলাকে ভয় করবে, ওয়াদা পূর্ণ করবে, আমানত আদায় করবে, সত্যবাদিতা অবলম্বন করবে, প্রতিবেশীর প্রতি লক্ষ্য রাখবে; এতীমের প্রতি দয়া করবে, সালাম করবে এবং বিনয়ী হবে। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ জনৈক মহিলা পথিমধ্যে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে এসে বলল ঃ আমি কিছু আরজ করতে চাই। তাঁর সঙ্গে তখন কয়েকজন সাহাবী ছিলেন। তিনি মহিলাকে বললেন ঃ তুমি গলির যেদিকে ইচ্ছা বসে যাও। আমি কাছে বসে তোমার কথা শুনে নেব। মহিলা তাই করল। তিনি কাছে বসে তার কথাবার্তা শুনলেন। ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ্ বলেন ঃ বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি সত্তর বছর রোযা রাখল। সে প্রতি সপ্তম দিনে ইফতার করত। সে আল্লাহ তাআলার

কাছে প্রার্থনা করল ঃ ইলাহী, আমাকে দেখাও, শয়তান কিভাবে মানুষকে পথভ্রষ্ট করে? অনেক দিন অতিবাহিত হওয়ার পরও যখন তার প্রার্থনা কবুল হল না, তখন সে বলল ঃ আমার ও আমার পালনকর্তার ব্যাপারে যে অন্যায় আমি করেছি, তা জানতে পারলে সেটা আমার এই প্রার্থনার চেয়ে উত্তম হত। তখন আল্লাহ তাআলা তার কাছে একজন ফেরেশতা পাঠালেন। ফেরেশতা বলল ঃ আল্লাহ তাআলা আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তোমার এ উক্তিটি আমার কাছে তোমার অতীত এবাদতের তুলনায় উত্তম। আল্লাহ তোমার চক্ষু খুলে দিয়েছেন। এখন দেখে নাও। সে দেখল, মানুষের মধ্যে এমন কেউ নেই যার চারপাশে শয়তানরা মাছির মত ভন্ ভন্ করছে না। সে আরজ করল ঃ ইলাহী, এই শয়তানদের থেকে কে বেঁচে থাকে? এরশাদ হল ঃ পরহেযগার এবং নম্র ব্যক্তি।

মুসলমানের সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করাও একটি হক। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ ওয়াদা একটি দান। তিনি আরও বলেন ঃ ওয়াদা একটি ঋণ। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে–

ثلاث في المنافق اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان

অর্থাৎ, মোনাফেকের মধ্যে তিনটি অভ্যাস রয়েছে– সে যখনই কথা বলে, মিথ্যা বলে, যখনই ওয়াদা করে, খেলাফ করে এবং যখনই আমানত প্রাপ্ত হয়, খেয়ানত করে। অন্য এক হাদীসে আছে–

ثلاث من كن فيه فهو منافق وان صلى وصام اذا حدث كذب الخ

অর্থাৎ, তিনটি অভ্যাস যার মধ্যে পাওয়া যায় সে মোনাফেক, যদিও নামায পড়ে এবং রোযা রাখে। যখনই সে কথা বলে, মিথ্যা বলে ------।

আর একটি হক রয়েছে। তা হল, তুমি মুসলমান ভাইয়ের সাথে সে কাজই করবে, যে কাজ তুমি মুসলমান ভাইয়ের পক্ষ থেকে তোমার জন্য কামনা কর। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ তিনটি অভ্যাস অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত বান্দার ঈমান পূর্ণ হয় না। প্রথম, দারিদ্র্য সত্ত্বেও আল্লাহর

পথে ব্যয় করা। দ্বিতীয়, আপন নফসের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেয়া। তৃতীয়, সালাম করা। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে- যে ব্যক্তি দোযখ থেকে দূরে থাকা এবং জান্নাতে দাখিল হওয়া পছন্দ করে, তার উচিত এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা যে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ' কলেমার সাক্ষ্য দেয় এবং মানুষের সাথে এমন কাজ করে, যে কাজ মানুষ তার সাথে করাটা সে আশা করে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আবু দারদাকে বললেন ঃ সহচরদের সাথে উত্তমরূপে উঠাবসা কর, তুমি ঈমানদার হয়ে যাবে। মানুষের জন্যে তাই পছন্দ কর যা নিজের জন্যে পছন্দ কর তা হলে তুমি মুসলমান হয়ে যাবে। হযরত হাসান (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা হযরত আদম (আঃ)-কে এই মর্মে ওহী পাঠিয়েছেন যে, চারটি কাজ কর, যা তোমার জন্যে এবং তোমার সন্তানদের জন্যে সকল কাজের মূল। তন্মধ্যে একটি বিশেষভাবে আমার জন্যে, একটি বিশেষভাবে তোমার জন্যে, একটি আমার ও তোমার জন্যে অভিন্ন এবং একটি তোমার ও মানুষের জন্যে অভিন্ন। যে কাজটি বিশেষভাবে আমার জন্যে, তা হচ্ছে, তুমি আমার এবাদত করবে এবং কাউকে আমার শরীক সাব্যস্ত করবে না। যে কাজটি বিশেষভাবে তোমার জন্যে, তা হচ্ছে, তোমার আমল, যার প্রতিদান আমি তোমাকে গুরুতর প্রয়োজনের সময় দেবে। যে কাজটি তোমার ও আমার জন্যে অভিন্ন, তা হচ্ছে, তুমি দোয়া করবে, আর আমি তা কবুল করব। যে কাজটি তোমার ও মানুষের জন্যে অভিন্ন, তা হল, তুমি তাদের সাথে এমন কাজ করবে, যা তারা তোমার সাথে করুক বলে তুমি আশা কর। হযরত মূসা (আঃ) প্রার্থনা করলেন ঃ ইলাহী, তোমার বান্দাদের মধ্যে সর্বাধিক ন্যায়পরায়ণ কে? আল্লাহ্ বললেন ঃ যে মানুষের বিনিময় নিজের কাছ থেকে নেয়।

আর একটি হক হল, পোশাক-পরিচ্ছদ ও আকার আকৃতি দ্বারা যে ব্যক্তি উচ্চ মর্যাদাবান প্রতিভাত হয়, তুমি তার বেশী সম্মান করবে। অর্থাৎ, প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে তার মর্যাদা অনুযায়ী ব্যবহার করবে। বর্ণিত আছে, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) এক সফরে এক মনযিলে অবতরণ করলেন। এমন সময় জনৈক ভিক্ষুক উপস্থিত হল। তিনি খাদেমকে বললেন ঃ এই মিসকীনকে একটি রুটি দিয়ে দাও। এর পর জনৈক অশ্বারোহী আগমন করল। তিনি খাদেমকে বললেন ঃ তাকে ডাক এবং খানা খাইয়ে দাও। লোকেরা আরজ করল ঃ মিসকীনকে তো আপনি

একটি রুটি দিয়ে বিদায় করলেন আর এই অশ্বারোহীকে ডেকে পাঠাচ্ছেন। এটা কেন? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্যে মর্যাদা সৃষ্টি করেছেন। আমাদেরও উচিত তাদেরকে সেই মর্যাদায় রাখা। মিসকীন লোকটি রুটি পেয়েই সন্তুষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু এই ধনী ব্যক্তিকে একটি রুটি দিয়ে দেয়া আমি সমীচীন মনে করিনি। বর্ণিত আছে, রসূলে আকরাম (সাঃ) একবার এক কক্ষে তশরীফ নিয়ে গেলে সাহাবায়ে কেরাম এত অধিক সংখ্যায় সেখানে জমায়েত হলেন যে, কক্ষে তিল ধারণের জায়গাও রইল না। এর পর জরীর ইবনে আবদুল্লাহ বাজালী সেখানে এলেন। তিনি ভিতরে জায়গা নেই দেখে দহলিজে বসে গেলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) পবিত্র চাদরটি তার কাছে ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন ঃ চাদরে বসে পড়। জরীর চাদরটি হাতে নিয়ে চোখে লাগালেন এবং চুম্বন করে অশ্রু বিসর্জন করলেন। অতঃপর চাদরটি ভাঁজ করে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে ফিরিয়ে দিলেন। তিনি আরজ করলেন ঃ হুযুর, আপনার পবিত্র কাপড়ের উপর বসার যোগ্য আমি নই। আল্লাহ তাআলা আপনাকে ইযযত দিন, যেমন আপনি আমাকে ইযযত দিয়েছেন। এর পর রসূলে আকরাম (সাঃ) ডানে বামে চোখ বুলিয়ে বললেন ঃ তোমাদের কাছে কোন সম্প্রদায়ের নেতা আগমন করলে তোমরা তার সম্মান করো। অনুরূপভাবে কারও উপর কারও পুরাতন হক থাকলে তার সম্মান করাও জরুরী। বর্ণিত আছে, রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর ধাত্রী মাতা হালিমা তাঁর কাছে আগমন করলে তিনি তাঁর জন্যে নিজের চাদর বিছিয়ে দেন এবং বলেন ঃ মা, আমার কাছে এসে খুব ভাল করেছেন। এর পর তাকে চাদরে বসিয়ে বললেন ঃ সুপারিশ করুন। আপনার সুপারিশ কবুল করব। যা চাইবেন তাই দেব। হালিমা বললেন ঃ আমি আমার সম্প্রদায়ের মুক্তির জন্য সুপারিশ করছি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আমার ও বনী হাশেমের অংশে যে পরিমাণ লোক পড়বে, আমি তাদেরকে আপনার হাতে সমর্পণ করব। এর পর চতুর্দিক থেকে সাহাবায়ে কেরামের আওয়ায উঠল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্ ! আমরাও আমাদের অংশ তাঁকে দিলাম। রসূলে করীম (সাঃ) হালিমার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করলেন। তাঁকে একটি খাদেম দিলেন এবং খায়বর থেকে প্রাপ্ত নিজের অংশের সম্পদ তাঁকে দান করলেন, যা হযরত ওসমান (রাঃ) এক লাখ দেরহাম দিয়ে তাঁর কাছ থেকে কিনে নেন।

আর এক হক হচ্ছে, মুসলমানদের মধ্যে যতদূর সম্ভব আপোষ করে দেবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে এমন বিষয় বলব না, যা নামায রোযা ও দান-খয়রাত অপেক্ষা উত্তম? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন ঃ অবশ্যই বলুন ইয়া রসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, পরস্পর সন্ধি স্থাপন করা পরস্পর বিভেদ সৃষ্টি করা ধর্মের জন্য মারাত্মক। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে–

افضل الصدقة اصلاح ذات البين অর্থাৎ, পারস্পরিক সমঝোতা স্থাপন করাই হল সর্বোত্তম সদকা।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন– একবার রসূলে করীম (সাঃ) উপবিষ্ট অবস্থায় এত হাসলেন যে, তাঁর সামনের দাঁত প্রকাশ হয়ে পড়ল। তা দেখে হযরত ওমর (রাঃ) আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আমার পিতামাতা আপনার জন্যে উৎসর্গ হোক– আপনি কেন হাসলেন? তিনি বললেন ঃ আমার উম্মতের দু'ব্যক্তি রব্বুল ইযযত আল্লাহ তাআলার সম্মুখে নতজানু হয়ে বসল। তাদের একজন আরজ করল, ইয়া রব, আমার হক তার কাছ থেকে দিইয়ে দিন। আল্লাহ তাআলা অপর ব্যক্তিকে বললেন ঃ তোমার ভাইয়ের হক দিয়ে দাও। সে আরজ করল ঃ ইলাহী, আমার পুণ্য থেকে কিছুই বাকী নেই যা আমি তাকে দেব। আল্লাহ তাআলা বাদীকে বললেন ঃ এখন তুমি কি করবে? তার কাছে তো কোন পুণ্যই অবশিষ্ট নেই। সে আরজ করল ঃ আমার কিছু গোনাহ তাকে দেয়া হোক। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নেত্রদ্বয় অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল। তিনি বললেন ঃ এটা বড় কঠিন দিন। এদিনে একজনের গোনাহ অন্য জনকে দেয়ারও প্রয়োজন হবে। অতঃপর তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তাআলা বাদীকে বললেন ঃ চোখ তুলে জান্নাতের দিকে তাকাও। সে তাকিয়ে বলতে লাগল ঃ ইয়া রব, আমার মনে হয় সেখানে মণিমুক্তা খচিত রৌপ্যের শহর ও স্বর্ণের প্রাসাদ রয়েছে। এটা কোন নবী, সিদ্দীক অথবা শহীদের জন্যে? আল্লাহ তাআলা বললেন ঃ যে এগুলোর দাম দেবে এগুলো তারই জন্যে। সে আরজ করল ঃ পরওয়ারদেগার, এগুলোর দাম কার কাছে আছে? এরশাদ হল ঃ তোমার কাছে। সে আরজ করল ঃ সেটা কি? আল্লাহ বললেন ঃ মুসলমান ভাইকে ক্ষমা করা। সে আরজ করল ঃ ইলাহী, আমি ক্ষমা করলাম। আল্লাহ বললেন ঃ তা হলে উঠ নিজের ভাইয়ের হাত ধরে তাকে

জান্নাতে দাখিল কর। এর পর রসূলে করীম (সাঃ) বললেন ঃ আল্লাহ তাআলাকে ভয় কর। পরস্পর সমঝোতা করতে থাক। কেননা, আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন মুমিনদের মধ্যে সমঝোতা স্থাপন করবেন। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে—

ليس بكذاب من اصلح بين اثنين فقال خير او نمى خيرا

অর্থাৎ, সে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয়, যে দুই ব্যক্তির মধ্যে সমঝোতা স্থাপন করে এবং ভাল কথা বলে অথবা সমঝোতার উদ্দেশে কোন ভাল খবর এক পক্ষ থেকে অন্য পক্ষের কাছে পৌঁছে দেয়।

এ থেকে জানা যায়, মানুষের মধ্যে সমঝোতা স্থাপন করা ওয়াজিব। কেননা, মিথ্যা বর্জন করা ওয়াজিব। কোন ওয়াজিব ততক্ষণ পর্যন্ত তরক করা যায় না, যে পর্যন্ত অধিক জোরদার ওয়াজিব যিম্মায় না চেপে যায়। অতএব দু'ব্যক্তির মধ্যে সমঝোতা স্থাপনকারী যখন মিথ্যাবাদী নয় তখন পারস্পরিক সমঝোতা মিথ্যা বর্জন অপেক্ষা অধিক জোরদার ওয়াজিব হল। নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

كل الكذب مكتوب الا ان يكذب الرجل فى الحرب فان الحرب خدعة او يكذب بين الاثنين فيصلح بينهما او يكذب لامراته ليرضيها ـ

অর্থাৎ, প্রত্যেক মিথ্যা লিখিত হয়; কিন্তু তিন প্রকার লিখিত হয় না। প্রথম, যুদ্ধে মিথ্যা বললে। কেননা, যুদ্ধ মানেই চালাকী। দ্বিতীয়, দু'ব্যক্তির মধ্যে সমঝোতা স্থাপনের উদ্দেশে মিথ্যা বললে এবং তৃতীয় স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করার জন্যে মিথ্যা বললে।

সকল মুসলমানের দোষ গোপন করাও একটি হক। নবী করীম (সাঃ) বলেন ঃ

من ستر على مسلم ستره الله تعالى فى الدنيا والاخرة ـ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন করে, আল্লাহ তাআলা ইহকাল ও পরকালে তার দোষ গোপন করবেন।

আরও বলা হয়েছে– যে বান্দা অপরের দোষ গোপন করবে, আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন তার দোষ গোপন করবেন। হযরত আবু সায়ীদ খুদরীর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের দোষ দেখেও গোপন করে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন। সাহাবী মায়েয তাঁর ব্যভিচারের কথা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করলেন, তিনি বললেন ঃ তুমি যদি একে কাপড়ের নীচে আবৃত করে নিতে, তবে এটা তোমার জন্যে ভাল হত। এথেকে জানা যায়, নিজের দোষ গোপন রাখাও মুসলমানের জন্যে অপরিহার্য। কেননা, নিজের মুসলমানীর হক তার উপর তেমনি জরুরী, যেমন অন্যের মুসলমানীর হক জরুরী। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেন ঃ আমি কোন মদ্যপায়ীকে পাকড়াও করলে আমার কাছে এটাই ভাল মনে হয় যে, আল্লাহ তাআলা তার দোষ গোপন রাখুন। কোন চোরকে পাকড়াও করলেও আমার কাছে তাই ভাল মনে হয়। হযরত ওমর (রাঃ) এক রাতে মদীনায় টহল দানকালে একজন পুরুষ ও একজন মহিলাকে যিনা করতে দেখলেন। তিনি সকালে সাহাবায়ে কেরামকে বললেন ঃ ধরে নাও যদি কোন খলীফা কোন পুরুষ ও নারীকে যিনা করতে দেখে এবং তাদের উপর "হদ" (যিনার শাস্তি) জারি করে, তবে তোমাদের অভিমত কি হবে? তারা বললেন ঃ আপনি খলীফা। আপনার ক্ষমতা আছে। কিন্তু হযরত আলী মুর্তযা (রাঃ) বললেন, হদ জারি করা আপনার জন্যে জায়েয নয়। জারি করলে আপনার উপর হদ কায়েম করা হবে। কেননা, আল্লাহ তাআলা যিনার হদ জারির জন্যে অন্ততপক্ষে চার জন সাক্ষীর প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য অপরিহার্য করেছেন। এর পর হযরত ওমর (রাঃ) কয়েকদিন চুপ থেকে আবার সেই প্রশ্ন তুললেন। সকলে প্রথম অভিমতই ব্যক্ত করলেন এবং হযরত আলী (রাঃ) তাই বললেন যা প্রথমে বলেছিলেন। এ থেকে জানা যায়, খোদায়ী শাস্তিসমূহের ব্যাপারে খলীফা নিজের জ্ঞান অনুসারে রায় দিতে পারেন কিনা, এ ব্যাপারে হযরত ওমর (রাঃ) সন্দিহান ছিলেন। তাই তিনি দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরে নেয়ার পর্যায়ে প্রশ্নটি উত্থাপন করলেন। এ কথা বলেননি যে, আমি এরূপ দেখেছি। কারণ, এটা তার জন্যে নাজায়েয হওয়ার আশংকা ছিল। শরীয়তে দোষ গোপন করাই যে কাম্য, এর জন্যে এ ঘটনাটি একটি বড় প্রমাণ। কেননা, সকল দোষের মধ্যে জঘন্যতম দোষ হচ্ছে যিনা। এর প্রমাণ চার জন সাক্ষীর

উপর নির্ভরশীল রাখা হয়েছে, যারা পুরুষাঙ্গকে নারী যৌনাঙ্গের ভিতরে এমনভাবে দেখবে, যেমন সুরমাদানির ভিতরে শলাকা থাকে। চার জন লোকের এভাবে দেখা কখনও হয় না। যদি বিচারক নিজে সত্যি সত্যি এটা জেনেও নেয়, তবুও তা ফাঁস করা তার জন্যে বৈধ নয়। এখন এক দিকে যিনা দমন করা রহস্যের প্রতি লক্ষ্য কর, এর শাস্তি রাখা হয়েছে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করা। এটা নিঃসন্দেহে সর্ববৃহৎ শাস্তি। অপর দিকে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক দোষ গোপন করার নির্দেশের বিষয়টিও চিন্তা কর। তিনি গোনাহগার মানুষের উপর কেমন পুরু পর্দা ফেলে দিয়েছেন। ফলে যিনার অবস্থা ফাঁস হওয়ার পথ সংকীর্ণ করে দিয়েছেন। আমরা আশা করি, কেয়ামতের দিন এই বিরাট কৃপা থেকে আমরা বঞ্চিত হব না।

এক হাদীসে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তাআলা যখন কোন বান্দার দোষ দুনিয়াতে গোপন করে, তখন তাঁর কৃপার পক্ষে এটা কিরূপে সম্ভব যে, কেয়ামতে তা ফাঁস করে দেবেন? আর যদি তিনি দুনিয়াতে ফাঁস করে দেন, তবে পরকালে পুনরায় ফাঁস না করার ব্যাপারে অধিক কৃপাশীল। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ বর্ণনা করেন, এক রাতে আমি হযরত ওমর (রাঃ)-এর সাথে মদীনায় টহল দিচ্ছিলাম। আমরা একটি প্রদীপ দেখতে পেয়ে সেদিকে চললাম। কাছে পৌঁছে দেখি একটি রুদ্ধদ্বার গৃহের অভ্যন্তরে লোকজন হৈ চৈ করছে। হযরত ওমর আমার হাত ধরে বললেন ঃ এ গৃহ কার জান? আমি বললাম ঃ না । তিনি বললেন ঃ এটা রবিয়া ইবনে উমাইয়ার গৃহ। এরা এখন মদ্যপানে মত্ত। তুমি কি বল, এদেরকে গ্রেফতার করব? আমি বললাম ঃ আমরা আল্লাহ তা'আলার নিষিদ্ধ কাজ করেছি। আল্লাহ বলেছেন ঃ ولاتجسسوا, অর্থাৎ, গোপন বিষয় তালাশ করে ফিরো না। অতঃপর আমি হযরত ওমরকে তেমনি রেখে চলে এলাম। এ থেকে জানা যায়, দোষ গোপন করা এবং তার পেছনে না পড়া ওয়াজিব। রসূলে করীম (সাঃ) হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ)-কে বলেছিলেন ঃ যদি তুমি মানুষের দোষের পেছনে পড়, তবে তারা বিগড়ে যাবে অথবা বিগড়ে যাওয়ার উপক্রম হবে। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে– যারা মুখে ঈমান এনেছে এবং যাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি, তারা শুন, তোমরা মুসলমানদের গীবত করো না এবং তাদের দোষের পেছনে পড়ো না। কেননা, যে ব্যক্তি তার মুসলমান

ভাইয়ের দোষের পেছনে পড়ে আল্লাহ তাআলা তার দোষের পেছনে পড়েন। আল্লাহ তা'আলা যার দোষের পেছনে পড়েন, তাকে লাঞ্ছিত করে দেন, যদিও সে নিজের গৃহের অভ্যন্তরে থাকে। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) বলেন ঃ যদি আমি কোন ব্যক্তিকে খোদায়ী শাস্তি পাওয়ার মত অপরাধে লিপ্ত দেখি, তবে তাকে গ্রেফতার করব না এবং কাউকে ডাকব না যে পর্যন্ত না আমার সাথে অন্য কেউ থাকে। অর্থাৎ, দু'জন সাক্ষী থাকলে অবশ্য সে ব্যক্তি গ্রেফতারের যোগ্য হয়ে যাবে। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আমি হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ)-এর কাছে ছিলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি অন্য একজনকে ধরে তাঁর কাছে নিয়ে এসে বলল ঃ এ লোকটি মাতাল। তিনি বললেন ঃ এর ঘ্রাণ লও। ঘ্রাণ লওয়ার পর জানা গেল সে বাস্তবিকই মদ্যপান করেছে। তিনি লোকটিকে মাতলামি দূর হওয়া পর্যন্ত আটকে রাখলেন। অতঃপর জল্লাদকে বললেন ঃ একে হাত উঁচু করে শরীরের বিভিন্ন অংশে বেত্রাঘাত কর। জল্লাদ আদেশ পালন করল। এর পর যে ব্যক্তি অপরাধীকে নিয়ে এসেছিল, তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি অপরাধীর কি হও? সে বলল ঃ আমি তার চাচা। হযরত ইবনে মসঊদ বললেন ঃ তুমি উত্তমরূপে তার শিক্ষাদীক্ষা ও চরিত্র গঠন করনি এবং তার দোষ গোপন করনি। এতদূর পৌঁছে যাওয়ার পর দন্ডবিধান করা শাসকের কর্তব্য হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাকারী । তিনি ক্ষমা পছন্দ করেন। অতঃপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন- وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا তারা যেন ক্ষমা ও মার্জনা করে।

এর পর হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) বললেন ঃ আমার মনে আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সর্বপ্রথম কোন্ চোরের হাত কেটেছিলেন। জনৈক চোরকে তাঁর খেদমতে হাযির করা হলে তিনি তার হস্ত কর্তন করলেন। কিন্তু তাঁর মুখমন্ডল মলিন হয়ে গেল। লোকেরা আরজ করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, মনে হয় আপনি এর হস্ত কর্তন খারাপ মনে করেছেন? তিনি বললেন ঃ খারাপ মনে না করার কি কারণ থাকতে পারে? তোমরা নিজের ভাইয়ের বিরুদ্ধে শয়তানের সাহায্যকারী হয়ো না। লোকেরা আরজ করল ঃ তা হলে আপনি একে মাফ করে দিলেন না কেন? তিনি বললেন ঃ এতদূর পৌঁছে গেলে দন্ড জারি করা বিচারকের কর্তব্য । আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল । তিনি ক্ষমা পছন্দ করেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন ঃ

وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ -

অর্থাৎ, তারা যেন ক্ষমা ও মার্জনা করে। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

এক রেওয়ায়েতে আছে, হস্ত কর্তন করার পর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মুখমন্ডল এমন বিবর্ণ হল যেন তাতে ছাই পড়ে গেছে। বর্ণিত আছে, ওমর (রাঃ) যখন এক রাতে মদীনায় টহল দিচ্ছিলেন, তখন এক গৃহ থেকে একজন পুরুষের গানের আওয়াজ শুনলেন। তিনি প্রাচীরে আরোহণ করে দেখলেন, পুরুষটির কাছে একজন মহিলা ও মদের পাত্র রক্ষিত রয়েছে। তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ্র দুশমন, তুই কি মনে করিস আল্লাহ্ তোর দোষ গোপন করবেন, আর তুই তার নাফরমানী করে যাবি? সে আরজ করল ঃ আমিরুল মুমিনীন, আপনি তড়িঘড়ি করবেন না। আমি আল্লাহ্ তা'আলার একটি আদেশ লঙ্ঘন করেছি ; কিন্তু আপনি তিনটি বিষয়ে তাঁর নাফরমানী করেছেন। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ وَلَا تَجَسَّسُوا (তোমরা দোষ অনুসন্ধান করো না।) অথচ আপনি তাই করছেন। তিনি বলেছেন ঃ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا (ছাদের উপর দিয়ে ঘরে প্রবেশ করা সৎকর্ম নয়।) আপনি প্রাচীর টপকে আমার কাছে এসেছেন । আল্লাহ বলেছেন ঃ

لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا -

অর্থাৎ, নিজের গৃহ ছাড়া অন্য কারও গৃহে প্রবেশে করো না, যে পর্যন্ত আলাপ পরিচয় না কর এবং গৃহবাসীদেরকে সালাম না কর; অর্থাৎ, অনুমতি গ্রহণ না কর। আপনি অনুমতি ও সালাম ব্যতিরেকেই আমার গৃহে চলে এসেছেন।

হযরত ওমর (রাঃ) বললেন ঃ আচ্ছা, আমি যদি তোকে ছেড়ে দেই, তবে ভবিষ্যতে ঠিক হয়ে যাবি কিনা? সে বলল ঃ আমিরুল মুমিনীন, আমাকে ক্ষমা করলে আমি জীবনে কখনও এ কাজ করব না। অতঃপর তিনি তাকে তদবস্থায় রেখে ফিরে এলেন।

এক ব্যক্তি হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল ঃ কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা যে মানুষের কানে কানে কথা বলবেন- এ সম্পর্কে আপনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছ থেকে কি শুনেছেন? তিনি বললেন ঃ আমি রসূলে করীম (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি- আল্লাহ তা'আলা তাঁর ঈমানদার বান্দাদেরকে কাছে ডাকবেন এবং তাহাদের উপর নিজ রহমতের ছায়া বিস্তার করে মানুষের কাছ থেকে তাদেরকে গোপন করে নেবেন। এর পর বলবেন ঃ তোমার অমুক গোনাহ মনে আছে কি? বান্দা আরজ করবে, ইয়া রব, মনে আছে। এভাবে যখন আল্লাহ বান্দার কাছ থেকে তার সকল গোনাহের স্বীকারোক্তি নিয়ে নেবেন এবং বান্দা নিজেকে ধ্বংসপ্রাপ্তদের মধ্যে গণ্য করবে, তখন এরশাদ করবেন ঃ হে আমার বান্দা, আমি দুনিয়াতে তোমার দোষ গোপন করেছিলাম, যাতে আজ তোমাকে ক্ষমা করে দিতে পারি। এর পর বান্দার হাতে তার পুণ্যের তালিকা দেয়া হবে। কাফের ও মোনাফেকদের অবস্থা হবে, তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরা বলবে- এরাই নিজের পালনকর্তার বিরুদ্ধে মিথ্যা বলেছিল। সাবধান, জালেমদের প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত।

এক হাদীসে আছে- كل امتى معا فى الا المجاهرون

অর্থাৎ, আমার সকল উম্মত ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে; কিন্তু প্রকাশ্যে গোনাহকারীরা হবে না। সে ব্যক্তিও প্রকাশ্যে গোনাহকারী গণ্য হবে, যে গোপনে গোনাহ করার পর মানুষকে তা জানিয়ে দেয়। নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

من استمع ستر قوم وهم له كارهون صب فى اذنيه الانك يوم القيامة -

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের গোপন ভেদ শুনে এবং তারা সেটা অপছন্দ করে, কেয়ামতের দিন তার কানে রাঙ্গতা গালিয়ে ঢেলে দেয়া হবে। আর একটি হক হল, অপবাদের জায়গা থেকে দূরে থাকতে হবে, যাতে মুসলমানদের মন তোমার প্রতি কুধারণা থেকে এবং তাদের জিহ্বা তোমার গীবত থেকে বেঁচে থাকে। কেননা, তারা তোমাকে মন্দ বলে যদি আল্লাহর নাফরমানী করে এবং এ নাফরমানীর কারণ তুমিই হও তবে তুমিও এতে অংশীদার হবে। সেমতে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ـ[২]

অর্থাৎ, কাফেররা যে সকল প্রতিমার পূজা করে, তোমরা তাদেরকে গালমন্দ করো না। তা হলে কাফেররা না বুঝে ধৃষ্টতা সহকারে আল্লাহকে গাল মন্দ করবে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি তার পিতামাতাকে গালি দেয়, তোমাদের মতে সে কেমন? লোকেরা আরজ করল ঃ কোন ব্যক্তি কি তার পিতামাতাকে গালি দেয়? এটা কি সম্ভব? তিনি বললেন ঃ হাঁ, গালি দেয়, তা এভাবে যে, সে অন্যের পিতামাতাকে গালি দেয়, জওয়াবে সে তার পিতামাতাকে গালি দেয়। ফলে সে যেন নিজেই নিজের পিতামাতাকে গালি দিল।

সারকথা, গোনাহের কারণ হওয়া নিজে গোনাহ করার মতই। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলে আকরাম (সাঃ) একবার তাঁর কোন পত্নীর সাথে কথা বলছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি সেখান দিয়ে চলে গেল। তিনি লোকটিকে ডাকিয়ে এনে বললেন ঃ সে আমার স্ত্রী সফিয়্যা। লোকটি আরজ করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, আমি অন্যের বেলায় ধারণা করলেও আপনারা বেলায় ধারণা করতাম না। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেনন ঃ শয়তান মানুষের মধ্যে তার রক্তের জায়গা দিয়ে চলে। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে– রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) রমযানের শেষ দশকে এ'তেকাফে ছিলেন। দু'ব্যক্তি সেখান দিয়ে গেলে তিনি তাদেরকে বললেন ঃ জেনে রাখ, সে আমার স্ত্রী সফিয়্যা। আমার আশংকা হল, শয়তান না তোমাদের অন্তরে কোন কুধারণা সৃষ্টি করে দেয়। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি নিজেকে অপবাদের জায়গায় দাঁড় করায়, এর পর তার প্রতি কেউ কুধারণা করে, সে যেন নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে তিরস্কার না করে। কেননা, সে এরূপ না করেলে কেউ তার প্রতি কুধারণা করত না। হযরত ওমর এক ব্যক্তিকে পথিমধ্যে কোন এক মহিলার সাথে কথা বলতে দেখে তাকে দোররা মারতে লাগলেন। লোকটি আরজ করল ঃ আমিরুল মুমিনীন, সে আমার স্ত্রী । তিনি বললেন ঃ তা হলে এমন জায়গায় কথা বললে না কেন, যেখানে কেউ তোমাকে দেখবে না?

আর একটি হক হচ্ছে, কোন ক্ষমতাবান ব্যক্তির কাছে যদি তোমার কদর মর্যাদা থাকে, তবে কোন ব্যক্তির উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে প্রয়োজন হলে তার কাছে সুপারিশ করবে। এতে তুমিও সওয়াব পাবে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামকে বলেন ঃ মানুষ আমার কাছে এসে তাদের বিভিন্ন অভাব-অনটন ব্যক্ত করে। তোমরা আমার কাছেই থাক। অতএব সুপারিশ কর; সওয়াব পাবে। আল্লাহ্ তাঁর নবীর হাতে নিজের পছন্দ অনুযায়ী ফয়সালা দেবেন। হযরত মোয়াবিয়ার রেওয়ায়েতে নবী করীম (সাঃ) বলেন ঃ আমার সামনে সুপারিশ কর, যাতে সওয়াব পাও। এক হাদীসে আছে– মুখের সদকার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন সদকা নেই। কেউ প্রশ্ন করল, মুখের সদকা কিভাবে হয়? তিনি বললেন ঃ সুপারিশ দ্বারা। এর কারণে রক্ত সংরক্ষিত হয়, অপরের উপকার হয় এবং তার উপর থেকে বিপদ কেটে যায়। হযরত ইকরিমা হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, বরীরার স্বামী ছিল মুগীস নামক জনৈক গোলাম। মুগীসের চেহারা এখনও আমার চোখের সামনে ভাসছে। সে বরীরার পেছনে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। অশ্রুতে তার দাড়ি ভিজে যাচ্ছে। রসূলে আকরাম (সাঃ) হযরত আব্বাস (রাঃ)-কে বললেন ঃ আশ্চর্যের বিষয়, মুগীস বরীরাকে এত ভালবাসে; অথচ বরীরা তাকে মনে প্রাণে ঘৃণা করে। অতঃপর তিনি বরীরাকে বললেন ঃ চমৎকার হত যদি তুমি তার কাছে ফিরে যেতে। সে-তো তোমার সন্তানের পিতা। বরীরা আরজ করল ঃ যদি আপনি আদেশ করেন, তবে আমি তাই করব। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ আমি আদেশ করি না; বরং সুপারিশ করি। সালাম করা এবং মোসাফাহা করাও একটি হক। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ যে ব্যক্তি সালামের পূর্বে কথা শুরু করে, তার কথার জওয়াব দিয়ো না যে পর্যন্ত না সে সালাম করে। জনৈক সাহাবী বলেন ঃ আমি রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে সালাম না করেই অনুমতি প্রার্থনা করলাম। তিনি এরশাদ করলেন ঃ সরে যাও এবং বল– আসসালামু আলাইকুম, আমার ভিতরে আসার অনুমতি আছে কি? হযরত জাবের (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ তোমরা যখন নিজের ঘরে যাও, তখন ঘরের লোকদেরকে সালাম কর। কেননা, যে এরূপ করে, তার ঘরে শয়তান আসে না। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ আমি আট বছর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমত করেছি। তিনি আমাকে বললেন, হে আনাস, ওযু পূর্ণ কর। এতে

তোমার আয়ু বৃদ্ধি পাবে। আমার উম্মতের মধ্যে যার সাথে দেখা হয় তাকে সালাম কর। এতে তোমার পুণ্য বৃদ্ধি পাবে। যখন তুমি নিজ গৃহে প্রবেশ কর, তখন গৃহের লোকদের সালাম কর। এতে তোমার গৃহে বরকত বৃদ্ধি পাবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِاَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوْهَا ـ

অর্থাৎ, যখন তোমাদেরকে সালাম করা হয়, তখন তোমরা তদপেক্ষা উত্তম সালাম কর অথবা উল্টে তাই বল। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে ঃ

والذى نفسى بيده لاتدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا فلا ادلكم على عمل اذا عملتموه تحاببتم قالوا بلى يا رسول الله قال افشوا السلام بينكم ـ

অর্থাৎ, সে আল্লাহর কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, তোমরা জান্নাতে দাখিল হবে না যে পর্যন্ত মুমিন না হবে এবং তোমরা মুমিন হবে না যে পর্যন্ত একে অপরকে মহব্বত না করবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন আমল বলে দেব না, যা পালন করলে তোমরা একে অপরকে মহব্বত করবে? সাহাবায়ে কেরাম বললেন ঃ বলে দিন ইয়া রসূলাল্লাহ! তিনি বললেন ঃ তোমরা নিজেদের মধ্যে সালামের খুব চর্চা কর।

আরও বলা হয়েছে– যখন মুসলমান অপরকে সালাম করে, তখন ফেরেশতা তার প্রতি সত্তর বার রহমত প্রেরণ করে। আরও বলা হয়েছে, যখন মুসলমান অপর মুসলমানের কাছ দিয়ে চলে যায় এবং সালাম করে না, তখন ফেরেশতারা বিস্মিত হয়। আরও বলা হয়েছে–

يسلم الراكب على الماشى واذا سلم من القوم واحد اجزأ عنهم ـ

অর্থাৎ সওয়ার ব্যক্তি যে পায়ে হাঁটে তাকে সালাম করবে। অনেক লোকের মধ্য থেকে একজন সালাম করলে সকলের পক্ষ থেকে যথেষ্ট হয়ে যাবে।

হযরত কাতাদা থেকে বর্ণিত আছে, পূর্ববর্তী লোকদের জন্যে সাক্ষাতের উপঢৌকন ছিল সেজদা। আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতকে সালাম দান করেছেন, যা জান্নাতীদের উপঢৌকন। আবু মুসলিম খাওলানী

(রহঃ) লোকজনের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় সালাম করতেন না। তিনি বলতেন ঃ সালাম না করার কারণ এছাড়া কিছুই নয় যে, আমি আশংকা করি, লোকজন আমার সালামের জওয়াব দেবে না। ফলে ফেরেশতারা তাদের প্রতি লানত করবে। সালামের সাথে মুসাফাহা করাও সুন্নত। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে বলল ঃ "আসসালামু আলাইকুম"। তিনি বললেন ঃ এ ব্যক্তির জন্যে দশটি পুণ্য। এর পর অন্য এক ব্যক্তি এসে বলল ঃ 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।' তিনি বললেন ঃ এ ব্যক্তি বিশটি পুণ্য পাবে। এর পর আর এক ব্যক্তি এসে বলল ঃ "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।" তিনি বললেন ঃ এ ব্যক্তি পাবে ত্রিশটি নেকী। হযরত আনাস (রাঃ) শিশুদের কাছ দিয়ে গেলে তাদেরকে সালাম করতেন এবং বলতেন ঃ রসূলে আকরাম (সাঃ) এরূপ করেছেন। আবদুল হামিদ ইবনে বাহরাম (রাঃ) বর্ণনা করেন– রসূলুল্লাহ (সাঃ) একদিন মসজিদে তশরীফ নিয়ে গেলেন। সেখানে একদল মহিলা বসে ছিল। তিনি হাতের ইশারায় তাদেরকে সালাম করলেন। বর্ণনাকারী আবদুল হামিদও হাদীসটি বর্ণনা করার সময় হাতে ইশারা করে দেখিয়ে দিলেন। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে–

لاتبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام واذا لقيتم احدهم فى الطريق فاضطروهم الى اضيقه ـ

অর্থাৎ, ইহুদী ও খৃস্টানদেরকে প্রথমে সালাম করো না। রাস্তায় তাদের সাথে দেখা হলে তাদেরকে সংকীর্ণ পথে যেতে বাধ্য কর। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

لاتصافحوا اهل الذمة ولا ابتدأوهم بالسلام فاذا لقيتموهم فى الطريق فاضطروهم الى اضيقه ـ

অর্থাৎ, যিম্মীদের সাথে মোসাফাহা করো না এবং তাদেরকে প্রথমে সালাম করো না। রাস্তায় তাদের সাথে দেখা হলে তাদেরকে সংকীর্ণ পথে চলতে বাধ্য কর।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ একদল ইহুদী রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে এসে বলল ঃ 'আসসামু আলাইকা' (আপনি নিপাত যান)।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ "আলাইকুম" (তোমরা)। হযরত আয়েশা বলেন ঃ আমি বললাম, "বাল আলাইকুম ওয়াল্লানাতু" (বরং তোরা নিপাত যা এবং তোদের প্রতি লানত)। তিনি বললেন ঃ হে আয়েশা, আল্লাহ তা'আলা নম্রতা পছন্দ করেন। হযরত আয়েশা আরজ করলেন ঃ আপনি শুনেননি এরা কি বলেছে? তিনি বললেন ঃ আমিও তো "আলাইকুম" বলে দিয়েছি। এক হাদীসে আছে–

يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير والصغير على الكبير ـ

অর্থাৎ, সওয়ার ব্যক্তি যে পায়ে হাঁটে তাকে সালাম করবে। যে পায়ে হাঁটে সে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে সালাম করবে। অল্পসংখ্যক লোক বেশী সংখ্যককে এবং ছোট বড়কে সালাম করবে। আরও বলা হয়েছে– তোমাদের কেউ কোন মজলিসে এলে সালাম করা উচিত। ইচ্ছা হলে মজলিসে বসবে। এর পর দাঁড়ালে সালাম করবে। কেননা, প্রথম সালাম দ্বিতীয় সালামের তুলনায় অধিক আইনসিদ্ধ নয়।

হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যখন দুই ঈমানদার পরস্পর মিলিত হয় এবং মোসাফাহা করে, তখন তাদের মধ্যে সত্তরটি রহমত বন্টন করা হয়। তাদের মধ্যে যে অধিক হাসিমুখ, সে ঊনসত্তরটি পায়। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যখন দু'জন মুসলমান মিলিত হয়, তখন তাদের মধ্যে একশ'টি রহমত বন্টন করা হয়। যে প্রথমে সালাম করে, তার ভাগে পড়ে নব্বইটি এবং অপর ব্যক্তি পায় দশটি। হযরত হাসান বসরী বলেন ঃ মোসাফাহা বন্ধুত্ব বৃদ্ধি করে। হযরত আবু হোরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ তোমাদের পারস্পরিক সালামের পরিশিষ্ট হচ্ছে মোসাফাহা। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে– মুসলমানকে চুম্বন করা নিজ ভাইয়ের সাথে মোসাফাহার শামিল। বরকত হাসিল করা ও সম্মান করার উদ্দেশে বুযুর্গ ব্যক্তির হাত চুম্বন করায় কোন দোষ নেই। ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পবিত্র হস্ত চুম্বন করেছি। কা'ব ইবনে মালেক বলেন ঃ যখন আমার তওবা

সম্পর্কে আয়াত নাযিল হয়, তখন আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে এসে তাঁর হস্ত চুম্বন করি। একবার জনৈক বেদুঈন আরজ করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আমাকে আপনার মস্তক ও হস্ত চুম্বন করার অনুমতি দিন। তিনি অনুমতি দিলেন এবং বেদুঈন তাঁর মস্তক ও হস্ত চুম্বন করল। হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর সাথে মোসাফাহা করেন, হস্ত চুম্বন করেন, অতঃপর উভয়েই সজোরে ক্রন্দন করতে থাকেন। হযরত বারা ইবনে আযেব বর্ণনা করেন, একবার রসূলে করীম (সাঃ) ওযু করছিলেন। আমি তাঁকে সালাম করলে তিনি জওয়াব দিলেন না। এর পর ওযু শেষ করে সালামের জওয়াব দিলেন এবং হাত বাড়িয়ে মোসাফাহা করলেন। আমি আরজ করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ, আমি জানতাম মোসাফাহা করা অনারবদের অভ্যাস। তিনি বলেন ঃ দুই মুসলমান যখন মিলিত হয় এবং মোসাফাহা করে, তখন উভয়ের গোনাহ ঝরে পড়ে। এক হাদীসে আছে, যখন কোন ব্যক্তি লোকজনের কাছ দিয়ে যায় এবং তাদেরকে সালাম করে, যদি তারা তার সালামের জওয়াব দেয়, তবে তার মর্যাদা লোকজনের উপর এক স্তর উন্নত হবে। কারণ সে তাদেরকে সালাম মনে করিয়ে দিয়েছে। আর যদি তারা সালামের জওয়াব না দেয়, তবে তাদের চেয়ে উত্তম একটি দল অর্থাৎ, ফেরেশতারা তার সালামের জওয়াব দেবে। সালাম করার সময় মাথা নত করা নিষেধ। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ আমরা রসূলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করলাম, আমাদের একজন অন্য জনের সামনে নত হবে কি না? তিনি বললেন ঃ না। আমরা বললাম ঃ একজন অন্যজনকে চুম্বন করবে কি না? তিনি বললেন, হাঁ। হযরত আবু যর (রাঃ) বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে যখনই সাক্ষাৎ করেছি, তখনই তিনি মোসাফাহা করেছেন। একদিন তিনি আমাকে তালাশ করলেন। আমি ঘরে ছিলাম না। যখন জানলাম, তখন তিনি তখতের উপর ছিলেন। তদবস্থায় তিনি আমার সাথে মোআনাকা (কোলাকুলি) করলেন। এ থেকে জানা গেল, কোলাকুলি করা ভাল। আলেমগণের সম্মানার্থে তাদের সওয়ারীর পাদান ধরে রাখার কথা হাদীসে

বর্ণিত আছে। সেমতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ)-এর পাদান ধরেছিলেন এবং হযরত ওমর (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পাদান ধারণ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, যায়েদ ইবনে সাবেত ও তাঁর সঙ্গীদের সাথে তাই কর। কারও সম্মানার্থে দন্ডায়মান হওয়া মাকরূহ নয়, যদি সেই ব্যক্তি তেমনটি আশা না করে। যদি সে নিজে চায় যে, মানুষ দাঁড়িয়ে তার সম্মান করুক, তবে দাঁড়ানো মাকরূহ। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ সাহাবায়ে কেরামের কাছে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চেয়ে অধিক প্রিয় অন্য কেউ ছিল না। কিন্তু আমাদের নিয়ম ছিল, তাঁকে দেখে আমরা দাঁড়াতাম না। কারণ, আমরা জানতাম তিনি এটা পছন্দ করেন না। তিনি একবার বললেন ঃ তোমরা আমাকে দেখে দাঁড়িয়ো না; যেমন অনারবরা দাঁড়ায়। তিনি আরও বলেন ঃ

من سره يمثل الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار -

অর্থাৎ, লোকজনের দাঁড়িয়ে থাকা যার জন্যে আনন্দদায়ক হয়, তার ঠিকানা জাহান্নাম। আরও বলা হয়েছে ঃ

لايقوم الرجل لرجل عن مجلسه ثم يجلس فيه ولكن توسعوا اوتفسحوا -

অর্থাৎ, এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির জন্যে দাঁড়িয়ে আবার বসবে না; কিন্তু তোমরা মজলিসে স্থান সংকুলান করবে।

এ নিষেধাজ্ঞার কারণেই পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ এ থেকে বেঁচে থাকতেন। বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে প্রস্রাব করার সময় সালাম করলে তিনি জওয়াব দানে বিরত থাকেন। এ থেকে বুঝা যায়, যে ব্যক্তি প্রস্রাব পায়খানায় ব্যস্ত থাকে, তাকে সালাম করা মাকরূহ। শুরুতে আলাইকুমুস সালাম বলে সালাম করাও মাকরূহ। এক ব্যক্তি এ শব্দ প্রয়োগে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সালাম করলে তিনি বললেন ঃ এটা মৃতের উপঢৌকন। তিনি একথাটি তিন বার বলে অবশেষে বললেন ঃ তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের সাথে দেখা করলে বলবে– "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ"। যে ব্যক্তি কোন মজলিসে এসে সালাম করে,

অতঃপর বসার জায়গা পায় না, তার সেখান থেকে ফিরে যাওয়া উচিত নয়; বরং সে কাতারের পেছনে বসে যাবে। একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) মসজিদে বসা ছিলেন, এমন সময় তিন ব্যক্তি আগমন করল। তাদের দু'জন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দিকে এগিয়ে গেল। একজন সামান্য জায়গা পেয়ে বসে পড়ল এবং দ্বিতীয় জন লোকজনের পেছনে বসে গেল। তৃতীয় ব্যক্তি স্থান না দেখে ফিরে গেল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজের কাজ শেষে বললেন ঃ এই তিন জন লোকের অবস্থা আমি বর্ণনা করছি শুন। একজন তো আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করেছে। আল্লাহ তাকে স্থান দিয়েছেন। দ্বিতীয়জন 'হায়া' তথা লজ্জা অবলম্বন করেছে। আল্লাহ তার ব্যাপারে হায়া করেছেন। তৃতীয়জন পৃষ্ঠ ফিরিয়ে নিয়েছে। ফলে আল্লাহ তার প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছেন। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে, যে দু'জন মুসলমান পরস্পরে সাক্ষাৎ করে এবং মোসাফাহা করে, পৃথক হওয়ার পূর্বেই তাদের গোনাহসমূহ মার্জনা করা হয়।

আর একটি হক হল, সক্ষম হলে মুসলমান তার মুসলমান ভাইয়ের ইযযত, জান ও মাল জালেমের কবল থেকে রক্ষা করবে, জালেমকে প্রতিহত করবে এবং মজলুমের সাহায্য করে তার পক্ষ থেকে জালেমের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। ইসলামী ভ্রাতৃত্বের দাবীস্বরূপ এটা প্রত্যেকের উপর ওয়াজিব। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে অপর ব্যক্তিকে মন্দ বললে তৃতীয় ব্যক্তি তার পক্ষ হয়ে তাকে বাধা দিল। তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ

من رد عن عرض اخيه كان له حجابا من النار -

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ভাইয়ের ইযযত রক্ষা করে, তার এ কর্ম তার জন্যে দোযখ থেকে আড়াল হয়ে যাবে।

আরও বলা হয়েছে– যে মুসলমান তার ভাইয়ের ইযযত বাঁচায়, আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিন তাকে অবশ্যই দোযখের আগুন থেকে বাঁচাবেন। হযরত আনাসের (রাঃ) রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যার সামনে তার মুসলমান ভাইয়ের কুৎসা রটনা করা হয় এবং ক্ষমতা

থাকা সত্ত্বেও সে তা প্রতিহত করে না, ইহকাল ও পরকালে আল্লাহ তাকে পাকড়াও করবেন। পক্ষান্তরে এমতাবস্থায় যে তার মুসলমান ভাইকে সাহায্য করবে, ইহকাল ও পরকালে আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেন। হযরত জাবের ও তালহা (রাঃ) বলেন ঃ আমরা রসূলে করীম (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে মুসলমান অপর মুসলমানের সাহায্য এমন জায়গায় করে না, যেখানে তার ইযযত ও সম্মান বিনষ্ট হতে থাকে, আল্লাহ তা'আলা এমন স্থানে তার সাহায্য করবেন না, যেখানে তার অন্তর সাহায্য প্রত্যাশা করবে।

হাঁচির জওয়াব দেয়াও একটি হক। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যে হাঁচি দেয়, সে বলবে– اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ (সর্বাবস্থায় প্রশংসা আল্লাহর)। আর যে জওয়াব দেবে, সে বলবে– يَرْحَمُكَ اللّٰهُ (আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন)। যে হাঁচি দেয় সে পুনরায় বলবে– يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ (আল্লাহ তোমাকে হেদায়াত করুন এবং তোমার অবস্থা সংশোধন করুন)। রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার এক ব্যক্তির হাঁচির জওয়াব দিলেন এবং অন্য এক ব্যক্তির জওয়াব দিলেন না। লোকটি এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ সে আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করেছে; কিন্তু তুমি নিশ্চুপ রয়েছ। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে ঃ মুসলমানকে তিন বার হাঁচির জওয়াব দেবে। এর বেশী হাঁচি দিলে সেটা সর্দি। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ) নীচ স্বরে হাঁচি দিতেন এবং নাক কাপড় কিংবা হাতে আবৃত করে নিতেন। হযরত আবু মূসা আশআরী বলেন ঃ ইহুদীরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে হাঁচি দিত এই আশায় যে, তিনি ইয়ারহামুকাল্লাহ বলুন; কিন্তু তিনি ইয়াহদীকুমুল্লাহ বলতেন। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে–

العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان فاذا تثاؤب احدكم فليضع يده على فيه فاذا قال اه اه فان الشيطن يضحك من خوفه ـ

অর্থাৎ হাঁচি হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে আর হাই শয়তানের পক্ষ থেকে। যখন তোমাদের কেউ হাই তোলে, তখন মুখের উপর হাত রাখবে। সে যখন আহ, আহ, করে, তখন শয়তান তার ভয়ে হাস্য করে।

হযরত ইবরাহীম নখয়ী (রহঃ) বলেন ঃ এস্তেঞ্জার অবস্থায় হাঁচি এলে আল্লাহ তা'আলার নাম উচ্চারণ করায় কোন দোষ নেই। হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ এমতাবস্থায় মনে মনে আলহামদু লিল্লাহ বলে নেবে। কা'ব আহবার হযরত মূসা (আঃ)-এর অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে আরজ করলেন, ইলাহী, তুমি নিকটে হলে আমি নিঃশব্দে তোমাকে কিছু বলব আর দূরবর্তী হলে সশব্দে বলব। আল্লাহ এরশাদ করলেন ঃ যে কেউ আমাকে স্মরণ করে, আমি তার সঙ্গে থাকি। মূসা (আঃ) আরজ করলেন ঃ আমরা কোন সময় এমন অবস্থায় থাকি, যাতে তোমাকে স্মরণ করা যায় না, যেমন নাপাকী বা প্রস্রাব-পায়খানার অবস্থা। আল্লাহ্ বললেন ঃ সর্বাবস্থায় আমাকে স্মরণ কর।

আর একটি হক হল, দুষ্ট লোকের সাথে পালা পড়লে সচ্চরিত্রতা প্রদর্শন করে তার অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা করা। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন ঃ আমরা কোন কোন মানুষের সামনে হাসি; কিন্তু অন্তর তাদেরকে অভিসম্পাত করে। বাহ্যিক সচ্চরিত্রতা প্রদর্শনের অর্থ এটাই। এটা তাদের সাথে করা হয়, যাদের তরফ থেকে অনিষ্টের আশংকা থাকে ।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ (তারা ভাল দ্বারা মন্দকে প্রতিহত করে)। وَيَدْرَؤُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ এই আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ سيئة তথা মন্দ বলে অশ্লীলতা এবং حسنة বলে সালাম ও সৌজন্য বুঝানো হয়েছে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে আসার অনুমতি চাইলে তিনি বললেন ঃ তাকে আসতে দাও। সে তার সম্প্রদায়ের মধ্যে জঘন্যতম ব্যক্তি। এর পর লোকটি ভেতরে এলে তিনি তার সাথে অত্যন্ত নম্র কথাবার্তা বললেন। এতে আমার

ধারণা হল, তাঁর কাছে লোকটির ইজ্জত রয়েছে। লোকটি চলে গেলে আমি আরজ করলাম ঃ যখন সে আসতে চেয়েছিল, তখন তো আপনি এমন এমন মন্তব্য করলেন, এর পর তার সাথে এমন নম্র কথা বললেন; এর রহস্য কি? তিনি বললেন ঃ আয়েশা, কেয়ামতের দিনে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সর্বাধিক হীন মর্যাদাসম্পন্ন সে ব্যক্তি হবে, যার কটূক্তির কারণে মানুষ তার সঙ্গ ত্যাগ করে । এক হাদীসে আছে- যে বিষয়ের মাধ্যমে মানুষ তার ইজ্জত বাঁচায়, তা হল তার জন্যে সদকা। রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, মানুষের সাথে মেলামেশা তাদের কর্ম অনুযায়ী কর এবং অন্তর দিয়ে তাদের থেকে আলাদা থাক। মোহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কোন উপায় বের করা পর্যন্ত যাদের সংসর্গে না থেকে উপায় নেই, তাদের সাথে যে ব্যক্তি সচ্চরিত্রতা অবলম্বন করে না, সে বুদ্ধিমান নয়।

ধনীদের সাথে উঠাবসা থেকে বিরত থাকা, দরিদ্রদের সাথে মেলামেশা করা এবং এতীমদের সাথে সদ্ব্যবহার করাও একটি হক। রসূলে করীম (সাঃ) এই দোয়া করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مِسْكِيْنًا وَاَمِتْنِىْ مِسْكِيْنًا وَاحْشُرْنِىْ فِىْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ ـ

অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ্, আমাকে মিসকীনরূপে জীবিত রাখ, মিসকীনরূপে মৃত্যুদান কর এবং মিসকীনদের দলে আমার হাশর কর।'

হযরত সোলায়মান (আঃ) তাঁর রাজত্বকালে যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন এবং কোন দরিদ্র লোককে দেখতেন, তখন তার কাছে গিয়ে বসতেন এবং বলতেন ঃ এক মিসকীন অন্য এক মিসকীনের সাথে একত্রে বসেছে। কথিত আছে, হযরত ঈসা (আঃ)-কে 'হে মিসকীন' বলে কেউ ডাকলে এটা তাঁর কাছে অন্য যে কোন সম্বোধনের তুলনায় অধিকতর প্রিয় ছিল। কা'ব আহ্বার (রঃ) বর্ণনা করেন, কোরআনের যেস্থানে 'হে ঈমানদারগণ' বলা হয়েছে, তাওরাতে সেখানে 'হে মিসকীনগণ' বলা হয়েছে। হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রাঃ) বলেন ঃ দোযখের সাতটি

দরজা রয়েছে– তিনটি ধনীদের জন্যে, তিনটি নারীদের জন্যে এবং একটি দরিদ্র ও মিসকীনদের জন্যে। হযরত ফোযায়ল বলেন ঃ আমি শুনেছি কোন একজন নবী আল্লাহ্র দরবারে আরজ করলেন, ইলাহী, আমি কিভাবে জানব যে, তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট? এরশাদ হল, লক্ষ্য করবে দরিদ্ররা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট কি না? এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে, নিজেকে মৃতদের সাথে উঠাবসা থেকে বাঁচাও। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্, মৃত কারা? উত্তর হল ঃ ধনাঢ্যরা। হযরত মূসা (আঃ) বললেন, ইলাহী আমি তোমাকে কোথায় খুঁজব? উত্তর হল ঃ ভগ্নহৃদয়দের কাছে। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ পাপাচারীর ধনৈশ্বর্য দেখে ঈর্ষা করো না। কারণ, তুমি জান না, মৃত্যুর পর তার কি অবস্থা হবে। তার পেছনে তো একজন তাড়াহুড়াকারী গ্রহীতা (মৃত্যু) লেগে আছে। এতীমের সেবাযত্নের ফযীলত নিম্নোক্ত রেওয়ায়েতসমূহ থেকে জানা যায়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি এমন এতীমকে বালেগ হওয়া পর্যন্ত নিজের কাছে রাখে, যার পিতা-মাতা মুসলমান ছিল, তার জন্যে জান্নাত নিশ্চিতরূপে ওয়াজিব। তিনি আরও বলেন–

انا وكافل اليتيم كهاتين ويشير باصبعيه .

অর্থাৎ, আমি এবং এতীমদের ভরণপোষণকারী এ দুটির মত। একথা বলার সময় তিনি দু'অঙ্গুলির দিকে ইশারা করছিলেন। আরও বলা হয়েছে– যে ব্যক্তি এতীমের মাথায় অনুগ্রহের হাত বুলাবে, যতগুলো চুলের উপর দিয়ে তার হাত যাবে, ততগুলো নেকী সে পাবে। আরও বলা হয়েছে– মুসলমানদের গৃহসমূহের মধ্যে সেই গৃহ উত্তম, যাতে এতীম থাকে এবং তার সাথে সদাচরণ করা হয়। পক্ষান্তরে সেই গৃহ সর্বনিকৃষ্ট, যাতে এতীম থাকে; কিন্তু তার সাথে অসদাচরণ করা হয়।

প্রত্যেক মুসলমানের মঙ্গল কামনা করা এবং তাকে প্রফুল্ল করার প্রয়াস পাওয়াও একটি হক। নবী করীম (সাঃ) বলেন–

لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه

অর্থাৎ, তোমাদের কেউ মুমিন হবে না যে পর্যন্ত নিজের জন্যে যা পছন্দ করে, তার মুসলমান ভাইয়ের জন্যে তাই পছন্দ না করে। আরও বলা হয়েছে–

ان احدكم مرأة اخيه فاذا راى فيه شيئا فليمطه عنه .

অর্থাৎ. তোমাদের একজন অপর জনের আয়না। যখন তার মধ্যে কোন কিছু দেখে, তখন তা দূর করে দেয়া উচিত। অন্য এক হাদীসে আছে– যে কোন ঈমানদারকে শান্তি দেয়, আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন তাকে শান্তি দেবেন। আরও বলা হয়েছে, রাতে কিংবা দিনে এক ঘন্টা নিজের ভাইয়ের কাজে ব্যয় করবে– কাজ পূর্ণ হোক বা না হোক, এটা তার জন্যে দু'মাস এ'তেকাফ করার চেয়ে উত্তম হবে। এক হাদীসে আছে–

انصر اخاك ظالما او مظلوما فقيل كيف ننصره ظالما قال تمنعه من الظلم .

অর্থাৎ, তোমার ভাইকে সাহায্য কর, সে জালেম হোক কিংবা মজলুম। প্রশ্ন করা হল ঃ আমরা জালেমকে কেমন করে সাহায্য করব? তিনি বললেন ঃ তাকে জুলুম করতে নিষেধ করবে। আরও বলা হয়েছে– ঈমানদারকে প্রফুল্ল করা, তার কোন দুঃখ দূর করা, ঋণ আদায় করা এবং ক্ষুধার্ত হলে অন্নদান করা আল্লাহ তা'আলার কাছে অধিক পছন্দনীয়। আরও বলা হয়েছে– দু'টো অভ্যাস সবচেয়ে মন্দ– আল্লাহর সাথে শরীক করা এবং আল্লাহর বান্দাদের ক্ষতি করা। পক্ষান্তরে দু'টি অভ্যাসের চেয়ে বড় কোন পুণ্য কাজ নেই– আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং তার বান্দাদের উপকার করা। রুগ্ন ব্যক্তিকে তার অবস্থা জিজ্ঞেস করাও একটি হক। এ হকের জন্যে রোগীর পরিচিত হওয়া এবং মুসলমান হওয়া যথেষ্ট। এর নিয়ম হল, রোগীর কাছে কিছুক্ষণ বসবে, প্রশ্ন কম করবে, সমবেদনা প্রকাশ করবে এবং আরোগ্য লাভের জন্যে দোয়া করবে। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ রোগীর অবস্থা জিজ্ঞেস করার পূর্ণতা হচ্ছে, তার কপালে অথবা হাতের উপর নিজের হাত রেখে জিজ্ঞেস করবে, কেমন

আছেন? যে ব্যক্তি রোগীর অবস্থা জিজ্ঞেস করে, সে যেন জান্নাতের খর্জুর বাগানে উপবেশন করে। সে যখন উঠে, তখন সত্তর হাজার ফেরেশতা রাত পর্যন্ত তার জন্যে রহমতের দোয়া করে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেন ঃ বান্দা অসুস্থ হলে আল্লাহ তা'আলা তার কাছে দু'জন ফেরেশতা প্রেরণ করে বলেন ঃ দেখ সে তার অবস্থা জিজ্ঞাসাকারীদের কাছে কি বলে। যদি অবস্থা জিজ্ঞাসাকারীদের আগমনে রোগী আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করে তবে ফেরেশতারা আল্লাহর দরবারে আরজ করে, অথচ আল্লাহ তাআলা নিজেই জানেন। এর পর আল্লাহ বলেন ঃ যদি আমি এই বান্দাকে ওফাত দেই, তবে তাকে জান্নাতে দাখিল করা, যদি আরোগ্য দেই, তবে তার গোশতের চেয়ে ভাল গোশত দেয়া, রক্তের চেয়ে ভাল রক্ত দেয়া এবং তার গোনাহ মাফ করা আমার জন্য অপরিহার্য, এগুলো আমি করবই। এক হাদীসে আছে, আল্লাহ তাআলা যার মঙ্গল চান তাকে বিপদাপদে জড়িত করেন, যাতে সে গোনাহ থেকে পবিত্র হয়ে যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ রোগীর অবস্থা জিজ্ঞাসা করা একবার সুন্নত এবং অধিক বার নফল। শিষ্টাচার হচ্ছে উত্তম সবর করা, অভিযোগ ও অস্থিরতা কম করা, দোয়া প্রার্থনা করা এবং ওষুধের সাথে ওষুধ স্রষ্টার উপর ভরসা করা।

মুসলমানের জানাযার সাথে চলাও একটি হক। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যে জানাযার পেছনে চলে সে এক কীরাত সওয়াব পায়। সহীহ হাদীসে আছে, কীরাত ওহুদ পাহাড়ের সমান। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) এ হাদীসটি শুনে বললেন ঃ আমি এ পর্যন্ত অনেক কীরাত আখেরাতের জন্যে সঞ্চয় করেছি। জানাযার পেছনে চলার উদ্দেশ্য, মুসলমানের হক আদায় করা এবং শিক্ষা গ্রহণ করা। মকহুল দামেশকী জানাযা দেখে বলতেন– আমরাও আসছি। এটা উপদেশ– কিন্তু এখন গাফিলতি চরমে পৌঁছেছে। পূর্ববর্তীরা চলে যায় কিন্তু পরবর্তীরা বুঝে না। ইবরাহীম যাইয়াত লোকজনকে মৃতের জন্যে রহমতের দোয়া করতে দেখে বলতেন ঃ তোমরা নিজেদের জন্যে রহমতের দোয়া করলে তা উত্তম হত। কেননা, এই মৃত ব্যক্তি তো তিনটি মনযিল থেকে মুক্তি পেয়ে গেছে। অর্থাৎ,

মালাকুল মওতের আকৃতি দেখে নিয়েছে, মৃত্যুর তিক্ততা আস্বাদন করেছে এবং খাতেমার ভয় থেকে মুক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু তোমাদের এসব মনযিল সামনে রয়ে গেছে। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ

يتبع الميت ثلثة فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبعه اهله وماله وعمله فيرجع اهله وماله ويبقى عمله -

অর্থাৎ, মৃতের পেছনে তিনটি বস্তু চলে। অতঃপর দু'টি ফিরে আসে এবং একটি বাকী থাকে। অর্থাৎ, তার পরিবারের লোকজন, অর্থ সম্পদ ও তার আমল পেছনে চলে। এর পর পরিবারের লোকজন ও অর্থসম্পদ ফিরে আসে এবং আমল তার সঙ্গে থেকে যায়।

মুসলমানের কবর যিয়ারত করাও একটি হক। এর উদ্দেশ্য দোয়া, শিক্ষা এবং অন্তরকে নরম করা। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে বের হলাম। তিনি কবরস্থানে পৌঁছে একটি কবরের কাছে বসে গেলেন। আমি অন্যদের তুলনায় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অধিক নিকটে ছিলাম। তিনি কাঁদলেন এবং আমিও কাঁদলাম। তিনি শুধালেন, তুমি কাঁদলে কেন? আমি আরজ করলাম ঃ আপনার কান্নার কারণে। তিনি বললেন ঃ এটা আমার জননী আমেনা বিনতে ওয়াহাবের কবর। আমি পরওয়ারদেগারের কাছে যিয়ারতের অনুমতি চাইলে তিনি অনুমতি দিলেন। এর পর আমি তাঁর জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করার আবেদন করলে তা মঞ্জুর হল না। তাই আমি কেঁদেছি, যা সন্তানের জন্যে স্বাভাবিক। হযরত ওসমান (রাঃ) যখন কবরে দাঁড়াতেন, তখন এত কাঁদতেন যে, অশ্রুতে তাঁর দাড়ি ভিজে যেত। তিনি বলতেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি–

ان القبر اول منازل الاخرة فان نجا منه صاحبه فما بعده ايسر وان لم ينج منه فما بعده اشد -

অর্থাৎ কবর হল আখেরাতের প্রথম মনযিল। যদি কবরবাসী এখানে মুক্তি পেয়ে যায়, তবে পরবর্তী মনযিলসমূহ সহজ। আর যদি এখানে

মুক্তি না পায়, তবে পরবর্তী মনযিলসমূহ আরও কঠিন।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ কবর মৃতের সাথে প্রথমে বলে, আমি সাপ-বিচ্ছুর ঘর, নির্জন গৃহ, মুসাফিরখানা, অন্ধকার মনযিল। এসব বস্তু আমি তোমার জন্যে রেখে দিয়েছি। তুমি আমার জন্যে কি উপকরণ সংগ্রহ করেছ? হযরত আবু যর (রাঃ) বলেন ঃ শুন, আমি তোমাদেরকে আমার নিঃস্বতার দিনের কথা বলছি। এটা সে দিন, যে দিন আমাকে কবরে রাখা হবে। আবুদ্দারদা (রাঃ) প্রায়ই কবরের কাছে বসে থাকতেন। লোকেরা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন ঃ আমি এমন লোকদের কাছে বসি, যারা আমাকে আখেরাত স্মরণ করিয়ে দেয়। তাদের কাছ থেকে চলে গেলে তারা আমার গীবত করে না। হাতেম আসাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি কবরস্থান হয়ে গমন করে, অতঃপর নিজের সম্পর্কে চিন্তা করে না এবং কবরবাসীদের জন্যেও দোয়া করে না, সে নিজের সাথে এবং কবরবাসীদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। এক হাদীসে আছে– প্রত্যেক রাতে একজন ঘোষক এই বলে ঘোষণা করে, হে কবরবাসীরা, তোমরা কার উপর ঈর্ষা কর? তারা বলে, আমরা মসজিদের বাসিন্দাদের উপর ঈর্ষা করি। কারণ, তারা রোযা রাখে, নামায পড়ে এবং আল্লাহর যিকির করে। আমরা তা করতে পারি না। হযরত সুফিয়ান বলেন ঃ যে ব্যক্তি কবরকে অধিক স্মরণ রাখবে, সে কবরকে জান্নাতের একটি বাগানরূপে পাবে। আর যে কবরের স্মরণ থেকে গাফেল থাকবে, সে তাকে দোযখের একটি গর্তরূপে পাবে। রবী ইবনে খায়সাম নিজের গৃহে একটি কবর খুদে রেখেছিলেন। অন্তরে কঠোরতা অনুভব করলেই তিনি তাতে শুয়ে পড়তেন। ঘন্টাখানেক শোয়ার পর এই আয়াত পাঠ করতেন ঃ رَبِّ ارْجِعُوْنَ لَعَلِّىْ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ

অর্থাৎ হে পরওয়ারদেগার, আমাকে ফিরিয়ে দাও, যাতে আমি পেছনে ফেলে আসা কর্মসমূহের মধ্যে কোন সৎকর্ম সম্পাদন করতে পারি। এর পর বলতেন ঃ হে রবী, তোমাকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। এখন সৎকর্ম করে নাও সে দিনের আগে, যখন আর ফিরিয়ে দেয়া হবে

না। মায়মুন ইবনে মেহরান বলেন ঃ আমি হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজের সাথে কবরস্থানে গেলাম। তিনি কবর দেখেই কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, মায়মুন, এগুলো আমার পিতৃপুরুষ বনী উমাইয়ার কবর। দেখে মনে হয়, তারা যেন দুনিয়াবাসীদের আনন্দ উৎসবে কখনও শরীক ছিল না। দেখ, এখন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আছে। রয়ে গেছে কেবল কিসসা-কাহিনী। সাপ বিচ্ছুতে তাদের দেহ খেয়ে ফেলেছে। এর পর তিনি কাঁদতে কাঁদতে বললেন ঃ আল্লাহর কসম, আমি বিলাস-ব্যসনে মত্ত এবং আল্লাহর আযাব থেকে নির্ভীক তাদের চেয়ে বেশী কাউকে জানি না।

প্রতিবেশীর হক ঃ প্রকাশ থাকে যে, ইসলামী ভ্রাতৃত্বের যে সকল হক বর্ণিত রয়েছে, প্রতিবেশীর হক সেগুলো থেকে আলাদা। তাই প্রতিবেশী মুসলমান হলে তার হক অন্য মুসলমানের তুলনায় বেশী হবে। কেননা, রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ প্রতিবেশী তিন প্রকার, প্রথম যার হক একটি; দ্বিতীয়, যার হক দুটি এবং তৃতীয়, যার হক তিনটি। যার হক তিনটি, সে হচ্ছে মুসলমান, আত্মীয় প্রতিবেশী। যার হক দু'টি সে মুসলমান প্রতিবেশী। আর যার হক একটি, সে মুশরিক তথা বিধর্মী প্রতিবেশী। এখানে লক্ষণীয় যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কেবল প্রতিবেশীত্বের কারণে মুশরিকের হক সাব্যস্ত করেছেন। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে– যে ব্যক্তি তোমার প্রতিবেশী, তার হক উত্তমরূপে মেনে চল। এতে তুমি মুসলমান হয়ে যাবে। আরও বলা হয়েছে–

ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه -

অর্থাৎ, জিবরাঈল আমাকে সর্বদা প্রতিবেশী সম্পর্কে ওসিয়ত করতেন। এমন কি, আমার ধারণা হল, তাকে ওয়ারিস করে দেবেন।

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে– কেয়ামতের দিন প্রথম যে দুই ব্যক্তি বাদানুবাদে লিপ্ত হবে তারা হবে দুই প্রতিবেশী। এক ব্যক্তি হযরত ইবনে মসঊদের খেদমতে হাযির হয়ে আরজ করল ঃ আমার এক প্রতিবেশী আমাকে জ্বালাতন করে, গালি দেয় এবং অতিষ্ঠ করে। তিনি বললেন ঃ যাও, যদি সে তোমার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী করে, তবে

তুমি তার ব্যাপারে আল্লাহর আনুগত্য কর। রসূলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করা হল, অমুক মহিলা দিনে রোযা রাখে এবং সারারাত জেগে এবাদত করে; কিন্তু সে প্রতিবেশীদেরকে কষ্ট দেয়। তিনি বললেন ঃ সে দোযখে যাবে। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। তিনি বললেন ঃ সবর কর। এর পর তৃতীয় অথবা চতুর্থ বারের অভিযোগ শুনে তিনি বললেন ঃ তোমার গৃহের আসবাবপত্র রাস্তায় ফেলে দাও। লোকটি তাই করল। লোকজন তার আসবাবপত্রের কাছে এসে জিজ্ঞেস করত, তোমার কি হল? কেউ বলে দিত, তার প্রতিবেশী তাকে কষ্ট দিয়েছে। তখন লোকেরা বলত, আল্লাহ তার প্রতি লানত করুন। অবশেষে তার প্রতিবেশী তার কাছে এসে বলল ঃ তোমার আসবাবপত্র তুলে নাও। আল্লাহর কসম, পুনরায় আমি আর এরূপ করব না। এক হাদীসে বলা হয়েছে— বরকত ও অমঙ্গল স্ত্রী, গৃহ ও ঘোড়ার মধ্যে হয়ে থাকে। স্ত্রীর বরকত হচ্ছে মোহরানা কম হওয়া, বিবাহ সহজে সম্পন্ন হওয়া এবং সচ্চরিত্রা হওয়া। স্ত্রীর অমঙ্গল হচ্ছে, মোহরানা বেশী হওয়া, বিবাহ কষ্ট সহকারে সম্পন্ন হওয়া এবং চরিত্র নষ্ট হওয়া। গৃহের বরকতময় হওয়ার অর্থ প্রশস্ত হওয়া এবং প্রতিবেশী ভাল হওয়া। গৃহের অমঙ্গলজনক হওয়ার অর্থ সংকীর্ণ হওয়া এবং প্রতিবেশী খারাপ হওয়া। ঘোড়ার বরকত হচ্ছে, অনুগত হওয়া ও উত্তম স্বভাবসম্পন্ন হওয়া এবং তার অমঙ্গল হচ্ছে হঠকারী হওয়া। জানা দরকার, প্রতিবেশীর হক কেবল এটাই নয় যে, তাকে কষ্ট দেবে না। কেননা, এ গুণটি পাথর, ইট ইত্যাদি জড় পদার্থের মধ্যেও আছে। এগুলো কাউকে কষ্ট দেয় না। বরং তার হক হচ্ছে সে কষ্ট দিলে বরদাশত করবে। কেবল বরদাশত করেই ক্ষান্ত হবে না; বরং তার সাথে নম্র ব্যবহার করবে এবং দয়াদাক্ষিণ্য প্রদর্শন করবে। কথিত আছে, নিঃস্ব প্রতিবেশী কেয়ামতের দিন তার ধনী প্রতিবশীকে জড়িয়ে ধরবে এবং বলবে— পরওয়ারদেগার, তাকে জিজ্ঞেস করুন সে তার দয়া থেকে আমাকে কেন বঞ্চিত রেখেছে এবং আমার উপর তার দরজা কেন বন্ধ রেখেছে? ইবনে মুক'নে খবর পেলেন, তার প্রতিবেশী ঋণের দায়ে নিজের গৃহ বিক্রি করে

ফেলেছে। তিনি প্রায়ই তার দেয়ালের ছায়ায় বসতেন। তিনি বললেন ঃ যদি সে নিঃস্বতার কারণে গৃহ বিক্রি করে, তবে আমার দ্বারা তার প্রাচীরের ছায়ায় বসার হক আদায় হবে না। অতঃপর তিনি প্রতিবেশীকে গৃহের মূল্য দিয়ে বললেন ঃ গৃহ বিক্রয় করো না। জনৈক বুযুর্গ বলেন, তাঁর গৃহে ইঁদুরের উৎপাত অনেক বেড়ে গেছে। এতে এক ব্যক্তি তাঁকে বিড়াল পালনের পরামর্শ দিল। তিনি বললেন ঃ এতে বিড়ালের শব্দ শুনে ইঁদুরগুলো প্রতিবেশীর গৃহে চলে যাবার আশংকা রয়েছে। যে বিষয় আমি নিজের জন্যে পছন্দ করি না, তা প্রতিবেশীর জন্যে কিরূপে পছন্দ করব?

সংক্ষেপে প্রতিবেশীর হক এই ঃ তাকে প্রথমে সালাম করবে। তার সাথে দীর্ঘ কথাবার্তা বলবে না এবং তার অবস্থা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করবে না। অসুস্থ হলে তার অবস্থা জিজ্ঞেস করবে এবং বিপদে সান্ত্বনা দেবে ও সঙ্গ ত্যাগ করবে না। আনন্দে মোবারকবাদ জানাবে এবং নিজেও তার সাথে আনন্দ প্রকাশ করবে। তার ত্রুটি-বিচ্যুতি মার্জনা করবে। ছাদের উপর থেকে তার গৃহের দিকে তাকাবে না। প্রাচীরের উপর কাঠ রেখে, নালা থেকে পানি ফেলে অথবা আঙ্গিনায় মাটি ফেলে তাকে উত্ত্যক্ত করবে না। তার বাড়ীতে যাওয়ার পথ সংকীর্ণ করবে না। তার কোন দোষ জানা গেলে তা গোপন করবে। সে কোন দুর্ঘটনায় পতিত হলে অবিলম্বে তার সাহায্যে এগিয়ে যাবে। সে বাড়ীতে না থাকলে তার বাড়ী দেখাশুনা করা থেকে গাফেল হবে না। পার্থিব অথবা ধর্মীয় কোন বিষয় তার অজানা থাকলে ঠিক ঠিক বলে দেবে। সাধারণ মুসলমানের যেসব হক আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, প্রতিবেশীর ক্ষেত্রেও সেগুলো পালন করতে তৎপর হবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ তোমরা কি জান প্রতিবেশীর হক কি? প্রতিবেশীর হক হল, সে সাহায্য চাইলে তাকে সাহায্য করা, কর্জ চাইলে তাকে কর্জ দেয়া, অসুস্থ হলে খবর নেয়া এবং মারা গেলে জানাযার সাথে চলা, তার সাফল্যে মোবারকবাদ দেয়া, বিপদে পড়লে সমবেদনা প্রকাশ করা। তার অনুমতি ছাড়া তোমাদের দালান গৃহ উঁচু করবে না, যাতে তার আলো বাতাস বন্ধ হতে পারে। কোন ফলমূল কিনলে তাকে হাদিয়া দেবে। নতুবা গোপনে নিজের গৃহে

আনবে এবং শিশুদেরকে ফল নিয়ে বাইরে যেতে দেবে না, যাতে তার শিশুদের মনে কষ্ট না হয়। তোমার পাতিলের সুগন্ধি দ্বারা প্রতিবেশীকে কষ্ট দিয়ো না। কিন্তু তখন, যখন এক চামচ তার বাড়ীতেও পাঠিয়ে দাও। প্রতিবেশীর হক কি তোমরা জান? সেই আল্লাহর কসম যার হাতে আমার প্রাণ– প্রতিবেশীর হক সে-ই আদায় করতে পারে, যার প্রতি আল্লাহর রহমত হয়।

হযরত মুজাহিদ বলেন ঃ আমি হযরত ইবনে ওমরের কাছে ছিলাম। তাঁর এক গোলাম যবেহ করা ছাগলের চামড়া ছাড়াচ্ছিল। তিনি বললেন ঃ হে গোলাম, ছাগল সাফ করার কাজ হয়ে গেলে প্রথমে আমার প্রতিবেশী ইহুদীকে গোশত দেবে। এ কথাটি তিনি কয়েকবার বললেন। গোলাম বলল ঃ আপনি কয়বার বলবেন? তিনি বললেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের সব সময় প্রতিবেশী সম্পর্কে ওসিয়ত করতেন। এমন কি, আমরা আশংকা করলাম, প্রতিবেশীকে ওয়ারিস করে দেবেন না তো! হেশাম বলেন ঃ হযরত হাসান বসরীর মতে কোরবানীর গোশত ইহুদী, খৃস্টানদেরকে খাওয়াতে কোন দোষ ছিল না। হযরত আবু যর (রাঃ) বলেন ঃ আমার বন্ধু মুহাম্মদ (সাঃ) আমাকে ওসিয়ত করলেন, ব্যঞ্জন পাকালে তাতে শুরবা বেশী দেবে। এর পর প্রতিবেশীর জন্যে কিছু অংশ পাঠিয়ে দেবে। হযরত আয়েশা আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আমার দু'জন প্রতিবেশী। একজনের দরজা আমার সামনে এবং অন্যজনের দরজা একটু দূরে। মাঝে মাঝে আমার কাছে দু'জনকে দেয়ার মত জিনিস থাকে না। অতএব তাদের মধ্যে কার হক বেশী? তিনি বললেন ঃ যার দরজা তোমার সামনে তার হক বেশী। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) নিজের পুত্রকে প্রতিবেশীর সাথে রুক্ষ ব্যবহার ও কটু কথা বলতে দেখে বললেন ঃ প্রতিবেশীর সাথে এরূপ করো না। কারণ, কথা থেকে যায় এবং মানুষ চলে যায়। হাসান ইবনে ঈসা নিশাপুরী লেখেন ঃ আমি আবদুর রহমান ইবনে মোবারককে জিজ্ঞেস করলাম– প্রতিবেশী আমার কাছে অভিযোগ করে যে, আমার গোলাম তার সাথে দুর্ব্যবহার করেছে; কিন্তু গোলাম তা অস্বীকার করে। এখন গোলামকে প্রহার করতেও আমার মন চায় না।

কারণ, সে হয় তো অপরাধী নয়। তাকে একদম ছেড়ে দেয়াও খারাপ মনে হয়। কারণ, এতে প্রতিবেশী আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়। এমতাবস্থায় আমি কি করব? হযরত আবদুর রহমান জওয়াবে বললেন ঃ তোমার গোলাম তোমার সাথে কোন অপরাধ করলে তাকে তখন সাজা দিয়ো না। এর পর যখন প্রতিবেশী অভিযোগ করে, তখন পূর্ব অপরাধের জন্যে শাসন কর। এমতাবস্থায় প্রতিবেশীও সন্তুষ্ট হবে এবং গোলামেরও সেই অপরাধেই সাজা হয়ে যাবে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ উত্তম চরিত্রের দশটি বিষয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা দান করেন। এগুলো পুত্রের মধ্যে থাকতে পারে এবং পিতার মধ্যে না-ও থাকতে পারে– (১) সত্যবাদিতা, (২) লোকের সাথে সদ্ব্যবহার, (৩) ভিক্ষুককে দান করা, (৪) সদাচরণের প্রতিদান দেয়া, (৫) আত্মীয়তা বজায় রাখা, (৬) আমানতের হেফাযত করা, (৭) প্রতিবেশীর হক মেনে চলা, (৮) সহচরের সম্মান করা, (৯) অতিথি সেবা করা এবং (১০) লজ্জা করা। এটা সবগুলোর মূল বিষয়। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ হে মুসলমান মহিলাগণ, কোন প্রতিবেশিনী যেন তার প্রতিবেশিনীর প্রেরিত বস্তুকে নগণ্য মনে না করে, যদিও তা ছাগলের খুরই হয়। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে প্রশ্ন করল ঃ আমি কোন কাজ ভাল করেছি, না খারাপ করেছি– একথা কিরূপে জানব? তিনি বললেন ঃ যদি তোমার প্রতিবেশীকে ভাল করেছ বলতে শুন, তবে জানবে ভাল করেছ। আর যদি প্রতিবেশীকে খারাপ করেছ বলতে শুন, তবে জানবে খারাপ করেছ।

আত্মীয় স্বজনের হক ঃ নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

يقول الله تعالى انا الرحمن وهذه الرحم شققت لها اسما من اسمى فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته ـ

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ আমি রহমান। আর এই রেহেম তথা আত্মীয়তা নামকে আমি আমার নাম থেকে নির্গত করেছি। অতএব যে এই আত্মীয়তা বজায় রাখবে, আমি তাকে বজায় রাখব। আর যে

একে ছিন্ন করবে, আমি তাকে ছিন্ন করব। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে–

من سره ان يبسط له فى رزقه وان ينسئله فى اثره فليصل رحمه -

যে ভাল মনে করে যে, তার মৃত্যু বিলম্বিত হোক এবং রিযিক বৃদ্ধি পাক, সে যেন আত্মীয়তা বজায় রাখে।

এক হাদীসে আছে– যে এ বিষয়ে আনন্দিত হয় যে, তার আয়ু দীর্ঘ হোক এবং রিযিক বেড়ে যাক, সে যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং আত্মীয়তা বজায় রাখে। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ কোন্ ব্যক্তি উত্তম? তিনি বললেন ঃ যে আল্লাহকে বেশী ভয় করে, আত্মীয়তা অধিক বজায় রাখে, সৎ কাজের আদেশ করে এবং অসৎ কাজ করতে নিষেধ করে। হযরত আবু যর বলেন ঃ আমার বন্ধু (সাঃ) আমাকে আদেশ করেছেন– আত্মীয়তা বজায় রাখ যদিও তোমাকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা হয় এবং সত্য কথা বল যদিও তিক্ত হয়। যায়েদ ইবনে আসলাম (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন মক্কা বিজয়ের উদ্দেশে বের হন, তখন এক ব্যক্তি তাঁকে বলল ঃ যদি আপনি সুন্দরী রমণী ও লাল উট লাভ করতে চান, তবে মুদাল্লাজ গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযান করুন। সেখানে এগুলোর প্রাচুর্য আছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আমাকে মুদাল্লাজ গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযান করতে নিষেধ করেছেন। কারণ তারা আত্মীয়তা বজায় রাখে। হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) বলেন ঃ আমার কাছে আমার জননী আগমন করলে আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করলাম ঃ আমার মা এসেছেন। তিনি এখনও মুশরিক। আমি তার সাথে দেখা করব কি? তিনি বললেন হাঁ। এক রেওয়ায়েতে আছে; আমি তাকে কিছু দেব কি? তিনি বললেন ঃ হাঁ, আত্মীয়তা বজায় রাখ। এক হাদীসে বলা হয়েছে; ফকীর মিসকীনকে সদকা করলে একটি সদকাই হয়; কিন্তু আত্মীয়কে কিছু দিলে দুটি সদকা হয়। আল্লাহ বলেন ঃ

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ -

অর্থাৎ, তোমার প্রিয় বস্তু ব্যয় না করা পর্যন্ত পুণ্য লাভ করবে না।

এই আয়াতের মর্ম অনুযায়ী হযরত আবু তালহা (রাঃ) তাঁর প্রিয় বাগানটি আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে চাইলেন। তিনি রসূলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করলেন ঃ এই বাগান আল্লাহ্‌র পথে ফকীর ও মিসকীনদের জন্যে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ তোমার সওয়াব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। এখন একে তোমার আত্মীয়দের মধ্যে বন্টন করে দাও। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আরও বলেন ঃ অন্তরে শত্রুতা পোষণ করে, এমন আত্মীয়কে দান করা উত্তম। এটা এমন, যেমন বলা হয়েছে, তার সাথে মিল যে তোমার থেকে আলাদা থাকে; তাকে দাও যে তোমাকে বঞ্চিত করে এবং তাকে মার্জনা কর যে তোমার উপর জুলুম করে।

সন্তান ও পিতামাতার হক ঃ প্রকাশ থাকে যে, আত্মীয়তা যত নিকটতর ও মজবুত হয়, হকও ততই জোরদার হয়। সন্তানের সাথে পিতামাতার আত্মীয়তাই সর্বাধিক মজবুত ও নিকটবর্তী । তাই অন্যান্য আত্মীয়ের চেয়ে পিতামাতার হক বেশী । পিতামাতা সম্পর্কে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ সন্তান যদি পিতাকে গোলাম অবস্থায় পায়, অতঃপর তাকে ক্রয় করে মুক্ত করে, তবুও পিতার হক আদায় হবে না। তিনি আরও বলেন ঃ পিতামাতার সাথে সদাচরণ করা নামায, রোযা, হজ্জ ওমরা ও আল্লাহর পথে জেহাদ করার চেয়ে উত্তম। আরও বলা হয়েছে– যে ব্যক্তি সকালে পিতা ও মাতা উভয়কে সন্তুষ্ট করবে, তার জন্যে জান্নাতের দিকে দু'টি দরজা খুলে যায়। সন্ধ্যায় যে এরূপ করে তার জন্যেও তাই হয়। পিতামাতার একজন থাকলে এক দরজাই খুলবে– যদিও তারা উভয়েই জুলুম করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সকালে পিতামাতাকে নারাজ করে, তার জন্যে দোযখের দিকে দু'টি দরজা খুলে যায়। আর যে সন্ধ্যায় নারাজ করে, তার অবস্থাও তদ্রূপ। একজন থাকলে এক দরজা খুলবে– যদিও তারা জুলুম করে। একথাগুলো তিনি তিন বার উচ্চারণ করলেন। এক হাদীসে আছে– জান্নাতের সুগন্ধি পাঁচ'শ বছরের দূরত্ব থেকে পাওয়া যায়। কিন্তু নাফরমান সন্তান ও আত্মীয়তা ছিন্নকারী তার ঘ্রাণ পাবে না। আরও বলা হয়েছে, নিজের পিতামাতা, ভাইবোন ও অন্যান্য আত্মীয়দের প্রতি আত্মীয়তার ঘনিষ্ঠতা অনুযায়ী অনুগ্রহ কর। বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা মূসা (আঃ)-কে বললেন ঃ হে মূসা, যে

ব্যক্তি তার পিতামাতার আনুগত্য করে, আমি তাকে অনুগত হিসাবে লেখি। আর যে ব্যক্তি পিতামাতার নাফরমানী করে এবং আমার আনুগত্য করে, আমি তাকে নাফরমান হিসেবে লেখি। কথিত আছে, যখন হযরত ইয়াকুব (আঃ) তাঁর পুত্র ইউসুফ (আঃ)-এর কাছে মিসরে গেলেন, তখন হযরত ইউসুফ (আঃ)-দাঁড়াননি। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রতি ওহী পাঠালেন, তুমি তোমার পিতার সম্মানার্থে দণ্ডায়মান হওয়া কঠিন মনে করলে কি? আমার ইযযত ও প্রতাপের কসম, তোমার ঔরস থেকে কোন নবী পয়দা করব না। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ কেউ সদকা দিতে চাইলে নিজের পিতামাতার নামে দিতে পারে, যদি তারা মুসলমান হয়। এই সদকার সওয়াব তারা উভয়ে পাবে এবং পুত্রও তাদের সমান সওয়াব পাবে, তাদের সওয়াব হ্রাস করা ব্যতীতই। মালেক ইবনে রবীয়া (রাঃ) বলেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় বনী সালমার এক ব্যক্তি এসে আরজ করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আমার পিতামাতা মারা গেছেন। আমার উপর তাদের আদায় করার মত কোন হক আছে কি? তিনি বললেন ঃ তাদের জন্যে নামায পড়ে মাগফেরাতের দোয়া কর, তাদের অঙ্গীকার-ওসিয়ত পূর্ণ কর, তাদের বন্ধুদের সম্মান কর এবং তাদের কারণে যেসব আত্মীয়তা আছে সেগুলো বজায় রাখ। তিনি আরও বলেন ঃ মায়ের সাথে সদাচরণ পিতার তুলনায় দ্বিগুণ। আর বলা হয়েছে ঃ মায়ের দোয়া দ্রুত কবুল হয়। এর কারণ জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি বললেন ঃ মা পিতার তুলনায় অধিক মেহেরবান হয়ে থাকে। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল ঃ আমি কার সাথে সদাচরণ করব? তিনি বললেন ঃ নিজের সন্তানের প্রতি অনুগ্রহ কর। তোমার পিতা-মাতার যেমন তোমার উপর হক রয়েছে, তেমনি তোমার সন্তানের প্রতিও হক রয়েছে। এক হাদীসে আছে– আল্লাহ সেই পিতার প্রতি রহম করুন, যে তার সন্তানকে সৎ হতে সাহায্য করে। অর্থাৎ, এমন মন্দ কাজ করে না, যদ্দ্বারা সন্তান নাফরমান হয়ে যায়। কথিত আছে, সন্তান সাত বছর বয়স পর্যন্ত পিতার খেলনা ও ফুলের তোড়া, আরও সাত বছর পর্যন্ত খাদেম, এর পর হয় দুশমন, না হয় শরীফ। আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ সন্তান জন্মের সপ্তম

দিনে তার নাম রাখবে ও আকীকা করবে এবং চুল ইত্যাদি পরিষ্কার করবে। ছয় বছর হলে তাকে আদব শিক্ষা দেবে। বয়স নয় বছর হলে তার বিছানা আলাদা করে দেবে। তের বছর বয়স হলে তাকে নামায পড়ার জন্যে প্রয়োজনবোধে প্রহার করবে। যখন বয়স ষোল বছরে পৌঁছে, তখন বিয়ে করাবে এবং হাত ধরে বলবে– আমি তোমাকে আদব শিখিয়েছি, লেখাপড়া করিয়েছি এবং বিয়ে দিয়েছি। এখন আমি আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করি তোমার ফেতনা থেকে এবং আখেরাতে তোমার আযাব থেকে। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে, সন্তানের হক পিতার উপর এই যে, তাকে ভাল আদব শেখাবে এবং তার ভাল নাম রাখবে। এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোবারকের কাছে নিজের পুত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। তিনি বললেন ঃ তুমি কখনও তাকে বদদোয়া করেছ কি? সে বলল ঃ হাঁ। তিনি বললেন ঃ তা হলে তুমি নিজেই তাকে নষ্ট করেছ। এখন এর কি প্রতিকার! সন্তানের প্রতি দয়া ও নম্রতা করা মোস্তাহাব। আকরা ইবনে হাবেস (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে দেখলেন, তিনি শিশু ইমাম হাসানকে আদর করছেন। আকরা আরজ করলেন ঃ আমার দশটি সন্তান আছে,আমি তাদের মধ্যে কাউকে আদর করিনি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ من لا يرحم لا يرحم (যে দয়া করে না, তার প্রতি দয়া করা হয় না)। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ) আমাকে একদিন বললেন ঃ ওসামার মুখ ধুয়ে দাও। আমি তার মুখ ধৌত করতে লাগলাম। কিন্তু ঘৃণা লাগছিল। তিনি আমার হাত ঝটকা দিয়ে নিজেই ধুয়ে দিলেন এবং আদর করলেন। অতঃপর বললেন ঃ সে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছে যে, মেয়ে হয়নি। একবার তিনি যখন মিম্বরে ছিলেন, তখন হাসান (আঃ) পিছলে পড়ে গেলেন। তিনি মিম্বর থেকে নেমে তাঁকে কোলে তুলে নিলেন। অতঃপর এই আয়াত পাঠ করলেন ঃ

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ অর্থাৎ, তোমাদের ধন-সম্পদ সন্তান-সন্ততি ফেতনা বৈ নয়।

আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ বলেন ঃ একদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) নামায পড়াচ্ছিলেন, এমন সময় হযরত হাসান (আঃ) আগমন করলেন এবং তাঁর

ঘাড়ে সওয়ার হয়ে গেলেন। তিনি সেজদায় অনেক বিলম্ব করলেন; এমন কি, নামাযীরা মনে করল, হয় তো আজ কোন নতুন ব্যাপার ঘটেছে। নামাযান্তে মুসল্লীরা আরজ করল ঃ আপনি দীর্ঘ সেজদা করেছেন। ফলে আমরা নতুন কিছু ঘটেছে বলে ধারণা করলাম। তিনি বললেন ঃ আমার সন্তান আমার উপর সওয়ার হয়ে গিয়েছিল, তাই তার মতলব পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাড়াতাড়ি তাকে নামিয়ে দেয়া ভাল মনে করিনি। এতে কয়েকটি উপকারিতা পাওয়া গেল– প্রথম, আল্লাহর নৈকট্য, যা সেজদা অবস্থায় অধিক সময় কাটল। দ্বিতীয়, সন্তানের প্রতি স্নেহ ও অনুকম্পা প্রকাশ পেল। তৃতীয়, উম্মতকে দয়া শিক্ষা দেয়া হল। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে– সন্তানের সুগন্ধি জান্নাতের সুগন্ধি সদৃশ। হযরত আমীর মোয়াবিয়া (রাঃ) আহনাফ ইবনে কায়েসকে তলব করে বললেন ঃ সন্তান সম্পর্কে আপনি কি বলেন? তিনি বললেন ঃ আমীরুল মুমিনীন, সন্তানরা আমাদের অন্তরের ফল এবং পিঠের বালিশ। আমরা তাদের জন্যে অনুগত পৃথিবী ও ছায়াবিশিষ্ট আকাশ। তাদের জন্যেই আমরা বড় বড় বিপদে ঢুকে পড়ি। তারা কিছু চাইলে দেবেন, রাগ করলে আদর করে তুষ্ট করবেন। তখন তারা মনে প্রাণে আপনাকে ভালবাসবে। আপনি তাদের প্রতি কঠোর হবেন না। তাহলে আপনার প্রতি অতিষ্ঠ হয়ে তারা আপনার দ্রুত মৃত্যু কামনা করবে। আমীর মোয়াবিয়া বললেন ঃ আহনাফ, আল্লাহর কসম, তোমার আগমনের পূর্বে আমি এযীদের প্রতি ভীষণ রাগান্বিত ছিলাম। আহনাফ চলে গেলে আমীর মোয়াবিয়া এযীদের প্রতি প্রসন্ন হলেন এবং দু'লাখ দেরহাম ও দু'শ থান তার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এযীদ এথেকে অর্ধেক আহনাফকে দিয়ে দিল।

এসব হাদীসদৃষ্টে বুঝা যায়, পিতামাতার হক অত্যন্ত জোরালো। এটা ভ্রাতৃ সম্পর্ক থেকেও অধিক জোরদার। এতে অতিরিক্ত দু'টি বিষয় রয়েছে– (১) অধিকাংশ আলেমের মতে, সন্দেহযুক্ত বিষয়সমূহে পিতামাতার আনুগত্য ওয়াজিব। তবে খাঁটি হারাম কাজে ওয়াজিব নয়। যদি তারা তোমাকে ছাড়া খেতে নারাজ হয়, তবে তোমার উচিত তাদের সাথে খাওয়া। কেননা, সন্দেহযুক্ত বিষয় বর্জন করার নাম পরহেযগারী। আর পিতামাতাকে সন্তুষ্ট রাখা ওয়াজিব। সুতরাং ওয়াজিবের উপর

পরহেযগারী অগ্রাধিকার পেতে পারে না। অনুরূপভাবে কোন নফল কাজে পিতামাতার অনুমতি ছাড়া সফর করা তোমার জন্যে জায়েয নয়। বিলম্ব না করে ফরয হজ্জে যাওয়াও নফল। কেননা, বিলম্বেও তা আদায় করা যায়। এলেমের অন্বেষণে সফর করাও নফল। তবে যদি নামায, রোযা ও অন্যান্য ফরযের এলেম হাসিল করা উদ্দেশ্য থাকে এবং শহরে কোন শিক্ষাদাতা না থাকে, তবে পিতামাতার হক আদায়ে আবদ্ধ না থেকে দেশ ছেড়ে দেবে। নতুবা তাদের ইচ্ছা ছাড়া সফর করবে না। হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি ইয়ামন থেকে হিজরত করে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে এসে জেহাদ করার সংকল্প প্রকাশ করল। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ ইয়ামনে তোমার পিতামাতা আছে কি? সে আরজ করল ঃ আছে। তিনি শুধালেন ঃ তারা তোমাকে অনুমতি দিয়েছে কি? সে আরজ করল ঃ না। তিনি বললেন ঃ তুমি প্রথমে গিয়ে তাদের অনুমতি নাও। অনুমতি দিলে এসে জেহাদ কর। নতুবা যতটুকু সম্ভব তাদের আনুগত্য কর। কেননা, এটা তওহীদের পরে সর্বোত্তম আমল, যা তুমি আল্লাহ তাআলার সামনে নিয়ে যাবে। অন্য এক ব্যক্তি জেহাদের ব্যাপারে পরামর্শ নেয়ার জন্যে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার মা জীবিত আছে কি? সে আরজ করল ঃ আছে। তিনি বললেন ঃ তার সাথে থাক। জান্নাত তার পদতলে। অন্য এক ব্যক্তি খেদমতে হাযির হয়ে হিজরতের বয়াত করার আবেদন করল এবং বলল ঃ আমার পিতামাতাকে কাঁদিয়ে আপনার কাছে এসেছি। তিনি বললেন ঃ তুমি তাদের কাছে যাও এবং যেমনি কাঁদিয়েছ তেমনি হাসাও। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে–

حق كبير الاخوة على صغيرهم كحق الوالد على ولده .

অর্থাৎ, বড় ভাইদের হক ছোট ভাইদের উপর পুত্রের উপর পিতার হকের অনুরূপ।

গোলাম ও চাকরদের হক ঃ প্রকাশ থাকে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সর্বশেষ ওসিয়ত ছিল, তোমরা তোমাদের গোলাম ও বাঁদীদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করবে। তোমরা যা খাবে তা থেকে তাদেরকে খাওয়াবে; যা পরিধান করবে, তা থেকে তাদেরকে পরিধান করাবে। তাদের দ্বারা বলপূর্বক এমন কাজ করাবে না যার সাধ্য তাদের নেই।

তাদের মধ্যে যাকে পছন্দ করবে তাকে রাখবে, আর যাকে অপছন্দ করবে তাকে বিক্রি করে দেবে। আল্লাহর সৃষ্টিকে আযাব দিয়ো না। তিনি তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে তাদের মালিকানাধীন করে দিতেন। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন ঃ এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে জিজ্ঞেস করল ঃ আমরা খাদেমের ত্রুটি-বিচ্যুতি কয়বার মার্জনা করব? তিনি চুপ করে রইলেন। এর পর বললেন ঃ প্রত্যহ সত্তর বার মার্জনা করবে। হযরত ওমর (রাঃ) প্রত্যেক শনিবারে মদীনা থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত আওয়ালী যেতেন। তিনি যদি গোলামদেরকে কোন সাধ্যাতীত কাজে নিয়োজিত দেখতেন, তবে তাদের কাজ কিছুটা হ্রাস করে দিতেন। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) এক ব্যক্তিকে সওয়ারীতে দেখলেন। তার গোলাম তার পেছনে দৌড়ে আসছিল। তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহর বান্দা, একেও তোমার পেছনে বসিয়ে নাও। কারণ, সে তোমার ভাই। তোমার মধ্যে যেমন প্রাণ আছে তেমনি তার মধ্যেও আছে। লোকটি গোলামকে পেছনে বসিয়ে নিল। অতঃপর হযরত আবু হোরায়রা বললেন ঃ বান্দা আল্লাহর কাছ থেকে দূরেই সরে যায় যে পর্যন্ত গোলাম তার পেছনে পায়ে হেঁটে চলে। আহনাফ ইবনে কায়েসকে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি সহনশীলতা কার কাছে শিখেছেন? তিনি বললেন ঃ কায়েস ইবনে আসেমের কাছে। তাঁর প্রসিদ্ধ ঘটনা হচ্ছে, তিনি গৃহে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় তাঁর বাঁদী কাবাবের একটি শিক তাঁর কাছে নিয়ে এল। শিক বাঁদীর হাত থেকে ছুটে গিয়ে কায়েসের ছেলের উপর পড়ে। ফলে সে আহত হয়ে মারা গেল। বাঁদী অত্যন্ত ভীত হল। তিনি ভাবলেন, মুক্ত করা ছাড়া তার ভয় দূর করা যাবে না। তিনি বললেন ঃ ভয় করিস না। যা, তুই মুক্ত। আওন ইবনে আবদুল্লাহর গোলাম তাঁর আদেশ লঙ্ঘন করলে তিনি বলতেন, তুই তোর প্রভুর মত হয়ে গেছিস। তোর প্রভু আল্লাহ তাআলার নাফরমানী করে আর তুই তোর মনিব প্রভুর নাফরমানী করিস। একদিন গোলাম তাঁকে অনেক ব্যথা দিলে তিনি বললেন ঃ তোর ইচ্ছা আমি তোকে প্রহার করি। কিন্তু তা হবে না। যা, তুই মুক্ত। মায়মুন ইবনে মেহরানের কাছে মেহমান এলে তিনি বাঁদীকে তাড়াতাড়ি খানা আনতে বললেন। বাঁদী হাতে খাদ্যভর্তি পেয়ালা নিয়ে দ্রুত রওয়ানা হল। পা পিছলে যাওয়ার কারণে গরম খাদ্য তার প্রভুর

মাথায় পড়ে গেল। তিনি আর্তচিৎকার করে বললেন ঃ আমাকে জ্বালিয়ে দিল রে। বাঁদী শশব্যস্ত হয়ে আরজ করল ঃ হে নেকী ও আদবের গুরু, আল্লাহ তাআলার এরশাদ অনুযায়ী কাজ করুন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ আল্লাহ তাআলার এরশাদ কি? বাঁদী বলল ঃ আল্লাহ বলেন– وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ। যারা ক্রোধকে দমন করে। মায়মুন বললেন ঃ আমি ক্রোধ দমন করলাম। বাঁদী বলল ঃ এর পর আল্লাহ বলেছেন– وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ এবং যারা মানুষকে ক্ষমা করে। তিনি বললেন ঃ আমি তোকে ক্ষমা করলাম। বাঁদী বলল ঃ আরও কিছু সদাচরণ করুন। কেননা, আল্লাহ বলেন ঃ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ আল্লাহ সদাচরণকারীদেরকে ভালবাসেন। তিনি বললেন ঃ তুই আল্লাহর ওয়াস্তে মুক্ত। ইবনে মুনকাদির বলেন ঃ জনৈক সাহাবী তাঁর গোলামকে প্রহার করলেন । গোলাম বলতে শুরু করল, আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে ছেড়ে দিন, কিন্তু তিনি ছাড়লেন না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) গোলামের ফরিয়াদ শুনে সাহাবীর কাছে গেলেন। তাঁকে দেখে সাহাবী প্রহার বন্ধ করলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এই গোলাম তোমাকে আল্লাহর দোহাই দিয়েছে; কিন্তু তুমি মাফ করনি। এখন আমাকে দেখে হাত গুটিয়ে নিয়েছ। সাহাবী লজ্জিত হয়ে আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে সে মুক্ত। তিনি বললেন ঃ যদি তুমি এরূপ না করতে, তবে দোযখের আগুন তোমার মুখ ভস্ম করে দিত। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে– গোলাম যখন তার প্রভুর কল্যাণে কাজ করে এবং আল্লাহ তাআলার এবাদত উত্তমরূপে সম্পাদন করে, তখন সে দ্বিগুণ সওয়াব পায়। আবু রাফে (রাঃ) যখন মুক্ত হলেন, তখন কাঁদতে কাঁদতে বললেন ঃ আমি দু'রকম সওয়াব পেতাম। এখন একটি চলে গেল। নবী করীম (সাঃ) বলেন ঃ আমার সামনে এরূপ তিন ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হয়, যারা সর্বপ্রথম জান্নাতে যাবে এবং এরূপ তিন ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হয়, যারা সর্বপ্রথম দোযখে ঢুকবে। যে তিন ব্যক্তি সর্বপ্রথম জান্নাতে যাবে, তাদের একজন শহীদ, দ্বিতীয় জন সেই গোলাম, যে আল্লাহ তাআলার এবাদত উত্তমরূপে করে এবং প্রভুর মঙ্গলের জন্যে কাজ করে। তৃতীয় জন পুণ্যবান, অধিক সন্তানবিশিষ্ট, সওয়াল বর্জনকারী ব্যক্তি। আর যে তিন ব্যক্তি সর্বপ্রথম দোযখে ঢুকবে, তাদের প্রথম জন জালেম আমীর; দ্বিতীয় জন এমন ধনী, যে আল্লাহর হক আদায় করে না

এবং তৃতীয় জন আস্ফালনকারী ফকীর। হযরত আবু মসউদ আনসারী (রাঃ) বলেন ঃ আমি আমার গোলামকে প্রহার করছিলাম, এমন সময় পেছনের দিক থেকে দু'বার শব্দ শুনলাম, হে আবু মসউদ, খবরদার। মুখ ফিরিয়ে দেখি রসূলুল্লাহ (সাঃ) দাঁড়িয়ে আছেন। আমার হাত থেকে বেত পড়ে গেল। তিনি বললেন ঃ তার উপর তোমার যতটুকু ক্ষমতা, তার চেয়ে অনেক বেশী ক্ষমতা তোমার উপর আল্লাহ্ তাআলার রয়েছে। এক হাদীসে বলা হয়েছে- যখন তোমাদের কেউ গোলাম ক্রয় করে, তখন প্রথমে যেন তাকে মিষ্টি খাওয়ায়। এটা তার পক্ষে ভাল। হযরত আবু হোরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ তোমাদের কারও জন্যে তার গোলাম খানা নিয়ে এলে সে যেন তাকে সঙ্গে বসিয়ে খাওয়ায়। এরূপ না করলে তাকে আলাদা দিয়ে দেবে। এক ব্যক্তি হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ)-এর খেদমতে পৌঁছে দেখল, তিনি আটা গুলছেন। লোকটি আরজ করল ঃ আপনি গুলছেন কেন? গোলাম কোথায়? তিনি বললেন ঃ গোলামকে অন্য কাজে পাঠিয়েছি। তাকে এক সাথে দু'কাজ দেয়া আমি পছন্দ করিনি। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে- كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته তোমরা সকলেই প্রজাওয়ালা। তোমাদের প্রত্যেককেই তার প্রজা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।

মোট কথা, গোলামের হক সংক্ষেপে এই ঃ খাদ্য ও পোশাকে তাদেরকে নিজের শরীক করবে এবং তাদের দ্বারা সাধ্যাতিরিক্ত কাজ নেবে না। তাদেরকে অহংকার ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখবে না। তাদের ত্রুটি বিচ্যুতি মার্জনা করবে। তাদের প্রতি ক্রোধ হলে চিন্তা করবে, তুমিও তো আল্লাহ তাআলার গোলাম, তাঁর আনুগত্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি করে থাক। তিনি শাস্তি দেন না। এ গোলাম অন্যায় করে থাকলে তাতে আশ্চর্য কি? আল্লাহ তাআলা তোমার উপর অধিক ক্ষমতাবান।

দ্বিতীয় খণ্ড
সমাপ্ত